বিভূতিভূষণের অপ্রকাশিত দিনলিপি

(১৯৩৩, '৩৪ ও '৪১)

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদিত

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স / ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট/কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৭
এপ্রিল ১৯৬০

প্রকাশক সমীরকুমার নাথ/নাথ পাবলিশিং / ২৬ পণ্ডিতিয়া প্লেস/কলকাতা ৭০০০২৯
মুদ্রক আর. রায়/সুব্রত প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ / ৫১ ঝামাপুকুর লেন/কলকাতা ৭০০০০৯

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

১

সব মুখবন্ধই বোধ হয় হৃদয়োন্মুখ। মুখের নয়, হৃদয়ের কথা। না হলে, সত্যিই কি লেখার দরকার ছিল? কতকগুলি ব্যষ্টির বা সমষ্টির প্রতি ঋণস্বীকারে ঋণ কি শেষ হয়ে যায়?

আমার হয়নি। এই বই লিখতে গিয়ে লেখাই বাহুল্য, আনন্দ তো পেয়েছি প্রচুরই, সেই সঙ্গে মিলেছে অস্থির এক বিস্ময় আর শঙ্কাতুর এক সংশয়। যন্ত্রের তাড়নায় হোক আর অন্তরের প্রেরণাই হোক সব লেখককেই পরিণামে সন্তুষ্ট, সমাহিত হতে হয়; নইলে পাঠকের ওপর তাঁর প্রভুত্ব বা প্রিয়তা কোথায়? এর শেষ বিচারের আশায় ভবভূতি থেকে ভবিষ্যৎ সবাই বসে আছেন। আমার অভীষ্ট আমার দেবতা।

পাতায় পাতায় বইয়ের বিপুলতা বেড়েছে। কেমন করে বাড়ল, কখন বাড়ল, আমার ভাল করে মনে পড়ে না। তার বড় কারণ বোধ হয়, আরও এক বিপুলতার অবিস্মরণীয় স্পর্শ আমি পেয়েছি। অবিস্মরণীয়কে নিয়েই আমার অপরিসীম বিস্ময় আর সংশয়।

মনে হয়েছে, এ কি গ্রন্থ না মনুষ্যহৃদয়গ্রন্থ? প্রয়োজনের উপলক্ষকে কতবার অতিক্রম করে সে এক মনুষ্য মহাদেশে গিয়ে পৌঁচেছে যেখানে শুদ্ধ, পরিমূঢ় বোধ না করে পারিনি। এত অজস্র দান! এত যাচিত-অযাচিত সাহায্য! বড়কে মনে করে রাখতে তত উদ্বিগ্ন বোধ করিনি, যত করেছি এই নামগোত্রহীন মনুষ্যজনপদকে। এঁদের কারও স্বীকৃতি হয়ত অগোচরেই রয়ে গেল নামহীন স্মৃতিসুখ হয়ে। সে আমার অনায়ত্ত ব্যর্থতা, পরিণামহীন অনুশোচনা। উচ্চ-তুচ্ছ, মহৎ-মধ্যম যাঁরা এই রচনার চারপাশে সহায়তার সামান্যও উপচার নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন স্মরণে-বিস্মরণে আমি তাঁদের সবাইকে প্রণাম জানাই।

প্রণম্যের সুবিশাল প্রান্তদেশে যেমন আমার আচার্য ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড সুকুমার সেন, পরম শ্রদ্ধেয় ড রমেশচন্দ্র মজুমদার, ড. দীনেশচন্দ্র সরকার, ড. নীহাররঞ্জন রায়, ড. রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, ড রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন-উপাচার্য হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত, পরিমল গোস্বামী, মণীন্দ্রলাল বসু, লীলা মজুমদার, এমন আরও কত জ্ঞানী-গুণিজন তেমনি অপর প্রান্তে নামহীন এক মুদির দোকানের মালিক, মোক্তার,

মফস্বলবাসী চিকিৎসক, স্কুলের শিক্ষক, কেরানী, গৃহস্থ বধূ ও গ্রাম্য বিধবা। এতগুলি মনুষ্যহৃদয়ের সমাবেশে স্বভাবতঃই আমি আচ্ছন্ন, আবিষ্ট।

যাঁদের অকৃপণ সহায়তা ব্যতিরেকে এই গ্রন্থের বর্ণপরিচয় আমার এবং পাঠকের চির অপরিচিত থেকে যেত তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্যা বিভূতিভূষণের সহধর্মিণী রমা (কল্যাণী) বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁদের পুত্র তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (বাবলু) ও ড বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। এই তিনটি হৃদয় আমার অন্তরের যথার্থ মহাজন।

বর্তমান গ্রন্থে সম্পাদনা এক অংশে সাহিত্য, ভাষা এবং অপর অংশে সাহিত্যাতিরিক্তকে নিয়ে। প্রথম যৌবনাবধি যাঁদের চরণ সান্নিধ্যে বিদ্যারসের সুখ পাই সেই ড সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ড সুকুমার সেন শরীরের অসুস্থতা নিয়েও কী গভীর অধ্যবসায়ে এই গ্রন্থের সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব এবং সাহিত্যবহির্ভূত অংশগুলি সমাহিত করেছেন যার স্মরণে লব্ধ বস্তুর জন্যে ছাত্রের শুধু বিনীত কৃতজ্ঞতা নয়, সর্বোপরি এক আচ্ছন্নতায় মন ভরে যায়। 'পিতামাতা জন্ম দিল / গুরু দিল গুণ / আলোনা ব্যঞ্জন যেন / তাতে দিল নুন।'

এই গভীর অভিভবের সঙ্গে আরও এক চিরতর অভাব যুক্ত হয়ে রইল। পাণ্ডুলিপির সঙ্গে যাঁর একদা এত নিবিড় সম্পর্ক ছিল (দেখা হলে কৌতুক করে বলতেন, কী বৈকুণ্ঠের খাতা বগলে এনেছেন তো ?) আমার সেই পূজ্য আচার্য ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই বই দেখে যেতে পারলেন না।

সম্পাদনায় সাহিত্য অংশে বাঙলা, সংস্কৃত, ইংরেজি, ইউরোপীয় এবং সাহিত্যের ইতিহাস, ভূগোল, নৃতত্ত্ব, প্রত্নবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ছায়াছবিবিদ্যা এবং আরও অন্যান্য সম্পাদ্য ব্যাপারে আমায় সহায়তা করেছেন ড নীহাররঞ্জন রায়, ড রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, ড. রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন-উপাচার্য হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, ড. সীতানাথ গোস্বামী, ড. অমলেন্দু দে, ড. বেলা লাহিড়ী, ড অমলেন্দু লাহিড়ী, বনবিভাগের প্রাক্তন-ডিরেক্টর কনক সেন, কেন্দ্রীয় জুওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার ড বিশ্বরঞ্জন দত্ত, ড. অজিতকুমার ভট্টাচার্য, ড প্রফুল্লকুমার দত্ত, জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রয়াত গ্রন্থাগারিক গোবিন্দলাল রায়, স্টেটসম্যান পত্রিকার কর্মী এবং গবেষক সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের সবাইকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা।

১৯৩৩ থেকে এই দিনলিপি শুরু ; অর্থাৎ আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে।

দিনলিপির অধিকাংশ মানুষই কে যে কোথায় কোন্ জনতায় বা নির্জনতায় চিরতরে মিশে গেছেন তাঁদের সংবাদ-সংগ্রহ সত্যিই একপ্রকার সাধ্যাতীত ব্যাপার। সেই অসাধ্য সাধন করেছেন একদিকে বারাকপুর-গোপালনগর-বনগাঁর অপরদিকে ঘাটশিলা-সারাণ্ডার অসংখ্য মানুষ।

লেখাই বাহুল্য, বিভূতিভূষণের জীবনে দুটি বাসস্থান ছিল—এক তাঁর বনগাঁ-বারাকপুরের বাড়ি আর তাঁর সিংভূম-ঘাটশিলার বাড়ি এ ছাড়া কলকাতায় ছিল তাঁর মেস এবং কর্মস্থল। এই তিন অঞ্চলের মানুষেরা ব্যক্তিপরিচিতির ব্যাপারে আমায় প্রাণভরে সাহায্য করেছেন। বনগাঁ-বারাকপুর ব্যাপারে তো বিশেষ করে ভুলতে পারি না বনগাঁ স্কুলের শিক্ষক বিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্তের কথা। বিভূতিভূষণের ওপর এঁর একটি সুখপাঠ্য গ্রন্থও আছে; নিঃসঙ্গ আরণ্যক বিভূতিভূষণ। ইনি ব্যক্তিপরিচিতি, বনগাঁ স্কুলের বিভূতিভূষণ পড়াকালীন ছবি এসব দিয়ে তো সাহায্য করেইছেন, আরও বিস্ময়কর, অযাচিতভাবে বিভূতি-ভূষণের একটি অপ্রকাশিত দিনলিপি উদ্ধার করে আমার বাড়ি বয়ে দিয়ে গেছেন। এঁর সহযোগিতা এবং মহত্ত্বকে আমি অন্তরে অন্তরে প্রণাম জানাই। ব্যক্তিপরিচিতির ব্যাপারে আমায় আরও সাহায্য করেছেন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ('মিতে'), তাঁর সন্তান ড. সলিলভূষণ মুখোপাধ্যায় (বলু), ড. প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পতিতপাবন চট্টোপাধ্যায়, সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় (সন্তু), অন্নপূর্ণা গোস্বামী, যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ফেলুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উমা বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ চট্টোপাধ্যায় (পাথুরিয়াঘাটা), সুবোধ ঘোষ (দিল্লী), কৃষ্ণধন দে, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, পশুপতি ভট্টাচার্য, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, অমিয়া চৌধুরী, নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুবর্ণবালা দাশগুপ্ত, পরিমল গোস্বামী, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সুপ্রভা চৌধুরী, লীলা মজুমদার, মণীন্দ্রলাল বসু ও পারলামেন্টের প্রাক্তন আণ্ডার সেক্রেটারী মহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য। বিশেষ করে এই শেষোক্ত জনটি ছিলেন বিভূতিভূষণের কলকাতার স্থানীয় সংবাদদাতা। বাড়িও ছিল বিভূতিভূষণের মির্জাপুরের মেসবাড়ির কাছে আমহার্স্ট স্ট্রীটে। মেসে, নয় পুঁটিরামের দোকানে, নয় রকে বসত সকালে-বিকেলে বিরাট আড্ডার আসর। মহিমারঞ্জন কৌতুক করে বলতেন, Paradise Lodge (মেসবাড়ির নাম ছিল), না Paradise Lost? তিনি এই গ্রন্থে কত অসংখ্য সংবাদ যে সরবরাহ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। অজিজ্ঞাসিত হয়েও মনে পড়েছে বলে বহু সংবাদ তিনি নিজে

থেকেই আমায় পাঠিয়েছেন। বিচিত্রাতে এককালে এঁর বিভূতিভূষণের ওপর লেখাও বেরয়।

এঁদের সবাইকে আমার প্রণাম জানাই।

স্থান ও মানচিত্রের (topography এবং map-এর) দুটি বড় অংশ বিভূতিভূষণের বাসস্থানকে ঘিরে; বনগাঁ-বারাকপুর এবং ঘাটশিলা-সারাণ্ডা। এছাড়া অবশ্য উড়িষ্যার এবং ভাগলপুরের কিছু অংশ রয়েছে। বিভূতিভূষণের বাসস্থানকে ঘিরে যে দুটি বড় অংশ তার পরিধি গোত্রহীন গ্রামে, পর্বতে, পার্বত্য-নদীতে এত বিশাল এবং দুনিরীক্ষ্য যে তার অন্বেষণ এবং প্রাপ্তি একপ্রকার ভাগ্যান্বেষণ এবং সৌভাগ্য বলে মনে হয়। এই সৌভাগ্যের রূপদানে আমায় সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছেন পি. ডবলু ডি র ইঞ্জিনিয়ার সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার ইন্দুভূষণ রায়, ল্যাণ্ড রেকর্ডস এবং সার্ভেসের লালগোপাল মুখোপাধ্যায়, ন্যাশান্যাল অ্যাটলাসের গ্রন্থাগারিক নারায়ণচন্দ্র সাহা এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ড. দিলীপকুমার মিত্র। সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় কী অপরিসীম পরিশ্রম করে যে স্থান ও মানচিত্র তৈরি করেছেন তা আমায় অভিভূত না করে পারেনি। ইন্দুভূষণ রায়, লালগোলাপ মুখোপাধ্যায়, নারায়ণচন্দ্র সাহা এবং ড. দিলীপকুমার মিত্র অকাতরে যুগিয়েছেন পরিশ্রমের রসদ; এই শেষোক্ত জনের মত এমন নাছোড়বান্দা সহায়তাপরায়ণ পড়ুয়া-বন্ধু সত্যিই বর্তমানে দুর্লভ। গ্রন্থাগারের পরিসীমাতে তো বটেই, একাধিকবার তিনি অপরিমিত সাহায্য এবং ঔৎসুক্য নিয়ে নিজেই আমার বাড়ি এসেছেন। এঁদের উপকার শত প্রত্যুপকারেও অসম্পূর্ণ, অপর্যাপ্ত থেকে যায়। আমার জীবনের এইসব উত্তমর্ণকে আমি আমার অন্তরের ঋণানুভব জানাই।

এই গ্রন্থে অজিতকুমার দত্ত বিভূতিভূষণের প্রতিকৃতিটি ব্যবহার করতে দিয়ে আমায় চিরঋণপাশে বদ্ধ করেছেন। তাঁকে আমার প্রণাম।

নির্ঘণ্ট-অনুলিপিতে আমায় সাহায্য করেছে আমার পরম স্নেহাস্পদ ছাত্র-ছাত্রী তপন গোস্বামী, সুব্রত রায়চৌধুরী, তপশ্রী চট্টোপাধ্যায় এবং সাথী রায়। এদের সবাইকে আমার আন্তরিক স্নেহাশিস।

বিনীত

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকা

পঁচিশ বছরেরও বেশি হল বিভূতিভূষণ গত হয়েছেন। কিন্তু এখনও তাঁর লেখার বিরাম নেই। হয়ত আরও অনেক দিন পর্যন্তই থাকবে না। এত ছড়ানো তাঁর লেখা।

অপ্রকাশিত দিনলিপি তাঁর সেই ছড়ানো,—ছড়ানো লেখাই।

তাঁরই স্মৃতিকথা। সেই স্মরণের রাজ্যটি সর্বব্যাপী ও বিচিত্র যে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না।

বিভূতিভূষণ কখনও নোট করেছেন। লিখছেন, 'A novel on forests। ওতে নির্জনতার কথা থাকবে। গাছপালার কথা থাকবে। অরণ্যানী—খাড়া উঁচু পাথরের স্তর। ধাতুপ্রস্তর। রঙীন ঝর্ণা যা ঘন অরণ্যের মধ্যে দিয়ে নেমে আসচে। পাহাড়ের মাথায় রাঙা রোদ। শিউলি বন।···দাবানল।···টাঁড়বারো। · অনেকে দেখেছে—গভীর রাত্রের অন্ধকারে খাদানের কাছে দাঁড়িয়ে মহিষের পালকে সতর্ক করচে।'

সিংভূমের অরণ্যে ঘুরতে ঘুরতে কখনও লিখছেন, 'যীশুকে যেদিন ক্রুশে বিদ্ধ করে মারা হোল বা অশোক যেদিন রাজা হলেন, সেদিনও সামনের পাহাড়টা অমনি দাঁড়িয়েছিল—তখনকার লোক অমনি জঙ্গলে কাঠ কাটতো। কে খবর রাখতো সুদূর খাইবার গিরিবর্ত্ম দিয়ে কোন্ নতুন বিজেতার দল ভারতবর্ষে প্রবেশ করল কি না? সুবর্ণরেখা তখনও এমনি নিঃসঙ্গ নির্বিকার-ভাবে বেয়ে চল্‌তো—এইসব পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে।'

পড়তে পড়তে মনে হয় আরণ্যকের কী নিখুঁত স্কেচ!

কখনও আবার ঠিক তারই পরে সুবর্ণরেখার ধারে বসে বিভূতিভূষণ হিশেব করছেন। 'টাকা ২৯৮৬৶৹ মোট দু হাজার নশো ছিয়াশি টাকা দু'আনা মাত্র। অতএব এই সালের মাসের আয় গড়ে ২৪৮৸৶৹ আনা মাত্র। ঘাটশিলা। সুবর্ণরেখা তীরের শালবন। সকালবেলা। ২৯-১২-৪১।'

কখনও লিখছেন স্মরণীয় সেই দিনটি। ৫ই এপ্রিল, ১৯৩৩, বুধবার। 'তাড়াতাড়ি স্নান সেরে কাপড় পরে তৈরী হলুম···রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা কর্ত্তে যেতে হবে। ···মোটরে বেরুনো গেল প্রশান্তবাবুর বরানগরের বাগান বাড়ীতে। ·· প্রশান্তবাবুর স্ত্রী আমাদের জন্যে খাবার আনলেন। তারপর এল আইসক্রীম।

রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন—আরে still they come।...বল্লেন পরিচয়ে আমার 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে লিখেছেন, এ মাসে বার হবে।'

কোথাও আবার তারই একটু আগে লেখা, অবোধ এক শিশুর 'unwanted smile'-এর কথা। 'সকালে পত্রে সংবাদ পেলুম জাহ্নবীর ছোট খুকী মারা গিয়েচে। ও যে মারা যাবে তা জানতাম। তবুও মনে পড়ে কেমন হাসত সম্পূর্ণ অকারণে—সবাই তার হাসির জন্যে বকতো। উপুড় হয়ে গড়িয়ে পড়ত একা একা বাইরের ঘরটাতে। সবাই বলতো যাওগা।'

কখনও এই কলকাতা, এখানকার সাহিত্যিকদের ঈর্ষা-দ্বেষ সম্বন্ধে ভয়ঙ্কর বিরক্ত। লিখছেন, 'সাহিত্যক্ষেত্রে পরস্পর যে হিংসা, দ্বেষ, সংকীর্ণতা দেখতে পাই আজকাল, ওতে আমার মন আর সায় দিচ্চে না। এক্ষেত্রে ক্রমেই কলকাতাতেই অতি বিষময় শস্যের বীজ উপ্ত হচ্চে—আমি ভাবচি দেশে চলে যাব। দেশে থেকে আমি দেশের যা সেবা করতে পারবো এমন আর কোথাও নয়। পরিশ্রম, সেবা—সবদিক থেকে। এখানকার এ সৌখীন জীবন যাপন করে পরস্পরকে হিংসাদ্বেষ করে কি হবে?'

কখনও আবার এই কলকাতাই তাঁর খুব ভাল লাগছে, খুশি হচ্ছেন। 'কলকাতা যেন নতুন চোখে দেখলুম।... অনেক আড্ডা জুটে গিয়েচে—স্কুল, বঙ্গশ্রী আপিস,...Imperial Library,...নীরদ চৌধুরীর বাসা...নানা ধরণের atmosphere...সেখানে গেলেই আনন্দ পাই এই শরতের রোদের মাঝখানে।'

কখনও লিখছেন, 'নীরদবাবু গাড়ী নিয়ে এলেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনা কর্লুম ৪০০০ চার হাজার বৎসর আগেকার যে পর্বত লিখন পাওয়া গিয়েচে সে সম্বন্ধে। ২৬শে ফেব্রুয়ারী সেখানে যাবো।' সম্বলপুরে গিয়ে নোট করছেন অপরিচিত শব্দ। 'মুড়কি—এখানে বলে ওকড়া।'

কখনও সিংভূমের অরণ্যে ঘুরতে ঘুরতে মাহিলি-মুণ্ডা বা গোঁড় সম্প্রদায়ভুক্ত আদিম অধিবাসীদের নাম-জীবনযাত্রার কথা লিখে রাখছেন। 'পথে এক জায়গায় সাগা নামে আদিম অধিবাসীরা পাথর গলিয়ে প্রাচীন উপায়ে তামা বার করচে তার চিহ্ন দেখলুম। ঝরা বলে জাত আছে—তারা সুবর্ণরেখার বালু থেকে এখনও সোনা বার করে শুনলুম।'

কখনও লিখছেন বা জীবজন্তুর নাম। অপরিচিত পাখি, তাদের গোষ্ঠী। 'খেঁকড়া, আসকাল বলে পাখি আছে—একটা সাঁই করে উড়ে গেল—বাজ-পাখির মত শিকারী।'

আর প্রকৃতির তো কথাই নেই। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ মানেই তো প্রকৃতি।

কোথাও জ্যোতির্বিদের মত লিখেছেন আলোর ঠিকানা। 'পাহাড়ের মাথায় নক্ষত্র উঠেচে—হাউই বাজির মত একটা trail blazei খসে পড়ল।'

কোথাও লিখছেন ভূতাত্ত্বিকের মত পাথরের নাম-ধাম। 'পাথরের ওপরে বসলুম। সেখান থেকে পাহাড় দেখা যাচ্ছে, অনেক দূর পাথরে যেন বাঁধানো —কোয়ার্টজাইট্। Hematite-quartzite।'

কিছুই আর বাদ যায়নি। 'যেথা তার যত উঠে ধ্বনি'। তাঁর বাঁশীর সুরে তখনই সাড়া জেগেছে।

বিভূতিভূষণ বিপুল এই বিশ্বমন্দিরেরই পুরোহিত। 'নীল আকাশ তলে সেই বনকলমীর ঝোপে ফুটন্ত বনকলমী ফুল দেখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম—যেন এ মহাপবিত্র দেবায়তন।'

দিনলিপিতে প্রকৃতিতে, প্রেমে, ঈশ্বরে সেই বিশ্ববাসী পুরোহিতেরই বিচিত্র পরিচয় ছড়ানো।

দুই

হাডসন লিখেছিলেন, প্রকৃতিকে আমার একটুও অপরিচিত লাগে না। কারণ, মাথার ওপর ঐ নীল আকাশ, ঐ রোদ-পোড়া মাটি, ঐ বাতাস, ঐ বৃষ্টি, ঐ ঘাস আর ঐ নক্ষত্র, ঐ গাছপালা আর ঐ পশুপক্ষী কিছুই আমার অপরিচিত নয়। কারণ, আমি ওদেরই একজন।

'The blue sky, the brown soil beneath, the grass, the trees, the animals, the wind and rain, and stars are never stranger to me ; for I am in and of and am one with them.' (Hampshire Days)

বিভূতিভূষণেরও মনে হয়, এই প্রকৃতির সঙ্গে, গাছপালার সঙ্গে, পাখির গানের সঙ্গে মানুষের যোগ আছে; তাই এত ভাল লাগে। গ্রামপ্রান্তের সন্ধ্যাচ্ছায়াচ্ছন্ন বেণুবনশীর্ষের দিকে চেয়ে তাঁর মনে হয়েছে, কত দিনের কত স্মৃতি, মায়ের কত ব্যথা, পিসিমা, ইন্দির ঠাকরুন—কত কী তাঁর সঙ্গে জড়ানো।

'আজ বৈকালে হাট থেকে এসে কুঠির মাঠে গিয়ে অনেকক্ষণ বসলুম। ...ঝোপের মাথায় মাথায় কি নতুন কচি লতা সাপের মত খাড়া হয়ে গেছে।

মন পরিপূর্ণ হয়ে গেল সৌন্দর্যের ভারে—চারিধারে চেয়ে এই প্রকৃতির সঙ্গে, পাখীর গানের সঙ্গে মানুষের সুখদুঃখের যোগ আছে বলেই এত ভাল লাগে। গ্রাম-প্রান্তের সন্ধ্যাচ্ছায়াচ্ছন্ন বেণুবনশীর্ষের দিকে চেয়ে মনে হয় ওদের সঙ্গে কত দিনের কত স্মৃতি যে জড়িত—সেই বর্ষার রাতে দিদির কথা, মায়ের কত দুঃখ, আদুরী ডাইনীর ব্যর্থতা, পিসিমা, ইন্দির ঠাকরুনের,—কত সমুদ্রে যাওয়ার স্মৃতি—সেই পিটুলিগোলা [illegible]কারী দরিদ্র বালকের, পল্লী বালা জোয়ানের, কতকাল আগের সে-সব ইংরাজ বালক-বালিকার, গাং-চিল পাখীর ডিম সংগ্রহ করতে গিয়ে যারা বিপন্ন হয়েছিল—Cape Wan-এর ওদিকে গিয়ে যারা আর ফেরেনি—কত কি, কত কি।

নদীজলও আজ লাগল অদ্ভুত—শান্ত সন্ধ্যা—কেউ নেই ঘাটে, ওপারের গাছপালায় ধূসর সন্ধ্যা নেমেচে—একটি নক্ষত্র উঠেচে মাথার উপর—কোন অনন্ত দেশের বাণীর মত এই শত দৈন্যসংকীর্ণতাময় সংসারের উর্দ্ধে জ্বল জ্বল করে জ্বলচে।' (তৃণাঙ্কুর, ৪র্থ মুদ্রণ, পৃঃ ২৬)

পড়তে পড়তে মনে হয় এই প্রকৃতি কি নিছকই প্রকৃতি? যে ঋতুতে ঋতুতে রঙ বদলায়, মানুষেরই দোসর হয়ে বেড়ে ওঠে? বিভূতিভূষণের মনে হয়, শুধু তাই নয়। প্রকৃতি এক বড় বিশল্যকরণী। মৃত মূর্ছিত চেতনাকে জাগ্রত করতে অত বড় ওষুধ আর নেই। শুধু মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক আছে বলেই নয়। বলেছিলেন, চৈত্র দুপুরের অলস নিমফুলের গন্ধে, ঝরা পাতার শুকনো সুবাসে, পাখির বেলা যাওয়া উদাস গানে অনন্তের অনুভূতি খোলে।

'প্রকৃতির নিরাবরণ মুক্ত রূপের স্পর্শে এই অনুভূতি খোলে। সুপ্ত আত্মা জাগত হয় চৈত্র' দুপুরের অলস নিমফুলের গন্ধে। জ্যোৎস্নাভরা মাঠে, আকন্দ ফুলের বনে, পাখীর বেলা-যাওয়া উদাস গানে, মাঠের দূর পারে সূর্যাস্তের ছবিতে, ঝরা পাতার রাশির সোঁদা সোঁদা শুকনা শুকনা সুবাসে। প্রকৃতি তাই আমার বড় বিশল্যকরণী—মৃত, মূর্ছিত চেতনাকে জাগ্রত করতে অত বড় ঔষধ আর নাই। (তৃণাঙ্কুর, পৃঃ ৫৩-৫৪)

শুধু ব্যক্তিগত জীবনে কেন, বিভূতিভূষণের সমগ্র সাহিত্য জুড়েই তো প্রকৃতির এই বিশল্যকরণীর প্রলেপ। আর এ তো শুধু প্রকৃতি নয়, এ এক রহস্য-রসান্বিত প্রকৃতি। বনৌষধির কটুতিক্ত সুঘ্রাণে, বালিহাঁসের সাঁই সাঁই রবে যে রহস্যকে অপু, ভবানীচরণ বুঝতে পেরেছিল।

'একটি অবর্ণনীয় আনন্দে, আশায়, অনুভূতিতে, রহস্যে মন ভরিয়া উঠিল।

প্রাণবন্ত তার আশা, সে অমর ও অনন্ত জীবনের বাণী বনলতার রৌদ্রদগ্ধ শাখা-পত্রের তিক্ত গন্ধ আনে—নীল শূন্যে বালিহাঁসের সাঁই সাঁই রবে শোনায়।' (অপরাজিত, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, পৃঃ ৩৯৯)

'সেই অপূর্ব রহস্যভরা তার অবগুণ্ঠন কখনো খোলে শিশুর কাছে। কখনো বৃদ্ধের কাছে···তেলাকুচো ফুলের দুলুনিতে অনন্তের সে সুর কানে আসে···কানে আসে বনৌষধির কটুতিক্ত সুঘ্রাণে, প্রথম হেমন্তে শেষ শরতে।' (ইছামতী, ৪র্থ মুদ্রণ, পৃঃ ৩৭৬)

বিভূতিভূষণের সাহিত্য এই মানুষ, গাছপালা আর অনন্ত—এরই ত্রিবেণী। জীবন, প্রকৃতি আর মহাকাল—এরই সঙ্গম।

বিভূতিভূষণের দিনলিপিও এই ত্রিধারায় গড়ে উঠেছে। প্রকৃতি, প্রেম আর ভগবান। ঈশ্বর, পৃথিবী আর ভালবাসা।

কলকাতায় খেলাতচন্দ্র ক্যালক্যাটা ইনস্টিটিউশনে তখন তিনি কাজ করেন। গ্রীষ্মাবকাশে নিজের গ্রাম বারাকপুরে ফিরছেন। গ্রামে ফেরা বিভূতিভূষণের কাছে একরকম নিজের কাছে ফেরা। দুধারের বাঁশঝাড়, উঁচু পোতা, ইছামতীর কালো জল পেরিয়ে নিজের কাছে পৌঁছনো। সেখানে তার সত্তার শান্তি, প্রাণের আরাম।

'দুধারে বাঁশঝাড়, উঁচু পোতা—নদীটা বেঁকে গিয়েছে—সুন্দর নদীটি—কলকাতার কোনো কর্মব্যস্ততা বা হাঙ্গামা এখানে নেই—আত্মা পরিপূর্ণ আকারের মধ্যে সতেজ হয়ে উঠে।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ৮. ৬. ১৯৩৩)

'নিথর কালো নদীজলে, ওপারের উলুবনের দিকে চোখ রেখে, পাখীর গান শুনতে শুনতে···যা আরাম ও শান্তি। (অপ্রকাশিত দিনলিপি ১১. ৬. ১৯৩৩)

'মোল্লাহাটীর মাঠ পর্যন্ত পথটা বাস্তবিক সৌন্দর্যশালী। একদিকে বাঁওড়, একদিকে বাঁশঝাড় ভারী সুন্দর দেখতে। বিকেল হয়েচে, পাখী ডাকচে—Joy of life যেন সারা অঙ্গে অঙ্গে অনুভব করছিলুম।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ৯. ৬. ১৯৩৩)

সেই অনুভবে কলকাতা কখন দূরের স্মৃতি হয়ে ওঠে, চেতনার গা থেকে একঘেয়েমির মালিন্য অপসৃত হয়। মনে হয় চিরকাল যেন এমন সহজের কাছাকাছিই বাস করছি।

'মোট বার দিন এসেচি বারাকপুরে, এরই মধ্যে কলকাতা মিলিয়ে মুছে গিয়েছে যেন। যেন বারাকপুরেই চিরকাল আছি মনে হচ্চে। কি সুন্দর লাগে

এখানে। boredom বলে পদার্থ নেই এখানে।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ২৭. ৫. ১৯৩৪)

'বারাকপুর যেমন ভাল লাগে—কলকাতা কিন্তু তেমন লাগে না।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ২০. ৬. ১৯৩৩)

শুধু স্বগ্রাম বলে নয়, যথার্থ গ্রাম বলেই বারাকপুর তাঁর এত প্রিয়। মাঝামাঝি জায়গা—যেখানে না আছে কলকাতার মত মানুষ আর 'deep seated culture' অথবা বারাকপুরের মত প্রকৃতি আর 'queerness of character', সে জায়গা তাঁর ভাল লাগে না। প্রকৃতির হিশেব মেলাতে বিভূতিভূষণের কোনদিন ভুল হয়নি। উলুখড়ের মাঠ, বাবলা শিমূলের সীমান্ত দিয়ে ঘেরা বারাকপুরের ইছামতীতে স্নান করতে করতে মনে হয়েছে,—বনগাঁতেও তো এই ইছামতী, কই সেখানে স্নান করে তো এত আনন্দ হয় না। বিভূতিভূষণ লিখছেন, তার কারণ বারাকপুরের প্রকৃতির মোহস্পর্শ। মনকে একদণ্ডও নিস্তেজ বা নিরানন্দ থাকতে দেয় না, সব সময়েই কিসের নেশায় মশগুল করে রাখে।

'এক বারাকপুরের মত স্থান নয়তো কলকাতা—এর মাঝামাঝি জায়গা অর্থাৎ বনগাঁয়ের মত petty সহরগুলো অতীব dull. এখানে না আছে প্রকৃতি, না আছে মানুষ। এদের না আছে গভীর ও deep seated culture—না আছে পাড়াগাঁয়ের মানুষের queerness of character। এরা যেমন dull, তেমনি uninteresting।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ৩. ৬. ১৯৩৩)

'বনগাঁয়ে থাকবার সময় এই boredom আমি ছুটীতে এখানে থাকতে শেষের দিকে বড় বেশী অনুভব করেচি। বারাকপুরে একদণ্ড মন নিস্তেজ বা নিরানন্দ থাকে না—সব সময় যেন কিসের একটা মোহে মন ডুবে থাকে—কিন্তু বনগাঁয়ে মন অবসাদগ্রস্ত ও নিষ্প্রভ হয়ে প্রতিদিনের মুহূর্তগুলো বিষময় করে তোলে। ছুটীর প্রথম দিকে যা অনুভব করেছিলাম—ছুটীর শেষের দিকে তা ভাল করেই বুঝেছিলাম। যারা পরামর্শ দিচ্ছে বনগাঁয়ে বাড়ী কর্তে—তারা একথা বুঝবে না।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ১৮. ৫. ১৯৩৩)

'আমাদের ঘাটে নাইতে গিয়েও এই কথাই মনে পড়ল—আমাদের দেশের মত দেশ আর নেই। ইছামতীর জলে স্নান করেও সুখ—ওপারের দিকে চেয়ে ওই উলুখড়ের মাঠ-নদী, বাবলা, শিমুল বন। বনগাঁয়ে ইছামতীর বাঁধা ঘাটে স্নান করে দেখেছি—সেখানে কোন আমোদই হয় না। অথচ এই ইছামতী তো

সেখানেও—কেন এমন হয়? (অপ্রকাশিত দিনলিপি ১. ৬. ১৯৩৩)

নিজের বলেই যে ব্যারাকপুরের মত এমন দেশ আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না তা নয়। বিভূতিভূষণের মনে হয় ব্যারাকপুর আর চারপাশের গ্রাম অতুলনীয় তার প্রাকৃতিক সম্পদে। এত অল্প জায়গার মধ্যে গাছপালার এমন বৈচিত্র্য, কুঁচ আর সাঁইবাবলায়, সর্বোপরি বাঁশবনে প্রকৃতির এমন ঘন সন্নিবেশ অন্যত্র দেখা যায় না। অর্থাৎ বারাকপুরের ecology-র বৈশিষ্ট্য তিনি বোঝেন।

'সত্যই আমাদের গ্রামটা ও চতুষ্পার্শ্ববর্তী পল্লীগুলি প্রাকৃতিক সম্পদে অতুলনীয়। এ সম্ভব হয়েচে কি জন্যে তাও আমি আবিষ্কার করেচি। অল্প জায়গার মধ্যে গাছপালার বৈচিত্র্য অনেক বেশী। বিশেষ করে কুঁচবন, সাঁই বাবলা, শিমুল, বাবলা, নলবন, উলুখড়—সকলের ওপর বাঁশবন আমাদের দেশে নদীর ধারে অত্যন্ত ঘন সন্নিবিষ্ট।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ১০.৬.১৯৩৪)

প্রকৃতি তো নয়, মনে হয় এ যেন এক বিরাট রঙিন খেলনা! খেলুড়ে সেই মুগ্ধমতির কৌতূহল আর মেটে না। শিশুর মতই সে অবাক, আত্মহারা। 'দেশকে এত ভাল লাগে। দারিঘাটার কাছ থেকেই আমি হাঁ করে চেয়ে থাকি গ্রামের দিকে।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ১৮.১.১৯৩৪)

বিশেষ করে এই চোত-বোশেখে। শিমুল-ছাতিম যখন পল্লবিত শাখা-প্রশাখায় মনে হয় নাচের একটা ছন্দ—চারিদিকে ঘন ছায়া, গায়ক পাখির ডাক এসব নিয়ে সত্যি অপূর্ব এই গ্রাম-বাঙলার প্রকৃতি। যদিও একেবারে ত্রুটিহীন নয়। এখানকার জমি এত সমতল না হয়ে যদি মাঝে মাঝে উঁচুনীচু হত, দিকচক্রবালে নীল শৈলমালা থাকত তাহলে তো কথাই ছিল না। তবু গালুডি, সিংভূম তো তিনি দেখেছেন। এই গ্রীষ্মে সে এক ছায়াহীন মরুভূমি। ঘাস নেই, এতটুকু সবুজ নেই। কিন্তু গ্রাম-বাঙলার প্রকৃতি সবুজে-ছায়ায় এখন এক নন্দন-কানন।

'Bengal is superb. এই সকালে সঙ্গে সঙ্গে নতুন পাতা গজিয়েচে—শিমুল, ছাতিম গাছের নৃত্যভঙ্গি কি অদ্ভুত-শাখা-প্রশাখার কি বিস্তার—কোকিল ডাকচে সর্বত্র—'Cest Grande! বিশেষ করে এই চৈত্র বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে। এই ঘাস, এই সবুজ চকচকে পাতার রাশি, এই ঘন ছায়া, এই গায়ক পাখির ডাক, বেলফুলের গন্ধ—কোথাও নেই। যদি এর সঙ্গে জমি পাহাড়ে হোত—দিকচক্রবালে শৈলমালায় নীল দীর্ঘ রেখা থাকতো—মাঝে মাঝে পাথর থাকতো

—তবে বাংলার তুলনা ছিল না…একঘেয়ে সমতলভূমি সর্বত্র—এ একটা defect বাংলার। দেখে তো এলুম গালুডি, সিংভূম—গ্রীষ্মের সব মরুভূমি, ঘাস-পোড়া, গাছে পাতা নেই, ছায়া নেই –খাঁ খাঁ করচে চারিদিকে, সবুজ নেই কোথাও। তার তুলনায় বাংলা এখন নন্দন কানন।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ১৩.৪.১৯৩৪)

একালের সেই গল্পকার যিনি লিখেছিলেন, পৃথিবীর মানুষ শুধু চোখ দিয়ে দেখে অপরাজিতাকে, আর এই চক্ষুষ্মান অন্ধ শব্দ দিয়ে, গন্ধ দিয়ে, ছোঁয়া দিয়ে বোঝে অপরাজিতাকে। ফিসফিসে শব্দে সে তার বিয়ের দিনের শাড়ি চিনতে পারে, চুড়ির আওয়াজে বুঝতে পারে তার হাত হঠাৎ দুঃখে আছড়ে পড়েছিল কপালে, বুঝতে পারে হাস্নুহানার গন্ধের সঙ্গে তার ভাঙা কাঁপা নিঃশ্বাসে কী গভীর অশান্তি।

তেমনই গন্ধের চোখ বিভূতিভূষণের। তিনি গন্ধ দিয়ে, শব্দ দিয়ে, ছোঁয়া দিয়ে সেই প্রকৃতির অপরাজিতাকে বোঝেন। অন্ধ হিরণ্ময়ের মত চোখ বন্ধ করেও যাঁর বুঝতে অসুবিধে হয় না ঘেঁটুফুলের কটুতিক্ত ঘ্রাণে, আমের বউলের গন্ধে, কোকিলের ডাকে প্রকৃতিতে আজ বসন্ত।

'পথে কি অপূর্ব বসন্তশোভা হয়েচে। বসন্তের সেই পুরাতন পরিচিত গন্ধ। দেখলুম দেশ সেইরকমই আছে—বাল্যের মতো।…ফাল্গুনে সেই গন্ধ পাওয়া যায়।…সেই পুরাতন, চিরপরিচিত চৈত্রের বাঁশবন।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ২৬.২.১৯৩৩)

'পথে ঘেঁটুফুলের তেঁতো গন্ধ ও আমের বউলে সুমিষ্ট গন্ধ।…এক জায়গায় কি অজস্র ঘেঁটুফুলই না ফুটেচে—এবার বসন্তটা খুব উপভোগ করা হোল—ঘেঁটুফুলের দিক থেকে ও আমের বউলের দিক থেকে।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ১২.৩.১৯৩৩)

'খুব ভোরে উঠে আকাশে যখন নক্ষত্র আছে তখন খয়রামারি গেলুম।‥ভোরের হাওয়ায় ও পাখির ডাকের মধ্যে দিয়ে মহিমময় প্রভাতের হাওয়া গায়ে লাগিয়ে বারাকপুর গেলুম। পথে ঘেঁটুফুলের সুগন্ধ।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ২৬. ৩.১৯৩৩)

'ভোরে উঠে বনগাঁ।…খুব বাতাবী নেবু ফুলের গন্ধ, আম বউলের গন্ধ,

---

১. 'চোখ গেল', সুবোধ ঘোষ।

কোকিলের ডাক চারিধারে। বেশ Soft, pretty আবহাওয়া।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ২৫. ২. ১৯৩৪)

'ভোরে কেমন সুন্দর জ্যোৎস্না পড়েছে— ···শেষ রাতের জ্যোৎস্না এক অদ্ভুত জিনিস—কত পল্লীপ্রান্তরের ঘেঁটুবনের কথা মনে করে দেয়—কত নির্জন নদীতীর—কত মা ও ছেলের করুণ ইতিহাস। সে সব কথা এই প্রভাতের বসন্ত জ্যোৎস্নায় মনে এল আবার।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ১৬. ৩. ১৯৩৩)

প্রকৃতির চেহারা বদলায়। ঘেঁটুফুলের কটুতিক্ত ঘ্রাণে,' আমবউলের সুগন্ধে বসন্তে যে প্রকৃতিকে চেনা গিয়েছিল, জলের গন্ধে বোঝা যায় সেই প্রকৃতিতে গ্রীষ্ম এসেছে। কীটস্, সুইনবার্ন আর প্রি-র‍্যাফেলাইট কবিদের মত এইসব জায়গায় বিভূতিভূষণের প্রকৃতিও কী চিত্ররূপময়, ইন্দ্রিয়নির্ভর! এইসব মুহূর্তে প্রকৃতির সেই সর্বাধিক শারীরিক কবিকে মনে না পড়ে পারে না যিনি নরম জলের গন্ধে, বাতাসে ঝিঁঝির ঘ্রাণে প্রকৃতিকে চেনেন।[১] সেই জলের গন্ধে ও স্পর্শে, কালবৈশাখীর নীলকৃষ্ণ মেঘসজ্জায়, চরের শ্যামলতায়, সোঁদালি ফুলের দুলুনিতে বিভূতিভূষণেরও গ্রীষ্মপ্রকৃতি কী sensuous!

'ঈশান কোণে [মেঘ] জমে এল—বৃষ্টি পড়তে লাগল—আমি বৃষ্টি মাথায় নিয়ে নদীজলে পড়লাম—ওপরে ওপরে সাঁতার দিতে লাগলুম। কি আনন্দ! ওপারের নীল চরে বিদ্যুৎ চমকাচ্চে। অপূর্ব সবুজ শিমুল গাছ ওধারে, নদীজলের গন্ধ—জলের কালো ঢেউ···সে এক অপূর্ব ব্যাপার।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ২৯. ৪. ১৯৩৪)

'অপূর্ব শোভা—গাঁঙের ওপারে কালবৈশাখীর মেঘ উঠেছে—ঘন নীলকৃষ্ণ মেঘসজ্জা—সে কি অপূর্ব দেখতে হয়েচে। নদীর ধারে সেই সোঁদালি ফুল দোলানো মাঠটাতে গেলুম।···ঝড় উঠল।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ১৬. ৫. ১৯৩৩)

'বৃষ্টি এল···কি নীলকৃষ্ণ মেঘ, কি বিদ্যুৎ, কি মাধবপুরের চরের শ্যামলতা —আমার উপাসনা ঐ ঝোড়ো মেঘে—অমন কালবৈশাখীর রূপে মনের মধ্যে যে ভাব জাগায় দেবতার আশীর্বাদের মত তা আসে।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ২২. ৪. ১৯৩৪)

১. 'মৃত্যুর আগে', জীবনানন্দ দাশ

বিভূতিভূষণের কাছে গ্রীষ্ম-বসন্তের মত বর্ষারও একটা আলাদা গন্ধ আছে। সে গন্ধ তাঁর আশৈশবের। তারই স্মরণে লিখেছেন, 'বর্ষাকালে বনগাঁ থেকে বাড়ী গেলে এরকম গন্ধ পেতুম—এবার তা পেয়েচি।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ৫. ৭. ১৯৩৩)

বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না, প্রকৃতির ঘরকন্নায় কোথায় কী আছে সবই বিভূতিভূষণের নখদর্পণে। দিনলিপির পাতা থেকে সত্যি মাঝে মাঝে চোখ ফেরাতে পারা যায় না যখন মনে হয় ইন্দ্রিয়ে-অতীন্দ্রিয়ে এমন করে প্রকৃতির রূপানুরাগ থেকে ভাবসম্মিলন, চোখের আলোয় এমন করে ভেতরে-বাইরেকে দেখা এবং বোধ হয়, বিভূতিভূষণের মত কতিপয়েরই সম্ভব। শুধু দেখা নয়, ঘ্রাণের রাস্তা ধরেও তিনি ঋতুরঙ্গশালায় প্রবেশাধিকার পেয়েছেন। জীবনানন্দ যে রোদের গন্ধ পেয়েছিলেন, বিভূতিভূষণও বর্ষার প্রকৃতিকে চেনেন ইছামতীর বনপ্রান্তে সেই রোদের গন্ধ দিয়ে। চালতেপোতার বাঁক থেকে ভারাক্রান্ত শ্রাবণের উঠে আসা, গাঙের ঘোলা জলে ঢলনামা, জলের ধারে পাড় ভেঙে পড়া এসব তো আছেই।

'গাঙের ঘোলা জলে ঢল নেমেচে। ···সেঁয়াকুল কাঁটার ঝোপটা জলের ধারে পাড় ভেঙে পড়ে গিয়েচে···সে দৃশ্যের তুলনা নেই। বড়লোকদের বাড়ীর অত লেস ঝোলানো পর্দার চেয়ে কত ভাল লাগে এটা দেখতে,. (অপ্রকাশিত দিনলিপি ৯. ৮. ১৯৪৩)

'কি অপরূপ নীলকৃষ্ণ ঘন মেঘরাশি। চালতেপোতার সাঁকোর দিক থেকে উড়ে এল। তারপর ঝমঝম বৃষ্টি ও হাওয়া।···এই ধরণের ঝড়বৃষ্টির অভিজ্ঞতা না থাকলে কখনো তার কথা লেখা যায় না।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ৩.৭.১৯৩৩)

'এ কদিনে আকাশের রং অপূর্ব নীল—ঠিক যেন শরৎ পড়ে গেছে—মাটী শুকনো খটখটে—এমন চমৎকার বর্ষা ঋতুর দৃশ্য অনেকদিন দেখিনি—রৌদ্রের গন্ধ ইছামতীর তীরের বনপ্রান্তে বসে ঘোলাজলের দিকে চেয়ে চেয়ে যদি অনুভব কর্তে পারি—তবেই ছুটীটি সার্থক হবে।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ২৮.৭.১৯৩৩)

তবু বিভূতিভূষণের কাছে প্রকৃতি শেষ পর্যন্ত শুধুই প্রকৃতি নয়, আরও এক প্রকৃতির ভাষা সে। তাঁর দিনলিপি-উপন্যাসে কতবার তিনি বলেছেন, গাছপালা, ফুলফল, আলোছায়া এ সব কিছুর সঙ্গে আমাদের আশৈশব সম্পর্কের ফলে পৃথিবীর যে একটা 'spiritual nature' আছে, প্রকৃতির যে এক নিহিত রূপ আছে সেটা আমরা কিছুতেই বুঝতে পারি না।

'এই পৃথিবীর একটা spiritual nature আছে, আমরা এর গাছপালা, ফুলফল, আলোছায়া, আকাশবাতাসের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেচি বলে, এর প্রকৃত রূপটি ধরা আমাদের পক্ষে বড় কঠিন হয়ে পড়ে।' (তৃণাঙ্কুর, পৃঃ ৩)

'এই পৃথিবীর একটা আধ্যাত্মিক রূপ আছে, এর ফুলফল, আলোছায়ার মধ্যে জন্মগ্রহণ করার দরুন এবং শৈশব হইতে এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের বন্ধনে আবদ্ধ থাকার দরুন, এর প্রকৃত রূপটি আমাদের চোখে পড়ে না।' (অপরাজিত, ২৬ পরিচ্ছেদ)

বর্ষা অপরাহ্নে ঘন সবুজের প্রাচুর্যে বৃষ্টি-ধোওয়া নীল আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁর মনে হয়েছে, রঙীন মেঘবর্ত্ম দিয়ে স্বর্গে-মর্তে বাস্তবিকই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

'বর্ষায় বৃষ্টিধৌত নির্মল রাঙা রোদভরা অপরাহ্নের সে দৃশ্য সত্যই অদ্ভুত—বাতাসের কি freshness! কি সুন্দর গন্ধ!…কি soft colour scheme আকাশের—নীল সে অদ্ভুত নীল—তেমনি নীল সত্যই কচিৎ দেখা যায়। চারিধারের মেঘস্তূপ…রাঙা গোধূলির রঙ বটের সারির গায়ে—নীচে ঘন সবুজের প্রাচুর্য—থৈ থৈ জল—মাথার ওপরে অপূর্ব রঙীন আকাশ। আমার মনে পড়ল কেবলই তাদের কথা যারা পৃথিবী ছেড়ে নানা দুঃখে চলে গিয়েচে—হরি রায়, কামিনী বুড়ী, নদীর ধারে শীতের সন্ধ্যায় গ্রামের কত বুড়বুড়ীদের চিতা জলতে দেখেচি—খুকী, গৌরীর কথাও মনে পড়ল—এই শ্রাবণসন্ধ্যায় সে প্রদীপ হাতে আমাদের ভিটায় সন্ধ্যা দিত—বাবা, মা, পিসিমা—সবাই ঐ নীল আকাশের রঙীন মেঘবর্ত্ম দিয়ে বহুদূরের কোন পথযাত্রায় বেরিয়ে চলে গিয়েছে…স্বর্গে মর্তে বাস্তবিকই যে সম্বন্ধ আছে…সে কথা সেদিন…মনে মনে আর অস্বীকার কর্তে পারলুম না।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ২৯. ৭. ১৯৩৩)

'কি নদীর ধারের গাছপালার প্রাচুর্য—কি শ্যামলতা!…অনেকদিন পরে কলকাতার কৃত্রিম সমাজের চোখ নিয়ে এসে এদের দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল।…সবুজ গাছপালা, শ্রাবণের আকাশভরা রোদ…আমি বসে বসে জন্মমৃত্যুর রহস্য পড়চি…বড় আনন্দে কাটল অনেকদিন দুঃখের পর।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ১. ৮. ১৯৩৪)

'সন্ধ্যায় পিঙ্গলবর্ণের মেঘ হয়েচে। মনে একটা strange bliss—এ ধরণের জীবনে খুব হয় না। মাথার উপরে একটা নক্ষত্র উঠেচে। কোথায় দূরে কি একটা পাখী ডাকচে—সমস্তটা মিলিয়ে একটা অদ্ভুত শান্তি।' (অপ্রকাশিত

দিনলিপি ১০ ৬. ১৯৩৪)

বিভূতিভূষণের উপন্যাসে-দিনলিপিতে যে অনন্ত অলস নিমফুলের গন্ধে, বনৌষধির কটুতিক্ত সুঘ্রাণে ধরা দেয়, ফুলে-ফলে, আলোয়-ছায়ায় পৃথিবীর যে আধ্যাত্মিক রূপ শায়িত হয়ে থাকে, স্বর্গ-মর্ত্য, জন্ম-মৃত্যু-চক্র যে দেবতার হাতে আবর্তিত হয়, বিভূতিভূষণ কতবার লিখেছেন, তিনি যে শুধু প্রবীণ বিচারক, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, বিজ্ঞ ও [illegible] কিংবা অব্যয়, অক্ষয় প্রভৃতি দার্শনিকতার আবরণে আবৃত তা নয়, তিনি এক মহাশিল্পী।[১] এ পৃথিবী তাঁরই গহন গভীর শিল্পরহস্য, বিশ্বযন্ত্রের লয়-সঙ্গতির এক মনোমুগ্ধকর তান।[২] বৃষ্টিভেজা বাঁশবন, মেঘান্ধকার সন্ধ্যা, নীরব ভেককুল, এই বর্ণনাতীত নির্জনতা তাঁরই হাতের সৃষ্টি।

শরৎ আসন্ন। মাথার ওপরে গাঢ় নীল আকাশ। ঝোপ আলো করে ভায়োলেট রঙের একটা বনকলমী ফুল। আর তারই ওপরে এক বিচিত্র বর্ণের প্রজাপতি। বিভূতিভূষণের মনে হয়, মহাশিল্পীই তিনি। এ বিশ্বপ্রকৃতি তাঁরই মহাপবিত্র দেবায়তন।

'অপূর্ব রূপ এখানে বিশ্বরূপের, জনহীন গ্রাম্য বাঁশ আমবন, মেঘান্ধকার বর্ষণমুখর সন্ধ্যা, ভেককুল নীরব, জোনাকী জ্বলে না—তিনি যেন অবর্ণনীয় উদাসীনতায় নির্জন রূপ দিয়েচেন এখানে। এ একটা creation—এ রূপ যে দিতে পারে, এ ভাষায় যে কথা বলে—সে মহাশিল্পী।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ১ ৬.১৯৪৩)

'সেই অপূর্ব নীল রংয়ের আকাশ ও বিচিত্র আকৃতিবিশিষ্ট বর্ষণক্লান্ত আষাঢ় অপরাহ্ণের অপরূপ মেঘমালা, সবুজ বৃক্ষলতার পাহাড়ের দিকে চোখ রেখে বিশ্বরূপ সম্বন্ধে কত কথাই ভাবলুম। ··সূর্যাস্তের রংএ···এক টুকরো আকাশ কি ইন্দ্রজাল তৈরী করেচে। ধূসর বর্ণের যেন একটা পাহাড় তার চারিপাশে পাটকিলে রংএর সমুদ্রতট, তার কালো নারিকেল কুঞ্জ—দূরে সেই সমুদ্রতট বেয়ে নীল কিশোর যেন আসছেন···গলায় বনমালা···জগৎ-জোড়া বনফুলের সুবাস চুলে···একা। এ সবের তোরণদ্বার স্বরূপ আমার সামনে কি একটা ঝোপ—তাতে একটা ফিঙে পাখি । আমি আনন্দে অভিভূত হয়ে গেলুম—বিশ্বরূপ! বিশ্বরূপ! মহাশিল্পী তুমি।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ৭.৭.১৯৪৩)

১. আরণ্যক, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, পৃঃ ২৫২। ২. ইছামতী, পৃঃ ২৬৭।

'ঠিক শরতের রোদ।... বাড়ীর পিছনে একটা ঝোপে ভায়োলেট রঙের বনকলমী ফুল ঝোপ আলো করে ফুটে থাকতে দেখলুম—আবার ঠিক তার ওপর...একটা ফুলে সে প্রজাপতিটা বসলো। মাথার ওপরে...গাঢ় নীলাকাশ, চারিপাশে গরম শরতের পরিপূর্ণ রোদ...ঘন সবুজ ঝোপের মাথায় এই অপূর্ব ফুটন্ত বনকলমী ফুলের দৃশ্য—একটা ফুলে প্রজাপতি বসেচে।..জয় হোক বিশ্বশিল্পী, জয় হোক তোমার।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ৬.৮.১৯৪৩)

'বাঁশতলার ঘাটে একখানা বাঁশে ভর দিয়ে খরস্রোত নদীতে মাঝখানে দাঁড়িয়ে অপরূপ বনঝোপের দিকে চেয়ে কি আনন্দই পেলুম।. একটা ঝোপের মাথায় বনকলমীর ফুল ফুটেছে...মাথার উর্দ্ধে নীল আকাশ, চকচকে সবুজ ঝোপ...গাছের মাথায় মাকাল লতা উঠেচে—দুপুরের আকাশে ঘুঘু ডাকচে—আমার সেই স্বপ্নের শরৎ অন্তকালের বহু বিস্মৃত দিনের আনন্দ মুহূর্তের অলিখিত ইতিহাস এই দিনগুলিতে যেন কোথায় লেখা আছে।...জয় হোক বিশ্বের অধিদেবতার। যিনি অপূর্ব সৃষ্টি, এই পাখির গান, এই শরতের সোনালী মধ্যাহ্ন কল্পনা করেচেন।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ১৫.৮.১৯৪৩)

শ্রাবণের শেষ। শরৎই বলতে পারা যায়।

যদিও সত্যি করে শরতের গন্ধ, বর্ষার জল-পাওয়া সতেজ প্রকৃতিতে, বিভূতিভূষণের কাছে আরও গাঢ়, ঝাঁঝালো। সেই সঙ্গে লতায় আটকে থাকা শিশিরে, নবীন সূর্যালোকে, বেগুনী বনকলমী ফুলে, ঘন নীল আকাশের নীচে লাল টুকটুকে মাকালফলের দুলুনিতে সে কী নয়নের মনোহর! তার অপরাহ্ন, সন্ধ্যা কী প্রশান্ত, রহস্যময়!

সূর্যাস্তের আলোয় আকাশের. নদীজলের রঙ বদলায়। প্রকাণ্ড বটগাছটা সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রশান্ত আর গম্ভীর হয়ে ওঠে। আকাশের মাথায় বহুদূরে শুকতারা ওঠে। এইসব মুহূর্তে প্রকৃতির নিস্তব্ধতা, বিভূতিভূষণকে নিজের কাছে এনেছে। শুধু প্রকৃতিকে ভালবাসা নয়, সহৃদয় বন্ধুর মত প্রকৃতি বিভূতিভূষণকে তাঁর সাহিত্যের স্বক্ষেত্র চিনিয়েছে। বুঝতে পেরেছেন, তাঁর স্থান এই পাড়াগাঁয়ে, নদীতীরের ছোট্ট কুটিরে। এই ঝিঙেফুলের কথা, এই সহজ জীবনের কথাই তাঁকে লিখতে হবে, ধার করা complex জীবন সমস্যা—এ তাঁর ক্ষেত্র নয়।

'এবার দেশের শোভা হয়েচে অপূর্ব। গাছপালার সেই ঘন সুগন্ধে বাতাস ভরপুর। আজ আবার আকাশ অপূর্ব ধরনের নীল। কত কি ফুল ফুটেচে—

কখনো মিষ্টি গন্ধ, কখনো বা অন্য ধরনের গন্ধ।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ২৮. ১০. ১৯৩৩)

'কি সুন্দর শরতের প্রাতঃকাল—লতায় শিশির, নবীন সূর্যালোক। বাঁধের ধারে ধারে কি চমৎকার বেগুনী বনকলমী ফুল ফুটেছে··· ডোবাতে লালফুল। ... গাছে গাছে মাকালফল পেকে দুলচে—কি চমৎকার।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ৮. ৯. ১৯৩৩)

'নৌকাতে সাতভেয়েতলা বেড়াতে গেলুম। যাবার ও আসবার সময় গাছপালা, বেতঝোপ ও কুঁচবনের ধারে কি অপূর্ব শোভা।···সত্যি বাংলার গাছপালার যে অপূর্ব রূপ, এমন বৈচিত্র্য, এমন শ্যামলতা, এমন প্রাচুর্য এক Tropical Countries ছাড়া আর কোথাও ভৌগোলিক কারণেও সম্ভব নয়।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ১৯. ৯. ১৯৩৩)

'কূলে কূলে ভরা ইছামতী—ঝোপে ঝোপে ভায়োলেট বনকলমী ফুল—এদিকে আবার বেতের ঝোপ ঘন সবুজ, সে এক অপূর্ব ব্যাপার।···প্রধানতঃ বটগাছটা সন্ধ্যার অন্ধকারে যেন প্রশান্ত, গম্ভীর—তেমনি রহস্যময় দেখাচ্চে। আসবার সময় সে কি অপূর্ব রূপ আকাশের, নদীজলের। মেঘের রং বদলে গেল—নদীজল রাঙা হয়ে উঠেচে। ধারে ধারে ক্ষেতে সন্ধ্যায় ঝিঙেফুল ফুটেচে। কত শান্তি মনে এনে দেয়—চারিধার নিস্তব্ধ, দূরে বহুদূরে পশ্চিম আকাশে শুকতারা উঠেচে। মনে হোল আমার স্থান এই পাড়াগাঁয়ে। নদীতীরের ছোট্ট কুটীরে। কলকাতায় নয়—এদের কথা লিখতে হবে—এই ঝিঙেফুলের কথা, জীবনের কথা। জার্মানি থেকে ধার করে আনা complex জীবন সমস্যা আমাদের দেশের নয়। (অপ্রকাশিত দিনলিপি ৯. ৯. ১৯৩৩)

কার্তিকের সেই delicious গন্ধটা চিনতে বিভূতিভূষণের অসুবিধে হয় না। গত সপ্তাহেও গ্রামে এসেছিলেন, পাননি। কার্তিকের মাঝামাঝি এই গন্ধটা পাওয়া যায়। প্রকৃতির ভাঁড়ার খুঁজে-পেতে দেখেছেন, গন্ধটা মরচে ফুলের। এই সময়ে কেয়োঝাঁকারও কী মিষ্টি গন্ধ বার হয়! হেমন্তের বনের মধ্যে ঢুকে মনে হয়, কেন লোকে পয়সা খরচ করে ট্রপিক্যাল ফরেস্ট দেখতে যায়। গাছ-গাছালির বিচিত্র সমাবেশে এখানে বন কি কম বিজন ও গভীর? ইছামতীতে নৌকোর ওপর বসে থাকতে থাকতে রাঙা রোদে হেমন্তকে আরও ভাল দেখায়; চারদিকে অদ্ভুত নিস্তব্ধতা, silence of the jungle—অপূর্ব লাগে।

'এবার বনগাঁয়ে এসে সেই গাছপালার অপূর্ব delicious সুগন্ধটা পাচ্ছি। ও সপ্তাহে পাইনি। কার্তিকের মাঝামাঝিই ও গন্ধটা পাওয়া যাবে।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ২৭. ১০. ১৯৩৩)

'এই সময়ে মরচের ফুল ফোটে—এবং এই সময়ের গন্ধটা মরচে ফুলের সম্প্রতি আবিষ্কার করেচি। মাখন সিমের গোলাপী দলগুলি ঘন সবুজ পাতার আড়ালে দেখা যাচ্চে—কেয়োঝাঁকার ফুলে কেমন একটা মিষ্টি গন্ধ।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ৪. ১১. ১৯৩৪)

'প্রকৃতির মধ্যে বাস—বেশ লাগে আমার। সকালে বাড়ীর পেছনের বন দেখে মনে হোল পয়সা খরচ করে ট্রপিক্যাল ফরেষ্ট দেখতে এখানে ওখানে যাবার দরকার নেই—এই তো ট্রপিক্যাল ফরেষ্ট।...এর চেয়ে বন নাগপুরে গভীর নয়।...বৈকালে বারাকপুরে ইছামতী নদীর ধারে একটা নৌকার উপর বসে রইলুম। রোদ রাঙা হয়ে গেছে, একটা নিস্তব্ধতা—silence of the jungle—বেড়ে সুন্দর।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ১৯. ১১. ১৯৩৩)

বিভূতিভূষণের দিনলিপিতে শীতের গন্ধ নেই, কিন্তু স্বভাব আছে। সে স্বভাব বিষণ্ন, নির্জন। সন্ধ্যায় বাঁশবনের নিস্তব্ধতায় যে শীতকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তাকেই তিনি অনুভব করেছেন স্বগ্রামের অন্ধকার রঙ্গমঞ্চে। বারাকপুর আজ শ্মশান, কেউ নেই। পৃথিবীতে শীত এসেছে। তবু বিভূতিভূষণ তো জীবনানন্দের মত শীতের কবি নন। তিনি বিশ্বাস করেন, এটুকু শেষ নয়, এখানে আরম্ভও নয়।[১] ইছামতীতেও তাই। সেখানেও লিখেছেন, জলের স্রোতে নতুন ইতিহাস লেখা হবে কালের বুকে।[২] তবু শীতের বিষণ্নতার মানে আছে। সে মানে চিরবসন্তের দোরগোড়ার কাছে আসা। সৌন্দর্যের কথায় শেলি বলেছিলেন, রহস্যবশতঃই সে প্রিয়তর[৩], জীবনের কথায় বিভূতিভূষণও বলতে পারতেন, বিষণ্নতাবশতঃই সে গভীরতর। শীত সেই বিষণ্ন গভীরতারই ঋতু।

'নিস্তব্ধ অন্ধকার বাঁশবন। কালো বাঁশঝাড়ের পটভূমিতে প্রজাপতি উড়চে—জনপ্রাণী নেই কোথায়। শীতের জনহীন, বিষণ্ন সন্ধ্যা। আজও বনভূমি সেই শৈশব স্বপ্নমাখা—অথচ রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার, বারাকপুর আজ শ্মশান—কেউ নেই—সব পালিয়েচে। স্বপ্ন স্বপ্নই আছে এখনও—তেমনই নবীন, তেমনই মোহময়।...

---

১. অপরাজিত, ২৬ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৩৯৯। ২. ইছামতী, ৪র্থ মুদ্রণ, পৃঃ ২৬৭।
৩. Hymn to Intellectual Beauty।

ব্যারাকপুরের মত মনকে নাড়া দেয় না কোন জায়গা। Depth of Being পর্যন্ত দেখা যায় এখানে এলে।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ৩০.১২.১৯৩৩)

এই হচ্ছে বিভিন্ন ঋতুতে তাঁর গ্রাম—গ্রাম্য প্রকৃতি। কিন্তু সারাণ্ডা-ঘাটশিলার আরণ্য প্রকৃতিতে এসব ঋতু কিরকম? সেখানেও কি শীত অমন depth of being নিয়ে আসে? বর্ষা আসে অমন soft colour scheme-এ? জলের গন্ধে গ্রীষ্ম আসে? ঘেঁটুফুলের কটুতিক্ত সুঘ্রাণে বসন্ত?

অবশ্য অরণ্য বলেই অরণ্যানিতে তা হবার নয়। কারণ একটা বন-বাদাড় আর একটা অরণ্য। একটা wood, আর একটা forest। ঋতুতে ঋতুতে দুটো প্রকৃতির ছবি আলাদা তো হবেই। যদিও মূলে তারা উভয়েই শান্তরসাস্পদ। তবু তার মধ্যে একটা পার্থক্য, একটা স্বগত ভেদ চোখে পড়ে। এই রূপের ফারাক পথের পাঁচালী, ইছামতীর গ্রামপ্রকৃতির সঙ্গে অপরাজিত, আরণ্যকের আরণ্য প্রকৃতির। দিনলিপিতেও এর কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি।

আগেই বলা হয়েছে, বিভূতিভূষণের সাহিত্যে প্রকৃতি তো নিছক প্রকৃতিই নয়, একটা spiritual natureও বটে। কী গ্রাম্য, কী আরণ্যপ্রকৃতি উভয়ই এক অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক প্রকৃতিরই প্রশস্ত দরজা। দুই প্রকৃতিই শেষ পর্যন্ত এক ভাগবতী অনুভবে মানুষকে নিয়ে যায়। যেখানে বিশ্বের অধিদেবতা এক হয়েও বিচিত্র, বিবিধ। ঘেঁটুফুলের গন্ধ, ঝোপে ঝোপে বনকলমী ফুল, ইছামতীর নদীজলে সূর্যাস্তের আভা, বৌ-কথা-কও পাখির ডাক, দূর আকাশের নক্ষত্র—গ্রাম বাঙলার এইসব ছবি-গান-গন্ধ বিভূতিভূষণকে যে দেবতার সামনে এনে দাঁড় করায় তিনি লোকে-লোকান্তে পরিব্যাপ্ত হয়েও বড়ো ঘরোয়া, বিশ্বের কারণ হয়েও মানুষেরই পিতার মত সন্তানকাতর, স্নেহে অসহায়।

'ঘেঁটুফুলের বনে···এমন সুন্দর লাগে। বাবা যখন অক্ষম হয়, তখন যেমন ছেলেদের জন্যে খেলাঘরের পুতুল করে দেয়, ভগবান যেন অক্ষম বাবা, সামান্য ঘেঁটুফুল করে রেখেচেন—একা থাকেন, কেউ তিরস্কার করলে কেঁদে ফেলেন। অন্তত তিনি, সবই পারেন তো। স্নেহ হয় তার জন্যে।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ১. ৩. ৪৫)

কিন্তু অরণ্যে সেই দেবতার রূপই ভিন্ন। সারাণ্ডা-ঘাটশিলার উঁচু নীচু প্রান্তর, অনাবৃত পাহাড়ের দেহ ভঙ্গি, শালমঞ্জরীর সুবাস, বন্য জন্তু-জানোয়ার অধ্যুষিত অঞ্চল, জনহীন জ্যোৎস্নালোকিত বনভূমি—অরণ্য প্রকৃতির এইসব 'বিশাল ছবির রাস্তা ধরে যে দেবতার কাছে গিয়ে বিভূতি-

ভূষণ পৌঁচেছেন সে দেবতা রহস্তরসে, সৃষ্টির বিরাটত্বে এক মহান দেবশিল্পী। বিভূতিভূষণের পল্লীপ্রকৃতির কিশোর বনমালী আরণ্যপ্রকৃতির মুক্ত প্রান্তরে নৃত্যশীল নটরাজের বেশে আবির্ভূত হয়েছেন।

'শালবনের ছায়ায় গিয়ে বসি। মনে অপূর্ব ধ্যানের ভাব আসে। মনে পড়ে আমাদের বিশ্ব উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রের দলের মধ্যে অবস্থিত এক বিরাট spiral নেবুলা।...এর কেন্দ্র sagittarius নক্ষত্রপুঞ্জের কাছাকাছি। দুশো পঞ্চাশ লক্ষ বছরে এ বিশ্ব একবার পাক খাচ্চে। ঝরা শালপাতার রাশির উপরে গভীর বনে পাখীর কূজনের মধ্যে একা বসে গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করে মনে হয় বৈদিক যুগে আছি। গভীর শান্তি। ভগবানকে মুখোমুখি পাই। তিনি এই বিরাট শান্তির মধ্যে, নিস্তব্ধ প্রকৃতির কোলে আসন পেতেছেন।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ৮. ৩. ১৯৪৩)

সেই নিস্তব্ধ আরণ্যপ্রকৃতিতে শীত—শীতের সন্ধ্যা কী ভাষা বহন করে আনে? সে ভাষা কি অনন্তের অন্তরতম কোন লিরিক, না বিশ্বের অধিদেবতার উদাত্ত কোন এপিক? বিভূতিভূষণ মনে করেন, সৃষ্টির বিরাটত্ব, cosmic scale-এর বিশালত্ব—এসব জায়গায় না এলে মানুষ বুঝবে কী করে? নিজের সাহিত্যের পরিচয় দিতে গিয়ে বিভূতিভূষণ যে সীমাহীন দেশকালের দেবতার কথা বলেছিলেন তাকেই আরণ্যপ্রকৃতিতে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। ঘর-গেরস্থালির কথা সেখানে তুচ্ছ লাগে।

'সন্ধ্যায় পূর্ণচন্দ্র উঠল। পূর্বদিকের পাহাড়ের মাথায় বেশ দেখালে। রাত্রে একবার খুব জ্যোৎস্না উঠল—চারিধারের পাহাড় প্রান্তর চমৎকার দেখায়। ইসমাইলপুরের কথা স্মরণ হয়—কেবল তফাৎ এই যে এখানে সংসার ও গেরস্থালির আবহাওয়া।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ৩০. ১. ১৯৩৪)

'এই ঘর গেরস্থালি...জমি বন্দোবস্ত......এসব ভাল লাগে না। রাত্রে কি অপূর্ব জ্যোৎস্না উঠেছে। চারিধারের পাহাড় উঁচু নীচু টিলা, ডুংরী পাহাড়, একটা নটরাজের মূর্তি......weird ও অদ্ভুত দেখায়—জঙ্গলে বুনো হাতি, বনমোরগ, বাঘ, হরিণ, ভালুক...ডাইনে চাঁইবাসায় নেতারহাটের পাহাড়। একটা পাথরের উপর কতক্ষণ বসে রইলুম। ও পাশের পাহাড়ের ওপর দিকে চাঁদ উঠেছে।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ৩১. ১. ১৯৩৪)

'কি জ্যোৎস্না উঠে গাছ পাহাড় weird করে দিয়েচে—আসবার পথে মনে হচ্চিল সিংভূম অঞ্চলে এইসব জনহীন জ্যোৎস্নালোকিত পথে ঘোড়ায়

চড়ে যেতে যেতে পথের ধারে তাঁবু ফেলে যদি থাকি !' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ১. ২ ১৯৩৪)

'সুবর্ণরেখা পার হয়ে চাপড়ি তামার খনি বেড়াতে এসেচি...জঙ্গলে ঘেরা পাটকিটা বলে গ্রামে। যাবার পথে কি অনাবৃত পর্বত দেহস্তরগুলো তির্যকভাবে উঠেচে · ঝর্ণার জলের ধারে কাদায় বন্যহস্তীর পদচিহ্ন দেখলুম।...শাল-পিয়ালের বনের মধ্যে দিয়ে—আমি এখন একটা পাহাড়ের মাথায় বসে বসে লিখচি আর খসখস শব্দ শুনে জঙ্গলের মধ্যে আড়চোখে চেয়ে দেখছি···।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ২. ২. ১৯৩৪)

'বহেড়া গাছের তলে দুপুরে বসলুম···heat haze কাঁপচে—কি চমৎকার দেখাচ্চে মহাদেব ডুংরী range !' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ১. ২. ১৯৩৪)

'কি অনাবৃত পাহাড়ের দেহটা এই জায়গায়—তির্যকভাবে বেঁকে উঠেচে বিরাট আদিম যুগের প্রস্তর···এসব igneous rocks—অর্থাৎ পৃথিবীর আদিম যুগের গলিত ধাতু ঠাণ্ডা হয়ে এরকম হয়েচে। সৃষ্টির বিরাটত্ব, cosmic scale এর বিশালত্ব—এইসব জায়গায় না এলে মানুষে বুঝবে কি করে ?' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ২. ২. ১৯৩৪)

বিভূতিভূষণের দিনলিপি পড়তে পড়তে মনে হয় এ শুধু একটা মানুষের দিনলিপি নয়, অরণ্যেরই যেন রোজনামচা। একই ঋতুর দিনগুলোর মধ্যে কী পার্থক্য ! প্রকৃতির এই record-keeper চোখ মেলে দেখেছেন, অরণ্যে প্রথম বসন্তের আবির্ভাব শীতের সঙ্গে অনেকটা মিলে মিশে। গাছগুলো শীতের মতনই অমন পত্রহীন, রোদও বেশ মিঠে। উদ্ধত শুধু গাছে গাছে থোকা থোকা ফুলগুলো। বসন্তেরই নিশানা। আর এ সমস্ত কিছুর সঙ্গে মিশেছে সেই সৃষ্টির বিরাটত্ব। পল্লীপ্রকৃতিতে যে বসন্তকে বিভূতিভূষণ স্নিগ্ধ গন্ধে ও পাখির গানে ললিত করে দেখেছেন, আরণ্যপ্রকৃতিতে তাকেই তিনি বিশাল পর্বতগাত্রে অপরাহ্ণের ঘনায়মান ছায়ায়, বন্যতুলসীর শুকনো সুবাসে, জ্যোৎস্নালোকিত শালের শাখা-প্রশাখায় মহিমময় করে প্রত্যক্ষ করেছেন।

"পত্রহীন সাদা গাছে হলুদ ফুল ফুটেচে।···সুবর্ণরেখার তীরে···বড় বড় পাথর ·· বৃক্ষরাজি·· সামনে উঁচু নীচু ভূমি, ডুংরী রৌদ্রে চমৎকার দেখাচ্চে।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ১৫. ২. ১৯৩৪)

'সামনে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে সুউচ্চ শৈলচূড়ায় অরণ্যানী—শীর্ষে প্রত্যাসন্ন অপরাহ্ণের পীতাভ রৌদ্র, সানুদেশে টুকটুকে লাল পিরিয়াল

ফুলের ঝোপ, নিষ্পত্র শুভ্রকাণ্ড করদগুলো কেমন বেঁকে চুরে নৃত্যশীল নটরাজের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে, মাঝে মাঝে শুকনো বনতুলসীর জঙ্গল। তার সঙ্গে মিশেচে বিরাটত্ব। ধাতুর একটা বিশাল পর্বত, ধাতুরঞ্জিত, রুক্ষ, অনাবৃত। গগনস্পর্শী স্তরসংস্থান দেখলে যেন মাথা ঘুরে যায়···সন্ধ্যার ছায়ায় নিম্নের উপত্যকার ও অপরাহ্ণের রাঙা রোদ মাখানো শৈলশীর্ষের মহিমময় সৌন্দর্য।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ১৫. ২. ১৯৩৪)

'কি নিঃসঙ্গ সন্ধ্যাতারার রূপ, শালগাছের ডালের ফাঁকে, অপূর্ব জ্যোৎস্না রাত্রে সুন্দর আকাশে পরিদৃশ্যমান। পাথরের ওপর জ্যোৎস্না পড়া চকচকে শালের শাখা-প্রশাখার রূপ—যেন কোন অনাবিষ্কৃত সুন্দর অরণ্যভূমিতে একা বসে আছি জনমানবশূন্য বনের মধ্যে নির্জন রাত্রে।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ১৮. ২. ১৯৪৩)

আরণ্যপ্রকৃতির এই নিঃসীমতার মাঝখানে প্রথম আর শেষ বসন্তকে চিনতে বিভূতিভূষণের অসুবিধে হয় না। রোদের মাত্রায় তিনি বলে দিতে পারেন এখন বসন্তের বিদায়। শেষ বসন্তের রোদ গ্রীষ্মের কিনারায় ঐরকম ঝাঁঝাঁ, দিগন্তঘেরা মালভূমি ঐরকম রৌদ্রদগ্ধ।

'১৮০০ ফুট নিম্নের সমতলভূমি, গরুবাছুর, বাড়িঘর সব পুতুলের মত দেখাচ্চে। রাস্তা দেখাচ্ছে সরু সাদা সুতোর মত। গরুর গাড়ীগুলো crawl করে যাচ্চে। আমাদের কত নীচে চিল উড়ছে, সাদা বকের দল উড়চে, সম্মুখে দূরবিস্তৃত সমতলভূমি দূরত্বের কুয়াশায় আচ্ছন্ন। একটু বামে ডালমা পাহাড় দেখা যাচ্চে ধোঁয়ার মত। রোদ চড়চে, পাকুড় গাছের ছায়া ঘুরে গেল। (অপ্রকাশিত দিনলিপি ১৫. ৩. ১৯৪৩)

'ঝাঁ ঝাঁ রোদ···রৌদ্রদগ্ধ দিগন্তঘেরা মালভূমি, টাঁড় পথের ধারে, গাছ নেই, পালা নেই, চাষ নেই, পলাশ নেই, শাল নেই। Beauty of vast space! space এর মহাসমুদ্রে ডুবে আছি যেন। ক্ষীণ জ্যোৎস্না উঠলো—সেই Mesa of Arizona—সেই বিরাট space আমাকে ঘিরে রয়েচে।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ১৬. ৩. ১৯৪৩)

ভাবতে গেলে অবাক লাগে, বিভূতিভূষণের অরণ্যে প্রখর গ্রীষ্ম কোথায়, প্রচণ্ড বর্ষাই বা কই? অন্ততঃ এই সব দিনলিপির পাতায় পাতায় তারা যে একপ্রকার অনুপস্থিতই একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। শুধু অপ্রকাশিত কেন-তাঁর প্রকাশিত দিনলিপির মধ্যে স্মৃতির রেখায় দু চারটে পাতা বাদ দিলে সত্যিই

তো অরণ্যের রোজনামচায় গ্রীষ্ম এবং বর্ষা উভয়ই অনুপস্থিত। আসলে এর পেছনে কতকগুলো কারণও আছে। প্রথমতঃ, ঘটনাগত ভাবে বিভূতিভূষণ এই দুই ঋতুর অধিকাংশ সময়ই হয় বারাকপুর নয় কলকাতায় কাটিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ, অরণ্যে ঘোরার পক্ষে গ্রীষ্ম বা বর্ষা কোনটাই খুব অনুকূল নয়, এটাই স্বাভাবিক। তবু স্মৃতির রেখায় যে আমরা দু চারটে পাতা পাই তার কারণ ১৯২৮ পর্যন্ত ভাগলপুরে দিয়া-ইসমাইলপুরের জঙ্গলমহাল ছিল তাঁর কর্মস্থল। সেখানে তাঁকে থাকতে হয়েছে। সেই বাস্তব পটভূমিতেই আরণ্যকের সৃষ্টি— গ্রীষ্মের ও বর্ষার জায়গা। সেখানেও, গ্রীষ্ম যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত এবং বর্ষা অনেকটাই স্নিগ্ধ। অথচ অরণ্যে এই দুই ঋতুর একটা ভয়াবহ ও আদিম রূপ আছে। বিভূতিভূষণের স্বভাব থেকে এ দুটোই খুব দূরে ছিল। সাহিত্যে-দিনলিপিতে এই দুই ঋতুর অনুপস্থিতির এটা একটা বড় কারণ।

শরতে সেই অরণ্যকে বিভূতিভূষণ চিনেছেন মেঘ ও রৌদ্রের খেলায়। কিন্তু সমস্তই অরণ্যের বিরাটত্বে সমর্পিত। তাঁর ভাষায় soft নয়, majestic।

'সূর্যালোকে ধরণী হাসচে···মুক্ত শালবন ও ধানক্ষেতে সবুজের মধ্যে বসে বৃষ্টি এল···।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ১৮. ৯. ১৯৪৩)

'পাহাড়ের hedgeএ বসে লিখচি, মাথায় মাথায় রাঙা রোদ, কালাঝোরের মাথায় মেঘের সাদা বাষ্প আবার রোদ—সেই চেরা পথটা দেখা যাচ্চে।...পাহাড়ের শৈলমালায় কি অপূর্ব panorama·· যেন roof of the world এ বসে আছি—এত উঁচু। রোদ এবার সিদ্ধেশ্বরী ডুংরির মাথাতেও পড়ল। কি vast majesty!' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ১৭. ১০. ১৯৪৩)

সেখানেই হেমন্তের আবির্ভাব। বিভূতিভূষণ তাকে সকালের শিশিরে, আসন্ন শীতের ঠাণ্ডা বাতাসে, পর্বতশিখরের ঈষৎ কুয়াশায় চিনেছেন।

'সকালবেলা।···সামনে অর্ধচন্দ্রাকার শৈলশ্রেণী···ছোট বড় গাছ ও বনানী সকালের শিশিরসিক্ত, পাখী ডাকচে, বনমধ্যে ঝর্ণার কুলুকুলু তান সব সময় কানে আসচে।···বহু গাছ, একটা নটরাজের মত নৃত্যশীল ভঙ্গীতে শাখা বাহু বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে সামনের পাহাড়ের পটভূমিতে···নির্জন নিস্তব্ধ বনভূমি···বসে আছি, আর শুনছি অসংখ্য বনবিহঙ্গের কলতান। টুং টুং টুং টুং ···একটা পাখী ডাকচে বনে। একটা টিয়ার মত ডাকচে।···শিশির সিক্ত বনস্থলীতে বনবিহঙ্গের এ কলগীতি এ অঞ্চলেও দুর্লভ।·· ঠাণ্ডা হাওয়া বইচে। ঈষৎ কুয়াশা লেগে আছে বাঁদিকের পর্বতশিখরে।' (অপ্রকাশিত

দিনলিপি ২৪.১১.১৯৪৩)

এমনি করেই বৃহৎ অরণ্যপ্রকৃতিতে ঋতুদের আনাগোনা। এবং সে আনাগোনা কোনক্রমেই ন্যাচারালিস্টের নজরে নয়। ঝোপের মাথায় বনকলমী ফুল, ঘুঘুর ডাক, ইছামতীর জলের ওপর শান্ত সন্ধ্যা, ঝিঙে ফুলের ক্ষেত বিভূতিভূষণকে যেখানে অনন্তের গৃহদেবতার সামনে নিয়ে গিয়েছে সেখানে সীমাহীন মুক্ত প্রান্তর, সিদ্ধেশ্বরী ডুংরির ওপারে সূর্যাস্ত, অনাবৃত বিশাল পর্ব্বতগাত্র, জনহীন জ্যোৎস্নালোকিত পথ তাঁকে বিশ্বদেবতারই সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। পল্লীপ্রকৃতিতে বিভূতিভূষণ যাঁকে ভালবেসেছেন, আরণ্য-প্রকৃতিতে তিনি তাঁকেই বিস্ফারিত বিস্ময়ে প্রণাম করেছেন। যদিও তিনি জানেন সেই মহৎ প্রণম্য আশীর্বাদের জন্যেই অপেক্ষারত।

'অসীমের উদ্দেশ্যে এই প্রণাম আমার বড় ভাল লাগে।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ২৭. ৯. ১৯৩৩)

'বনের মধ্যে এখন সন্ধ্যা নামচে।···অন্ধকার পর্বতশিখর···জলজল নক্ষত্র উঠেচে মাথার ওপরে। ভগবান কোথায় কোন আকাশে এই ironstone এর পদার্থ দিয়ে এই পাহাড়ের গাম্ভীর্যের মধ্যে নিজেকে অদৃশ্য করে কোথায় আছেন সেই great being আজ তাকে বুঝলাম ভাল করে। বনে, পাহাড়ে এমনি রাত্রে, তারাভরা অন্ধকার আকাশতলে তাঁকে বোঝা যায়—মন্দিরে নয়, বাড়িতে পূজার ঘরে নয়। ··This is realisation।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ৫. ১. ১৯৪৩)

'এই বিশ্বপ্রকৃতিকে ভগবানের রূপ বলে উপাসনা করবো।···যখন দেখি কচি পাতা ওঠা শালবন—তখনই ভাবি হে অনন্ত ভগবান, এই আপনি নানা রূপে সামনে। এই কথাটা ভাবলে নতুন প্রাকৃতিক দৃশ্য—beauty of sense enjoyment এর দিক থেকে নয়—একটা আধ্যাত্মিক আনন্দ এর সঙ্গে জড়ানো থাকবে।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ৩. ৪. ১৯৪৩)

'দুদিকে শ্যামল পাহাড়, ঘন বনভূমির মধ্যে সাদা পাথরের স্তূপে বসে আছি··· সূর্য অস্ত গেল···বিহঙ্গের কলকাকলীর মধ্যে সন্ধ্যা নেমে এল—ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোক ক্রমশঃ স্পষ্টতর হোল—গাছপালা, পাথর অদ্ভুত দেখাতে লাগলো।···ভগবান অদ্ভুত আর্টিষ্ট বটে।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ১৬.১.১৯৪৩)

'সকালে বনের মধ্যে দাঁড়িয়ে। বড় বড় শালগাছের ও সামনের সেই শৈলচূড়ায় একটি গাছ একা দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু করে বনের মধ্যে, ওর

দিকে চেয়ে ভগবানের কথা মনে এল। কি অদ্ভুত এই সৃষ্টি, কত পাহাড়, কত জঙ্গল, কত বনৌষধি লতা, কত জলপ্রপাত কত awe inspiring beauty spot-এ দূর দূর নক্ষত্রের মধ্যে শত কোটি সহস্র কোটি গ্রহেও হয়তো এমনি কোটি কোটি লক্ষ কোটিবার পুনরাবৃত্তি হচ্চে—অথচ কাকে তিনি দেখাচ্চেন, কে এসব দেখে আনন্দ পেয়েছিল এই লক্ষ বৎসরের মধ্যে? সে উদাসীন কিশোর নির্বিকার লীলার আনন্দে সৃষ্টি করে চলেচেন, কিন্তু মানুষ না হলে এসব তাঁর সৌন্দর্য দেখতো কে? (অপ্রকাশিত দিনলিপি ১৯.১১.১৯৪৩)

'ভগবানের করুণা ব্যতীত এই দুর্গম অরণ্যপথে ভ্রমণ আমার দ্বারা সম্ভব হোত না। তিনি হয়তো তাঁর হাতের অপূর্ব সৌন্দর্যসৃষ্টি, যা এ পর্যন্ত কেউ ভালবেসে দেখেনি—তাই দেখাবার জন্তে উন্মুখ ছিলেন। তাই তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন—বল্লেন—দেখো, দেখ কেমন করেচি। কেউ দেখে না, কেউ আসে না—যারা আসে তারা কাঠের ব্যবসাদার। তুমি দেখো। সব জায়গা বেড়িয়ে ভাল করে ছাখো। আর বল তো কেমন হয়েচে? তোমার মুখে শুনি। জয় হোক তাঁর।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ২৮. ১১. ১৯৪৩)

তিন

বিভূতিভূষণ একটি দিনলিপিতে লিখেছিলেন, আমি কৌতূহলাক্রান্ত মহাকালের মিছিলে। এই রাজা-বাদশা, ভৃত্য, সেনাপতি—স্রোতের তৃণের মত এদের ভেসে যাওয়ার দিকটা আমায় মুগ্ধ করে।

এক কথায় সমগ্র বিভূতিভূষণের সাহিত্যেরই মর্মকথা বলতে পারা যায়। মোহিতলালকেও নিজের একটি উপন্যাসের সারাৎসার সম্পর্কে এই কথাই লিখেছিলেন; 'vastness of space and passing time'। শুধু একটি কেন পথের পাঁচালী-অপরাজিত থেকে শুরু করে ইছামতী পর্যন্ত কোন উপন্যাসে নয়? পথের পাঁচালীতে যে মহাকালকে তিনি অপুর নেপথ্যে রেখেছিলেন, অপরাজিততে বীরু রায়েরও কত আগে থেকে এবং কাজলেরও কত পর পর্যন্ত সেই মহাকালের বীথিপথকে অপুর দৃষ্টির সামনে তিনি মেলে ধরেছেন। ধনঝরি পাহাড়ের মাথায় সত্যচরণেরও সেই মহাকালের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ভবানীচরণেরও অনন্তের সঙ্গে দেখা।

দিনলিপিতেও তাই। সীমাহীন দেশকালে বিভূতিভূষণেরও অসীমানুভূতি। তাঁর eternity, তাঁর ভগবান। তারই ছায়া কখনও ঐ গ্রামের পুকুর

বিলবিলেতে, কখনও প্রথমা স্ত্রী গৌরীতে। গ্রামপ্রাচীনার কাছে বিলবিলের আদ্যিকালের ইতিহাস শুনতে শুনতে তাঁর মনে হয়েছে, এই প্রাচীনা তখন গ্রামের নববধূ, বৃদ্ধেরা তখন নবযুবক—বিলবিলে তারও আগে ছিল। আবার, কোথায় সেই গৌরীর সঙ্গে মিলনের আশায় ১৯১৮ সনের ভরা সন্ধ্যাটি, আর কোথায় এই ১৯৩৩ সনের নিঃসঙ্গ একাকিত্ব! কখনও জলধারা নির্মিত পাহাড়ী খাত দেখতে দেখতে মনে হয়, মহেঞ্জোদরো-হরপ্পার তরুণীরা যখন প্রসাধন করত তখনও এই খাতের অর্ধেকও হয়নি। তারও কত আগে এইসব পাহাড় ছিল। ভাবতে গেলে মনে হয়, পাহাড় না মহাকালের মানদণ্ড? শৈশবের ভিটে, ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ, জ্যোৎস্নায় শায়িত বন-পাহাড়, গৌরী, সুপ্রভা —সব নিয়ে অসীমেরই এক বিরাট এপিক। শোকে-দুঃখে, শান্তিতে-বিষাদে অতীব রহস্যময়। বিভূতিভূষণ তারই নাভিমূলে ফিরে গিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত অনন্তেই তিনি সমাসীন।

'আজ সকালে গ্রামের ইতিহাস কিছু কিছু সংগ্রহ করলাম। 'বিলবিলে' নামে ডোবার নাম কেন হল এইটাই ছিল আমার জিজ্ঞাসার বিষয়। হিসাব করে দেখলাম উনি [খুড়ি মা] ইংরাজী ১৮৮২ সালে এ গ্রামে এসেচেন প্রথম নববধূরূপে। তখনও উনি শুনেচেন 'বিলবিলে' নামটা। তিনি যখন আসেন তখন গ্রামের বৌ যুগলকাকার মা, যতীশ কাকার মা…ওদের ছেলেরা গ্রামের উঠতি বয়সের যুবক। এই মহাকালের গল্প বড় ভাল লাগে—আমায় মুগ্ধ করে।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ২৮. ৫. ১৯৩৩)

'১৯১৮ সালে ঠিক এই দিনেই বোধ হয় আমি এখান থেকে সন্ধ্যার ট্রেনে বনগাঁ গিয়েছিলুম…'পুরাতন ভৃত্য' আবৃত্তি কর্ত্তে কর্ত্তে। কত কথাই মনে এল। জীবনের নানা পরিবর্তন ঘটেচে। Great Spirit-কেও যেন নক্ষত্রালোকিত মহাশূন্যে দেখতে পেলুম।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ২০. ১০. ১৯৩৩)

'Time একটা প্রকাণ্ড element, মানুষের ব্যাপারে এটা বুঝেচি— মহাকাল। কিনা করে দিতে পারে মহাকাল। এর রসায়ন অদ্ভুত। (অপ্রকাশিত দিনলিপি ৮. ৭. ১৯৩৪)

'পাহাড়ী নদী পাথর কেটে গভীর নালা সৃষ্টি করেচে—স্তরে স্তরে অনাবৃত কঠিন প্রস্তর সাজানো— মহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পা নগরীতে সে যুগের নরনারীরা যেদিন প্রসাধন করতো, তখন ঐ প্রস্তরের অর্ধেকও কাটেনি। এইসব ভাবলে eternity-র সম্মুখীন হতে হয়।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ২৪. ২. ১৯৪৩)

'কত অপূর্ব জিনিস দিয়ে জীবন গাঁথা। আজমাবাদের এই কাছারীর বটগাছ, এমন বিকেলে সেই ধূধূ মাঠ, সেই আমাদের শৈশবের ভিটে, নতুন কালবৈশাখী, বৃষ্টির ভিজে মাটির গন্ধ, বেলপাহাড়ের জ্যোৎস্নাভরা মাঠ বা পাহাড়শ্রেণী, গৌরী, সুপ্রভা···কাদের কথা বাদ দেবো? সব নিয়ে এই যে জীবন—এ একটা বিরাট রহস্যময় Epic'। (অপ্রকাশিত দিনলিপি ৪. ৫. ১৯৩৩)

'অন্ধকার আকাশে ওপরে ছায়াপথ উঠেচে ··আমার অভিনন্দনের মালাতে বাবার পুঁথির একটা পাতা গুঁজে রেখেচি, সে কথা মনে পড়লো···আমি কেমন অভিভূত হয়ে গেলুম।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ১৪. ৯. ১৯৩৩)

'জ্যোৎস্না রাতে কতক্ষণ বাইরে বসে রইলাম। হাতে শুকনো পেঁপের ডালের মত ডালটাতে বাঁকা কঞ্চির কথা মনে হলো। সত্যি জীবনটা কি শোক, দুঃখ, শান্তি, বিষাদপূর্ণ ··আর যাঁকে ভগবান বলা হয় তিনি কি বিরাট। আমি এই ভগবানকে জানতে চাই। ক্ষুদ্র প্রতিমার রূপ নয়। কালী, দুর্গা—গ্রাম্য দেবতা। এই মহান বিরাটতার সঙ্গে খুকুর কমনীয়তা গ্রাম্য ঘেঁটুবনের সৌন্দর্য সবই তিনি সৃষ্টি করেচেন—এমন কি spirit world-এর cosmic ether এর সমুদ্র পর্যন্ত।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ২১. ২. ১৯৩৪)

'Wide World-এর taste আর নেই। কেন্দ্রবিন্দুতে মন এসেচে। মনের মধ্যে অদ্ভুত energy—rejuvenation—আমি জীবনকে পেয়েচি ··nothing else matters'। (অপ্রকাশিত দিনলিপি ২৮. ৬. ১৯৩৩)

আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে, বিভূতিভূষণ কি পরলোকচর্চায় বিশ্বাস করতেন? নিজে কি কিছু আত্মিকচর্চা করতেন?

করতেন মানে? একেবারে নিয়মিত করতেন। দিনলিপির পাতা উল্টোলেই দেখা যাবে, প্ল্যানচেট, seance, মিডিয়াম—এসবের চর্চা ছিল তাঁর। সেখানে কখনও বাবা. কখনও তাঁর প্রথমা স্ত্রী—এঁদের আত্মাকে আনা হত। একবার বিভূতিভূষণের পুনর্বিবাহের কথাও তাঁদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। মহানন্দ বলেছিলেন, তাঁর মত নেই। গৌরী কিন্তু সম্মতি জানিয়েছিলেন।

'Rishi-র কাছে গেলুম। সেখানে circle হোল। ··বাবা বললেন তিনি পথের পাঁচালী দেখেচেন।···বল্লেন আমার বিয়েতে তাঁর মত নেই। গৌরী বল্লেন তার মত আছে।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ৮. ৭. ১৯৩৩)

চার

এই অনন্তের সংসারী জীবনে কিরকম ছিলেন? উদাসীন? সংসারবিরক্ত? কামিনীকাঞ্চনত্যাগী মায়াবাদী?

উপন্যাসে কিন্তু লিখেছিলেন, আনন্দে, যৌবনে, জীবনে, পুণ্যে ও দুঃখে, শোকে ও শান্তিতে অনন্তের এই পথ। দিনলিপিতে লিখেছিলেন, শেষ রাত্রের নদীজলে যখন জ্যোৎস্না পড়ে, শেওলায় কূলে তাল দেয়, মনে হয় তুমি আছ, ছোট্ট ছেলে কচি গন্ধ গায়ে মেখে যখন নরম হাত দুটি দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে, মনে হয় সেখানে তুমি আছ, রাতের আকাশ পেরিয়ে ওরায়ন যখন পশ্চিম আকাশে অস্ত যায়, মনে হয় সেখানে তুমি আছ। মাঠের ধারে গ্রাম্য ফুলের দল যখন ঠেলাঠেলি করে দাঁড়িয়ে থাকে তখন মনে হয় সেখানেও তুমি আছ।

আসলে বিভূতিভূষণের অনন্তে মানুষ, প্রকৃতি কেউই পরম উপলব্ধির অন্তরায় নয়। বরং অনুকূলই; অপরিহার্য। প্রকৃতির এই বিরাট রূপ যা মনকে অসীম রহস্যানুভূতিতে আচ্ছন্ন করে দেয়, বিভূতিভূষণ লিখেছেন, তাকে কখনও প্রত্যক্ষ করেছি নিস্পৃহ, উদাস মনোভাবে, কখনও দেখেছি মধুময় স্বপ্নে, নরনারীর বেদনায়। বিভূতিভূষণে মানুষ আর প্রকৃতি অসীমের একই বৃন্তের দুটি ফুল। তাঁরই সুমহতী কল্পনায় এই মেঘ, সন্ধ্যা, কোলাহলরত শিয়ালের দল, সরস্বতী হ্রদের জলজ পুষ্প, মঞ্চী, রাজুপাঁড়ে, ভানুমতী, মহালিখারূপের পাহাড় একদিন বীজরূপে নিহিত ছিল। মানুষে-প্রকৃতিতে তাঁরই প্রকাশ—তাঁরই বাণী। উপন্যাসে-দিনলিপিতে বারবার করে বলেছেন, এই পৃথিবীর একটা spiritual nature আছে যা আশায়, স্নেহে, দয়ায় প্রেমে আবছা আবছা ধরা পড়ে। প্রকৃতির মত মানুষও তাই বিভূতিভূষণের আর এক বিশল্যকরণী, যার স্পর্শে অনন্তের অনুভূতি খোলে। রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন, জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালবাসা। দিনলিপির পাতায় পাতায় স্নেহে, দয়ায়, প্রেমে বিভূতিভূষণের সেই মানুষী রূপ ছড়ানো। এক একটি মানুষকে নিয়ে ছোট ছোট ভালবাসার গাথা।

সে গাথা কখনও বিধবা বোন জাহ্নবীকে নিয়ে। দেখার কেউ নেই। ছোট ভাগনে-ভাগনিকে নিয়ে নতুন বাসা করেছেন, অসুখে nurse করছেন—সংসারবাসী সন্ন্যাসীর এক নতুন অভিজ্ঞতা। কখনও লিখছেন জাহ্নবীর ছোট্ট শিশুকন্যার মৃত্যু নিয়ে শোকগাথা। অকারণে হাসতে হাসতে সে উপুড় হয়ে গড়িয়ে পড়ত। গ্রামের

মানুষের এই অনাথ শিশুর এত হাসি পছন্দ হত না। বলতো, যাওগে। তারই বালিশটা খয়রামারির মাঠে পড়ে আছে। কখনও ছাত্র দেবব্রতকে নিয়ে এক স্নেহগাথা। মান-অভিমান, এড়িয়ে যাওয়া—সবশেষে সেই নিম্নগামী স্নেহের কাছেই পরাজয়। দিনলিপিতে কখনও বিভূতিভূষণের প্রথমা স্ত্রীকে নিয়ে এক স্মরণগাথা। সেই সব অক্ষয়সন্ধ্যা, প্রদীপদানরতা একটি মেয়ের ছবি। কখনও এই বিপত্নীকের এক গ্রাম্য মেয়েকে নিয়ে প্রেমগাথা—তার কালো কেশে কচুরিপানার ভায়োলেট ফুল পরিয়ে দেওয়া। তবু শেষ পর্যন্ত এ মিলন অসম্পূর্ণ। কারণ দুজনেই সগোত্র। অথবা একটি মেয়ের বিবাহের করুণ কাহিনী। কারও বর পছন্দ হল না। মা কাঁদলেন। বাড়ির লোকে বললে, এ বরে কেন মেয়ে দেব? মেয়ের কথা অনুক্ত থেকেই শেষ পর্যন্ত বিবাহ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল। কখনও নববিবাহিতা বালিকা কল্যাণীকে নিয়ে এই উত্তরচল্লিশ সংসারীর কী উদ্বেগ! কখনও নবজাত শিশু সন্তান বাবলুকে ঘাটশিলায় ছেড়ে যাওয়া নিয়ে পিতৃহৃদয়ের শোকোচ্ছ্বাসগাথা। কলকাতায় আসবেন, বাবলু কিছুতে আসতে দেবে না। জামা চেপে ধরেছে। এদিকে ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে এল। জোর করে জামা ছাড়িয়ে নিতে তার সে কী কান্না! সারা প্ল্যাটফর্ম মুখরিত হয়ে উঠল। ট্রেন ছেড়ে দিল। আবার কোথাও তারই অর্ধস্ফুট কাকলি নিয়ে এক শিশুকাব্য। কোথাও ১৩৫০-এর মন্বন্তর নিয়ে মনুষ্যত্বেরই গাথা। কলকাতায় ক্ষুধার্ত মানুষের আর্তনাদ আর শোনা যাচ্ছে না। প্রতিদিন মৃতদেহের পাহাড় জমছে। কিন্তু মানুষ বাদ দিয়ে তো সবই মিথ্যে, ফাঁকা। দুঃখের মধ্যে দিয়ে, পরার্থের মধ্যে দিয়ে, মানুষের সেবার মধ্যে দিয়ে যে আনন্দ সেই আনন্দই বিভূতিভূষণ লিখেছেন পরম সত্যের বাণী।

'আগের দিন চালকী এসেচি। জাহ্নবীর অসুখে এবার বড় বিপদে ফেলেচে। একা ১৩।১৪ দিন nurse করেচি।·· জীবনে এই প্রথম সংসার করচি। এতদিন ছিলাম মুক্ত—আজ যেন ধরা পড়ে গেছি মনে হচ্চে। নতুন sensation বটে।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ১৫. ১. ১৯৩৩)

'সকালে পত্রে সংবাদ পেলুম জাহ্নবীর ছোট খুকী মারা গিয়েচে। ও যে মারা যাবে তা জানতাম। তবুও মনে পড়ে কেমন হাসত সম্পূর্ণ অকারণে—সবাই তার হাসির জন্য বকতো। উপুড় হয়ে গড়িয়ে পড়ত একা একা বাইরের ঘরে থেকে। সবাই বলতো যাও গা।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ২২. ২. ১৯৩৩)

'খুকী মারা গেছে—তার বালিশটা খয়রামারির মাঠে পড়ে আছে—দেখে

এসেছি।…জাহ্নবীকে সকালে বকেচি বিনা দোষে—সেজন্য মনটা ভাল নয়।'
(অপ্রকাশিত দিনলিপি ২৭. ২. ১৯৩৩)

'স্কুলে যাবার পথে দেবব্রতের সঙ্গে দেখা হয়েছিল—কিন্তু আমি এড়িয়ে গেলুম। স্কুলে গিয়ে শুনি দেবব্রত অনেকবার নাকি আমার নাম করেচে। স্কুল থেকে সকাল সকাল বেরুচ্চি হঠাৎ দেবব্রত দেখি সামনের ফুটপাতে দিয়ে যাচ্চে আমাকে দেখতে পেয়েচে কিনা কে জানে? বোধ হয় পেয়েচে। আমিও এড়িয়ে গেলাম।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ১১. ১. ১৯৩৩)

'দেবব্রতের সঙ্গে দেখা হল ওদের বাড়ীর বাইরে। কতকাল পরে। পুরোনো দিনের মত ওকে আদর করলুম।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ২০. ১. ১৯৩৩)

'স্কুলে ছোট ছেলেরা আমাকে ভারী ভালবাসে। আমাকে জড়িয়ে ধরে ছুটে এসে, ছাড়তে চায় না ভয়ও করে না।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ১৪. ৮. ১৯৩৩)

'ছোট ছেলেদের যে লোকে মারধর করে—এ আমি মোটে সহ্য কর্ত্তে পারিনে কেন? এইমাত্র ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল মাঠে ঐ পার্শী মেয়েটা যে তার ছোট খোকাকে ঠেঙাচ্ছিল—ও দেখে আমার বুকের মধ্যে কেমন করে।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ৭. ৮. ১৯৩৩)

'বনতুলসী জঙ্গলের অপূর্ব সুঘ্রাণের মধ্যে দিয়ে রৌদ্রে নীল আকাশের তলে পাহাড়ের সানুতে পিয়াল গাছের ছায়ায় কতক্ষণ বসে রইলুম।…সন্ধ্যাবেলা…. কতকাল আগের কথা সে সব। তার জীবন দিয়ে সন্ধ্যাটি সে আমার মনে অক্ষয় করে রেখেচে।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ১৪. ১০. ১৯৩৩)

'পথে কেবলই ভাবছিলুম এই সময়ের কথা—পুরোনো বঙ্গবাসী আমলের কথা, একটা ছোটঘরে প্রদীপদানরতা মেয়ের কথা।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ২১. ১০. ১৯৩৪)

'সন্ধ্যায় খুকু এল। বাইরে বসে অঙ্ক কসলে ও গল্প শুনলে। ওর খোঁপায় কচুরির ফুলটা গুঁজে দিলুম।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ৩. ১২. ১৯৩৪)

'খুকুর সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা কত কথা হল। আমি বললুম, তুই বাঁড়ুয্যে না হলে তোকে বিয়ে করতুম। ও হাসলে—বল্লে আপনি চলে গেলে আমার মন পালাই পালাই হবে।…মেয়েরা না হলে সৃষ্টি মিথ্যে হোত—কথাটা ঠিক।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ১০. ৬. ১৯৩৪)

'খুকু…আমি কাছে ডাকলুম…আমি যে এতটা **highly impassioned** তা এর আগে জানতাম না। এটা একটা উগ্র বেদনার মত বুকে এসে বিঁধচে…

আমি একেবারে helpless।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ১৭. ৬. ১৯৩৪)

[মানুষ] 'আজ বিয়ে।···বর এল কিন্তু বরযাত্রী এল না। বরও পছন্দ হল না কারুর···বরকর্ত্তা নিতান্ত গ্রাম্য ভদ্রলোক—তাকে দেখলে মায়া হয়।··· খুড়ো কেঁদে ফেল্লেন। এ বরে কেন মেয়ে দেবো বলে, পিসিমা কাঁদলেন। শেষে বিয়ে হয়ে গেল।···৬।৮ টাকার জন্যে বৃদ্ধ বরকর্ত্তা কি পীড়াপীড়িই না কর্ল্লে। কিন্তু সে অত্যন্ত গরীব বলে। আমার বড় কষ্ট হোল—এই সামান্য টাকা এর কাছে কত টাকা।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ৫. ৭. ১৯৩৩)

'চলুন ষ্টেশনে সবাই এসেছেন।···এসে দেখি শৈলজা, প্রভাবতী দেবী, বুদ্ধদেব সবাই দাঁড়িয়ে।···দক্ষিণ বারাসাতে পৌছে সবাই সালতিতে উঠে চলচি —প্রত্যেক গ্রামেই চিতা জলচে। ··লোকে বল্লে এ অঞ্চলে ভীষণ কলেরার মড়ক লেগেচে।···আমার মন যে কি উতলা হোল কি বলবো। সেই দিগন্তবিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে অন্ধকারে দূরের একটি নিরীহা, প্রেমময়ী বালিকার কণ্ঠস্বর কেবলই কানে আসে। কেবলই কানে আসে কল্যাণী।···মেসে এসেই আগে ঘর খুলে দেখচি দোরের পাশে ওর চিঠি এসে পড়ে আছে কিনা। আছে, আছে। ভগবান তোমায় অজস্র ধন্যবাদ।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ১৯. ১. ১৯৪১)

'বাবলুর জন্যে মন খারাপ। কাল ওকে রেখে চলে যাবো ১০।১২।১৬ দিনের জন্যে।···ষ্টেশনে আমার সঙ্গে এসে ওর কি কান্না। আমার জামা আঁকড়ে ধরলে। নির্মমভাবে জোর করে ছাড়াতে সে কি কষ্ট আমার। জীবনে কখনও ওর উপর অমন নির্মম হইনি। ওর কান্নায় প্ল্যাটফর্ম মুখরিত হতে লাগলো।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ২৩. ৮. ১৯৫০)

'বাবলু বলে—তাহলে তুমি হ' হ' করবে না। মাকে ভোরে বলেচে—মা ওতো—চারতে বাজচে।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ১৬. ১. ১৯৫০)

[বাবলু] 'বল্লে টিয়া পাখী তো নেই। আমি খেয়েছি না অর্থাৎ আমি খাইনি।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ১৬. ২. ১৯৫০)

'বাবলু বলে—বাবা কি ভাল সিনারি।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ১০. ২. ১৯৫০)

'বাবলুর জ্বর ১০১°।—ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই ওকে তুমি ভাল করিয়ে দাও।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ১৩. ও ১৬. ৪. ১৯৫০)

'ওয়াভেল সাহেব কাল কলিকাতায় ছদ্মবেশে বেড়িয়ে ক্ষুধার্ত্ত নরনারীদের দেখেচেন শুনলুম। ওদের করুণ আর্তনাদ কলকাতার বাতাসকে বিষাক্ত করে

তুলচে। কিছু ভাল লাগে না।...ঘাটশিলা আসবার সময়ে প্রত্যেক ষ্টেশনে উলঙ্গ কঙ্কালসার নরনারীর ভিক্ষার জন্য কাতর প্রার্থনা—এ দৃশ্য আর কতকাল সহ্য করতে হবে? হাহাকারে চারিধার পূর্ণ হয়ে উঠলো। মানুষ মরে পাহাড় হয়ে যাচ্চে।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ২৭. ১০. ১৯৫০)

'এতদিন ফাঁকা আনন্দ নিয়ে ছিলুম—কিন্তু জীবনে selfish আনন্দের কোন মূল্য নেই। দুঃখের মধ্যে দিয়ে পরার্থের [illegible] দিয়ে মানুষের সেবার মধ্যে দিয়ে যে আনন্দ, জীবনে তাই হোক পরম সত্যের বাণী। ভগবান বল দিন। Great Angel World সাহায্য করুন।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ১১. ৮. ১৯৩৩)

পাঁচ

এই তো গেল বিভূতিভূষণের স্বভাবের—ভাষান্তরিত করে যাকে বলা যায় প্রীতিতে-প্রকৃতিকে-অধ্যাত্ম ভাবনায় মিলিয়ে মানুষেরই চিরদিনের পরিচয়! কিন্তু প্রতিদিনের বিভূতিভূষণ কিরকম ছিলেন?

যে কলকাতায় তাঁর জীবনের বেশির ভাগ সময় কেটেছে সেই কলকাতা তাঁর কিরকম লাগত? সাহিত্যিক মহলে কিরকম রেশারেশি ছিল? বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কিরকম সম্পর্ক ছিল?

বিভূতিভূষণ তাঁর একটি উপন্যাসে লিখেছেন, কলকাতাকেই আমি ভাল বলি। সেখানে মানুষ না হলে চোখ ফোটে না, মন বড় হয় না।

কলকাতায় তিনি থাকতেন ৪১ নম্বর মির্জাপুর স্ট্রীটে একটি হোটেলে। হাটও বলতে পারা যায়। মির্জাপুরের মত কর্মচঞ্চল জায়গা এবং হোটেলের মত সদাব্যস্ত বাড়ি। দিনলিপিতে বারবার করে লিখেছেন, এই প্রাণের জন্যেই কলকাতা এত বেশি ভাল লাগে। ব্যস্ততায়-এনগেজমেণ্টে, সংগ্রামে-শান্তিতে কলকাতা এত জীবন্ত, অভিজ্ঞ! বিভূতিভূষণ তাকে চিত্রে-চরিত্রে এত নিখুঁত করে চেনেন! অ্যাসফ্যাণ্টের রাস্তা এড়িয়ে মুচুকুন্দ ফুলের আবির্ভাব দেখে তাঁর বুঝতে অসুবিধে হয় না কলকাতায় এখন বসন্ত। হোটেলের নীচ দিয়ে বছরের পর বছর ফিরিওয়ালা হাঁকতে হাঁকতে যায় 'ল্যাংড়া আ-আম'—চিনতে অসুবিধে হয় না এ কলকাতারই কণ্ঠস্বর। ছবিতে-গানেতে কলকাতা তাঁর বড় পরিচিত। সেখানেই স্কুল, বঙ্গশ্রী, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি, কৌতুক-পরিহাস, সাহিত্যিকদের ঈর্ষাকাতরতা—রবীন্দ্রনাথকে দেখা থেকে শুরু করে জাপানী কায়দায়

সুনীতিবাবুর সঙ্গে পাঞ্জালড়া—সব আছে। আর তারই ফাঁকে বিশ্বের বিশালতার কাছে নিজেকে কখন ডেকে নিয়ে যাওয়া।

'মৃজাপুরের এখানে এলেই মনটা নূতন হয়ে যায়—এতটা ফাঁকা জায়গায় একটা নতুন অনুভূতি হয়।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ১৮. ৬. ১৯৩৩)

'আজ কলকাতা যেন নতুন চোখে দেখলুম। ১৮।১৯ বছরের কত স্মৃতি এর সঙ্গে জড়ানো। এত আলো, এত পরিচ্ছন্নতা—কালীপূজার জের এখনও মেটেনি—হাউই তুবড়ী এখনও ফুটচে—বড় ভাল লাগল। এই সময়টা কত বৎসর ধরে একা enjoy করে এসেচি কলকাতায়। যখন ছাতিমফুল ফুটত তখন। কত রাত পর্যন্ত বারান্দায় অবাক হয়ে বসে রইলুম।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ২০. ১০. ১৯৩৩)

'কলকাতা এত ভাল লাগেনি আর কখনও। একে এবার যেন নতুন দেখচি। ···ধর্মতলা স্ট্রীটের মোড়ে যখন গিয়েচি, সন্ধ্যা হোল। ট্রামে লাল সবুজ আলো জ্বালিয়েচে—ট্রাফিকের ভিড়, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলুম—এত সুন্দর এত সজীব। এত বিরাট মনে হতে লাগল ugly কলকাতা সহরকে। (অপ্রকাশিত দিনলিপি ২১. ১০. ১৯৩৩)

'কলকাতার জীবনটা কাটে একটা কাজকর্ম ও engagement এর ঘূর্ণীপাকের মধ্যে। পাড়াগাঁয়ের dull life নয়। জীবনের অভিজ্ঞতাও তাই এখানে বেড়ে চলে।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ২৫. ১০. ১৯৩৩)

'নক্ষত্রগুলোর দিকে চেয়ে আজ বড় অপূর্ব আনন্দ হোল।···এখানে মনটা ভারী active থাকে কিন্তু। কলকাতা এখন বেশ লাগচে। (অপ্রকাশিত দিনলিপি ৯. ১১. ১৯৩৩)

'বেহালা। পথে মুচুকুন্দ ফুলের গাছে এখনও ফুল যথেষ্ট—তবে শুকিয়ে এসেছে। বিজয়মঞ্জিলের সেই গাছটা দেখতে বড় সুন্দর—একেবারে গোড়া থেকে ফুল হয়েচে।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ১০. ৪. ১৯৩৩)

'বেরিয়ে ভাবলুম বঙ্গশ্রীতে যাবো। পথে হরেকৃষ্ণ বাবুর সঙ্গে দেখা। হরেকৃষ্ণ বাবু বল্লেন সেখানে কেন আর যাবেন, খুব খাওয়া দাওয়া হোল জন্মাষ্টমী উপলক্ষে—আমি সেখান থেকে আসচি—সব শেষ হয়ে গেল—ফুটপাতে বসে পড়লুম।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ১২. ৮. ১৯৩৩)

'সাহিত্যক্ষেত্রে পরস্পর যে হিংসা, দ্বেষ, সংকীর্ণতা দেখতে পাই আজকাল ওতে আমার মন আর সায় দিচ্চে না। এক্ষেত্রে ক্রমেই কলকাতাতেই অতি

বিষময় শস্যের বীজ উপ্ত হচ্চে—আমি ভাবচি দেশে চলে যাবো। (অপ্রকাশিত দিনলিপি ১৩. ৭. ১৯৩৩)

'পার্ক সার্কাস···রাত ৮টার সময়ে। পথে নক্ষত্রভরা আকাশের দিকে চেয়ে বিশ্বের বিশালতা ও মানুষের ক্ষুদ্রত্বের কথা ভাবছিলুম। বাসায় ফিরে দেখি পশুপতিবাবু অনেক···ফুল দিয়ে গেছেন।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি (২৩. ২. ১৯৩৩)

ছয়

কিন্তু এসবের কী দাম? কী তাদের সাহিত্যিক মূল্য? সার্থকতা? বিভূতিভূষণ লিখেছেন, তার অবকাশই বা কোথায়? কারণ এসব লেখা হয়েছে দ্রুত ধাবমান রেলগাড়িতে, পথের পাশে কোন বৃক্ষতলে অথবা বনে পাহাড়ে কোন শিলাসনে। লেখকমনের কারিগরি প্রকাশের সেখানে অবকাশ কোথায়, ইচ্ছেই বা কোথায়? বরং তাঁর গোপন বাসনা, অনেকদিন পরে যখন পুরনো কথা শুধুই মনে পড়বে, অথচ কথার মানুষেরা চিরদিনের জন্যে হারিয়ে যাবে, তখন এইসব দিনলিপি পড়তে পড়তে তাদের আবার যেন শরীরী করে দেখতে পাব।

'বিভিন্ন অবস্থায় ও বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক পরিবর্ত্তনে মনের মধ্যে যে অনুভূতি জাগে আমার এ দৈনন্দিন লিপিতে তাহাই প্রতিবিম্বিত হইয়াছে মাত্র। কখনো অন্ধকারে, কখনো জ্যোৎস্নাশান্ত রজনীতে, কখনো সুখে, কখনো দুঃখে, গহন পর্বতারণ্যে বা জন কোলাহল মুখর নগরীতে, বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে বা শান্ত নিঃসঙ্গতার মধ্যে মন যেখানে নিজেকে লইয়াই ব্যস্ত ছিল—এইসব রচনার সৃষ্টি সেখানে। পুস্তকে বা পত্রিকায় ছাপার অক্ষরে প্রকাশের জন্য এগুলি লিখিত হয় নাই। সেইজন্য বহুস্থলে এই রচনাগুলির মধ্যে এমন জিনিস দেখা দিয়াছে যাহা নিতান্ত ব্যক্তিগত। লিপিকৌশলের ইচ্ছা ইহাদের মনে ছিল না—হয়তো দ্রুত ধাবমান রেলের গাড়িতে, কিংবা পথচারী পথিকের স্বল্প অবসরে, পথিপার্শ্বের কোন বৃক্ষতলে বা শিলাসনে যে সব রচনার উদ্ভব—লেখক মনের কারিকুরি প্রকাশের অবকাশ সেখানে কোথায়?···আমার জীবনে ব্যক্তিগত অনুভূতির অতীত ইতিহাসের দিক হইতে ইহার মূল্য আমার নিজের কাছে যথেষ্ট বেশি। বহু হারানো দিনের মনের ভাব ও বিস্মৃত অনুভূতিরাজি আবার স্পষ্ট হইয়া ওঠে। যে সব অবস্থার মধ্যে আর কখনো পড়িব না,

ক্ষণকালের জন্য তাহার মধ্যে আবার ডুবিয়া [ডুবি] এগুলি পড়িতে পড়িতে। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখকে বাণীমূর্তি দেওয়ার ইহাই একটা বড় সার্থকতা বলিয়া মনে করি।' (তৃণাঙ্কুর, ভূমিকা)

কিন্তু শুধুই কি তাই? ব্যক্তিগত সার্থকতা? যাঁরা তাঁর জীবন ও জগতের বাইরে তাঁদের কাছে কি সত্যিই এসবের কোন মূল্য নেই, মানে নেই? Pepys, Evelyn, Kafka, বিভূতিভূষণ এঁদের ডায়েরি ব্যক্তিগত, সাহিত্যের অচ্ছুত?

অথচ ব্যক্তিগত যে সেকথা এতো অস্বীকার করার উপায় নেই; এবং সেই সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব ডায়েরি অত্যন্ত সাংকেতিক, সংক্ষিপ্ত। Amiel-এর Journal পড়তে পড়তে এই কথাই Mathew Arnold লিখেছিলেন; এগুলি যথার্থই সাহিত্যসম্ভব। তবে বিষয়গুলিকে আরও বিশদভাবে ফোটালে এবং যথাযথভাবে বাঁধলে এরা সত্যিই সাহিত্য হয়ে উঠত।[১]

তাকেই আমরা বলি রচনাকর্ম। পাঠকের জন্যে তা একান্তই প্রয়োজনীয়।

অথচ সত্যি বলতে কী, চিঠি বা দিনলিপির মত জনান্তিক রচনায় পাঠকের জন্যে লিখছি এই বোধটাই লেখকের মনের মধ্যে একেবারে থাকে না। ভাগ্যিস থাকে না! তাই এখনও চিঠি পাই, ডায়েরি রাখি। চিঠি কী ডায়েরি কেউ কি কখনও জনতার জন্যে লেখে? না, পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে পাঠায়? সাহিত্যকেই আমরা রচনাকর্ম বলি, কিন্তু তাই বলে চিঠি, কী ডায়েরি এগুলোকেও কি আমরা রচনাকর্মের পর্যায়ে ফেলব?

সবাই জানে সাহিত্যের মায়ের কান্না সত্যি মায়ের কান্নার চেয়ে বানানোই। তবু সাহিত্যের মায়ের কান্নাই আমাদের কাছে অনেক বেশি ব্যাপক, দীর্ঘস্থায়ী। সর্বজায়ার কান্নায় কে না কাঁদে? প্রাকৃত মায়ের কান্না যেখানে শোকের

১ Probably the literary criticism which he did so well, and for which he shows a true vocation, gave him nevertheless but little pleasure because he did it thus fragmentarily and by fits and starts. To do it thoroughly, to make his fragments into wholes, to fit them for coming before public, composition with its toils and limits was necessary. (Essays in Criticism, Amiel)

প্রত্যক্ষতায় ও পরিচয়ে সত্য ও ব্যক্তিগত, সাহিত্যের মায়ের কান্নাকে সেখানে বাড়িয়ে না রচনা করলে তা অধিকতর সত্য ও সবার হয়ে ওঠে না। এই সত্য করে তোলার মধ্যেই সাহিত্যের রচনাকর্ম নিহিত। নিজের জন্যে প্রায় লেখার দরকার হয় না, অন্ততঃ হলেও তা নিজের মত করে লিখে নিলেই চলে। কিন্তু সাহিত্যরচনা তো শুধু নিজের জন্যে নয়, সেই সঙ্গে পাঠকের জন্যেও। কিন্তু চিঠি বা দিনলিপি কোনটাই পাঠকের জন্যে লেখা নয়। এবং এইখানেই চিঠির বা দিনলিপির সাহিত্য হয়ে ওঠার অসুবিধে। এর মধ্যেও আবার দিনলিপির অসুবিধেই সবচেয়ে বেশি। কারণ চিঠি পাঠক সমাজের উদ্দেশ্যে না হলেও অন্ততঃ একজন পাঠকের উদ্দেশ্যে লেখা। নিদেন পক্ষে তার কথা ভেবেও, স্বল্প হলেও, লেখককে সত্যি করে তোলার রচনাকর্মে একটু না একটু মন দিতেই হয়।

কিন্তু দিনলিপি? সে তো একান্তভাবেই নিজের, অব্যবহিতভাবে লেখকেরই জন্যে লেখা। স্থানকালপাত্রের নাম, অনুভূতির ইতস্ততঃ সংকেত এগুলোই তো অতীতকে সত্যি করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। সেখানে আবার রচনাকর্মের প্রয়োজন কি? দূরত্বকে অতিক্রম করার জন্যে, পাঠকের বিশ্বাসের জন্যেই তো রচনাকর্মের দরকার। লেখকে-পাঠকে মিলে তবেই তো সাহিত্য। কিন্তু দিনলিপিতে তার অবকাশ কোথায়?

তবু, লোকে সাহিত্য পড়ার মত কী আনন্দে দিনলিপি পড়ে, তাকে যত্ন করে সংগ্রহ করে রাখে, তাকে ভালোবাসে! তা কি শুধুই জানা বলে, কোথাও হওয়া বলে নয়?

একথা সত্যি, দিনলিপির ক্ষেত্রে লেখকের কিছু পৌঁছে দেবার থাকে না, কোন দূরত্ব অতিক্রমের দরকার হয় না। আর সেই কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দিনলিপি সাহিত্য নয়, সংগ্রহ; রচনাকর্ম নয়, রচনা। তবু তো দিনলিপি মানুষকে মুগ্ধ করে, হওয়ায়।

তার কারণ বোধ হয়, ডায়েরি-লেখক মাঝে মাঝে নিজের অস্তিত্বেরই নার্সিসাস হয়ে ওঠে। নিজেকেই সে ভালবাসতে শুরু করে। অজ্ঞাতে অথচ অনুভবে নিজেকেই তার রচনার এক অনুরাগী পাঠক করে তোলে। তার জন্যেই সে লেখে, রচনাকর্ম সম্পূর্ণ করে তোলে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ভাল সাহিত্য মাত্রেই তাই। উন্মেষ, চমৎকৃতি, সিদ্ধি। সাহিত্যে সে সিদ্ধি প্রয়াসে, গৃহিণীপনায়, শিল্পকর্মে। যেমনি তার সর্বব্যাপী সামঞ্জস্য, তেমনি তার সর্বাতিরিক্ত লাবণ্য।

সাহিত্যের এই প্রয়াসের ও সিদ্ধির পাশে দিনলিপি তার রচয়িতারই এক অনায়াস সিদ্ধি, নিজেরই অজ্ঞাতে এক মায়ারাজ্যেরই রচনা। যদিও সে রাজ্য সর্বব্যাপী নয়, ইতস্তত: ; প্রবন্ধ নয়, প্রকীর্ণ। ঈশ্বরে, প্রকৃতিতে, ভালোবাসায় বিভূতিভূষণের দিনলিপিতে এই মায়ারাজ্যেরই রচনা। স্বপ্নোত্থিতেরই গান। সহসা, অনিয়মিত। এবং পাঠকেরও আড়ি পাতা। শেষ পর্যন্ত সেই পাঠকের এবং লেখকের মিলন। দিনলিপিরও সাহিত্যিক সার্থকতা।

'রাত ১১॥০ টা। দ্বিতীয়া তিথির। ঘন অরণ্যের মধ্যে বসে লিখচি এক ঝর্ণার ধারে। সামনে পাষাণময় চূড়ার মধ্যে দিয়ে কুইনা নদী ক্ষুদ্র একটি জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে কুলুকুলু শব্দে বয়ে চলেচে। ঝরঝর অবিশ্রান্ত চলমান কুইনা নদীর স্রোতোধারার শব্দ গভীর রাত্রে সারাও অরণ্যের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে। কে এসেচে এমন গভীর রাত্রে এখানে, কে এর অবর্ণনীয় রহস্যময় শোভা দেখেচে ? অথচ লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে এই চাঁদ এমনি উঠেচে, এই অরণ্য তার সমস্ত শোভা দিয়ে হাজার হাজার এমনি গভীর নিশীথে চন্দ্রালোকে এমনি অপূর্ব রহস্যময় শোভা দেখাতো—আজ যাঁর কৃপায় এখানে এসেচি, তিনি কোথায় যেন আজ নবীন কিশোরের রূপে ছেলেমানুষের মত সলজ্জ সপ্রতিভ নিবেদনে একপাশে দাঁড়িয়ে তাঁর হাতের সৃষ্টি কেমন লাগে আমাদের, শুনবার আশায় উদ্‌গ্রীব, উন্মুখ। জয় হোক তাঁর, সে অদৃশ্য অধিদেবতার। গাছের ফাঁকে চাঁদ উঠেচে, ঘন বনের মধ্যে ক্ষুদ্র কুইনা নদীর ৬০।৭০ হাত চওড়া পাষাণময় চড়ায় চাঁদের আলো পড়েচে……। জ্যোৎস্না ফুটেচে আরও—রাত ১টা। আলো-ছায়ায় কি অদ্ভুত মায়ারূপ বনে। এইসব গভীর বনের পার্বত্য নদী দ্বারা তৈরি সরোবরে দেবকন্যারা বোধ হয় নামেন স্নান ও জলকেলির জন্যে, ইতর দৃষ্টির অন্তরালে। লক্ষ অতীত যুগের অতীত জলকলতানে এখানে কথা কইচে—মৌন অরণ্য নিশীথ রাত্রে আদিমযুগের স্বপ্নে বিভোর। ভাষা আছে এ বর্ণনার।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ১৪. ১১. ১৯৪৩)

'অদ্ভুত শরতের দিনের মত রৌদ্র। নীল আকাশ। আজ বনে বনে যেন বাল্যের মত নিবিড় ঝোপের ছায়ায় মাকালফল, মটরলতা সংগ্রহ করবার দিন। মনে হয় শুধু বনে বনে বেড়াই। যেন কতকাল আগে এই সব বনের নিভৃত ছায়ায় বনের পরী হয়ে ঘুরে বেড়াতুম—অন্য কোন জন্মে। তারই স্মৃতি আমায় আজও উদ্বেল করে তোলে।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ১৬. ৮. ১৯৪৩)

'ইন্দু রায় বসে গল্প করে···ওর বাড়ীতে এক মজুর ছিল, সে নাকি বাংলা

মুলুকের সব জায়গা বেরিয়েছিল—কোথায়? না বাহাদুরপুর (গোয়াড়ির ওপারে) 'আর যাতি সাহস হোল না'—বেশ গল্প।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি ২০. ৬. ১৯৪৩)

বিনীত নিবেদনে বিভূতিভূষণ বলেছেন, ব্যক্তিগত অনুভূতির ইতিহাসের দিক থেকে এর মূল্য আমার নিজের কাছেই যথেষ্ট বেশি। কিন্তু এর পরেও কি বলব না, শুধুই তাই? বিভূতিভূষণের দিনলিপি পড়তে পড়তে কি মনে হয় না, কোন মহৎ উপন্যাসের উপসংহারের মতই, নাটকে জনান্তিক ভাষণের মতই তাঁর লেখা স্বয়ংসম্পূর্ণ? গানেরই মত সাংকেতিক, ছোটগল্পেরই মত ইঙ্গিতময়?

'আমার জীবনের ও জগতের বহির্দেশে যাঁহারা অবস্থিত তাঁহারা এগুলি হইতে কি রস পাইবে আমি জানি না'. এই কথা বলে যিনি আরম্ভ করেছিলেন তিনিই শেষে বলেছেন, 'কৌতুক বা কৌতূহলের মধ্য দিয়া একটা নৈর্ব্যক্তিক আনন্দের অনুভূতি জীবনের সকল দর্শকের পক্ষে স্বাভাবিক—কারণ ইহার মূলে রহিয়াছে মানব মনের মূলগত ঐক্য।'

এই গুণেই বিভূতিভূষণের দিনলিপি তাঁর হয়েও সাহিত্যের মত সবারই।

১৯৩৩

১লা জানুয়ারি ১৯৩৩। ১৭ই পৌষ, ১৩৩৯। রবিবার[১]

আগের দিন চালকী[২] এসেচি। জাহ্নবীর অসুখে এবার বড় বিপদে ফেলেচে। একা। ১৩।১৪ দিন nurse করেচি। কেউ সাহায্য করবার নেই, সে কি মুস্কিল! বিকেলে বারাকপুর গেলাম। সুসার ক'কার[৩] সঙ্গে দেখা হোল। খুড়ীমা[৪] বসে রোদ পোয়াচ্চে। বেলা থাকতে থা . .ত চলে এলুম।

২রা জানুয়ারি, ১৯৩৩। ১৮ই পৌষ, ১৩'.৯। সোমবার

এদিন সকাল থেকে বনগাঁয়ে remove . রবার উদ্যোগ কর্ত্তে কেটে গেল[৫]। আমি সকালে এক দফা জিনিসপত্র নিয়ে রওনা হলুম। বন্ধুর[৬] বাসায় খাওয়া গেল। সন্ধ্যার আগে ওরা[৭] এল। আমি রাত ৮ টায় রওনা হলুম।[৮] বেজায় শীত। টকু[৯] এগিয়ে দিয়ে গেল। ট্রেনে বেজায় দেরী। অনেকক্ষণ শীতে কষ্ট পাওয়ার পরে অবশেষে ট্রেনে উঠলুম।

১ বিভূতিভূষণের বর্তমান দিনলিপিটি এই বছরেরই একটি ডায়েরি বইয়ে লেখা। ডায়েরিটি 'Everyman's Diary, 1933/M. C. Sarkar & Sons. 15 College Square. Calcutta'। আয়তন : দৈর্ঘ্য ৫'৮"; প্রস্থ ৩'৬"।

২ বনগাঁ; বিভূতিভূষণের স্বগ্রাম বারাকপুরের পাশের গ্রাম। এখানে তাঁর বোন জাহ্নবীর বিয়ে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অতি অল্প বয়সেই তিনি বিধবা হন। ছেলেমেয়েরা তখন খুবই ছোট ছোট। সেজন্যে বিভূতিভূষণই সব দেখাশোনা করতেন।

৩ সুসারমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বারাকপুরবাসী।

৪ হরিদাসী বন্দ্যোপাধ্যায় ('জেলি'র মা), বারাকপুরবাসিনী।

৫ ভগিনীপতি জ্ঞানেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর বিভূতিভূষণ বোনকে চালকী থেকে নিয়ে এসে বনগাঁয় বাসা করে দেন। দৃষ্টিপ্রদীপ-এ দাদার মৃত্যুর পর জিতুর সাংসারিক দায়িত্বগ্রহণের কাহিনীতে এই ঘটনার ছায়া আছে।

৬ ক্যাপ্টেন ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বারাকপুরবাসী। বিভূতিভূষণ 'বন্ধু' বলে ডাকতেন। এঁর বনগাঁয়েও বাড়ি ছিল।

৭ জাহ্নবী আর তাঁর ছেলেমেয়ে উমা ও শান্তি।

৮ কলকাতায় এলেন। বিভূতিভূষণ তখন খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইনষ্টিটিউশনের শিক্ষক। থাকতেন মির্জাপুর স্ট্রীটের এক মেসে।

৯ সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথের ছেলে।

৩রা জানুয়ারি, ১৯৩৩। ১৯শে পৌষ, ১৩৩৯। মঙ্গলবার[১]

আজ সকালে খানিকটা পড়াশুনা করা গেল। দুপুরে সজনীর[২] ওখানে গেলুম। সেখান থেকে বেরিয়ে বাসায়[৩] এলুম।

৪ঠা জানুয়ারি, ১৯৩৩। ২০শে পৌষ, ১৩৩৯। বুধবার

দুপুরে সজনীর আপিসে গেলুম ও তাকে সঙ্গে নিয়ে গেলুম P. C. Sircar-এর দোকানে।[৪] সেখানে ওরা এই ডায়েরিটা দিলে। তারপর Imperial library[৫], বাসায় এসে প্রথমে এল আমার ক্লাসফ্রেণ্ড্ সিদ্ধেশ্বর তারপর পানিতরের[৬] তারাপদ বাবু[৭]। তাঁর মুখে খবর পাওয়া গেল ৩৩নং মদন মিত্রের লেনে আমার সেই বাল্য কালের বাবার[৮] দিদিদের বাড়ী। আজ ও দের [ওদের] ঠিকুজী কুষ্ঠী [কোষ্ঠী] খানা দিলুম।

১ তারিখের নীচে লেখা, 'তারাপদ বাবু-২২B কালচাঁদ পতিতুণ্ডী লেন। Off Ranee Road পাইকপাড়া'।

২ সজনীকান্ত দাস ; তখন বঙ্গশ্রীর সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছেন। বসতেন ৫৬নং ধর্মতলা স্ট্রীটে। বিভূতিভূষণের স্কুলও ছিল একই রাস্তায় ৬৫নং ধর্মতলা স্ট্রীটে।

৩ প্যারাডাইস লজ (মেস); ৪১নং মির্জাপুর স্ট্রীট। এখানে বিভূতিভূষণের সঙ্গে একই ঘরে থাকতেন তাঁর ছোটভাই নুটুবিহারী (তখন ক্যাম্বেল স্কুলে ডাক্তারি পড়তেন।) এবং পূর্বোল্লিখিত টরু (বঙ্গবাসীতে আই. এস. সি. পড়তেন।)

৪ প্রকাশক প্রভাতচন্দ্র সরকার (পি. সি. সরকার অ্যাণ্ড কো. লিমিটেড), ১৮নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা। এখান থেকে বিভূতিভূষণের যাত্রাবদল, দৃষ্টিপ্রদীপ প্রভৃতি গ্রন্থ বেরিয়েছিল।

৫ ১৯৪৮ সনে নাম বদলে ন্যাশানাল লাইব্রেরি।

৬ বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত গ্রাম। বিভূতিভূষণের প্রথম বিবাহ এখানে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বছরখানেক পরেই ১৯১৮ সনে তিনি বিপত্নীক হন।

৭ তারাপদ চট্টোপাধ্যায়, জাহ্নবীর দেওর। বিভূতিভূষণের এই সময়ে দ্বিতীয় বিবাহের চেষ্টা চলছিল। এবং সেই চেষ্টাও সম্ভবতঃ পানিতরে। (দ্র. ১৬. ২. ১৯৩৩)

৮ মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫ই জানুয়ারি, ১৯৩৩। ২১শে পৌষ, ১৩৩৯। বৃহস্পতিবার

সকালে উঠে গল্প[১] লিখ্‌লাম। তারপরই কৃষ্ণধনবাবু[২] এল। ওর সঙ্গে কথা রৈল বিকেলে প্রবাসী আপিসে যাবো। দুপুরের পর প্রবাসীতে গেলাম। অশোকের[৩] সঙ্গে অনেক কাল পরে দেখা হোল। ওপরে নীরদ[৪] নেই, রামানন্দবাবুকে টাকার কথা বল্‌লুম। সেখান থেকে ফিরবার পথে আমরা কমলালেবু কিনে ফুটপাথের ধারে দাঁড়িয়ে খাচ্ছি—সেখানে যোগানন্দবাবুর[৫] সঙ্গে দেখা। বৈকালে দুজনে রূপবাণীতে গেলুম। শীতল ও চাঁদির সঙ্গে দেখা—ফিরবার পথে সাহিত্য সেবক সমিতিতে[৬] গেলুম। সেখানে প্রমোদ দাসগুপ্তের[৭] সঙ্গে অনেক কাল পরে দেখা হোল। সুপ্রভার[৮] একখানা পত্র লুকিয়ে রেখেছিল কৃষ্ণধনবাবু, পথে দিলে।

৬ই জানুয়ারি, ১৯৩৩। ২২শে পৌষ, ১৩৩৯। শুক্রবার

সকালে উঠে একটা গল্পের খানিকটা লিখে স্কুলে[৯] গেলুম। সকালে ছুটী হোল স্কুলের। খানিকটা বাড়ীতে এসে পড়াশুনো করে সুপ্রভাদের হোস্টেলে[১০]

---

১ সম্ভবতঃ 'পেয়ালা' (যাত্রাবদল)। ১৩৩৯ সনের ফাল্গুনে প্রবাসীতে গল্পটি বেরয়।

২ কৃষ্ণধন দে।

৩ অশোক চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে। ইনি প্রবাসী ও Modern Review পত্রিকার কার্যালয়ের এবং প্রেসের কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন।

৪ নীরদচন্দ্র চৌধুরী। তখন প্রবাসী ও Modern Review-র সহকারী সম্পাদক।

৫ যোগানন্দ দাস, সাপ্তাহিক ও মাসিক শনিবারের চিঠির প্রথম সম্পাদক।

৬ বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীটে সাহিত্যিক রমেশ সেনের বাড়িতে সাহিত্য সেবক সমিতি ছিল।

৭ প্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত, সাহিত্যিক নীরদরঞ্জনের ভাই।

৮ সুপ্রভা দত্ত। তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে এম. এ. পড়তেন।

৯ খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইনস্টিটিউশন; ৬৫, ধর্মতলা স্ট্রীট। এই স্কুলে বিভূতিভূষণ ১৯২৯ থেকে '৪১ সন পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন।

১০ তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের পি. জি. হস্টেল ছিল ১৮বি, হরীতকী বাগান লেনে। সুপ্রভা এখানে থেকে পড়তেন।

গেলুম। সেখান থেকে বেরিয়ে শ্যামবাজারের দিকে যাচ্চি—রূপবাণীতে নীরদবাবুর[1] সঙ্গে দেখা। দুজনে One day (?) with you দেখলুম। নীরদবাবুর স্ত্রীও[2] ছিলেন।

মন্মথদের[3] সঙ্গে দেখা, তাদের গাড়ীতে বাড়ী পৌছে দিয়ে গেল।

৭ই জানুয়ারি, ১৯৩৩। ২৩শে পৌষ, ১৩৩৯। শনিবার

স্কুলের পর গেলুম বেলুড়[4]। ছাদে বসে চা খাওয়া হোল। রাত্রে খুব আড্ডা—পায়েস ও পিঠে খাওয়া গেল। সকালে উঠে চা ও কপি সিদ্ধ খেয়ে আমি ও নীরদবাবু সকালের ট্রেনে কলিকাতা এলাম।

তারপর আশীস্ গুপ্ত[5], করুণাবাবু[6], শরদিন্দুবাবু[7], সুপ্রভার এক ভাই ও কৃষ্ণবাবু[8] এলেন।

৮ই জানুয়ারি, ১৯৩৩। ২৪শে পৌষ, ১৩৩৯। রবিবার

রবিবার সকালে উঠে কলিকাতা এলাম। ক্রমে ক্রমে অনেকে এল। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে উঠে স্কুলের মিটিংএ গেলুম। চারু বিশ্বাস[9] নানা তর্ক ওঠালে—বাজেট্ ও হিসাব নিয়ে। কিছুই শেষ পর্যন্ত মীমাংসা হোল না। আমি ও

১ নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত। এঁর নামকরা উপন্যাস সুশান্ত সা।

২ সুবর্ণ দাশগুপ্ত।

৩ মন্মথনাথ ঘোষ, পাথুরিয়াঘাটা। ইনি সম্পর্কে বিভূতিভূষণের ছাত্রের ভাই ছিলেন। বিভূতিভূষণ পাথুরিয়াঘাটার খেলাতচন্দ্র ঘোষেদের বাড়িতে নানান পদে চাকরি করেছেন। কখনও গৃহশিক্ষক, কখনও জঙ্গলমহালের অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার, কখনও খেলাতচন্দ্র ইন্‌স্টিটিউশনের শিক্ষক।

৪ এখানে নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত বাসা নিয়েছিলেন। কালীঘাটে নিজেদের বাড়ি ছিল।

৫ গল্পকার হিশেবে পরিচিত ছিলেন। এঁর বইয়ের নাম ইহাই নিয়ম, বন্দিনী সুভদ্রা, স্বপ্নে দেখা মেয়ে। ইনি আর্থিক জগৎ নামে একটি পত্রিকাও সম্পাদনা করতেন।

৬ করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

৭ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

৮ কৃষ্ণদয়াল বসু।

৯ চারুচন্দ্র বিশ্বাস, প্রাক্তন বিচারপতি, কলকাতা হাইকোর্ট। খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইন্‌স্টিটিউশনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

ফণিবাবু[১] বেরিয়ে হেঁটে বাসায় এলুম। পথে রাধাকান্তের[২] সঙ্গে দেখা। সে বৌবাজার থেকে আমার সঙ্গে হেঁটে হ্যারিসন রোড্ পর্য্যন্ত এল পুরানো দিনগুলার মত। সুপ্রভা একটা চিঠি ও বই দিয়ে পাঠিয়েচে।

৯ই জানুয়ারি, ১৯৩৩। ২৫শে পৌষ, ১৩৩৯। সোমবার

সকালে উঠে কৃষ্ণধন বাবু ডেকে নিয়ে গেলেন নীলকণ্ঠ কেবিনে[৩] খাওয়াতে। ফিরে এসে স্কুলে গেলুম। রঞ্জনদের[৪] ওখানেও যাওয়া গেল। কিছুক্ষণ বঙ্গশ্রীর[৫] আপিসে কাটানোর পরে গেলুম পড়াতে। তার আগে সুনীতিবাবু[৬] ও সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত[৭] এবং প্রেমেনের[৮] সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হোল। পড়াতে গিয়ে আলোকের[৯] বাপের সঙ্গে হোল আলাপ। রাত্রে এল নটবর চাকুরীর চেষ্টায়। আহা, গরীব বেচারী! কি কর্ত্তে পারি আমি ওর জন্যে—কি ক্ষমতা আছে আমার? কেন ও এ illusion পোষণ করে যে আমি ওকে চাকুরী দিতে পারি?

১ ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সহকারী প্রধান শিক্ষক, খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইনস্টিটিউশন।

২ রাধাকান্ত বসু, পাথুরিয়াঘাটা। ইনি সম্পর্কে বিভূতিভূষণের ছাত্রের ভাই ছিলেন।

৩ আমহার্স্ট স্ট্রীটে বিভূতিভূষণের মেসের কাছে। দোকানটি এখনও আছে।

৪ রঞ্জনকুমার দাস, সজনীকান্তের ছেলে।

৫ সাহিত্য-মাসিক। প্রথম প্রকাশ মাঘ, ১৩৩৯; সম্পাদক সজনীকান্ত দাস। বিভূতিভূষণ এই পত্রিকাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। শুধু গল্প নয়, 'বিচিত্র জগৎ' নামে একটি নিয়মিত ফীচারও তিনি লিখতেন।

৬ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

৭ কালো বা নকল রবি নামে পরিচিত ছিলেন। ইনি নারায়ণ পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র'-এর প্যারডি করে 'মৃণালের দুঃখ' নামে একটি গল্প লেখেন। মৌলিক লেখাও এঁর রয়েছে; যেমন, কমলের দুঃখ, মহাপ্রস্থান ইত্যাদি।

৮ প্রেমেন্দ্র মিত্র।

৯ আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, নীরদরঞ্জনের ছেলে।

১০ই জানুয়ারি, ১৯৩৩। ২৬শে পৌষ, ১৩৩৯। মঙ্গলবার

সকালে কৃষ্ণধনবাবু এসে স্কুলের পথে অনেকদূর পর্য্যন্ত গেল। স্কুলে যতীন্দ্র[১] বলছিল দেবব্রত[২] আমার কথা বলেচে। মোহিতকে[৩] বলেচি ওর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে।

বৈকালে বাসায় এসে খাবার খেলুম। তারপর পশুপতি বাবুর[৪] সঙ্গে বেরুনো গেল তাঁর গাড়ীতে। বিচিত্রাতে[৫] উপেনবাবুর সঙ্গে দেখা করে ট্রামে P. C. Sircar-এর দোকানে বই[৬] নিয়ে ট্রামে সোজা Park Circus. সিরাজুলদের[৭] ওখানে।

আজ কি ধোঁয়া! এই আসচি সেখান থেকে।

১১ই জানুয়ারি, ১৯৩৩। ২৭শে পৌষ, ১৩৩৯। বুধবার

কৃষ্ণধনের সঙ্গে সকালে চা খেয়ে এলুম। স্কুলে যাবার পথে দেবব্রতের সঙ্গে দেখা হয়েছিল—কিন্তু আমি এড়িয়ে গেলুম। স্কুলে গিয়ে শুনি দেবব্রত অনেকবার নাকি আমার নাম করেচে।

স্কুল থেকে সকাল সকাল বেরুচ্চি হঠাৎ দেবব্রত দেখি সামনের ফুটপথ দিয়ে

১ যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষক, খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইন্স্টিটিউশন।

২ ছাত্র, খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইন্স্টিটিউশন।

৩ মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষক, খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইন্স্টিটিউশন।

৪ ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য, সাহিত্যিক। ইনি সরকারি ডাক্তার ছিলেন। নানান ধরনের বই তিনি লিখেছেন। যেমন, অবশ্যম্ভাবী (উপন্যাস), অন্তরঙ্গ রবীন্দ্রনাথ, নিজের ডাক্তার নিজে। থাকতেন বাগবাজারে ১২নং হরলাল মিত্র স্ট্রীটে।

৫ সাহিত্য-মাসিক। প্রথম প্রকাশ আষাঢ়, ১৩৩৪। সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। এই পত্রিকাতেই বিভূতিভূষণের প্রথম উপন্যাস পথের পাঁচালী প্রকাশিত হয়। বিচিত্রাতে তিনি 'বিশ্ব-জগৎ' নামে একটি নিয়মিত ফীচারও লিখতেন।

৬ যাত্রাবদল নামে গল্প-সংকলন। ১৯৩৪ সনে এটি উল্লিখিত প্রকাশন থেকে বেরয়।

৭ ছাত্র, খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইন্স্টিটিউশন।

যাচ্চে। আমায় দেখ্‌তে পেয়েচে কিনা কে জানে? বোধ হয় পেয়েচে।

আমিও এড়িয়ে গেলাম। ট্রামে উঠে প্রবাসীতে। ব্রজেনবাবু[১] গল্প চাইলে। সেখান থেকে বাসায় এসে খাবার খেয়ে লিখ্‌লুম খানিকটা। তারপর পার্ক সার্কাস থেকে পড়িয়ে এই ফিরচি।

আমার মনটা দেবব্রত দেবব্রত করচে।

১২ই জানুয়ারি, ১৯৩৩।২৮শে পৌষ, ১৩৩৯। বৃহস্পতিবার

স্কুল থেকে পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে কুমারটুলিতে গেলুম ঠাকুরের বায়না দিতে। সেখান থেকে ট্রামে বিচিত্রা আপিসের কাজ সেরে প্রবাসীতে এলুম। সেখানে টাকা আদায় করে[২] ও গল্প (পেয়ালা)[৩] দিয়ে বাসায় এসে খাবার খেয়েই ট্রামে বেরুলাম পার্ক সার্কাসে। সেখান থেকে হেঁটে নীরদ বাবুর বাড়ী কালীঘাট রোডে।[৪] ওপরে গিয়ে নীরদবাবুর বাবা ও মার সঙ্গে গল্প করলুম। তারপরে রমেশবাবু[৫] এল। সকলে মিলে খাওয়া দাওয়া সেরে খুব আড্ডা দেওয়া গেল—তারপরে ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে বাস আর পাইনে। রমেশবাবু আগের বাসে চলে গেলেন—আমি বাস আর পাইনে—রাত সাড়ে বারোটার সময় পেলুম—তাতেই কলেজ স্ট্রীটে নেমে চলে আসি। কাল আবার রমেশবাবু নিমন্ত্রণ কল্লে।

১৩ই জানুয়ারি, ১৯৩৩।২৯শে পৌষ, ১৩৩৯। শুক্রবার

সকালে স্কুলের ছুটি। দুপুরে ঘরেই শুয়ে। পৌষসংক্রান্তি। অনেক দিন পরে মনে পড়ল আজমাবাদে[৬] আজকার দিনটিতে সেই কুঁড়ে ঘরটার

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; তখন প্রবাসীর সহকারী সম্পাদক।

২ সম্ভবতঃ 'ভণ্ডুলমামার বাড়ী' (যাত্রাবদল) গল্পটির জন্যে। এটি পৌষের প্রবাসীতে বেরিয়েছিল।

৩ ফাল্গুন মাসের প্রবাসীতে বেরয়। পরে যাত্রাবদল গ্রন্থে সংকলিত হয়।

৪ ৩৩, কালীঘাট রোড।

৫ সাহিত্যিক রমেশ সেন (কবিরাজ)।

৬ ভাগলপুর জেলা। আজমাবাদ-ইসমাইলপুরে খেলাতচন্দ্র ঘোষের জঙ্গলমহাল ছিল। ১৯২৪ থেকে ১৯২৮ সন পর্যন্ত বিভূতিভূষণ এখানকার অ্যাসিস্টেণ্ট্‌ ম্যানেজার ছিলেন। এই জঙ্গলমহালের পটভূমিতেই অপরাজিত-এর আরণ্যক পর্ব এবং আরণ্যক উপন্যাস লেখা।

পাশ দিয়ে আসতুম—ভাবতাম ওরা তিলের লাড়ু পাকাচ্চে—সেই শান্ত সন্ধ্যা। অজানা দেশের মুক্ত প্রান্তর। মুক্ত মাঠ···সেই বটেশ্বরনাথ পাহাড়ে মেলা দেখতে যাওয়া সেও তো আজ।

সন্ধ্যার পরে বেরিয়ে পড়াতে গেলুম সিরাজুলকে। সেখান থেকে রমেশ-বাবুর বাড়ীতে পৌষ পার্ব্বণে পিঠে খাবার নিমন্ত্রণে। দেবতোষ বাবুর সঙ্গে সেখানে দেখা হোল। অনেক রাত্রে বাসায় ফিরলুম।

১৪ই জানুয়ারি, ১৯৩৩। ১লা মাঘ, ১৩৩৯। শনিবার

আজ বরিশাল এক্সপ্রেসে বাড়ি[1] গেলুম। খেঁদীর[2] জ্বর। উঠে খাবার তৈরী কর্ল্লে। বেশ শীত। বন্ধুর বৌ[3] বাইরের ঘরে রাঁধচে। সেখানে বসে চা খেলুম। তারপর বাসায় এসে Journals পড়া গেল।

১৫ই জানুয়ারি, ১৯৩৩। ২রা মাঘ, ১৩৩৯। রবিবার

সকালে উঠে ছেলেবেলার মত খয়রামারির মাঠে[4] বেড়াতে গেলুম। অনেক বদলে গেছে তবুও বেশ সুন্দর। তারপর বাজার হাট করলুম। জীবনে এই প্রথম সংসার করেচি।[5] এতদিন ছিলাম মুক্ত—আজ যেন ধরা পড়ে গেছি মনে হচ্চে। নতুন Sensation বটে।

বেলা হলে নদীতে স্নান করে এলুম।

তারপর খেয়ে একটু শুয়ে উঠে চাউলের কলে গেলুম। একটু বেলা পড়লে

১ বনগাঁর বাসাবাড়ি।

২ রাজলক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়, চালকীবাসিনী। ইনি জাহ্নবীর ভাশুরঝি; সেই সূত্রে বিভূতিভূষণের ভাগিনেয়ী।

৩ সরোজিনী দেবী, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী।

৪ বনগাঁ।

৫ বিভূতিভূষণের প্রথম বিবাহ ১৯১৭ সনে কলেজে পড়তে পড়তে। লেখাপড়া পাছে বিঘ্নিত হয় এইজন্যে তাঁর শ্বশুর পরীক্ষার আগে পর্যন্ত মেয়েকে নিজের কাছেই রেখেছিলেন। ১৯১৮ সনে বিভূতিভূষণের বি. এ. পরীক্ষা হয়ে গেলে তিনি মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠান। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তার মাস কয়েক পরেই গৌরী মারা যান। ফলে সংসারের দায়িত্ব বলতে যা বোঝায় তা বিভূতিভূষণ প্রথম অনুভব করেন বোন জাহ্নবীর ভার নিয়ে।

পায়েস ও পরেটা খেয়ে সুনীলের[১] সঙ্গে মোটরে রওনা। শশধর[২] আমাদের সঙ্গে এল। বেশ আরাম করে বসে এলুম।

মেসে মহা হৈ চৈ, মেস ভেঙে যাবে।

১৬ জানুয়ারি, ১৯৩৩। ৩রা মাঘ, ১৩৩৯। সোমবার

স্কুলে গেলুম—সেখান থেকে বেরিয়ে গেলাম বঙ্গশ্রীর আপিসে। কৃষ্ণধনবাবুও একটু পরে সেখানে [—] দুজনে বেরিয়ে কার্জন পার্কে বসে গল্প করলুম। তারপর আমি পড়াতে এলুম। রাত্রে এসে দেখি মেসে খুব মিটিং চলচে। মেস ভেঙে যাবে ইত্যাদি।

১৭ই জানুয়ারি, ১৯৩৩। ৪ঠা মাঘ, ১৩৩৯। মঙ্গলবার

এদিন বেলা দেড়টার পরে স্কুল থেকে বেরিয়ে বিভূতিদের[৩] বাড়ি গেলুম। সেখান থেকে আবার ওর মোটরে ওর সঙ্গে কলেজ স্কোয়ারে এলুম। বাসায় এসেই একটু পরে বেরুলুম পার্ক সার্কাসে।

অনেকরাত্রে ফিরি।

১৮ই জানুয়ারি, ১৯৩৩। ৫ই মাঘ, ১৩৩৯। বুধবার

স্কুল থেকে বাসায় এসে খেলুম। তারপর খুব মোঁপাসাঁ [মোপাসাঁ] পড়ে তার পরেই পার্ক সার্কাস। সন্ধ্যার আগে রেবতীবাবু এল। পঞ্চানন মান্না আবার আজ পড়বে বল্লে। রাত্রে তিনু[৪] এল।

১৯শে জানুয়ারি, ১৯৩৩। ৬ই মাঘ, ১৯৩৯। বৃহস্পতিবার

স্কুলে ব্রহ্মকিশোরবাবু[৫] এলেন। স্কুল থেকে বেরিয়ে পুরানো বইএর দোকানে বেড়ালুম। পঞ্চানন মান্না পড়বে বলেছিল, সে এল না। ৬টার পরে আমরা

১ সুনীল মুখোপাধ্যায়, বনগাঁবাসী। এঁর দাদা বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ('মিতে') কনট্র্যাক্টরি করতেন। তাঁরই গাড়িতে কলকাতায় আসেন।

২ শশধর মুখোপাধ্যায়, খুকুর মামা।

৩ বিভূতিভূষণ বসু, পাথুরিয়াঘাটা। এঁরই গৃহশিক্ষক ছিলেন বিভূতিভূষণ। মৌরীফুল গল্প-সংকলন এঁকেই উৎসর্গ করা।

৪ তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়, বারাকপুরবাসী ; ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ভাই।

৫ ব্রহ্মকিশোর মুখোপাধ্যায়, ভাইস প্রেসিডেন্ট, খেলাত্‌চন্দ্র ক্যালকাটা ইন্সটিটিউশন।

ছাদে পায়চারী করে স্কুল সম্বন্ধে পুরানো দিনের মত আলোচনা কর্ত্তে লাগলুম। তারপর পার্ক সার্কাসে।

শীত আজ কম।

২০শে জানুয়ারি, ১৯৩৩। ৭ই মাঘ, ১৩৩৯। শুক্রবার

ছোটমামার[1] সঙ্গে কথা ছিল দুর্গাপদ বাবুকে নিয়ে উপস্থিত থাকবে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের গেটে। আমি ঠিক ৪||০ টার সময় গেলাম। সেখান থেকে সজনীর ওখানে বসলুম।

দেবব্রতের সঙ্গে দেখা হোল সকাল বেলা ওদের বাড়ীর দোরে। কতকাল পরে। পুরানো দিনের মত ওকে আদর করলুম।

২১শে জানুয়ারি, ১৯৩৩। ৮ই মাঘ, ১৩৩৯। শনিবার

বৈকালে বেলুড় গেলাম। চা খেয়ে ছাদের উপর বসে আড্ডা দেওয়া গেল। রাত্রে ঘরের মধ্যে বসে আমি নীরদবাবু, নীরদবাবুর স্ত্রী খুব ভূতের গল্প করা গেল। সকালে সুপ্রভার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে গিয়েছিলাম ওদের হোস্টেলে।

২২শে জানুয়ারি, ১৯৩৩। ৯ই মাঘ, ১৩৩৯। রবিবার

বেলা তিনটে পর্য্যন্ত আড্ডা দেওয়ার পরে তিনটের গাড়ীতে চলে এলুম। ময়দান ও চৌরঙ্গি বেড়িয়ে বাড়ি ফিরলুম।

২৩শে জানুয়ারি, ১৯৩৩। ১০ই মাঘ, ১৩৩৯। সোমবার

স্কুলে যাবার আগে কৃষ্ণধনবাবু এল। পথে দেখলুম দেবব্রতরা যাচ্চে। স্কুল থেকে বঙ্গশ্রীতে সজনীর ওখানে গেলুম। তারপর পার্ক সার্কাস থেকে বাড়ী।

২৪শে জানুয়ারি, ১৯৩৩। ১১ই মাঘ, ১৩৩৯। মঙ্গলবার

অনেকদিন পরে আজ সকালে রাজবলহাটের[2] স্কুলের সেক্রেটারী ভূপতিবাবুর সঙ্গে দেখা হোল। কত ঘটনা হয়ে গেল ইতিমধ্যে।...ভাবলেও মনে অবাক হয়ে যেতে হয়।

ভূপতিবাবুর সঙ্গে সেবার যখন শেষ দেখা করে এসেছিলুম জাঙ্গিপাড়ার[3] বাসায় মার[4] কাছে, তখন আমি কি বুঝতুম? সামান্য নগণ্য স্কুলমাস্টার।

---

১ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভাটপাড়াবাসী।

২ থানা জাঙ্গিপাড়া, হুগলি।

৩ হুগলি। বিভূতিভূষণ ১৯১৯ সনের ৭ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯২০ সনের ৩১শে মে পর্যন্ত জাঙ্গিপাড়া স্কুলে শিক্ষকতা করেন।

৪ মৃণালিনী দেবী।

তারপর কলিকাতা ও Imperial Library : রমাপ্রসন্নের বাসায় হরিনাভির[১] ঠিকানা। চারুবাবুর[২] সঙ্গে দেখা ও প্রমথ বাঁড়ুয্যে[৩]। ? ও ছানা খাওয়া… লুডো (?) খাওয়া…বর্ষার রাত। মার মৃত্যু ফুলীদের[৪] বাড়ী…সত্য মজুমদার …ক্যালভ্যার্ট…নদী (?) রাঁধে…ভূতের গল্প…নতুন চেয়ার…বাঁশের উপর দিয়ে দূরে দেখা…চাকুরী গেল…মেস…Cow Protection.[৫] বরিশাল… চাটগাঁ…বিভূতি · ভাগলপুর…ইসমাইলপুর আজিমাবাদ…পাটনা…ক্লারিজ[৬] … দেবব্রত গেল—পথে দেখা—সুপ্রভা, ভূপতিবাবু।

কৃষ্ণধনবাবু স্কুলে গেল। বিভূতিদের বাড়ী চাঁদা আনতে গিয়ে সুরেন গাঙ্গুলিকে[৭] ফেলে গেলুম বিচিত্রা আপিসে।

২৫শে জানুয়ারি, ১৯৩৩। ১২ই মাঘ, ১৩৩৯। বুধবার

আজ সকালে খুব বৃষ্টি। কাল রাত্রে টকুর সঙ্গে ঝগড়া হোল। সকালে বেরুতে গিয়ে বনগাঁর পত্র পেলুম (—) খেঁদা[৮] লিখচে জাহ্নবীকে একা রাখতে

---

১ ২৪ পরগনা। বিভূতিভূষণ ১৯২০ সনের ২১শে জুন থেকে ১৯২২ সনের ১৭ই জুলাই পর্যন্ত হরিনাভি স্কুলে শিক্ষকতা করেন।

২ চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ; তখন প্রবাসীর সহ-সম্পাদক।

৩ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন উপাচার্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

৪ অন্নপূর্ণা গোস্বামী (খুকী), রাজপুরবাসিনী (২৪ পরগনা)। হরিনাভি স্কুলে শিক্ষকতার সময় বিভূতিভূষণ রাজপুরে সত্যভূষণ মজুমদারের বাড়িতে থাকতেন। প্রতিবেশী হরিদাস লাহিড়ীর কন্যা অন্নপূর্ণা অর্থাৎ ফুলী বিভূতিভূষণকে দেখাশোনা করতেন। ইনিই অপরাজিত-এর পটেশ্বরী চরিত্রের উৎস।

৫ কেশোরাম পোদ্দারের প্রতিষ্ঠিত Cow Protection League। ১৯২২ সনে বিভূতিভূষণ এখানে প্রচারকের কাজ করতেন এবং সেই সূত্রে তাঁর পুব-বাঙলা এমনকি সুদূর বর্মা পর্যন্ত যাওয়া। অভিযাত্রিক তারই ফসল।

৬ এইচ. সি. ক্লারিজ, প্রধান শিক্ষক, খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইন্সটিটিউশন।

৭ সাহিত্যিক সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। এঁর নামকরা উপন্যাস স্মৃতির আলো, মৃগতৃষ্ণা, পূর্বরাগ।

৮ সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, চালকীবাসী। ইনি জাহ্নবীর ভাশুরপো : সেই সূত্রে বিভূতিভূষণের ভাগিনেয়।

হবে। বিচিত্রা আপিসে সুরেন গাঙ্গুলীর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হোল। সেখান থেকে বেলা দেড়টার সময় স্কুল। কাল বিমলেন্দু কুমারকে বকেছিলুম। আজ তাকে একটু আদর করলুম। খোয়া ক্ষীর ব্যবসার কথা সুরেনবাবুই বললেন। তারপর স্কুল থেকে বেরিয়ে ননী[1] নিয়ে গেল আর্টিষ্ট নিরঞ্জন সাহার বাসায়। লিনোকট্ এর কাজ বেশ করেচে। সেখান থেকে বঙ্গশ্রী আপিসে। সুনীতিবাবু এলেন ও নকলদানা (নকুলদানা) খাওয়া গেল। তারপর পার্ক সার্কাসে গেলুম। চৈতন্যদেবও[2] আজ ছিল। টরু বাড়ী গেছে[3]।

২৬শে জানুয়ারি, ১৯৩৩। ১৩ই মাঘ, ১৩৩৯। বৃহস্পতিবার

স্কুলের ছুটির পরে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড়ে দেবব্রতের সঙ্গে দেখা হোল। দেবব্রতের চোখের কি অসুখ হয়েচে—বেচারী স্বর্য্যের দিকে চাইতে পারে না। সেখান থেকে বেরিয়ে প্রবাসীতে এলুম[4] কারণ পত্র লিখেছিলেন ব্রজেন দা। তাঁর কথামত M. C. Sircar এর দোকানে মৌরীফুল গল্পটি দিলাম। সেখান থেকে বাসা হয়ে পার্ক সার্কাস। পড়িয়ে রওনা হয়ে সোজা বেরুলাম কিন্তু যেতে হয়ে গেল দেরী। ৯—৫ মিনিটের গাড়ী ফেল করে বাসে বেলুড় গেলুম। সেখানে কি বেজায় শীত। নীরদবাবু ও তার স্ত্রীর সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প গুজব করে খেয়ে শোয়া গেল।

২৭শে জানুয়ারি, ১৯৩৩। ১৪ই মাঘ, ১৩৩৯। শুক্রবার

ভোরে বেলুড় থেকে রওনা হয়ে নটার গাড়ীতে বনগাঁয়ে এলাম। সন্ধ্যায় ক্লাবে গেলুম ও বন্ধুর Dispensary তে বসে খুব আড্ডা দেওয়া গেল।

২৮শে জানুয়ারি, ১৯৩৩। ১৫ই মাঘ, ১৩৩৯। শনিবার

১ ননী চক্রবর্তী, বিভূতিভূষণের সহপাঠী।

২ শিল্পী চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়।

৩ দিনলিপির নীচে আলাদা অনুচ্ছেদে লেখা, 'সুরেনবাবু—গৃহভারতী। Puraini Rd. South Bhagalpur তরণীকান্ত আলু। মেওয়াপটি। নতুন বাজার। (? কড়াই ও) মন্মথঘাটী মেওয়াপটি। নতুন বাজার।'

৪ 'মৌরীফুল' গল্পটি প্রবাসীতে বেরনোর পরে সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবর্তিত 'কথা ও কাহিনী' সিরিজ-এর পঞ্চম সংখ্যারূপে এটি এক আনা মূল্যে বেরয়। সম্ভবত: এই উপলক্ষেই তিনি গল্পটি দিতে গিয়েছিলেন।

সকালে উঠে আমি ও পরেশ[১] দুজনে বলুর[২] মোটরে বারাকপুরে। নদীতে স্নান করলুম। বৈকালে কুঠীর মাঠে[৩] কুল খেতে গেলুম আমি ও পরেশ।

একটা নির্জন স্থানে বসে অস্তসূর্যের আলোয় কি সুন্দর শোভাই দেখলুম [—] একটা শিমূল গাছের ডালপালায়। একটা শুকনো ডালপালার গাদায় আগুন ধরিয়ে চলে এলুম। শ্যামাচরণ দাদার[৪] বাড়ীতে নিমন্ত্রণ।

রাত্রে পরেশের বাড়ীতে শুয়ে শীতে হি হি করে কাঁপলুম সারারাত। তাদের নেই লেপ। গায়ে দেবার নেই কিছু। তেমনি শীত পড়েচে।

২৯শে জানুয়ারি, ১৯৩৩। ১৬ই মাঘ, ১৩৩৯। রবিবার

সকালে উঠে দেখি আমার বাবার হাতের লেখা পুঁথির অংশ[৫] ও মহানাটকের[৬] বইয়ের পাতা প্রতাপাদিত্য[৭] ও আমার I. A. সময়কার পড়া ? এর স্মৃতি জড়িত বইখানার পাতাগুলো ছিঁড়ে পড়ে আছে। সুসার কাকা খুব ভোরে এসেচেন—আমি ও পরেশ আসতে আসতে বাড়ী গেলাম। এসে খেয়ে দেয়ে আমি বলুর সঙ্গে চাঁদপাড়া[৮] গেলাম মোটরে। যতীন দত্তর[৯] ঘোর

---

১ পরেশ চট্টোপাধ্যায় (ভোঁদো), চালকীবাসী। জাহ্নবীর দেওরপো ; সেই সূত্রে বিভূতিভূষণের ভাগিনেয়।

২ ডাঃ সলিলভূষণ মুখোপাধ্যায় (বুলু/বলু), বনগাঁবাসী ; বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ('মিতে') ভাই।

৩ বারাকপুর। পথের পাঁচালীতে এর উল্লেখ আছে।

৪ শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বারাকপুরবাসী।

৫ মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু কথক ছিলেন না, তিনি নিজে পালাও লিখতেন। তাছাড়া সংস্কৃতে তিনি কবিতা লিখতেন। বিভূতিভূষণ বিশ্বাস করতেন, তাঁর সাহিত্যরচনার প্রেরণা উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি বাবার কাছে পান। ডায়েরিতেও লিখেছিলেন, 'বাবা রেখে গিয়েছিলেন তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করবার জন্যে, তাই যদি করতে পারি, তার চেয়ে সত্যতর কোন তর্পণের খবর আমার জানা নেই।'

৬ মহানাটকম্ ; দামোদর মিশ্র রচিত সংস্কৃত নাটক।

৭ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নাটক। পুরো নাম বঙ্গের প্রতাপ-আদিত্য।

৮ গাইঘাটা থানা, ২৪ পরগনা।

৯ বনগাঁবাসী।

অসুখ। সন্ধ্যায় ফিরে হাট বাজার করি।

৩০শে জানুয়ারি, ১৯৩৩। ১৭ই মাঘ, ১৩৩৯। সোমবার

সকালে উঠে খুব আড্ডা দিলুম। আজ সরস্বতী পূজা। স্কুলে গিয়ে টরুকে অঞ্জলি দেওয়ালুম। খুকী[1] ও শান্ত[2] গেল। তাদের অঞ্জলি দিয়ে প্রসাদ দিলাম। বন্ধুদের বাড়ী নিমন্ত্রণ খেয়ে আড্ডা দিলাম। বিকেলে আমি ও টরু প্রফুল্লদের[3] বাড়ী গেলাম।

৩১শে জানুয়ারি, ১৯৩৩। ১৮ই মাঘ, ১৩৩৯। মঙ্গলবার

সকালে খাবার খেয়ে বরিশাল এক্সপ্রেসে কলিকাতা। একটু ঘুমুলাম। বেলা ২৷৷০ টাতে ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে সারস্বত সম্মেলনে এলুম। কিছু বক্তৃতাও কর্ত্তে হোল। সেখান থেকে স্কুল। আমি, বিরাজ[4] ও যতীন বেরিয়ে সাঙ্গু-ভ্যালিতে [—] চা খেয়ে ওরা চলে গেল। আমি বঙ্গশ্রীতে এলুম। সেখানে ঘোর তর্ক [—] বঙ্কিমচন্দ্র বড় না রবীন্দ্রনাথ বড়। খানিকটা আড্ডা দিয়ে বাড়ী।

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩।১৯শে মাঘ, ১৩৩৯। বুধবার

সকালে স্কুলে যেতে দেবব্রতের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কিন্তু বিকেলে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে আমরা বসেছিলাম—আমি ও কৃষ্ণবাবু, তখন ওকে মোহিত বাঁড়ুয্যে ডাকতে গেল—ও এল না। এতে মন খারাপ হয়ে গেল। সাহিত্য জিনিসটা করবো বল্লেই হয় না। পা গুণে গুণে চলে সাহিত্য হয় না। সে মনের একটা অবস্থা—যখন বন্যার স্রোতের মত উদ্দাম ঢেউ কোথা থেকে এসে নিজেকে ভুলিয়ে দেয়—সর্বস্ব ভুলিয়ে দেয়—সে আলাদা জিনিস। সে ভাবস্রোত—হিমালয় থেকে অবতরণশীলা ভাগিরথীর [ভাগীরথীর] মত পাহাড় পর্যন্ত ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে এ-মনি তার জোর।

২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ২০শে মাঘ, ১৩৩৯। বৃহস্পতিবার

স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী আপিসে গেলাম। সেখানে একবার খেলাম টিফিনের

১ উমা বন্দ্যোপাধ্যায়। জাহ্নবীর মেয়ে; বিভূতিভূষণের ভাগিনেয়ী।

২ শান্ত চট্টোপাধ্যায়। জাহ্নবীর ছেলে; বিভূতিভূষণের ভাগিনেয়।

৩ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ; বনগাঁ কংগ্রেস শাখার সভাপতি ছিলেন।

৪ বিরাজমোহন চাকলানবীশ, শিক্ষক, খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইনষ্টিটিউশন।

সময়ে, একবার ছুটির পরে। গোসাবা নিয়ে ক্ষেত্রবাবুর[১] সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলা গেল বাসে। তারপর পার্কসার্কাস হয়ে বাসায়। রাত্রে হরিনাভির নৃপেন[২] এল।

আজ শৈলজা[৩] যাত্রাবদল[৪] গল্পটার অজস্র প্রশংসা কর্ল্লে বঙ্গশ্রী আপিসে।

৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৩৩৯। ২১শে মাঘ, ১৩৩৯। শুক্রবার

স্কুলের টিফিনের মধ্যে বঙ্গশ্রী আপিসে গেলুম। তারপর ছুটির পরে আবার। অজিত দত্ত ওর বিয়েতে নিমন্ত্রণ কর্ল্লে। তারপর আমি ও মৃণাল সর্ব্বাধিকারী[৫] দুজনে বেরিয়ে ইনষ্টিটিউটে। চারুবাবু এসে ফিরে গিয়েছেন। বিশু ও আমি লাউঞ্জে অনেকক্ষণ Study circle সম্বন্ধে আলাপ করলুম। তারপর পেণ্টার রমন সাহেবের কাছে গেলাম। সেখান থেকে বাড়ী এসে তবে পার্ক-সার্কাস—

৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ২২শে মাঘ, ১৩৩৯। শনিবার

স্কুলে যেতে পথে দেবব্রতকে দেখেছি আজ। স্কুলে গিয়েই Kitchen সাহেবকে এক চিঠি পাঠালুম। তারপরে Imperial Libraryতে গেলুম। এলেই হেডমাস্টার[৬] বল্লেন আমায় যেতে হবে Chief Manager এর ওখানে। নীরদবাবু গাড়ী নিয়ে এলেন। তাঁর গাড়ীতে দুজনে বিভূতিদের বাড়ীর কাজ সেরে নীরদ বাবুর বাড়ী এসে চা খেলাম। তারপর মোটরে বেরিয়ে আলিপুরে হর্টিকাল্‌চারাল সোসাইটীর বাগানে কতক্ষণ বস্‌লাম। আমাকে ঘোষ ব্রাদার্স এর দোকানের মোড়ে নামিয়ে দিয়ে নীরদবাবু চলে গেলেন। মনোজের[৭] সঙ্গে দেখা সেখানেই। মনোজ Examiner হয়েচে এবার বললে। তারপর নীরদবাবু সম্বন্ধে কথা বলতে আমি আবার নীরদবাবুর বাড়ি যাই। সেখান থেকে সুশীল বাবুর[৮] ওখানে। প্রমথ চৌধুরী গাড়ীতে উঠ্‌চেন। সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা মেসে রাত দশটায়।

---

১ ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়, শিক্ষক, খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইনষ্টিটিউশন।

২ নৃপেন রায়, বিভূতিভূষণের বন্ধু।

৩ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

৪ ১৩৩৯ সালে পৌষ মাসের বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়। পরে যাত্রা-বদল গল্পগ্রন্থে সংকলিত।

৫ প্রাক্তন অধ্যাপক, আশুতোষ কলেজ।

৬ রামনারায়ণ ভট্টাচার্য, হেডমাস্টার, খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইনষ্টিটিউশন।

৭ মনোজ বসু।

৮ অধ্যাপক সুশীল মিত্র।

৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ২৩শে মাঘ, ১৩৩৯। রবিবার

আজ পূর্ণ বিশ্রাম। সকালে দু একজন লোক ও নিরঞ্জন সাহা আর্টিস্ট এল। দুপুরে একটু ঘুমুলুম। তারপর উঠে নীরদবাবু গাড়ি নিয়ে এলেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করলুম ৪০০০ বৎসর আগেকার যে পর্বত লেখন সম্বলপুরে পাওয়া গিয়েচে সে সম্বন্ধে। ২৬শে ফেব্রুয়ারী সেখানে যাবো ঠিক হোল। তারপর Hellen [Helen] Keller[১] এর ও Anthony Trollope[২] এর জীবনী পড়লাম। বৈকালে হীরেন্দ্র দত্তের[৩] বক্তৃতা শুনতে গেলুম। আমাকে ওদের কতকগুলো বই পড়তে হবে।

Modern Cosmogony আমাদের ঋষিরা আগেই জানতেন। মহাবিভূতি উপনিষদে শ্লোক আছে :

'অস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য সমন্ততঃ এতাদৃশিনী অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডানি সাবরনানি জ্বলন্তি।'[৪] এদের নিয়ন্তা যে অক্ষর পুরুষ, তাঁর সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক যাজ্ঞবল্ক্য বলেচেন 'এতস্য অক্ষর পুরুষস্য প্রশাসনে গার্গী সূর্যচন্দ্রমসৌ (নভসি) বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ।'[৫]

৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ২৪শে মাঘ, ১৩৩৯। সোমবার

6.2. 1940.[৬] দেবব্রতের সঙ্গে কালই দেখা হয়েছিল, রোজই হয়। তেমনি

১ আমেরিকান লেখিকা। অল্প বয়সেই অন্ধ হন। এঁর বিখ্যাত আত্মজীবনীর নাম The Story of my Life এবং The World I Live in।

২ ইংরেজ ঔপন্যাসিক। এঁর আত্মজীবনীর নাম An Autobiography।

৩ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

৪ 'অস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য সমন্ততঃ স্থিতান্যেতাদৃশান্যনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডানি সাবরণানি জ্বলন্তি।' [এই রকম অনন্ত কোটি আবরণ যুক্ত ব্রহ্মাণ্ড এই ব্রহ্মাণ্ডের চারিদিকে দীপ্যমান।) —ত্রিপাদ্‌ বিভূতিমহানারায়ণোপনিষৎ, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ৩৬৯, ঈশাদিবিংশোত্তরশতোপনিষদঃ, নির্ণয়সাগর সংস্করণ।

৫ 'এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ' [হে গার্গি, এই অক্ষরের (ব্রহ্মের) শাসনে সূর্য ও চন্দ্র বিধৃত রয়েছে।]—বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ৩।৮।৯।

৬ অতীতচারণ বিভূতিভূষণের অত্যন্ত প্রিয় ব্যাপার ছিল। তিনি কখনও বর্তমান বছরের দিনলিপিতে অন্য বছরের ঐ দিনটিতে কী ঘটেছিল তা লিখে রাখতেন। এটি আসলে ১৯৪০ সনের ৬ই ফেব্রুয়ারিতে ১৯৩৩ সনের ঐ দিনটির স্মরণ। পাণ্ডুলিপির কালির গাঢ়তার পার্থক্য থেকে বোঝা যায় প্রথম অনুচ্ছেদটুকুই ১৯৪০ সনের।

ভালবাসা এখনও—বরং গাঢ় হয়েছে।

দেবব্রত বলেচে নাকি? কাছে কেই বা যায়? মোহিত বলছিল। সত্যই বটে। বিভূতির থেকেও? Love জিনিসটা সত্য না মিথ্যা? A great experiment.

সকালে রাধুর মাস্টার এলো। ওদের বাড়ীর সম্বন্ধে অনেক কথাই বল্লে। তারপর আমি গেলুম স্কুলে। পঞ্চানন বলে পড়ুয়া কিন্তু পড়ে না। আজ স্কুলের ছাদ থেকে দেখছিলুম দূরের আকাশটা। প্রথম বসন্তে সেই ভাঁট ফুলের দল[1] —সেই রক্তাক্ত শিমূলবন, সেই সব।

স্কুল থেকে বেরিয়ে হেঁটে College St. দিয়ে বাসায় এলাম। মেসের ছেলেরা থিয়েটার করচে সেখানে সব যাচ্চে। কি সুন্দর জ্যোৎস্না আজ! দক্ষিণ হাওয়া দিচ্চে।

পার্ক সার্কাস থেকে পড়িয়ে বাসায় এলুম। মেসে কেউ নেই—সব থিয়েটারে।

৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ২৫শে মাঘ, ১৩৩৯। মঙ্গলবার

স্কুলে আজকাল master classic পড়চি। বঙ্গশ্রী আপিসে গেলুম ছুটীর পরে। সেখান থেকে আমি ও চৈতন্যদেব museumএ স্বাস্থ্য প্রদর্শনী দেখতে গেলুম। সেখান থেকে পার্ক ষ্ট্রীট দিয়ে হেঁটে পার্ক সার্কাসে গেলাম। পার্ক ষ্ট্রীট দিয়ে যেতে যেতে Weldon (?) Libraryতে গেলুম অনেক কাল পরে।

কি সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেচে আজ! পার্ক ষ্ট্রীটের এদিকে কখনো আসিনি। বড় সুন্দর লাগছিল। বড় বড় রাস্তা—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ীঘর—দোকানপসার —যেন বিলেতের শহরে বেড়াচ্চি। যেই পার্ক সার্কাসে ঢুকেচি—অমনি অপরিষ্কার।

৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ২৬শে মাঘ, ১৩৩৯। বুধবার

আজ স্কুল থেকে সোজা বঙ্গশ্রী আপিসে গেলুম। সেখানে রবি মৈত্র[2] সুশীল-বাবুদের ব্যাপার নিয়ে খুব হৈ হৈ সুরু করেচে। সেখানে তর্ক ওঠালুম। তারপর এলেন সুনীতিবাবু। তাঁর সঙ্গে গল্প চলতে লাগলো—তিনি আবার একটা প্রবন্ধ লিখতেও লাগলেন! তারপর ট্রামে পার্ক সার্কাস হয়ে অজিত দত্তের বাড়ী

১ অপর নাম ঘেঁটু, সংস্কৃতে ঘণ্টাকর্ণ। clerodendron infortunatum Gaertn.

২ রবীন্দ্রনাথ মৈত্র।

নিমন্ত্রণ খেতে গেলুম মানিকতলায়। সজনী, শৈলজা, প্রেমেন, নীহার রায়[১] সবাই সেখানে ছিল। খুব হৈ হৈ হোল। খেতে বসে আমরা সবাই সমস্বরে 'শৈলজা' শৈলজা' বলে চেঁচাতে লাগলুম। ভারী মজায় খাওয়া হোল। অনেক-রাত্রে বাসায় ফিরলুম।

বসন্ত আসচে। শীত পড়ে গিয়েচে। রোজ দুপুরে স্কুলের ছাদে উঠে দূর চক্রবালে চেয়ে থাকি। ১৩০০ সালে বাবা বাড়ীতে বসে পুঁথি লিখেছিলেন—সে পুঁথি এবার গিয়ে বুড়ী পিসিমার[২] বাড়ী থেকে নিয়ে এসেচি—সেই সুদূর জীবনের কথা মনে হয় এই স্নিগ্ধ দুপুরে। কোথায় কতদূরে এসে পড়েচি।

৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ২৭শে মাঘ, ১৩৩৯। বৃহস্পতিবার

স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী। সকালে ছুটি হয়ে গেল আশু শাস্ত্রীর[৩] মৃত্যুর জন্যে। ওখান থেকে বঙ্গশ্রীতে। সজনীর সঙ্গে প্রবাসী। বড়লোকের একটা বাড়ী ভাড়া দিচ্চে দেখলুম[৪]। আমহার্স্ট দিয়ে রমেশ সেনের ওখানে। সেখান থেকে ট্রামে করে পার্ক সার্কাস। রাত্রে এসে নীরদের পত্র পেলুম দেখা কর্ত্তে লিখেচে। পশুপতিবাবু এলেন—তাঁর গাড়ী করে বাগমারী হয়ে নীরদের বাসা। সুশীল-বাবুদের ব্যাপারটা নিয়ে গল্প হোল। দ্বারিক ঘোষের ওখানে খেয়ে রাত্রে বাড়ী।

খুব জ্যোৎস্না।

দেবব্রত নাকি কি সব কথা বলেচে শুনলুম মোহিত ও হারাধনের মুখে।

১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ২৮শে মাঘ, ১৩৩৯। শুক্রবার

সকালে উঠে আমি ও টকু বড়লোকের সেই বাড়ীটা দেখতে গেলুম। ওখান থেকে আমি বেলুড় গেলাম। হাওড়া স্টেশনে নীরদবাবুর সঙ্গে দেখা হোল। আমি একা গিয়ে Mrs. Das Guptaকে দেখতে গেলাম। খানিকক্ষণ ছাদে বসে আড্ডা ও চা খাওয়া হোল। ৪-৫০ টার ট্রেনে ফিরে বাসায় এলুম। একটু পরেই ট্রামে পার্ক সার্কাস। এই ফিরচি। আজ বিশ্রী ধোঁয়া।

১ নীহাররঞ্জন রায়।

২ কুসুমকুমারী চট্টোপাধ্যায় (পিসিমা/ বুড়ী পিসিমা), বারাকপুরবাসিনী।

৩ আশুতোষ শাস্ত্রী, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ।

৪ বন্ধু ক্যাপ্টেন ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কলকাতায় প্র্যাকটিস করবেন বলে বিভূতিভূষণ তখন তাঁর জন্যে বাড়ি দেখছিলেন।

১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ২৯শে মাঘ, ১৩৩৯। শনিবার

সকালে স্কুলে গেলুম। সেখান থেকে বরিশাল এক্সপ্রেসে বনগাঁ গিয়ে সন্ধ্যার সময় নামলুম। সন্ধ্যায় বন্ধুর বাসায় বসে একটু গল্প গুজব করা গেল। হাটবাজার করলুম।

১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ৩০শে মাঘ, ১৩৩৯। রবিবার

সকালে উঠে বাজার করা গেল। ১৮ই তারিখ পর্যন্ত জলের দেনা শোধ[১]। খুব কুয়াসা। বন্ধুর Dispensaryতে বসে একটু গল্প করলুম। খয়রামারির মাঠে সজনে গাছে খুব ফুল ফুটেচে। সরোজের[২] সঙ্গে বাজারে দেখা। খাওয়া দাওয়া করে বিকেলের ট্রেনে রওনা।

১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ১লা ফাল্গুন, ১৩৩৯। সোমবার

স্কুলের ছুটি। সকালে উঠে হরবিলাস[৩] এল। তারপর দুপুরে একটু ঘুমিয়ে Imperial Libraryতে গেলুম Secret doctrine[৪] আনতে। বাজে বই। বিকেলে আমি ও টুকু বেরুলাম। রমেশ সেনের ডাক্তারখানা [,] M. C. Sircar এর দোকান—সেখানে রবি মৈত্র বসে আড্ডা দিচ্চে।

রাত্রে রমেশ সেনের ভাইয়ের বৌভাত। একবার খেয়ে উঠেচি। নীরদবাবু এসে আর একবার খাওয়ালে। গাড়ী করে রাত বারোটায় মেসে এলুম। খুব জ্যোৎস্না। বিছানায় জ্যোৎস্না পড়েচে।

১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ২রা ফাল্গুন, ১৩৩৯। মঙ্গলবার

সকালে নৃপেন রায় এল। স্কুলে গেলুম—সেখান থেকে Imperial Library-তে বই বদলে বঙ্গশ্রী আপিসে। শৈলজা, প্রেমেন সবাই সেখানে। শৈলজার এক বন্ধু হাতের ছাপ নিলে। সেখান থেকে হেঁটে এলুম পঞ্চানন মান্নার মামার কারখানায়। কথাবার্ত্তা সেরে A. C. Deyএর সঙ্গে Calcutta Trading Coর আপিসে দেখা করা গেল। তারপর পার্ক সার্কাস ও মেস।

১ বিভূতিভূষণের বোন জাহ্নবীর বনগাঁর বাসাতে ভারীতে জল দিত। তার বাবদ দেনা শোধ।

২ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বনগাঁবাসী।

৩ হরবিলাস ঘোষ, বনগাঁবাসী; ইনি বনগাঁর কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট প্রফুল্ল ঘোষের ভাই।

৪ লেখিকা Helen Petrovna Blavatsky।

১৪।২।৩৪[1]

গালুডি। সকাল। পাহাড়ের সামনে বসে লিখচি, বনে পত্রহীন গাছে ? ফুল ফুটেচে। এক বৎসর পরে এই অংশ লিখচি, জীবনটা বদলায়নি তবে প্রকৃতির সঙ্গে এইসব দিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ ঘটেচে। সেবারে বেলপাহাড়ের যাবার সময় বুঝতে পারিনি যে এতকাছে এমন সুন্দর স্থান আছে। 'দৃষ্টি-প্রদীপে'র ভিতুর মাতৃবিয়োগের অধ্যায়[2] কাল রাত্রে পোষ্ট মাস্টারের সঙ্গে কেন্দ্রপোসি ও Guaর বনের পরে গল্প করেচি।

১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ৩রা ফাল্গুন, ১৩৩৯। বুধবার

স্কুল থেকে নীরদবাবুর গাড়ীতে কালিঘাট [কালীঘাট]। পার্ক সার্কাসে হেঁটে এলুম বালীগঞ্জ দিয়ে।

গালুডি। ১৫ই ফেব্রুয়ারী। ১৯৩৪

এ বছর ঠিক এই দিনটাতে গালুডিতে বসে লিখ্‌চি। সামনে নেকড়াডুংরি পাহাড়টার সামুতে পত্রহীন সাদা গাছে হলুদ ফুল ফুটেচে। দূরে দূরে পাহাড়ের গায়ে মেঘের ছায়া। সকালে সুবর্ণরেখার তীরে বেড়াতে গিয়েছিলুম—এক জায়গায় বড় বড় পাথর ঢেলা বৃক্ষরাজি। বেলা ১১টা। এইবার কেষ্ট চাকর জল নিয়ে আস্‌বে কলসীবাংলো থেকে— নাইবো। সামনের উঁচুনিচু ভূমি, ডুংরী রৌদ্রে চমৎকার দেখাচ্চে।

১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৩৯। বৃহস্পতিবার

ছুটীর পরে ভীষণ বৃষ্টি। খানিকটা আটকে থেকে ৪৷৷৹টার পরে মেসে এলুম। আজ সকালে পানিতরের সেই ভদ্রলোক বিবাহের জন্যে এসেছিলেন। সেই পানিতরে আবার বিবাহ। ১৯১৭[3] আর ১৯৩৩। ষোল বৎসর পরে············

বিকেলে এসে চা খেয়ে একটু পরে আমি ও টক্ক বেরিয়ে দু'একটা জিনিসপত্র কিনতে গেলুম—তার পরেই ট্রামে পার্ক সার্কাস।

১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ৫ই ফাল্গুন, ১৩৩৯। শুক্রবার

স্কুলে আজকাল যাই অন্য রাস্তা দিয়ে ঘুরে। পাছে দেবব্রতদের সঙ্গে দেখা

১ ১৯৩৪ সনের এই অংশটি ১৯৩৩ সনের ৭ই মার্চের পাতায় লেখা।

২ নবম অধ্যায়।

৩ ১৩২৪ সালের ৩১শে শ্রাবণ (অগস্ট, ১৯১৭) পানিতরনিবাসী কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা গৌরীর সঙ্গে বিভূতিভূষণের বিবাহ হয়। ১৩২৫ সালের ৬ই অগ্রহায়ণ (নভেম্বর, ১৯১৮) গৌরী মারা যান।

হয়ে যায়—সে একটা unpleasant ব্যাপার। সকালে ছুটী হোল, বাসায় এসে পড়লাম Wide World[1]—তারপর ট্রামে পার্ক সার্কাস। সেখান থেকে হেঁটে স্কুলে। খাওয়া দাওয়া ছিল। হেডমাস্টার ও আমরা ব্রিজ খেললুম। তারপর খাওয়া সেরে অনেকরাত্রে আমি ও ক্ষেত্রবাবু হেঁটে বাড়ী আস্‌তে আস্‌তে শাঁখারীটোলার নেড়ানেড়ীর মেলা ও ঠাকুরবাড়ী দেখ্‌লুম। দেবব্রতদের ওপরের ঘরে আলো জ্বল্‌চে। রাত বারোটা।

১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ৬ই ফাল্গুন, ১৩৩৯। শনিবার[2]

সকালে অনেকদিন পরে কান্তি[3] এল। স্কুলে কাজকর্ম্ম ছিল না। তেতলার ছাদে ফণি বাবু ও আমি গল্প গুজব করা গেল। আমি ও ক্ষেত্রবাবু বেরিয়ে Abraham Lincoln[4] দেখ্‌তে গেলুম। দক্ষিণাবাবুও[5] সেখানে। তারপর বেরিয়ে বাসায় এসে বস্‌লুম। কৃষ্ণবাবু ডেকে পাঠিয়েছিল—যেতে পারলুম না। অনেককাল পরে Theosophical Hall-এ গিয়ে পড়াশুনা কর্ল্লুম। তারপর ইনষ্টিটিউটে 'নদের নিমাই' দেখলুম। একটী youngman-কে কি সুন্দর দেখ্‌লুম —ওরকম রূপ আমি সত্যই অনেককাল দেখিনি।

১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ৭ই ফাল্গুন, ১৩৩৯। রবিবার

দুপুরে সুধীরদের বাড়ী নিমন্ত্রণ। Ripon College Magazine-এর একটা কপি যাতে আমার বাল্যের পদ্যটা বেরিয়েছিল[6]—অনেক কাল পরে পেলুম। সুধীরের স্ত্রী সম্পর্কে আমার বোন্ হয়—এসে প্রণাম কর্ল্লে। বাসায় এসে আর কোথাও যাওয়া ঘট্‌ল না। ঘোর বৃষ্টি ও ঝড়—একটু বেরিয়েছিলাম—ভিজে বাড়ী ফিরলাম্।

১ লণ্ডন থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা। প্রথম প্রকাশকাল ১৮৯৮।

২ তারিখের ওপর লেখা, 'Imp—M. C. Sircar—L. S. for Art'।

৩ ? কান্তিচন্দ্র ঘোষ।

৪ Stephen Vincent Benet ও Gerrit Lord-এর লেখা বই। ডিরেক্টর ছিলেন D. W. Griffith।

৫ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। ইনিও বিভূতিভূষণের সঙ্গে একই মেসে থাকতেন।

৬ রিপন কলেজে (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) বিভূতিভূষণ ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সন পর্যন্ত পড়েছিলেন।

২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ৮ই ফাল্গুন, ১৩৩৯। সোমবার

স্কুলে গেলাম—সেখান থেকে বঙ্গশ্রী আপিসে। রবি মৈত্রকে নিয়ে অনেক কথাবার্ত্তা হোল। পার্ক সার্কাস হয়ে বাড়ী।

২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ৯ই ফাল্গুন, ১৩৩৯। মঙ্গলবার।

আজও তাই। স্কুল থেকে আজও বঙ্গশ্রী। ব্যবসার কথা তুলে সেখানে মহা হট্টগোল। সকালে P. C. Sircar ছেলে নিয়ে এসেছিল ব্যবসা করবার জন্যে। সুনীতি বাবু এসেছিলেন বঙ্গশ্রী আপিসে।

২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ১০ই ফাল্গুন, ১৩৩৯। বুধবার

আজ শিবরাত্রির ছুটী। সকালে পত্রে সংবাদ পেলুম জাহ্নবীর ছোট খুকী মারা গিয়েচে। ও যে মারা যাবে তা জানতাম। তবুও মনে পড়ে কেমন হাসতো সম্পূর্ণ অকারণে—সবাই তার হাসির জন্যে বকতো। উপুড় হয়ে গড়িয়ে পড়ত একা একা বাইরের ঘরে থেকে। সবাই বলতো যাওগা।[১]

স্কুলে ছুটীর পরে বঙ্গশ্রী আপিসে আমি, প্রেমেন, সজনী, কিরণ[২]। হেঁটে বাড়ী আসতে আসতে Ghost land[৩] বই কিনে আনলুম। তারপর হেঁটে পার্ক সার্কাস।

আজ শিবরাত্রি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে অনেক রাত্রে জীবনের কত শিবরাত্রির কথাই ভাবলুম। মাকে দেখতে গিয়েছিলুম জাঙ্গিপাড়া থেকে—বনগাঁয়ে কালোদের[৪] বাসা—আমার পাঁচড়া হওয়া—কত কি?

রাত ১১টার সময়ে অখিল মিস্ত্রির লেনে থিয়েটার দেখতে গেলাম কিন্তু ঢুকতে পারা গেল না।

রাত্রে টক্ন শিবরাত্রি করে রাত জাগচে। ইলেক্‌ট্রিক লাইট জ্বালিয়ে রেখেচে—ভাল ঘুম হোল না।

২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ১১ই ফাল্গুন, ১৩৩৯। বৃহস্পতিবার

ছুটী ছিল শিবরাত্রির। জাহ্নবীর খুকী মারা গিয়েচে সংবাদটা আজই

১ দৃষ্টিপ্রদীপ-এ জিতুর ভাইঝি ছোট্ট খুকীর মৃত্যুতে ঘটনাটির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তৃণাঙ্কুর-এও এর উল্লেখ আছে। (দ্র. পৃ. ৭৮)

২ কিরণকুমার রায় (কি. কু. রা.), বঙ্গশ্রীর সহকারী সম্পাদক ছিলেন।

৩ লেখক O'Donnell Elliot।

৪ পশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, বারাকপুরবাসী। খুকু (প্রীতিলতা) এঁরই বোন। এঁরা যুগল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (যুগলকাকা) ছেলেমেয়ে।

পেলুম।[১] সকালে সন্তোষ দত্ত[২] ও মনোজ এল। প্রবাসী আপিসে গেলুম বিকেলে, কেদার বাবুর[৩] সঙ্গে নানা বনের গল্প হোল। নেতার ঘাট—চক্রধরপুর ঘাটের কাছে নাকি খুব বন। সুপ্রভাদের হোস্টেলে গেলুম। সুপ্রভা বল্লে আপনি একমাস ৭ দিন আসেন নি—কেমন গুণে গুণে রেখেচে! সেখান থেকে নলিনী সরকারের[৪] বাড়ী। নলিনীবাবুর ছোট মেয়েটী অপরাজিত ও পথের পাঁচালীর নানা ছোটখাট জায়গা মুখস্থ রেখেচে। আজ দুপুরে আকাশ বড় নীল—কতক্ষণ বাইরে বসে কত কি ভাবলুম। এমন সুন্দর লাগে! নলিনীবাবুর বাড়ী থেকে ট্রামে পার্ক সার্কাস গেলুম—রাত ৮টার সময়ে। পথে নক্ষত্রভরা আকাশের দিকে চেয়ে বিশ্বের বিশালতা ও মানুষের ক্ষুদ্রত্বের কথা ভাবছিলুম। বাসায় ফিরে দেখি পশুপতি বাবু অনেক ডালিয়া ফুল দিয়ে গেছেন।

২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ১২ই ফাল্গুন, ১৩৩৯। শুক্রবার

এদিন টিফিনের ছুটীতে বঙ্গশ্রীতে গিয়ে টাকা নিলুম—ও ছুটীর কিছু আগে মনোমোহন বাবুর[৫] ওপর ভার দিয়ে প্রবাসী আপিসে গেলুম college sq. midday fare-এর ট্রামে[৬]। সেখানে থেকে 'পেয়ালা' গল্পের টাকা মিটিয়ে বাসায় এলুম।

২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ১৩ই ফাল্গুন, ১৩৩৯। শনিবার

বিকালে বাড়ী গেলাম। ম্যাজিস্ট্রেট[৭] সাহেবের জন্য টাউন হলে সভা হচ্চে

১ ২২শে ফেব্রুয়ারিই শিবরাত্রি। পরদিন ঐ উপলক্ষেই ছুটি ছিল। বিভূতিভূষণ ২২শের ডায়েরি সম্ভবতঃ ২৩ তারিখেই লেখেন এবং অসাবধানতায় খুকীর মৃত্যুসংবাদ আগের দিনই বসিয়ে দেন। পরে সেটাকে তিনি ঠিক করে ২৩ তারিখ করেন।

২ শিক্ষক, খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইনষ্টিটিউশন।

৩ কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বড় ছেলে।

৪ নলিনীকান্ত সরকার, গায়ক।

৫ মনোমোহন রায়, শিক্ষক, খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইনষ্টিটিউশন।

৬ সেই সময় ট্রামে দুপুরবেলায় midday fare চালু ছিল। ফার্স্ট ক্লাস তিন পয়সা, সেকেণ্ড ক্লাস দু' পয়সা।

৭ সৈয়দ ফারুক মীর্জা।

সেখানে অনেকের সঙ্গে আলাপ হোল। মুন্সেফ বাবু[১] ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে।

২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ১৪ই ফাল্গুন, ১৩৩৯। রবিবার

সকালে উঠে বন্ধুর মোটরে বারাকপুর। পথে কি অপূর্ব্ব বসন্ত শোভা হয়েচে! বসন্তের সেই পুরাতন পরিচিত গন্ধ। দেখ্‌লুম দেশ সেই রকমই আছে—বাল্যের মত। আবার ফাল্গুনে সেই গন্ধই পাওয়া যায়। ইছামতীতে স্নান করে পুঁটী-দিদিদের[২] বাড়ী গেলুম। স্নানের আগে আমাদের বাড়ীর বাঁশবনের ধারে বেড়াতে গেলুম। সেই পুরাতন, চিরপরিচিত ফাল্গুন-চৈত্রের সেই বাঁশবন।......পথে হাজারীর[৩] মোটরের সঙ্গে দেখা। পেঁপে কিনে খেলাম সবাই মিলে। জগন্নাথকে মোটরে চড়ালুম। তারপর জেলিকে[৪] সঙ্গে নিয়ে বনগ্রামের বাসায় খাওয়া সেরে বৈকালে গোপালনগর স্কুলে প্রাইজের সভায়। জলযোগ করা গেল। ফিরলুম সন্ধ্যায়। যতীনবাবু হেডমাস্টারের[৫] সঙ্গে দেখা কর্ল্লুম।

২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ১৫ই ফাল্গুন, ১৩৩৯। সোমবার

সকালে কলকাতা এলুম। খুকী মারা গেছে—তার বালিশটা খয়রামারির মাঠে পড়ে আছে—দেখে এসেছি। এসে স্কুলে গেলুম। টিফিনের সময় গেলুম বঙ্গশ্রীতে। বাসায় এসে আবার আমি ও টরু বেরুলাম। তারপর পার্ক সার্কাস হয়ে এই আসচি। জাহ্নবীকে আজ সকালে খুব বকেচি বিনা দোষে—সেজন্য মনটা ভাল নয়।

২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ১৬ই ফাল্গুন, ১৩৩৯। মঙ্গলবার

সকালে গেলুম নীরদবাবুর বাড়ীতে ন'টার সময়ে। বেলপাহাড় যাবার উদ্যোগ কর্ত্তে। তারপর ট্রামে স্কুলে এলুম। একটু সকালে ছুটি দিয়ে বেরিয়ে

১ তেজেন?

২ সুনয়নী দেবী, বারাকপুরবাসিনী; বিভূতিভূষণের সইমার (কাদম্বিনী মুখোপাধ্যায়) মেয়ে।

৩ হাজারী প্রামাণিক, গোপালনগরবাসী (বনগাঁ)। ইনি এঁর বাবা হরিপদ প্রামাণিকের নামে গোপালনগরে হরিপদ ইন্‌স্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করেন। শেষ জীবনে বিভূতিভূষণ এখানে শিক্ষকতা করেছিলেন।

৪ তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বারাকপুরবাসী।

৫ যতীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, বনগাঁ হাইস্কুল।

পড়েচি পথে বিরাজবাবু বল্লেন বঙ্গশ্রী থেকে আমার নামে পত্র পাঠিয়েছিল। গেলুম সেখানে Proof দেখতে—সুনীতিবাবুও ছিলেন। সেখান থেকে Calcutta Trading Coতে। প্যারীবাবু[১] ইত্যাদি রয়েচেন। প্রেমেন ও শৈলজাও সেখানে। চা ও খাবার খাওয়ালে। কাগজের নাম দিলুম 'উদয়ন'।[২] বাইরে এসে প্রেমেন বল্লে দশটাকায় গল্প দিতে বলচে। আমি বল্লুম—পাগল নাকি? এস pact করি ২৫ টাকার কম কখনো গল্প দেবো না।

পার্ক সার্কাসে গেলুম—সেখান থেকে বাসায় এলুম এইমাত্র। টক্ নেই—রানাঘাটে গিয়েচে। আমরা শুক্রবার বেলপাহাড় যাবো ঠিক হয়েচে। দেখি কি হয়।

১লা মার্চ, ১৯৩৩। ১৭ই ফাল্গুন, ১৩৩৯। বুধবার

পার্ক সার্কাস গেলুম। আজ একটু শীত পড়িয়াছে। টক্ রাণাঘাটে গিয়াছিল—বৈকালে আসিল। তারপর আমি ট্রামে পার্ক সার্কাস।

রাত্রে নুটুর[৩] মেসে গেলুম। নুটু অনেকদূর এল আমার সঙ্গে।

২রা মার্চ, ১৯৩৩। ১৮ই ফাল্গুন, ১৩৩৯। বৃহস্পতিবার

অনেকদিন পরে একঘেয়েমিটা কাটবে। কাল সম্বলপুরে বনের মধ্যে যে শিলালিপি বেরিয়েচে—সেইটা দেখতে যাবো। স্কুলের পরে কালীঘাট গেলুম নীরদবাবুদের সম্বন্ধে ঠিকঠাক কর্ত্তে—আর দেখতে গেলুম চারুবাবু এখানে আছেন কিনা। অনেক রাত্রে ট্রামে ফিরে এলাম।

৩রা মার্চ, ১৯৩৩। ১৯শে ফাল্গুন, ১৩৩৯। শুক্রবার

এদিন সকালে স্কুলে গেলুম—সেখান থেকে বঙ্গশ্রী আপিসে গিয়ে পরিমলবাবু[৪] ও কিরণবাবুকে যাবার জন্যে যোগাড় কল্লু'ম। তারপর বেরিয়ে

১ প্যারীমোহন সেনগুপ্ত; তখন প্রবাসীর সহ-সম্পাদক।

২ সাহিত্য-মাসিক। প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ, ১৩৪০। সম্পাদক, অনিলকুমার দে। বিভূতিভূষণের একাধিক ছোটগল্প কাগজটিতে বেরিয়েছিল—যথা, 'বৈদ্যনাথ', 'ডানপিটে'।

৩ ডাঃ নুটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণের ভাই। তখন ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র। পড়াশুনোর সুবিধের জন্যে প্যারাডাইস লজ ছেড়ে শিয়ালদায় এক মেডিক্যাল ছাত্রদের মেসে থাকতেন।

৪ পরিমল গোস্বামী; তখন শনিবারের চিঠির সম্পাদক।

পাউরুটি ও টোমাটো কিনে মেসে ফিরে এলুম। কৃষ্ণবাবু এল—তার সঙ্গে কত গল্প কর্ল্ুম। তারপর জিনিসপত্র নিয়ে রওনা হলুম সম্বলপুরের জন্যে। রাত নটায় ট্রেন। এসে দেখি প্রমোদবাবু ও কিরণ দাঁড়িয়ে। সজনী এখনও আসে নি, পরিমলও না। গাড়ীতে উঠেই বল্লে এ গাড়ী সিনি হয়ে যাবে—কারণ লাইন খারাপ হয়ে গেছে। সারারাত ট্রেনে কাটল—গাড়ীতে খুব ভিড় ও ঠেলাঠেলি বটে তবে আমাদের দিকে কেউ ঘেঁসেনি।

সম্বলপুরে ডেপুটি কমিশনার মিঃ সেনাপতিকে[1] আমাদের যাওয়ার কথা লেখা হয়েচে—তিনি সমস্ত বন্দোবস্ত করে রাখবেন লিখেচেন।

৪ঠা মার্চ, ১৯৩৩। ২০শে ফাল্গুন, ১৩৩৯। শনিবার

নদী, বন পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে প্রায় সারাদিন কাটবার পরে সাড়ে তিনটার সময় বেল পাহাড় স্টেশনে গাড়ী পৌঁছল। সামনে পাহাড়, ছোট্ট স্টেশন। ডেপুটি কমিশনারের লোক স্টেশনে ছিল। তাদের সাহায্যে জিনিসপত্র নিয়ে উঠলাম ডাকবাংলায় [।] সামনে জগন্নাথের মন্দির—এক ধারে বেশ পাহাড়। ভারী সুন্দর স্থানটি। নিকটের পুকুরে আমরা স্নান করে এসে খাওয়া দাওয়া কর্ল্ুম—তারপর নদীর ধারে একটা হাট হচ্চে দেখে বেড়াতে গেলুম। উড়িয়া মেয়েরা হাটে কেনা বেচা কর্চ্চে—তাদের ভাষা উড়িয়া, কিন্তু চেহারা ও পোষাক পরিচ্ছদে সাঁওতালী। ধান দিয়ে মুড়কি—এখানে বলে ওকড়া[2]—নিচ্চে। শুঁটকি চিংড়ি মাছ শালপাতায় বিক্রি করচে। কেমন সুন্দর এদের সরলতা।······তারপর স্টেশনে বেড়াতে গিয়ে চা খেয়ে সামনের জঙ্গলে গেলুম – আমরা কজন। তখন ঝোপের ধারে আমরা বসে রইলুম—আমি খানিকক্ষণ একা। রোদে পোড়া সোঁটা মাটীর rich গন্ধ ইসমাইলপুরের কথা মনে করিয়ে দেয়—দূরে পাহাড়ের দিকে জলজ্বলে নক্ষত্র উঠেচে—পশ্চিমের দূর দিগন্তে অস্ত আকাশের রাঙা আভা—সে এক অপূর্ব্ব অনুভূতি! বিশেষ করে কলকাতা থেকে নতুন গিয়ে [।]

১ নীলমণি সেনাপতি আই. সি. এস.।

২ 'ওকড়া' শব্দের অর্থ পূর্বে ছিল খই-মুড়কি। পরে অর্থসঙ্কোচে শুধু মুড়কি। ষোড়শ / সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙলায় লেখা চূড়ামণি দাসের গৌরাঙ্গবিজয়-এ 'উখড়া' শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়; পূর্ব-বাঙলায় এখনও বলে। শব্দটির সম্ভাব্য সংস্কৃত রূপ *উৎকৃতক।

বিক্রমখোলের যাত্রাপথ

বিক্রমখোল—শিলালিপি [Indian Antiquary পত্রিকার সৌজন্যে]
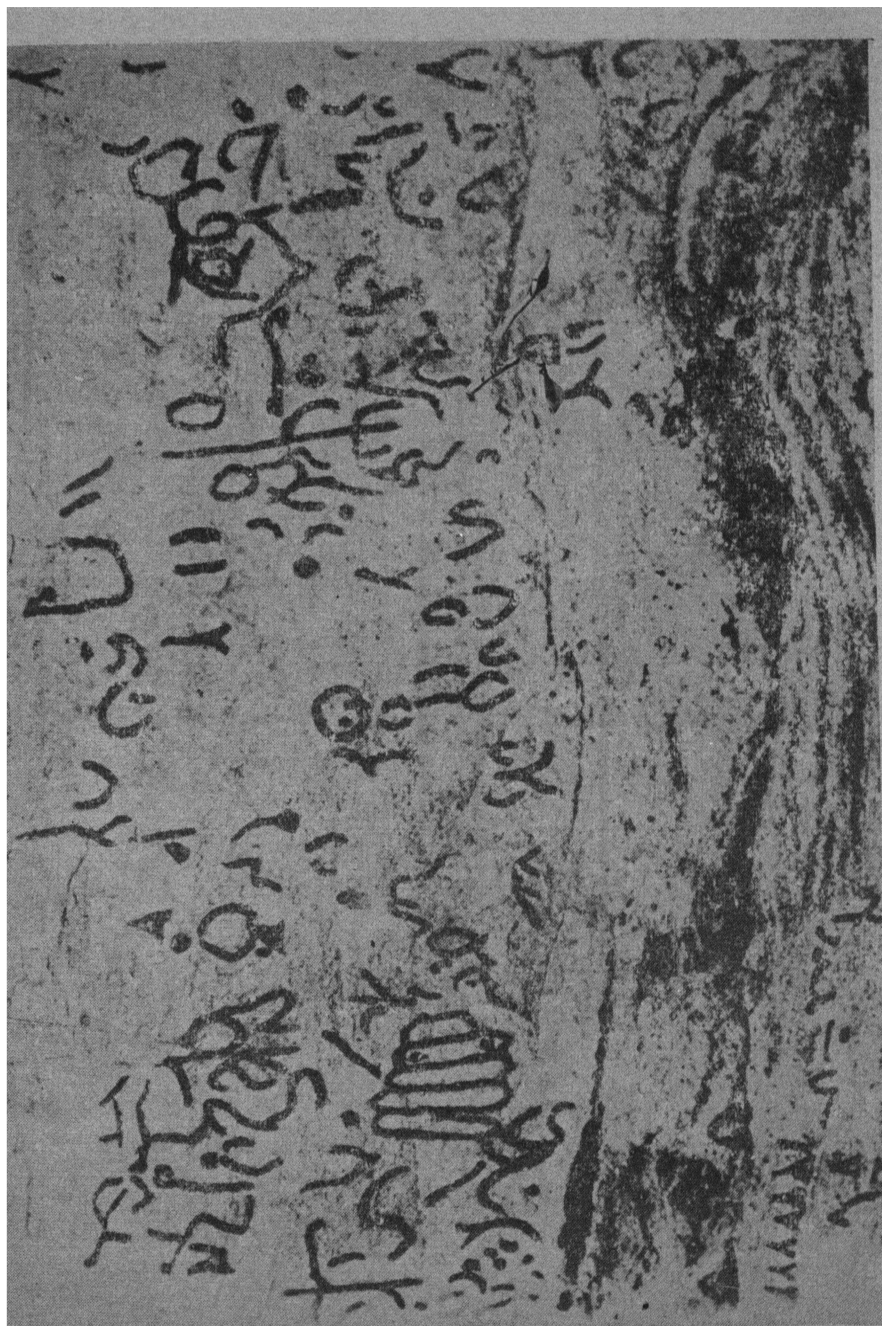
৫ই মার্চ, ১৯৩৩। ২১শে ফাল্গুন, ১৩৩৯। রবিবার[১]

সকালে উঠে লোক নিয়ে আমরা বিক্রম সোল রওনা হলুম। পথে শালের জঙ্গল—ছোট ছোট নদী—এক জায়গায় নদীর ওপর বাঁশের সেতু—তার ওপর ঘাস বিছাচ্চে। একটু দূরে গিয়ে একটা ওদেশী মদের চোলাইখানা। একজন লোকের কাছে আমি একটা বাঁশের লাঠি কিনলাম। দুপুরের সময় আমরা ত্রিগোলা গ্রামে পৌঁছে গেলুম। একটু পরে পাটোয়ারী[২] এল। গাঁ ঢুকতে একটা আমতলায় একদল লোক রেঁধে খাচ্চে—তারা নাকি নাচ দেখাতে এসেচে। আমরা বল্লুম আমরা নাচ দেখবো। দাড়িওয়ালা এক বৃদ্ধ, গলায় পৈতে, কেমন সরল। পাটোয়ারী দুধ ও মুড়কী নিয়ে এল। তারপর শালের ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আমরা গেলুম বিক্রম সোলে। গ্রানাইট crag এর নীচে খোদাই লিপি[৩]—চারিধারের জঙ্গলের দৃশ্য সত্যই অপূর্ব্ব। নীচে এক জায়গায়

১ তারিখের ওপরে লেখা, 'কাপড় ৪খানি—অন্ত। ধুতি ৪টা। পাঞ্জাবী ৪ খানি। রুমাল ২টা। ফতুয়া ২টা [।] বালিশের ওয়াড় ২টা।'

২ পাটোয়ারী শব্দের অর্থ যে গ্রামের কর আদায় করে। শব্দটির সম্ভাব্য সংস্কৃত রূপ পট্টপালক। হিন্দিতে পট্‌বার (patwar)।

৩ ওড়িষ্যার সম্বলপুর জেলায় তিতলয়বহল গ্রামে বিক্রমখোল পাহাড়টি অবস্থিত। ট্রেনে যেতে হলে হাওড়া-নাগপুর লাইনে বেলপাহাড় স্টেশনে নেমে ৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে গেলে প্রথমে ত্রিগোলা গ্রাম; সেখান থেকে ৬ মাইল দূরে বিক্রমখোল পাহাড়।

বিক্রমখোল পাহাড়ের চুড়োর ৬ ফিট নীচে এবড়ো-খেবড়ো বেলে-পাথরের গায়ে অদ্যাবধি অনুদ্ধৃত-পাঠ এই বিক্রমখোল শিলা-চিত্রলিপি। যে পাথরের গায়ে এই লিপিটি সেটি দৈর্ঘ্যে ২৭ ফিট ৭ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ১১৫ ফিট। লিপিটির আয়তন দৈর্ঘ্যে প্রায় ৭ ফিট এবং প্রস্থে ৩৫ ফিট। স্বামী জ্ঞানানন্দ নামে এক শিক্ষিত সাধু এই লিপিটি আবিষ্কার করেন এবং বিখ্যাত পুরাতাত্ত্বিক কে. পি. জয়সোওয়ালের দৃষ্টি আর্কষণ কবেন। জয়সোওয়ালের আলোচনা পড়েই সভ্যজগৎ বিক্রমখোল লিপির কথা প্রথম জানতে পারে। বর্তমান এই লিপির একটি ছাঁচ ভুবনেশ্বর মিউজিয়ামে রক্ষিত।

জয়সোওয়াল তাঁর আলোচনায় লেখেন, বিক্রমখোল শিলা-চিত্রলিপির লিখনরীতি দেখে মনে হয়, এর কাল মহেঞ্জোদরো ও ব্রাহ্মীলিপির মধ্যবর্তী। অর্থাৎ ৩০০০ হাজার খ্রীস্ট-পূর্বাব্দ থেকে ৩০০ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দের মধ্যে। শিলা-

বসলুম গিয়ে। পিরিয়াল ফুল[১] ফুটেচে—একটা ছোট পাহাড়ী শুষ্ক নদী। বিকেল

চিত্রলিপিটির কোন কোন বর্ণে তার নিজস্ব বা আদি ব্রাহ্মীলিপির ছাঁদ বর্তমান। এর থেকে প্রমাণ হয়, ভারতবর্ষেই ব্রাহ্মীলিপির জন্ম এবং সেই ব্রাহ্মী-লিপি থেকেই ফিনিশীয় ও ইউরোপীয় লিপিগুলি উদ্ভূত। [মহেঞ্জোদরো-হরপ্পার চিত্রলিপি আবিষ্কার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ম্যাক্সমূলার, বেবর, বুলার, বার্ণেল প্রভৃতি লিপিবিশারদগণের ধারণা ছিল, ফিনিশীয় লিপি থেকে ব্রাহ্মীলিপির সৃষ্টি। কিন্তু মহেঞ্জোদরো-হরপ্পার চিত্রলিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় এই ধারণা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। বুলার সিদ্ধান্ত করেন, ফিনিশীয় লিপি খ্রীস্ট-পূর্ব অষ্টম বা দশম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। আর তা থেকেই খ্রীস্ট-পূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতীয় বর্ণমালার সৃষ্টি। কিন্তু মহেঞ্জোদরো-হরপ্পার চিত্রলিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় এই ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, মহেঞ্জোদরো-হরপ্পার চিত্রলিপির কাল ৩০০০ হাজার খ্রীস্ট-পূর্বাব্দ—অর্থাৎ ফিনিশীয় লিপির চেয়েও অনেক অনেক প্রাচীন। মহেঞ্জোদরো-হরপ্পার এই চিত্রলিপি থেকেই ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভব। বিক্রমখোল শিলা-চিত্রলিপি এই দুইয়ের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ের।]

বিক্রমখোল শিলা-চিত্রলিপি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, পাথরের গায়ে লিপিগুলি প্রথমে এঁকে তারপরে খোদাই করা হয়েছিল। লিপিগুলি ডান দিক থেকে শুরু করে বাঁদিকে পড়তে হবে বলে মনে হয়। এই লিপিগুলির একটিতে যে পশু চিত্র দেখা যায় সেটি সম্ভবতঃ কোন চিত্রলিপির অংশ নয়, একটি প্রতীক মাত্র। শিলা-চিত্রলিপিগুলির লিখন রীতির ছাঁদ দেখে মনে হয়, এগুলি অক্ষরাত্মক (বর্ণাত্মক) পর্যায়ে গিয়ে পৌঁচেছে।

জয়সোওয়াল তাঁর আলোচনার সিদ্ধান্তে লিখেছেন, অদ্যাবধি ব্রাহ্মীলিপির যে আদি নিদর্শন পাওয়া গেছে বিক্রমখোল শিলা-চিত্রলিপি সুনিশ্চিতভাবে তার চেয়েও প্রাচীন। এবং আরও বলেছেন, বিক্রমখোল লিপিকে কোনক্রমেই আর্যলিপির মধ্যে ফেলা যায় না।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা গেল, জয়সোওয়ালের অভিমত বর্তমান প্রত্নতাত্ত্বিক-দের মতে বিশেষ নির্ভরযোগ্য নয়। (দ্র. Indian Antiquary, মার্চ, ১৯৩৩)

১৩৪০ সালের শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে হরিদাস পালিত 'বিক্রমখোল শিলালিপি/শালিবাহন বা সাতবাহন রাজার শাসনলিপি' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই বছরেই বৈশাখ মাসের বঙ্গশ্রীতে বিভূতিভূষণও 'বিক্রমখোল' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন।

১ ? পিরিয়া/Nasturtium officinale R. Br.। সংস্কৃতে গঙ্গতি।
? বাঙলা পিরালো/Randia uliginosa Dc.।

[বিকেলে] ফিরে এসে পুকুরে স্নান কল্লু'ম। কি বালি! তারপর নাচ দেখলুম। ওরা আগে চলে গেল। আমি এক জ্যোৎস্নালোকিত বন পর্বতের পথে গরুর গাড়ীতে ৯ মাইল পথ ওদের জিনিসপত্র নিয়ে এলুম।

৬ই মার্চ, ১৯৩৩। ২২শে ফাল্গুন, ১৩৩৯। সোমবার।

ঝার্সাগুড়া স্টেশনে ভোর হোল। মুখ হাত ধুয়ে সবাই কালকার রাত্রির তৈরী পুরী ও মোয়া, তরকারী খেলুম। চা পাওয়া গেল না। পথের শোভা বড় সুন্দর বিশেষ করে ইব্, গোইলকেরা, পোসাইটা—এইসব স্টেশনের কাছেই ঘন জঙ্গল। মনোহরপুর, পানপোষ, গড়পোষ। স্টেশনগুলি গভীর বনের মধ্যে বল্লেও হয়। সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর গড়পোষের পূর্ব্ববর্তী ভূমিভাগ। গড়পোষে একটি সুন্দর বাংলো আছে স্টেশনের কাছে—থাকা যায়। বামড়াও বেশ জায়গা। স্টেশনের কাছে খুব বন ও মাঠ, শালবন, দূরে নীল পাহাড়। ধুরুয়াদিহি স্টেশনের চারিপাশে আদিম যুগের অরণ্যানী যেন। কি গভীর বন! সকলের চেয়ে Beautiful Landscape এই ধুরুয়াদিহি স্টেশনে ও ইব স্টেশনে। বাগ্‌দিহিও তাই। কলকাতার কাছে গিডনী বেশ জায়গা। অতি সুন্দর জলাশয়। বাজার—মুক্ত মাঠ, শালবন। অনেক বাঙ্গালী Changerরা থাকে।

রাত নটায় কলকাতায় পৌছুনো গেল।

৭ই মার্চ, ১৯৩৩। ২৩শে ফাল্গুন, ১৩৩৯। মঙ্গলবার

কাল সন্ধ্যায় পৌঁছে সাবান মেখে স্নান করে কিছু খেয়ে টকুর সঙ্গে গল্প গুজব করার পর শুয়ে পড়লাম। কাল রাত্রে একেবারে ঘুম হয়নি—বেলপাহাড় স্টেশনে একটা মালের বস্তার ওপর শুয়ে কাটাবো ভেবেছিলুম কিন্তু পরিমল বাবুকে ছেড়ে দিলুম। বেজায় শীতও গিয়েচে। কাল শোবামাত্রই ঘুম। আজ সকালে উঠে শরীর যেন ভেঙে পড়েচে এমনি ঘুম। মনে হোল কি কাণ্ড যেন করে এসেচি—জীবন বুঝি এবার থেকে নতুন পথে চলবে। কিন্তু আসলে কিছুই হবে না জানি। এই কয় দিনের অভিজ্ঞতা অতি অপূর্ব। মনটা enriched হয়ে গেছে কতটা। সকালে শান্তি[১] এল—কিছু টাকা ধার চায়। সমরের কাছে চুল ছাটলুম [ছাঁটলুম]। বৈকালে বঙ্গশ্রী আপিসে প্রমোদবাবু ইত্যাদি সব

১ কবি শান্তি পাল; প্রসিদ্ধ সাঁতারুও। এঁর কাব্যগ্রন্থের নাম পথচারী, ছন্দবীণা।

এলেন। ওখান থেকে বেরিয়ে সুধীরবাবুর[১] সঙ্গে সীতা দেবীর ওখানে গেলুম। সীতাদেবীকে ভ্রমণবৃত্তান্ত বললুম।

৮ই মার্চ, ১৯৩৩। ২৪শে ফাল্গুন, ১৩৩৯। বুধবার

সকালে উঠে ললিতু এল। ছুটীর পরে বেরিয়ে পড়াতে গেলুম। পথে একজন লোক ডাকচে—গিয়ে দেখি আমাদের সতীশ একটা আফিমের দোকানে বসে বিক্রী করচে। জল খাওয়ালে। ওকে দেখে খুব আনন্দ হোল। তারপর পড়িয়ে উঠে হেঁটে প্রথমে গেলুম সুশীল মিত্রের বাটী। সেখান থেকে নীরদবাবুদের বাড়ী গিয়ে দেখি পরিমল, নির্বাণ—রা সেখানে আগে থেকেই জুটেচে। খুব খাওয়া দাওয়া গেল, আড্ডা হোল। অনেক রাত্রে বেরিয়ে এই আসচি।

৯ই মার্চ, ১৯৩৩। ২৫শে ফাল্গুন, ১৩৩৯। বৃহস্পতিবার[২]

স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী আপিসে গেলুম। সেখানে প্রমোদবাবুও এলেন। Associated Press এর জন্যে একটা লিখলুম। পশুপতিবাবু ফোন কল্লেন আমি সুপ্রভাকে দেখতে যাবো কিনা হাঁসপাতালে [হাসপাতালে—] একটু পরে পশুপতিবাবু এলেন। সবাই মিলে যাওয়া গেল—মীরা[৩] বলে একটী মেয়ে ছিল—পশুপতি বাবুর মেয়ের মতই—সে কোকো করে খাওয়ালে। কমলালেবু খাওয়ালে। সুপ্রভার কেবিনে গেলুম—আমার ডায়েরীটা দিয়ে এলুম। ওখান থেকে ট্রামে উঠে সোজা পার্ক সার্কাস।

১০ই মার্চ, ১৯৩৩। ২৬শে ফাল্গুন, ১৩৩৯। শুক্রবার

স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী হয়ে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে গেলুম। সেখান থেকে বেরিয়ে পার্ক সার্কাস।

১১ই মার্চ, ১৯৩৩। ২৭শে ফাল্গুন, ১৩৩৯। শনিবার

সকালে গেলাম প্রথমে চারু বিশ্বাসের বাড়ী [—] চারু বিশ্বাস বাড়ী নেই। তারপর গেলুম রমাপ্রসাদবাবুর[৪] ওখানে। তিনিও নেই। সেখান থেকে

১ সীতা দেবীর স্বামী সাহিত্যিক সুধীরকুমার চৌধুরী; প্রবাসীর সম্পাদনা কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এঁর কাব্যগ্রন্থের নাম জলের লিখন; গল্প-উপন্যাসের নাম রাহুর প্রেম ও অন্যান্য গল্প এবং আবছায়া।

২ তারিখের উপরে লেখা, 'অদ্য হইতে দুগ্ধ দিতেছে—'।

৩ বারাকপুরবাসী হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মীয়া।

৪ রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন বিচারপতি, কলকাতা হাইকোর্ট।

নীরদবাবুর বাড়ীতে আড্ডা দিয়ে স্কুল—। স্কুল থেকে বনগ্রাম।

বনগাঁয়ে আজ বেশ জ্যোৎস্না। বারান্দাতে মাদুর পেতে বসে ভাবলুম ও শনিবারে আজ বেলপাহাড়ের ডাকবাংলার ধারে জ্যোৎস্নায় বসে আছি।

১২ই মার্চ, ১৯৩৩। ২৮শে ফাল্গুন, ১৩৩৯। রবিবার[১]

সকালে উঠে বাজারে। তারপর বলুর সঙ্গে দুপুরের পর সিমলে গেলাম মোটরে। পথে কি ঘেঁটুফুলের তেতো গন্ধ ও আমবউলের সুমিষ্ট গন্ধ। সিমলের বাড়ীর বাইরে দুপুরে একজায়গায় কি অজস্র ঘেঁটুফুলই না ফুটেচে—এবার বসন্তটা খুব উপভোগ করা হোল ঘেঁটুফুলের দিক থেকে ও আম বউলের দিক থেকে। বর্দ্ধমবেড়ে[২], হুদো মাণিককোল[২], বেনাড়ে[২] প্রভৃতি গ্রাম দেখলুম। আসবার সময় মোটরের ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেল। সনাতনের[৩] মোটর আসচে চাকদা থেকে—পাওয়া গেল। আমরা হেঁটে গোপালনগর স্টেশনের ওপারের পথটা দিয়ে এসে স্টেশনে উঠ্‌লাম। ওপারে বড় সুন্দর মাঠটা। আর বিকেল [বিকেলে] এসময়ে কোন সময়েই গোপালনগর আসিনি। সেখান থেকে গোপালনগর হয়ে দোলের নিমন্ত্রণ খেয়ে লরিতে বাসা।

১৩ই মার্চ, ১৯৩৩। ২৯শে ফাল্গুন, ১৩৩৯। সোমবার

সকালে উঠে বাসায় কাজকর্ম করা গেল। দুপুরের পরই কলকাতায় চলে এলুম—বিকালের ট্রেনে। পথে পথে কি অজস্র ঘেঁটুফুলের গন্ধ—জ্যোৎস্না উঠল—গোবরডাঙ্গার কাছের বনে অজস্র ঘেঁটুফুল—এবার যথেষ্ট ঘেঁটুফুল দেখা হোল! এরকম কোনবার দেখিনি—অনেকদিন দেখিনি।

১৪ই মার্চ, ১৯৩৩। ৩০শে ফাল্গুন, ১৩৩৯। মঙ্গলবার

স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী আপিসে গেলুম। সেখান থেকে Wide World কিনতে—Municipal Market-এ[৪] গেলুম—সেখান থেকে যেতে হোল পার্ক সার্কাসে। খুব সকালেই সেখান থেকে বেরিয়ে এলুম বাসায়। তাড়াতাড়ি বঙ্গশ্রীর

১ তারিখের ওপরে লেখা, 'দুধবন্ধ'।

২ সবগুলিই বনগাঁ থানায়।

৩ সনাতন চক্রবর্তী। এক সময়ে ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ড্রাইভার ছিলেন ; পরে স্বাধীনভাবে মোটর বাসের ব্যবসা শুরু করেন।

৪ বর্তমানে নিউ মার্কেট।

লেখাটা[1] দিলুম—কারণ University-র লেখা কাগজ[2] হাতে পড়লে—আর পারবো না।

১৫ই মার্চ, ১৯৩৩। ১লা চৈত্র, ১৩৩৯। বুধবার

সকাল সকাল স্কুল থেকে বেরিয়ে Examiner's meeting এ গেলুম Universityতে [—] ধীরেন, মনোজ, জসিম[3] ওরা সবাই এসেছিল। খানিকটা এদিক ওদিক ঘুরে M. C. Sircar এর দোকান গেলুম। সেখান থেকে বাসায় এসে আর বেরুইনি—কেবল শুক্রবার সাহিত্য সেবক সমিতিতে গেলুম [।] পরিমল বাবুর paper ছিল, বিশ্বসোল সম্বন্ধে। কিন্তু তিনি এলেন না।

১৬ই মার্চ, ১৯৩৩। ২রা চৈত্র, ১৩৩৯। বৃহস্পতিবার

স্কুল থেকে বেরিয়ে প্রথমে বঙ্গশ্রী আপিসে। অবিশ্যি সকালে উঠে যাই রোজ পার্ক সার্কাসে সিরাজুলকে পড়াতে। তারপর আজ বঙ্গশ্রী বেরিয়েচে—সেখানে গিয়ে আড্ডা দিলুম। আজ বাইরে শুয়েছিলাম, ভোরে কেমন সুন্দর জ্যোৎস্না পড়েচে—কত কথা মনে হোল—পুরোনো দিনে যেমন ভাবতুম—শেষ রাতের জ্যোৎস্না এক অদ্ভুত জিনিস—কত পল্লীপ্রান্তরের ঘেঁটুবনের কথা মনে করে দেয়—কত নির্জ্জন নদীতীর—কত মা ও ছেলের করুণ ইতিহাস। সেই সব কথা এই প্রভাতের বসন্ত জ্যোৎস্নায় মনে এল আবার। বৈকালে উদয়ন আপিসেও গেলুম—সেখান থেকে এই মাত্র এসেচি। এখন বনগাঁয়ের ফটিক[4] এল—ঘরে টকু[5] বা টক্ক[6] কেউ নেই—আজ পরীক্ষা শেষ করে কোথায় বেরিয়েচে।

---

১ চৈত্র সংখ্যার লেখা। নাম 'ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি আশ্চর্য বস্তু'।

২ বিভূতিভূষণ প্রবেশিকা পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন। প্রধান পরীক্ষক দীনেশচন্দ্র সেন। তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই পরীক্ষা নিত।

৩ জসিমুদ্দীন।

৪ ফটিক উকিল, বনগাঁবাসী।

৫ নির্মলকুমার চট্টোপাধ্যায় ; ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মেজ ছেলে। ইনি তখন যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পড়তেন।

৬ ইনি বিভূতিভূষণের কাছে থেকে বঙ্গবাসী কলেজে আই. এস. সি. পড়তেন।

১৭ই মার্চ, ১৯৩৩। ৩রা চৈত্র, ১৩৩৯। শুক্রবার

সকালে সুপ্রভার হোস্টেলে গেলুম ওর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে কারণ ও চিঠি লিখেচে কাল বাড়ী চলে যাবে। সেখান থেকে এসে দেখি কচা[১] এসেচে। কচা ওর ছেলেকে বল্লে ছ্যাখ ছ্যাখ বায়াস্কোপ ও থিয়েটার ছ্যাখ। সে dungeon এ গিয়ে কি কাসি (?) বল্লে—দাদা বড় মেরেচে—বাবা যা পায় ছুঁড়ে মারে। আহা, বাপের প্রাণ!······ও helpless, কি করে বেচারী! ওর দোষ দিতে পারিনে। স্কুল থেকে University গেলুম খাতা আনতে। খাতা?। বাসায় এসে টকু ও টুকুকে নিয়ে গেলুম। Institute এ Social এ। সেখান থেকে বেরিয়ে College Square এ খানিকটা দাঁড়ালুম। প্রথম সরবত খেলুম আজ এ গ্রীষ্মে।

১৮ই মার্চ, ১৯৩৩। ৪ঠা চৈত্র, ১৩৩৯। শনিবার

স্কুল থেকে বেরিয়ে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী হয়ে বেলুড় গেলুম। ছাদে ছায়া পড়েচে। লিচুর মুকুলের সুগন্ধ বেরুচ্চে বৈকালের ছায়ায়। কোকিল ও পাপিয়া ডাকচে। ডাব খেলুম। তারপর বাইরের ছাদে বসে নীরদবাবু ও আমি কত রাত পর্য্যন্ত গল্প কর্ল্লুম।

১৯৩৫।

এ দিনটীতে খাতা আনলুম। গ্রীষ্মের প্রথম সরবৎ খেলুম। কাল রাজপুর বেড়াতে গিয়ে অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নালোকে হারিঝি চণ্ডীর মাঠে বসেছিলুম আমি আর ভম্বল[২]। খুকী চা করে দিলে ও চাল ভেজে খাওয়ালে।

১৯৩৬।

এই দিনটীতে খাতা আনতে গিয়ে গেলুম না। স্কুল থেকে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী গিয়ে আফ্রিকা ভ্রমণের বই ও Plant Geography আনি। গত রবিবারে রাজপুর গিয়ে বেগুন[৩] ও আমি হারিঝি চণ্ডী মাঠের ধারে সন্ধ্যায় বসেছিলুম অনেকক্ষণ। কাল ? চৌধুরীর বাড়ী গেছলুম। সুধীরবাবুর[৪] দোকানে বসে হেমেন রায়ের[৫] সঙ্গে আড্ডা।

১ ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বারাকপুরবাসী ; ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ভাই।

২ ভম্বল ভট্টাচার্য, রাজপুরবাসী।

৩ অমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, রাজপুরবাসী।

৪ সুধীরচন্দ্র সরকার।

৫ হেমেন্দ্রকুমার রায়।

১৯৪১।

কি আশ্চর্য ! আজ দিনটীতে স্কুল সকালে ছুটী হোতেই ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী গিয়ে আফ্রিকা ভ্রমণের বই আনবো বলে ঠিক করেছিলুম—কিন্তু যাইনি। খাতা এনেচি আগের দিন। কল্যাণী[১] আসতে দিচ্ছিল না কাল। বিভূতিদের বাড়ী গেলুম সন্ধ্যার পরে (?) আফ্রিকা সম্বন্ধে আজও বই পড়চি।

১৯শে মার্চ, ১৯৩৩। ৫ই চৈত্র, ১৩৩৯। রবিবার।

সকালে উঠে আমি ও নীরদবাবু কলকাতা এলুম চা ও ডিমসিদ্ধ খেয়ে। হেঁটে অনেকদিন পরে পেছন দিক দিয়ে পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীটে ঢুকে বিভূতির বাড়ী গেলুম। অনেকক্ষণ বসে গল্প করলুম, চা খেলুম। ফিরে এসে দুপুরে ঘুমুলুম। তারপর পার্ক সার্কাসে গেলাম। সতীশের সঙ্গে ও চন্দননগরের শ্রীমন্তের সঙ্গে দেখা—ওরা আমার ছাত্র। বসে বসে জাঙ্গিপাড়ার সম্বন্ধে অনেক নতুন কথা হোল। ওখান থেকে বেরিয়ে বাসায় এসে মোটরে হাওড়ায় গেলুম। রামকৃষ্ণ আশ্রমে সভাপতিত্ব কর্ত্তে হবে—তারাই মোটর নিয়ে এসেছিল। হেড্‌মাস্টারটী বেশ লোক। খাওয়া দাওয়ার পরে রাত দশটায় মোটরে পৌছে দিয়ে গেল।

২০শে মার্চ, ১৯৩৩। ৬ই চৈত্র, ১৩৩৯। সোমবার

সকালে পার্ক সার্কাস। তারপর স্কুলের পর—বঙ্গশ্রী। সেখান থেকে University গিয়ে কাগজ আনলুম। University Restaurant-এ খেলুম অনেককাল পরে। বাসায় পশুপতি বাবু এলেন। তাঁর সঙ্গে বিচিত্রা আপিসে [—] পবে নীরদের বাড়ী। নীরদের ছেলে দেখ্‌লুম। ট্রামে বাসা।

২১শে মার্চ, ১৯৩৩। ৭ই চৈত্র, ১৩৩৯। মঙ্গলবার

আজকাল খাতা দেখ্‌বার তাড়ায় আর সব কাজ চাপা পড়েচে। খাতা দেখে আর সময় পাইনে। বিকেলে একবার ইন্‌ষ্টিটিউটে গিয়ে ভোট দিয়ে এলুম। বেরিয়ে বইয়ের দোকানের কাছে দিলীপের সঙ্গে দেখা। সে Garrod আর Middleton Murry নিয়ে বক্‌তে বক্‌তে আমার সঙ্গে সারাপথ এল, বল্লে, আপনাকে আর পাবো কোথায় ?··· ···শেষে এক স্বরচিত সনেট্‌ ফুটপাথের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনালে। অদ্ভুত প্রকৃতির লোক !

রাত্রে এসে আবার কাগজ।

১ কল্যাণী (রমা) বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণের স্ত্রী। ১৯৪০ সনে এঁকে বিবাহ করেন।

২২শে মার্চ, ১৯৩৩। ৮ই চৈত্র, ১৩৩৯। বুধবার

স্কুলে গেলুম—সেখান থেকে বাসায় এসে খাতা। বৈকালে Institute এ গোলমাল—উৎসব হচ্চে। সেখান থেকে বাসায় এলুম।

২৩শে মার্চ, ১৯৩৩। ৯ই চৈত্র, ১৩৩৯। বৃহস্পতিবার

ভয়ানক খাটুনি পড়েচে। কাগজ দেখার জন্যে দিনরাত বিশ্রাম নেই। বঙ্গশ্রী আপিস্ থেকে সোজা বাসা! সন্তোষ দত্ত এল বৈকালে—একটু গিয়ে কলেজ স্কোয়ারে বস্‌লুম।

আজ হয়ে তিনদিন স্কুল ছুটী। কাল পুণ্যব্রত স্কুলে যাচ্চে দেখ্‌তে পেয়েছিলাম [।]

২৪শে মার্চ, ১৯৩৩। ১০ই চৈত্র, ১৩৩৯। শুক্রবার

আজ ছুটী বারুণীর। সকালে উঠে দেখি দুটো Cooperative এর দুধের বোতল রেখে গিয়েচে। ভোর সবে হয়েচে। লোকের চোখে চোখে ঘুম জড়ানো। এত সকালে কে খাবে দুধ? খুব সকালে দুধ দিয়ে যায় কল্‌কাতায়—না? সেদিকে চেয়ে রইলুম কতক্ষণ। চোখ আর অন্যদিকে ফেরাতে পারিনে। কতক্ষণ চেয়ে থাকি। কেমন যেন অবাক্ হয়ে গেলুম—সত্যি এ ধরণের ভাব আমার কখনো হয়নি।

বৈকালে নীরদবাবু এলেন। তাঁর গাড়ীতে তাঁর সঙ্গে সারা দুপুর আড্ডার পরে বঙ্গশ্রীতে এলুম। সেখান থেকে বেরুতে যাচ্চি দরজায় সুনীতি বাবু। টেনে আবার নিয়ে গেলেন। মালপুয়া খাওয়া হোল। অবনী বাবু[১] এসেচে শিলং থেকে। হেঁটে দুজনে বাসায় এলুম। তারপর আবার তখুনি বঙ্গশ্রীতে গেলুম। সেখান থেকে মুনীন্দ্র সর্ব্বাধিকারীর[২] বাড়ী এলুম। কয়েকটি ছেলে আমার বইএর বিশেষতঃ মেঘমল্লার[৩]গল্পটীর দেখি খুব ভক্ত। অনেকরাত্রে বাড়ী [।]

২৫শে মার্চ, ১৯৩৩। ১১ই চৈত্র, ১৩৩৯। শনিবার

সকালে কাগজ দেখ্‌লুম। বৈকালে এক্সপ্রেসে বনগাঁয়ে। সন্ধ্যায় বেড়াতে

১ সাহিত্যিক অবনীনাথ রায়। অপৌরুষেয় এঁর ভূতের গল্পের বই। অন্যান্য বই অনুচ্চারিত, অতীশ দে গ্রেট।

২ সাহিত্যিক মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী। কবিতার বই মানসকুঞ্জ। গল্প-উপন্যাস হালদার-বাড়ী, সোনার বাঁধন।

৩ মেঘমল্লার গল্প-সংকলন।

বেড়াতে ওপারে দেবেনের[১] ডাক্তারখানায় গেলুম। অপূর্ব্বর মৃত্যু সম্বন্ধে কথা-বার্ত্তা হোল। খুব ফুলের গন্ধ বেরুচ্চে। সুগন্ধ। বিশ্বনাথ[২], দেবেন ও আমি।

২৬শে মার্চ, ১৯৩৩। ১২ই চৈত্র, ১৩৩৯। রবিবার

খুব ভোরে উঠে আকাশে যখন নক্ষত্র আছে তখন খয়রামারি গেলুম। বাড়ী এসে হাতমুখ ধুয়ে ভোরের হাওয়ায় ও পাখীর ডাকের মধ্যে দিয়ে মহিমময় প্রভাতের হাওয়া গায়ে লাগিয়ে বারাকপুর গেলুম। পথে কি ঘেঁটু ফুলের সুগন্ধ! খুকুর[৩] সঙ্গে দেখা হোল—অনেককাল পরে। সেই খুকু! এসে প্রণাম কল্লে। অনেকক্ষণ গল্পগুজব হোল [:] ওর হাতের কাজ দেখালে। তারপর হরিপদদার[৪] বাড়ী গেলাম। ফিরে এসে আমতলায় একটা ভাঙা লোহার খাটে বসলুম। তারপর হেঁটে বনগাঁয়ে চলে এসে বাসায় কাগজ দেখি—

২৭শে মার্চ, ১৯৩৩। ১৩ই চৈত্র, ১৩৩৯। সোমবার

স্কুল থেকে দুপুরের পর বেরিয়ে গোল দিঘীতে খানিকটা বসলুম। তারপর বাড়ী। বৈকালে টরুকে সঙ্গে নিয়ে কুলদাবাবুর[৫] বক্তৃতা শুনে এলাম বহুকাল পরে। রাত্রে ননী এল। অনেক রাত পর্য্যন্ত ওর সঙ্গে রাজপুরের গল্প কল্লুম।

২৮শে মার্চ, ১৯৩৩। ১৪ই চৈত্র, ১৩৩৯। মঙ্গলবার

সকালে দীনেশ বাবুর[৬] বাড়ী গেলুম বেহালাতে কাগজ দিতে। সারা পথে কি অপূর্ব মুচকুন্দ[৭] ফুলের গন্ধ। বিশেষ করে আলিপুরে। বিজয় মঞ্জিলের[৮] একটা গাছ কি প্রকাণ্ড, ও সুন্দর দেখতে, ওখানকার ওই parsonageটাও ফুলে ভর্ত্তি—অদ্ভুত স্থান। দীনেশ সেন বল্লেন আপনাদের দেশে কাঁথা পাওয়া যায়? আমি বল্লুম চেষ্টা করে দেখবো। নেমে Municipal Market থেকে Wide World কিনে নিয়ে স্কুলে এলুম। ছুটির পরে বঙ্গশ্রীতে নৃপেন চাটুয্যেও[৯] সেখানে ছিল।

---

১ দেবেন্দ্রনাথ রায়, বারাকপুরবাসী।

২ বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বনগাঁবাসী।

৩ প্রীতিলতা মুখোপাধ্যায়, বারাকপুরবাসিনী।

৪ হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বারাকপুরবাসী।

৫ অধ্যাপক কুলদারঞ্জন দাশগুপ্ত।

৬ দীনেশচন্দ্র সেন।

৭ Pterospermum Seberifolium Lam.। সংস্কৃতে কর্ণিকার।

৮ দীনেশচন্দ্র সেনের বাড়ির নাম।

৯ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

হঠাৎ সেই থেকে মনে কেমন আনন্দ নেমে গেল। এ রকম আনন্দ অনেকদিন পাইনি। অপূর্ব্ব আনন্দ। Crates of ? through Euphorbia Forests—ওই ছবিটা মনে হতেই ভেবে দেখলুম পৃথিবীর সব স্থানই সুন্দর। বারাকপুরই বা মন্দ কি? শতসহস্রস্মৃতিজড়ানো অমন স্থান কোথায় পাবো? আনন্দের আর স্থান দিতে পারিনে মনে। কাল? ছুটী।

২৯শে মার্চ, ১৯৩৩। ১৫ই চৈত্র, ১৩৩৯। বুধবার

ছুটী। কাগজ দেখে সকালে ললিতের বাড়ী ও? দেখে এলুম। দুপুরে ঘুমুলাম। বেলা ২টার সময় এলেন প্রমোদবাবু। তারপর হাওড়া স্টেশনে। E. I. R. Institute এ গেলুম লিলুয়াতে তেঁতুলের[১] সঙ্গে দেখা। নরেন দেব ও রাধারানী দেবীর বাড়িতে গিয়ে সবাই আড্ডা দিলুম। রাত্রে ফিরি।

৩০শে মার্চ, ১৯৩৩। ১৬ই চৈত্র, ১৩৩৯। বৃহস্পতিবার

টিফিনের সময় বঙ্গশ্রী আপিসে। সেখান থেকে বাসা। বাসায় এসে আর কোথাও বেরুইনি। খাতা দেখছিলুম। সন্ধ্যার সময় হঠাৎ একটা ঝড় উঠল—দরজা জানালা সব বন্ধ করে দিলুম। বেজায় গরম।

৩১শে মার্চ, ১৯৩৩। ১৭ই চৈত্র, ১৩৩৯। শুক্রবার

কাগজ দেখা ও স্কুল। টিফিনের সময় বঙ্গশ্রী। বৈচিত্র্যহীন।

১লা এপ্রিল, ১৯৩৩। ১৮ই চৈত্র, ১৩৩৯। শনিবার

ছুটির পরে পরেশের[২] সঙ্গে দেখা করে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী। পুলিশের খুব ভিড়। ট্রাম ডিপোর কাছে কংগ্রেসের নাকি অধিবেশন হয়েছিল শুনলুম। বেজায় রৌদ্র। ট্রামে ফিরি।

২রা এপ্রিল, ১৯৩৩। ১৯শে চৈত্র, ১৯৩৩। রবিবার

সারাদিন বসে কাগজ দেখলাম। কাগজের বোঝা নামাতে পার্লে বাঁচি। বৈকালে হীরেন দত্তের বক্তৃতা শুনতে গেলুম।

৩রা এপ্রিল, ১৯৩৩। ২০শে চৈত্র, ১৩৩৯। সোমবার

সকাল সকাল ছুটী হোল। নিমাইকে আজ ক্লাসে বেজায় বকলুম ও মারও দিলুম। বেজায় গোলমাল করছিলো। ছেলেটা বোধ হয় একটু পাগলা ধরনের। মেরে মনটাতে একটু কষ্ট হোল।

---

১ সনৎ লাহিড়ী, রাজপুরবাসী; ফুলির ভাই।

২ পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অধীনে বাঙলার পরীক্ষক ছিলেন।

তারপর গেলুম বঙ্গশ্রীতে। বিকেলে সুধীর সরকারের দোকানে শিবরাম চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে দেখা হোল।

কাল। রামনবমী। বাইরে বসে কথা ভাবছিলুম। সেই পাপিয়া ডাকৃত আমাদের দেশে। শুকনো বাঁশপাতার ওপর দুপুরে বাঁশবাগানে বেড়াতুম। কি আনন্দ নিয়ে। কেননা কাল লুচির নেমতন্ন খেতে যাবো।[১] বাবার সেই যোষা দোষাম্পদ? ইত্যাদি। খাতাখানা এখনও আছে। সুপ্রভাকে লিখবো কথাটা ভাবচি।

৪ঠা এপ্রিল, ১৯৩৩। ২১শে চৈত্র, ১৩৩৯। মঙ্গলবার

স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী আপিস। সেখান থেকে ইউনিভার্সিটীতে রেজিস্ট্রারের আপিস। সেখান থেকে এসে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে কাপড় পরে তৈরী হলুম কারণ পশুপতিবাবু ফোন করেচেন যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা কর্ত্তে যেতে হবে। তাঁর মোটরে বেরুনো গেল প্রশান্ত বাবুর বাড়ীতে[২]। অনেকদিন পরে সেখানে গেলুম। সেই ও বছর Good Fridayর দিন গিয়েছিলুম। সুনীতিবাবু ও কালিদাস বাবু[৩] সেখানে আগেই বসেছিলেন। প্রশান্ত বাবুর স্ত্রী[৪] আমাদের জন্যে খাবার আন্‌লেন। তারপর এল আইসক্রীম। রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন— আরে Still they come! .....বেশ জ্যোৎস্না উঠেচে। বল্লেন পরিচয়ে আমার 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে লিখেচেন,[৫] এ মাসে বার হবে। ওখান থেকে এলুম নীরদের ওখানে। তার কাছ থেকে Prehistory[৬] বই খানাই নিয়ে এলুম অনেক কাল পরে। বাসায় এসে দেখি পানিতরের মণীন্দ্রবাবু আমার জন্যে অপেক্ষা করচেন। তারপর এলেন প্রমোদবাবু।

---

১ সম্ভবতঃ বৃন্দাবন গোস্বামীদের (বারাকপুর) বাড়িতে রামনবমী উৎসব হত।

২ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ। বরানগরের এই বাড়িই বর্তমানে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনষ্টিটিউট।

৩ কালিদাস নাগ।

৪ নির্মলকুমারী (রাণী) মহলানবীশ।

৫ পরিচয়, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৪০, পুস্তক পরিচয়, কৃষ্ণ রাও—চারুচন্দ্র দত্ত।

৬ World Prehistory, John Grahams Douglas Clark।
A Book of Prehistory, Dina Portway Dobson.

৫ই এপ্রিল, ১৯৩৩।২২শে চৈত্র, ১৩৩৯। বুধবার

পূর্বের লেখা ভুল। রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিলাম আজ। কাল সকালে বেহালায় দীনেশ সেনের বাড়ী পরীক্ষার কাগজ দিতে যাই ও ফিরবার পথে নীরদ বাবুর বাড়ী, মুরলী[১] ও মনোজের ওখানে এবং শ্যামাপ্রসাদবাবুর[২] ওখানে যাই।

রামনবমী কাল ছিল। বৈকালে বসে পুরোনো দিনের কথা ভাবলুম।

৬ই এপ্রিল, ১৯৩৩। ২৩শে চৈত্র, ১৩৩৯। বৃহস্পতিবার

দুটী খাতা দেখলুম। বৈকালে উদয়ন আপিসে [।] এদিন ছুটী। কাগজ দেখে বৈকালে উদয়ন আপিসে গেলুম। সন্ধ্যার সময় থিয়েটার রোডে ম্যাকফার্সন স্কোয়ার[৩] বলে একটা জায়গায় বসে কাটালুম।

৭ই এপ্রিল, ১৯৩৩। ২৪শে চৈত্র, ১৩৩৯। শুক্রবার

কাগজ দেখবার পরে বৈকালে বেলুড় গেলুম। রাত ২।।০টা পর্য্যন্ত জেগে আমি, প্রকাশবাবু ও নীরোদবাবু ছাদে আড্ডা দিতে দিতে ভূতের গল্প করলুম।

৮ই এপ্রিল, ১৯৩৩। ২৫শে চৈত্র, ১৩৩৯। শনিবার

সকালে বেলুড় থেকে চা খেয়ে বেরিয়ে মেসে এলুম। স্নান সেরে স্কুল। সেখান থেকে বঙ্গশ্রী। তারপর স্টেশনে গেলুম।[৪] দশটাকার নোটের গোলমাল হোল। আবার গেলুম বঙ্গশ্রীতে। বেজায় গুমট গরম। সন্ধ্যাবেলা বসে বসে কাগজ দেখলুম। নিয়ম মত রোজ ১৫ খানা দেখি। ৩রা মে আমাদের শেষ দিন। ওর মধ্যে দিতেই হবে।

৯ই এপ্রিল, ১৯৩৩। ২৬শে চৈত্র, ১৩৩৯। রবিবার

কাগজ দেখে মামার বাড়ী[৫] গেলুম। বলরাম সরকারের ঘাট বেড়িয়ে দুর্গাপদর সঙ্গে আলাপ করা গেল। সেজমাসীমা[৬] এখানে। রাত্রে চলে এলুম।

১ মুরলীধর বসু, কালি-কলম পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক।

২ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন উপাচার্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩ বর্তমানে ইউ. এন. ব্রহ্মচারী সরণীর (পুরনো পার্ক স্ট্রীট) ওপরে।

৪ পরের দিন বিভূতিভূষণ ভাটপাড়া যান। সম্ভবতঃ সেজন্যে টিকিট কিনতে গিয়েছিলেন।

৫ ভাটপাড়া।

৬ নগেন্দ্রনন্দিনী দেবী, মৃণালিনী দেবীর বোন।

১০ই এপ্রিল, ১৯৩৩। ২৭শে চৈত্র, ১৩৩৯। সোমবার

বিনয় গাঙ্গুলী বলে একটা ছোট ছেলে মারা গিয়েচে, স্কুলের ছুটী এজন্যে সকাল সকাল হোল। ট্রামে বাসায় এসে ঘুমুলাম—কারণ কাল রাত্রে ঘুম হয়নি।

আজ সকালে উঠে আবার গেলুম বেহালা। পথে মুচুকুন্দ ফুলের গাছে এখনও ফুল যথেষ্ট—তবে শুকিয়ে এসেচে। বিজয়মঞ্জিলের সেই গাছটা দেখতে বড় সুন্দর—একেবারে গোড়া থেকে ফুল হয়েচে। তারপর দীনেশবাবু অনেকক্ষণ বসে তাঁর Cultural History of Bengal এর কথা বল্লেন। সেখান থেকে উঠে ভবানীপুরে শ্যামাপ্রসাদবাবুর কাছে এলুম। শ্যামাপ্রসাদবাবু ঘরে নেই, অনেকক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে রইলুম। তারপর তিনি এলে তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা হোল। উমাপ্রসাদের[১] সঙ্গেও দেখা হোল।

বৈকালে বেড়িয়ে এসে সরোজনলিনীতে[২] মনোজের সঙ্গে দেখা। ওবেলা তার বাসায় গিয়ে দেখা পাইনি। দুজনে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে গেলুম। একজন নমঃশূদ্র এসে দেশের কথা ও যুদ্ধ কি করে কল্লে মুসলমানদের সঙ্গে সে কথা বল্লে। দুজনে ছবিঘরে Robinson Crusoe দেখলুম। চমৎকার ছবি। ? দৃশ্য।

১১ই এপ্রিল, ১৯৩৩। ২৮শে চৈত্র, ১৩৩৯। মঙ্গলবার

ছুটীর পরে বঙ্গশ্রীতে। বৈকালে কাগজ দেখবার পরে বেড়াতে যাচ্চি। নলিনী সরকারের সঙ্গে দেখা। তার সঙ্গে Liberty[৩] আপিসে ভূতের গল্প শুনতে গেলুম। ফিরে এসে কৃষ্ণধনের সঙ্গে খানিকটা গল্প গুজবের পর ললিতদের ওখানে টাকার তাগাদাতে গেলুম। রাত্রে মেসে পোলাও ও মাংস হোল—অনেক রাত্রে খাওয়া। বেজায় মেঘ করে পরদিন সকালে ঝড় এল। আমি বসে বসে Good Fridayতে বাড়ী গিয়ে কি করবো তাই ভাবছিলুম। চড়কে অনেককাল পরে বাড়ী যাবো।

১২ই এপ্রিল, ১৯৩৩। ২৯শে চৈত্র, ১৩৩৯। বুধবার

সকালে ছুটীর পরে—বাড়ী এলুম। সেখান থেকে জিনিসপত্র কিনে Ripon College Reunionএ গেলুম। সুশীলবাবুর সঙ্গে দেখা। তাঁর সঙ্গে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বসলুম। তারপর বাড়ী।

---

১ উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

২ সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি ; তখন ছিল মির্জাপুর স্ট্রীটে। বঙ্গলক্ষ্মী পত্রিকা এখান থেকে বেরত।

৩ ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯২৯, সম্পাদক, সত্যরঞ্জন বক্সী।

১৩ই এপ্রিল, ১৯৩৩। ৩০শে চৈত্র, ১৩৩৯। বৃহস্পতিবার

ভোরে উঠে বনগাঁ। বাজার করে আনলুম। বলুর সঙ্গে গল্প। বৈকালে সাংঘাতিক ঝড় বৃষ্টি। রাত্রে শীত পড়ে গেল। এ ধরণের ঝড় অনেকদিন দেখিনি।

১৪ই এপ্রিল, ১৯৩৩। ১লা বৈশাখ, ১৩৪০। শুক্রবার

আজ হালখাতার নিমন্ত্রণ। দুপুরে বলুর ওখানে হালখাতা করে ওর মোটরে বাঁকি করিমালী[১] গেলুম। সেই বাঁকি করিমালী, বাবা যেখানে কথকতা কর্ত্তে গিয়েছিলেন। সারা দুপুর বর্ষা কালের মত বৃষ্টি হয়েচে। অনেকরাত্রে বাঁকি করিমালী থেকে ফিরলুম। রাত্রে নারাণদার দোকানই থেকে খাবার আনলুম।

১৫ই এপ্রিল, ১৯৩৩। ২রা বৈশাখ, ১৩৪০। শনিবার

আজ একটু ধরেচে। ভাবলুম আজ বৃষ্টির জল কাদা শুকিয়ে গেলে কাল বারাকপুর যাবো। বৈকালে খুকীকে নিয়ে পুলের ঘাটে বসলাম। বিকেলে আমার বাসায় পেটমোটা বীরেন, তার দাদা, সুরেন,[৩] ভোলানাথবাবু[৪] অনেকে এসে বসলেন। পুলের ঘাটে সরোজ অনেক আমার সঙ্গে গল্প করলে। রাত্রে আবার বলুর সঙ্গে লরিতে চেপে থিয়েটার দেখতে গেলাম ছ'ঘরেতে। সুরেন উকীলের ছেলে চন্দ্রগুপ্ত সেজেছিল; বেশ করলে। ১২॥০ টা রাত্রিতে ফিরলুম।

১৬ই এপ্রিল, ১৯৩৩। ৩রা বৈশাখ, ১৩৪০। রবিবার

আজ সকালে ঘন মেঘাচ্ছন্ন চারিদিক। খুব বৃষ্টি আরম্ভ হোল। জাহ্নবী মাদুর শুকিয়ে দিতে যাচ্ছিল ফুটবল খেলার মাঠে। আমি বারণ করলুম—বললুম এখুনি বৃষ্টি আসবে। এলও তাই; একেবারে শ্রাবণ মাস। দুই সাহেবের সঙ্গে আলাপ হোল। একজন পেরুর কন্সল্ আর একজন Symons, একজন Naval officer, ওরা ডাকবাংলাতে খেতে বসেছিল। রাত্রে আমি ও বলু গল্প করে খুব খেলাম।

১৭ই এপ্রিল, ১৯৩৩। ৪ঠা বৈশাখ, ১৩৪০। সোমবার

আজ Symonsএর সঙ্গে তারই গাড়ীতে গেলুম বেনাপোলে সফদার মিয়ার পুকুরে। ঝাঁ ঝাঁ দুপুর। পাকা রাস্তা থেকে একটু হেঁটে ওদের বাড়ী। সাহেবের

---

১ যশোর, সারসা থানা, বাঙলাদেশ।

২ গোপালনগর।

৩ সুরেন মিত্র, বনগাঁবাসী।

৪ ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনগর-শিমুলিয়াবাসী (বনগাঁ)।

সঙ্গে অনেক কথা হোল। বল্লে Gentlemen like you have a great responsibility Mr. Banerji. দুজন মাছ ধর্ত্তে বসা গেল। কি ভয়ানক রোদ। গোপাল[১] চার ফেলে দিলে। সারাদিন ডাবের জল খাওয়া গেল। সাহেব আধসেরটাক একটা মাছ ধল্লে। তারপর আমরা মোটরে ফিরে এলুম। আমার বাসার কাছে আমি নেমে গেলুম। সন্ধ্যার সময় পায়েস নিয়ে ওদের ডাকবাংলাতে গেলুম। Symons ব্যায়াম করচে। খুব গল্প গুজব খাওয়া দাওয়া হোল। পায়েসের ওপর সাহেব কুঁতফলের ? ঢেলে সব স্বাদ নষ্ট করলে। অন্য সাহেবটা তেজপাতা চেটে খেতে গেল। সেটা বেশ সরল। প্রকৃত ভক্ত।

১৮ই এপ্রিল, ১৯৩৩। ৫ই বৈশাখ, ১৩৪০। মঙ্গলবার

সকালে সাহেবেরা কলকাতায় গেল। আমিও একটু ছানা খেয়ে বরিশাল এক্সপ্রেসে কলকাতা এলুম। স্কুলে সকালে ছুটি হোল। বঙ্গশ্রীতে গেলুম। সজনী দাস নেই। হেঁটে জেলেপাড়া দিয়ে বাসায় এলুম। সন্ধ্যার সময় প্রভাত সান্ন্যাল এসে পরীক্ষার কাগজের গল্প করলে। একটু তামাক কিনে আনলুম। কোথাও বেরুলুম না। 'The Engineer'[২] বলে ভূতের গল্পটা রাত্রে বসে পড়া গেল। চাংড়িপোতার নৃপেন এসে বল্লে রবিবারে ওদের কি একটা মিটিং এ সভাপতিত্ব কর্ত্তে হবে।

১৯শে এপ্রিল, ১৯৩৩। ৬ই বৈশাখ, ১৩৪০। বুধবার

সকালে স্কুল। বিকালে Imperial Library গেলুম। সেখান থেকে বেরিয়ে গড়ের মাঠ ও ফোর্টের ধারটা বেড়িয়ে থিয়েটার রোড ধরে পার্ক সার্কাসে সিরাজুলের বাড়ী গেলুম। সেখানে গোলাম মোস্তাফা[৩] তার মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে এসেচে। বাড়ি এসে দেখি টরু[৪] এলাহাবাদ থেকে এসেচে। তার সঙ্গে এলাহাবাদের গল্প হোল। তারপর কৃষ্ণধন দে ও পরিমলবাবু এলেন। পরিমলবাবু খাওয়াতে নিয়ে গেল ওদের বাসায়।

১ গোপাল রায়, বারাকপুরবাসী।

২ লেখিকা Amelia Ann Blanford।

৩ সাহিত্যিক। এঁর কাব্যগ্রন্থের নাম টুনটুনির গান; উপন্যাস, রূপের নেশা।

৪ পূর্ব উল্লিখিত টরু নন। পরীক্ষাসূত্রে এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে বিভূতি-ভূষণের পরিচয় হয়।

২০শে এপ্রিল, ১৯৩৩। ৭ই বৈশাখ, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

Imperial Libraryতে গিয়ে রিপনের পুরাতন সহপাঠী মতিলালের সঙ্গে আলাপ হোল। বঙ্গশ্রী আপিসে সুশীল দে এলেন। আমি ইবন্ বাটুটা[১] সম্বন্ধে কথা বললুম। সুনীতিবাবুও এলেন। ওখান থেকে দুজনে বেরিয়ে গেলুম আর্ট Exhibition এ। হেঁটে বাড়ী এলুম। রাতে হরিনাভির শৈলেন ও পানিত্তরের মণীন্দ্রবাবুর ভাই এসে সেকালে [র] গল্প করলেন।

২১শে এপ্রিল, ১৯৩৩। ৮ই বৈশাখ, ১৩৪০। শুক্রবার[২]

দুপুরে কাগজ দেখলুম। বৈকালে Imperial Libraryতে মতিলালের সঙ্গে গল্প গুজব হোল। বেরিয়ে তারক দাদের দোকানে খেয়ে বঙ্গশ্রীতে। খুব মেঘ হয়েচে। সেখান থেকে মেসে এসে গেলুম Radio Stationএ। মানময়ী গার্লস স্কুল[৩] হোল। আমি ও প্রমথ রায়[৪] হেঁটে লাল দিঘী দিয়ে বাড়ী ফিরি।

২২শে এপ্রিল, ১৯৩৩। ৯ই বৈশাখ, ১৩৪০। শনিবার

দুপুরে প্রবাসী Office এ গেলুম [।] সেখান থেকে পশুপতি বাবুর বাটী গেলাম বাগবাজারে। সেখান থেকে গেলুম সন্ধ্যায় বেলুড়ে। খুব চাঁপাফুল ফুটেচে। রাত ১টা পর্য্যন্ত গল্প।

২৩শে এপ্রিল, ১৯৩৩। ১০ই বৈশাখ, ১৩৪০। রবিবার

সকালে এলুম আমি ও নীরদ বাবু। খুব বৃষ্টি। কানাই[৫] এল, অমিয়[৬] এল, হরিনাভির ছেলেরা এল। কিন্তু হরিনাভি যাওয়া হোল না বৃষ্টির জন্যে। সন্তোষ বাবু এল। বিভূতিদের বাড়ী গেলুম [।] অনেকদিন পরে ওদের বাড়ি উৎসব দেখা গেল। ডাঃ শ্রীকুমার ব্যানার্জ্জির সঙ্গে আলাপ পরিচয় হোল।

১ প্রসিদ্ধ মিশরীয় পর্যটক ; মহম্মদ তোঘলকের সময় ভারতবর্ষে আসেন। এঁর রচিত পুস্তকের নাম সফরনামা।

২ তারিখের উপরে লেখা, 'নতুন—১ জোড়া পুরানো ১ জোড়া সাদা পাঞ্জাবী—১ [?] ১টা গেঞ্জি ১টি রুমাল ১টা ওয়াল [ওয়াড়] ১টা—'।

৩ রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের নাটক।

৪ অধ্যাপক ও সাহিত্যিক। শনিবারের চিঠির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। এঁর অনূদিত গ্রন্থের নাম মুসোলিনী।

৫ কানাইলাল ঘোষ, শিল্পী।

৬ অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৪শে এপ্রিল, ১৯৩৩। ১১ই বৈশাখ, ১৩৪০। সোমবার

সকালে স্কুলে গেলুম। রাম বল্লে, ও দেবব্রতের পত্র এনে দেবে। সে নাকি বলেচে বিভূতি বাবু চলে যান মৌলবীর[১] সঙ্গে, কথা বলেন না। সন্তোষ বাবু রোজ সঙ্গে আসে।

দুপুরে কাগজ দেখি। দুপুরে আজ খুব ঘুমিয়েছি। উঠে দেখি একেবারে ৪৷৷৹টা। ৬ খানা কাগজ দেখে ট্রামে গেলুম বঙ্গশ্রীতে। সুশীল দা অমরু শতকের কবিতা পড়লেন। সুনীতিবাবুও এলেন।

২৫শে এপ্রিল, ১৯৩৩। ১২ই বৈশাখ, ১৩৪০। মঙ্গলবার

আজও দেবুর পত্র আনিতে পাচিনি [পারেনি]। সুপ্রভার পত্রখানারও উত্তর দেওয়া হয়নি। দুপুরে কাগজ দেখে Imperial Library গেলুম। বেলা তখন ৫৷৷৹টা। ভাবলুম দেবু ঐ মনুমেন্টের সাম্‌নের মাঠে ফুটবল খেল্‌চে। গেলেই দেখা হবে। ? সম্বন্ধে পড়ছি। বড় সুন্দর কথা।

বঙ্গশ্রী এলুম। নৃপেন বল্লে, বাগবাজারে একটা লাইব্রেরীতে যেতে হবে তার anniversaryতে। কৃষ্ণধন বাবুর সঙ্গে বেরিয়ে ট্রামে খিদিরপুর দিয়ে রাত ৮৷৷৹টার সময় ঠাণ্ডা বাতাসে গেলুম কালিদাস রায়ের[২] বাড়ী ও দক্ষিণা বাবুর বাড়ী। দক্ষিণা বাবুর ছেলে কত বড় হয়েচে।

অনেকরাত্রে ফিরি।

২৬শে এপ্রিল, ১৯৩৩। ১৩ই বৈশাখ, ১৩৪০। বুধবার

দুপুরটা বেশ কাটে। ঝম্ ঝম্ রোদ। গরম এবার তত নয়। আমি বসে বসে কাগজ দেখি আর নির্জ্জন ঘরে কত কথা ভাবি। দেবুর কথা বড় মনে হয়। মন কেমন করে। আজ কাগজ শেষ হোল। কাল সকালে নিয়ে যাবো দীনেশ সেনের বাড়ী। আজ সকালে মোটরে সেই সোমনাথবাবুর[৩] সঙ্গে অনেককাল পরে দেখা। University-র কাগজ শেষ করে আজ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম।

২০ মার্চ কাগজ এনেছিলুম আর আজ ২৬ এপ্রিল কাগজ দিয়ে দিচ্চি।

একটু পরে করুণা[৪] এল দলবল নিয়ে—তাদের সঙ্গে গল্প কর্ত্তে সন্ধ্যা হয়ে গেল। রাত ৮টায় বার হলুম।

---

১ নুরুল হক, শিক্ষক, খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইনস্টিটিউশন (দ্র. ১৪.৯.৫০)।

২ ১৫নং রাজা বসন্ত রায় রোড।

৩ অধ্যাপক সোমনাথ মৈত্র।

৪ অধ্যাপক করুণাময় মুখোপাধ্যায়।

২৭শে এপ্রিল, ১৯৩৩। ১৪ই বৈশাখ, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

সকালে উঠে স্কুলে গেলুম। সেখান থেকে দীনেশ বাবুর বাড়ী বেহালায় কাগজ দিতে। বেহালা থেকে দুপুর রোদে হেঁটে এলুম চৌরঙ্গীর মোড়ে—এ্যাসপ্ল্যানেডে। দুপুর রোদে হাঁটতে ভারী সুন্দর লাগছিল। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ঢুকে একটু মতিলালের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইলুম। তারপর বাসায় এসে স্নানাহার করে একটু ঘুমানো গেল। তারপর বঙ্গশ্রী আপিস—সেখান থেকে জ্ঞানবাবুর[1] গাড়ীতে বাগবাজার চন্দ্রনাথ পরিষদের সভায়। রাত ৯টার পরে সেখানে খাওয়া দাওয়া সেরে ট্রামে [illegible] একটা film দেখতে Madan Theatre[2] এ। অনেক রাত্রে শুলুম।

২৮শে এপ্রিল, ১৯৩৩। ১৫ই বৈশাখ, ১৩৪০। শুক্রবার

আজ ঝঞ্ঝাট নেই। কাগজ, বঙ্গশ্রীর লেখা সব শেষ হয়ে গেছে। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে Imperial Libraryতে গেলুম। সেখান থেকে এলুম দীনেশ দাসের[3] সভায়। একটা artists club গড়বার জন্যে সভা আহুত [আহূত] হয়েচে। আমায় করলে সভাপতি। মণীন্দ্রবাবুর[4] সঙ্গেও দেখা হোল। ওখান থেকে হেঁটে রমেশবাবুর ডাক্তার খানায় গেলুম অবনী রায়কে খুঁজতে কারণ কাল তাকে সভাপতিত্ব করতে হবে বাণী সঙ্ঘের বাৎসরিক উৎসবে। বাড়িতে দেখলুম [—] নেই কোথাও।

ফিরে চলে এলুম। অনেকদিন পরে ভাগলপুরে Wide World এর সেই 'Father of all rattle snakes' গল্পটা পড়লাম।

২৯শে এপ্রিল, ১৯৩৩। ১৬ই বৈশাখ, ১৩৪০। শনিবার

সকালে স্কুল সেরে সন্তোষবাবুর সঙ্গে এলুম। দুপুরে নভেলটা[5] লিখলুম খানিক। বিকেলে বেলুড়। খুব চাঁপা ফুল ফুটেচে। প্রমোদবাবু ৬টার গাড়ীতে এলেন। তারপর চা ও পরেটা খেলুম। ২৷৷০টা পর্য্যন্ত আড্ডা। তারপর ঘুম।

১ জ্ঞান রায়, আইনব্যবসায়ী।

২ পুরো নাম Madan Theatre and Places of Varieties। বর্তমানে Elite সিনেমা।

৩ দীনেশরঞ্জন দাশ, কল্লোল পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক।

৪ মণীন্দ্রলাল বসু।

৫ দৃষ্টি-প্রদীপ।

৩০শে এপ্রিল, ১৯৩৩। ১৭ই বৈশাখ, ১৩৪০। রবিবার

ভোরে উঠে সাতটার ট্রেনে কলিকাতা। অবনী ও নিরঞ্জন সাহা এলেন। দুপুরে অমিয় এসে আমাদের নিয়ে গেল শ্রীরামপুরে। লীলা[১] দিদি খুব খাওয়ালেন। বেশ লোক। খুকীর[২] ছেলে এসে আমায় ডাকলে—খুকী পাঠিয়ে দিয়েচে। ওদের বাড়ী গেলুম—চা খেলুম। খুকী বল্লে আমি কিছু বলচিনে কিন্তু। দোর পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল। আহা বড় চমৎকার মেয়ে। খুব ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেল।

১লা মে, ১৯৩৩। ১৮ই বৈশাখ, ১৩৪০। সোমবার

সকালে স্কুলে যেতে দেবব্রতরা যাচ্চে দেখলুম। কথা হোল না। দুপুরে খুব ঘুম দিলুম—তারপর উঠে কিশোর কাকার[৩] কাছে যাবো—পথে ট্রামে সাতু কাকার[৪] সঙ্গে দেখা। কিশোর কাকার ওখানে গিয়ে শুনি যদু মারা গিয়েচে দশ দিন হোল মেও হাঁসপাতালে। Poor girl! তারপর স্কুলে এলুম হেঁটে—পথে P. C. Sircar এর দোকানে একবার গেলাম। স্কুলে থেকে টাকা নিয়ে বঙ্গশ্রী। সেখানে গিয়ে শুনি রবীন্দ্রনাথ আমার সন্ধান করচেন—পশুপতি বাবু আমার মেসে মোটর নিয়ে এসেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ নতুন নাটক[৫] পড়বেন—বলেচেন বিভূতিকে আনা চাই। সুনীতিবাবু ও সুশীলবাবু এলেন। সুনীতিবাবু কচুরী আনালেন—খুব খাওয়া হোল। ট্রামে আমি ও কৃষ্ণধন ফিরবার সময় ডাঃ জ্ঞান মুখার্জ্জির[৬] সঙ্গে দেখা অনেক কাল পরে। ওর বাসায় যেতে বল্লেন—৪নং ফেডারেশন ষ্ট্রীট—ব্রাহ্ম বালিকা স্কুলের পাশে।

২রা মে, ১৯৩৩। ১৯শে বৈশাখ, ১৩৪০। মঙ্গলবার

আজ কে বলছিল দেবব্রত নাকি রোজ দাঁড়িয়ে থাকে আমার জন্যে ওদের দোরে। স্কুল থেকে এসে ঘুম দিলুম [—] তারপর প্রবাসী। সেখান থেকে বঙ্গশ্রী। এই আসচি।

সন্ধ্যায় ঝড় বৃষ্টি।

---

১ লীলা বন্দ্যোপাধ্যায়, খুলনাবাসিনী; হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোন।

২ অন্নপূর্ণা গোস্বামী (ফুলী), রাজপুরবাসিনী।

৩ কিশোরমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বারাকপুরবাসী।

৪ সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বারাকপুরবাসী।

৫ বাঁশরি।

৬ বৈজ্ঞানিক।

৩রা মে, ১৯৩৩। ২০ বৈশাখ, ১৩৪০। বুধবার

স্কুল থেকে বাসা। সেখান থেকে Imperial Libraryতে Nabil's Narrative[1] পড়লুম। ভারী চমৎকার। সেখান থেকে বঙ্গশ্রীতে সুশীল দের সঙ্গে আড্ডা হোল। অমূল্য বাবুকে[2] হাত দেখালুম। তারপর ওখান থেকে গেলাম উদয়নে। শৈলজা সেখানে বসে টাকা নিয়ে ঝগড়া করচে। আমার সঙ্গে অনেক দূর এল। আমি পার্ক সার্কাসে সির ক্রুলদের বাসায় গেলুম টাকা আনতে। মহরমের procession এ ট্রাম বন্ধ [।] অনেক রাত্রে ফিরি।

রাত্রে আজকাল বাইরে শুয়ে চমৎক মনে হয়। নক্ষত্র, উদার আকাশ, ঝিরঝিরে হাওয়া।

৪ঠা মে, ১৯৩৩। ২১শে বৈশাখ, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

ক্লাসে আজ বিমলেন্দু মার খেলে। অজিত একটা প্রবন্ধ বেশ লিখেছিল।

দুপুরে Imperial Library থেকে বেলা পড়লে কার্জ্জন পার্কে গিয়ে বসলুম। তারপর বঙ্গশ্রী হয়ে বাসা।

আজ মনে অপূর্ব্ব আনন্দ পাচ্ছি আবার। এত আনন্দ রাখবার জায়গা নেই। কত অপূর্ব্ব জিনিস দিয়ে এই জীবন গাঁথা। আজমাবাদের সেই কাছারীর বটগাছ এমন বিকেলে সেই ধূ ধূ মাঠ, সেই আমাদের শৈশবের ভিটে, নতুন কালবৈশাখী বৃষ্টির ভিজে মাটির গন্ধ, বেল পাহাড়ের জ্যোৎস্নাভরা মাঠ বন পাহাড়শ্রেণী, গৌরী,[3] সুপ্রভা, অন্নপূর্ণা, খিনু,[4] দেবু কাদের কথা বাদ দেবো ?

সব নিয়ে এই যে জীবন—এ একটা বিরাট রহস্যময় Epic—

---

১ The Dawn-Breakers/Nabil's Narrative of the Early Days of the Baha'i Revelation। Shoghi Effendi কর্তৃক মূল ফারশি থেকে অনূদিত ও সম্পাদিত।

২ অমূল্যচন্দ্র সেন, প্রাবন্ধিক। এঁর নামকরা বই জৈনধর্ম।

৩ বিভূতিভূষণের প্রথমা স্ত্রী।

৪ বিভূতিভূষণ যখন বনগাঁ স্কুলে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র তখন তাঁর বাবা মারা যান। হস্টেলের খরচ চালানো দুষ্কর হয়ে পড়ায় স্কুলের প্রধান শিক্ষক চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় বিভূতিভূষণ বনগাঁর তদানীন্তন সরকারী ডাক্তার বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। খিনু (ডাক নাম শিবরাণী) বিধুভূষণের মেয়ে; বিভূতিভূষণকে দেখাশোনা করতেন। ইনিই অপরাজিত-এর নির্মলা চরিত্রের উৎস।

৫ই মে, ১৯৩৩ ২২শে বৈশাখ, ১৩৪০। শুক্রবার

দুপুরে লিখলুম—মৃণাল সর্ব্বাধিকারী এল দুপুরে। Pad দিয়ে গেল। বিকেলে খুব মেঘ করে এল—কালো মেঘ, ঝড় উঠলো। বেলা তখন তিনটে। ঘুম থেকে উঠে হেঁটে বঙ্গশ্রী। সেখানে স্নীতিবাবু, সুশীলবাবু সবাই উপস্থিত। আমার হাত দেখিয়ে সুনীতিবাবু বল্লেন—বলুন তো এর বিয়ে হবে কিনা? তাই নিয়ে খুব মজা হোল। তারপর সজনী ও অজিতের[১] সঙ্গে মোটরে হ্যারিসন রোডের মোড়ে—সেখান থেকে বেলুড়। প্রমোদবাবু এলেন। পিঠে ও ফলমূল খাওয়া হোল। রাত ২॥০ পর্য্যন্ত—সন্ধ্যায় খুব ঝড়বৃষ্টি। শীত পড়ে গেল।

৬ই মে, ১৯৩৩। ২৩শে বৈশাখ, ১৩৪০। শনিবার

ভোরে উঠে গল্প গুজব। স্নান করে খেয়ে নিয়ে কোথায় যাওয়া যায় ভাবতে ভাবতে ঠিক হোল কেওটা[২] যাবো। দুপুরের ট্রেনে চুঁচুঁড়া [—] প্রমোদ বাবুর বাসায় গিয়ে সবাই উঠলাম college এর সামনে। কৃষ্ণচূড়া ফুল ফুটেচে। কেওটা যাওয়া হোল না—সন্ধ্যে হয়ে গেল। খুব জ্যোৎস্না—গঙ্গার ঘাটে মাদুর পেতে বসে আড্ডা। খেয়ে আবার মাঠের সামনে আড্ডা। শেষ রাত্রের গাডীতে কল্‌কাতায় রওনা হলুম।

৭ই মে, ১৯৩৩। ২৪শে বৈশাখ, ১৩৪০। রবিবার

ভোর ৬টায় মেসে এসে স্নান করে ঘুম দিয়ে উঠলুম। দেখি বেলা ১২টা। তারপর খুব গরম—দুপুরে বসি? লি্খচি। দুপুরে ঝড় ও বৃষ্টি। এবার আবহাওয়ার অবস্থা বড় গোলমেলে—বৈশাখ মাসে তেমন গরম একদিনও পড়ল না—বরং রোজ রাত্রে শীত করে—এমন ঠাণ্ডা।

বিকেলে বেজায় বৃষ্টি। কৃষ্ণবাবুর সঙ্গে অখিল মিস্ত্রী লেনে রমাপ্রসাদের বাড়ীটাতে গেলুম [।] Theosophical Hall এ খানিকটা কাটালুম। Instituteএ গেলুম [,] কিন্তু সেটা বন্ধ। সুরেশ মালিকে (?) এক গ্লাস জল দিতে বল্লুম। হলএ বসে বসে মনে হোল এই ঘোর বর্ষার সন্ধ্যায় ইছামতীর ধারের চরে কে যেন ঘাস কাটচে নৌকা লাগিয়ে। কি শান্ত ছবিটা!

১ অজিত চৌধুরী; সজনীকান্ত দাসের বন্ধু।

২ শাগঞ্জ-কেওটা (ব্যাণ্ডেল), হুগলি জেলা। কথকতা উপলক্ষে বিভূতিভূষণ শৈশবে বাবার সঙ্গে এখানে আসেন। এখানে থাকতে তিনি পড়তেন প্রসন্ন গুরুমশায়ের পাঠশালায়। (পথের পাঁচালীতে এই পাঠশালার উল্লেখ আছে।)

রাত্রে একজন তরুণ আর্টিস্ট এল। তাকে ভারী ভাল লাগে। ছেলেমানুষ —কত গর্ব্ব করে গেল। Sacrificeও করেচে—তাও বল্লে।

৮ই মে, ১৯৩৩। ২৫শে বৈশাখ, ১৩৪০। সোমবার

দুপুরে খুব বৃষ্টি। আশীসবাবু এল দুপুরে। তারপর ঘুমিয়ে উঠে বঙ্গশ্রী। সুনীতিবাবু এসে খুব আলোচনা কল্লেন। সবাই মিলে Nankim Restaurant[১] এ যাওয়া গেল। খুব খেলুম। এ মাত্র ফিরেচি। বেজায় ঠাণ্ডা।

প্রেমেন ও আমি গোলদিঘীর মোড়ে মোটর থেকে নামলুম।

৯ই মে, ১৯৩৩। ২৬শে বৈশাখ, ১৩৪০। মঙ্গলবার

সকালে ঝুপঝাপ্ বৃষ্টি। বেজায় ঠাণ্ডা পড়ল। ঘুমিয়ে পড়ে উঠ্‌তে হয়ে গেল দেরী। জসিমউদ্দীন এল ওর সেই লভলিরিকের খাতা বলে গল্পটা নিতে [—] সঙ্গে অবনীন্দ্র ঠাকুরের ছোট ছেলে[২]। স্কুলে যেতে হয়ে গেল দেরী —আজ মহাত্মা উপবাস আরম্ভ করেচেন[৩]—মোড়ে মোড়ে খুব কাগজ বিক্রী হচ্ছে। স্কুল থেকে বাড়ী আসবার সময়ে পথে খেয়েই ফিরলুম।

আজ ভেবে দেখ্‌লুম নতুন জায়গায় যাওয়ার আনন্দের চেয়ে পুরাতন পরিচিত জায়গায় অনেকদিন পরে ফিরে যাওয়ার আনন্দ ঢের বেশী। তাই ইসমাইলপুর থেকে একদিন কল্‌কাতা ও বারাকপুরে যাবার আনন্দ এত বেশী ছিল। আজ আবার ইসমাইলপুরে ফিরে যেতে সেই আনন্দই পাবো।

বিকালে বঙ্গশ্রী। সুশীল বাবু, অমূল্য বাবু ইত্যাদি—হাত দেখা দেখি। সতু সেন[৪] শচীন রায়ের 'মহানিশা' দেখতে যাবার নিমন্ত্রণ কল্লে।

আমি ও কৃষ্ণধন ট্রামে ফিরি।

১০ই মে, ১৯৩৩। ২৭শে বৈশাখ, ১৩৪০। বুধবার

আজ খুব ঘোরাঘুরি। সকালে দেখ্‌লুম দেবব্রত স্কুলে যাচ্ছে।

স্কুল থেকে এসে বঙ্গশ্রীর লেখা লিখি। একটু ঘুমিয়ে উঠে সোজা কয়লাঘাটে

১ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ।

২ মানীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩ তারিখে সামান্য ভুল আছে। ৮ই মে মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে ২১দিন ব্যাপী অনশন শুরু করেন। ঐদিন পুনা যারবেদা জেলের আমবাগানে উপাসনার পর তিনি অনশন শুরু করেন এবং ঐদিনই তিনি মুক্তি পান।

৪ চিত্র-পরিচালক।

E. B. আপিসে প্রভাত বাবুর[১] কাছে লেখা নিয়ে। সেখান থেকে B.N.R. এর আপিস হয়ে Imperial Libraryতে। বই নিয়ে ওখান থেকে বঙ্গশ্রী। সুনীতি বাবু এলেন। আমি ও কৃষ্ণবাবু বেরিয়ে গোল পুকুরে বসে আলু কাব্‌লি খেয়ে ট্রাম ধরে নীরোদ এর সঙ্গে। পথে ধরণীর সঙ্গে দেখা অনেক কাল পরে। তারপর নীরদের ওখান থেকে আস্‌চি [—] পথে প্রবোধ সান্ন্যালের সঙ্গে দেখা। নীরদ বল্লে কেদার বাবু বলেচেন বিভূতিবাবুর উপন্যাস পেলে আর কারুর চাই নে। তারপর ললিতের কাছে টাকার তাগাদা করে এই বাড়ী আস্‌চি। রাত ৯টা।

১১ই মে, ১৯৩৩। ২৮শে বৈশাখ, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

দুপুরে বঙ্গশ্রীর জন্যে লেখা লিখে একটু ঘুমুলাম। তারপর ট্রামে স্কুলে মাইনে নিতে। বসেই আছি। কেউ আসে না—তারপর এল সন্তোষবাবু। তারপর এল ঘোর ঝড়বৃষ্টি। ওখান থেকে ৩৷৹টার সময় বেরিয়ে ভবানীপুরে মনীষ গুপ্তের বাড়ীতে। গল্পগুজবের পর চা ও খাবার খেলুম। তারপর তার সঙ্গে কৃষ্ণকালী লেনের আমাদের সেই পুরোনো মাসীমার বাড়ীর উদ্দেশ্যে গেলুম। কোনো চিহ্নও নেই। 'যদুনাথ?' দেখ্‌লুম খ্যাঁদাদের। তারপর বঙ্গশ্রীতে আড্ডা দিয়ে এই বাড়ী আস্‌চি। আবার? বাড়ী ঘুরে এলুম।

১২ই মে, ১৯৩৩। ২৯শে বৈশাখ, ১৩৪০। শুক্রবার

সকালে দেবব্রতকে দেখ্‌লুম স্কুলে যাচ্চে। আমি স্কুল থেকে এসে আজ আর বেরোইনি। ননী এল দুপুরে। তার সঙ্গে গল্পগুজব কর্লুম। সন্ধ্যায় নিতাই[২] এল গাড়ী নিয়ে—পাথুরেঘাটায় সভা হোল। ননীও গেল। রাত দশটায় ওদের গাড়ীতেই আবার ফিরি।

আজ চাঁদ উঠেচে ভাঙা মেঘের মধ্যে দিয়ে [—] বাইরে সজল বাদলের (?) ঠাণ্ডা হাওয়া—বেশ লাগ্‌ল আজ। বাইরে গভীর রাতে বসে কত কথাই ভাবি। কত কথাই মনে উঠল।

আজ মনে আনন্দও খুব—কারণ কাল স্কুল বন্ধ হচ্চে।

১৩ই মে, ১৯৩৩। ৩০শে বৈশাখ, ১৩৪০। শনিবার

সকালে দেবব্রতদের দেখ্‌তে পেলুম। স্কুলে ছেলেরা খাওয়ালে। তারপর দুপুরে আশীস্ ও কৃষ্ণধন এল। তারপর গেলুম প্রবাসীতে টাকার জন্যে। ওখান

১ প্রভাত সান্যাল, প্রবাসীর অন্যতম সহকারী সম্পাদক।

২ ? নিতাই ঘটক, সংগীতশিল্পী।

থেকে ফিরে মৌচাকের গল্পের টাকার জন্যে।[১] তারপর একটু বাসায় বসেই আবার ট্রামে বঙ্গশ্রী। সেখানে ? —আমি ও সুশীলবাবু চিঠি দেখিয়ে গল্পগুজব করা গেল। ওখান থেকে সবাই মিলে বাসে থিয়েটার দেখ্‌তে। আমি আবার ঠিক সময়ে নাম্‌তে পারলুম না তাই নিয়ে ওরা হাসাহাসি করলে। শৈলজার সংবর্দ্ধনার দিন ছিল—সেও এল। আড্ডা (?) শেষ হওয়াতে ওরা সবাই বেরিয়ে গেল। সজনীও। রাম অধিকারী[২] এসে বল্লে প্রমথ চৌধুরী শৈলজা সংবর্দ্ধনা সভায় আমার বইএর কথা উল্লেখ করেচেন ও অনেক কথা বলেচেন। তারপর রাম অধিকারী সরবত খাওয়ালে ও আবার থিয়েটারে বসে রিজিয়া[৩] দেখ্‌লুম। শেষ দেখেছিলুম বনগাঁয়ে। অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরি।

জ্যোৎস্নায় বাইরে শুলুম।

১৪ই মে, ১৯৩৩। ৩১শে বৈশাখ, ১৩৪০। রবিবার

সকালে উঠে বেলঘরেতে গেলুম মেজমামার[৪] কাপড়চোপড় কিনে নিয়ে। বেলা ১২টার গাড়ীতে ফিরে সিগারেট্ ও তামাক কিনে বরিশাল এক্সপ্রেসে দেশে এলুম। পথে ভয়ানক মেঘ—খুব ঠাণ্ডা হাওয়া—চোখে কয়লা পড়ে বড় কষ্ট পেলুম।

বনগাঁয়ে নেমে বলুর ডাক্তারখানায় কয়লার গুঁড়ো বার করে নিয়ে গল্পগুজব কর্ত্তে রাত অনেক হয়ে গেল। আমি ও টক্ক নদীর ধারে গিয়ে বস্‌লুম।

১৫ই মে, ১৯৩৩। ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। সোমবার

আজ সকালে মোটরে চাল্‌কী গেলুম শশীবাবুর বাড়ীতে[৫]। ফিরে এসে স্কুলে গেলুম। Cleopetra [Cleopatra) বইখানা[৬] কতকাল পরে নিয়ে এলুম। বৈকালে বীরেশ্বর বাবুর[৭] বাসায় কতক্ষণ Spritualism আলোচনা করা গেল। হাট (?) করি।

১ এই বছরে শ্রাবণ মাসে 'অতিথি' নামে বিভূতিভূষণের একটি গল্প বেরয় (তালনবমী গ্রন্থে 'রাজপুত্র' নামে সংকলিত।) সম্ভবতঃ তারই টাকা।

২ ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী। বঙ্গশ্রীর আসরে ইনি নিয়মিত আসতেন।

৩ মনোমোহন রায়ের নাটক।

৪ শরৎকুমার চট্টোপাধ্যায় (মৃণালিনী দেবীর ভাই)।

৫ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, চালকীবাসী; বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের বাবা।

৬ Henry Rider Haggard-এর উপন্যাস।

৭ বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (বনগাঁ), আইনব্যবসায়ী।

১৬ই মে, ১৯৩৩। ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। মঙ্গলবার

সকালে উঠে বলুর ওখানে গল্পগুজব করা গেল। তারপরে দুপুরে ঘুমিয়ে উঠে বারাকপুরে গেলুম। আজ দিনটা বেশ সুন্দর। কুঠীর মাঠে বেড়াতে গেলুম—অপূর্ব্ব শোভা—গাঙের ওপারে কালবৈশাখীর মেঘ উঠ্‌চে—ঘন, নীলকৃষ্ণ মেঘসজ্জা—সে কি অপূর্ব্ব দেখতে যে হয়েচে। নদীর ধারের সেই সোঁদালিফুল[১] দোলানো মাঠটাতে গেলুম। হঠাৎ ঝড় উঠল—সেখান থেকে দৌড় দিয়ে সইমাদের[২] বাড়ি এসে হাজির। খুকুর সঙ্গে কাঠের ক্রুসের গল্পটা বল্লুম। তারপর এল ঝড়বৃষ্টি।

রাত ৮টার সময় ঝড়বৃষ্টি থামলো—নক্ষত্র উঠল। শিবুদের[৩] সঙ্গে যাত্রা শুনতে গেলাম। করুণা আমি একসঙ্গে বসে রাত তিনটে পর্য্যন্ত 'কুশধ্বজ' অভিনয় দেখলাম। তারপর আমরা বোর্ডিংএ গিয়ে শুলাম। পায়ে নতুন জুতোর ব্যথা বড় ভয়ানক। শেষরাত্রে সাজঘরের সামনে এসে দাঁড়ালুম। যে লোকটা বশিষ্ঠ সেজেছিল, সে ভাল অভিনেতা—কিন্তু সাজ খুললেই তার চেহারা ও মুখের বুলি অন্যরকম হয়ে গেল।

১৭ই মে, ১৯৩৩। ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। বুধবার

সকালে উঠে বোর্ডিংএ হাতমুখ ধুয়ে হেডমাস্টারের[৪] আপিসে একটু গল্পগুজব করে বাজারে এলুম। হরিবোলের[৫] দোকানে চা খেয়ে হাজারী সিংএর সঙ্গে অনেক পুরানো কথা বলা গেল। নন্দ সেকরা[৬] এসে ওর ছেলের কথা বল্লে। তারপর হেঁটে ছায়াভরা পথে বনগ্রাম এলুম। জলযোগ করে স্নান সেরে এলুম। দুপুরে একটু ঘুমুনো গেল। দুপুরের পর ভয়ানক বৃষ্টি। দালানে বসে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের বৃষ্টি বড় উপভোগ্য হোল। তারপর অনেক রাত পর্য্যন্ত বলুর ওখানে গল্প-গুজব করে রাত ১০টায় বাড়ী ফিরি।

১ বাঙলায় অপর নাম বাঁদরলাঠি। সংস্কৃতে সুবর্ণক, সম্পাক, রাজবৃক্ষ। Cassia Fistula Linn.।

২ কাদম্বিনী দেবী, বারাকপুরবাসিনী ; বিভূতিভূষণের মায়ের সই।

৩ শিবুরাণী দেবী, বারাকপুরবাসিনী।

৪ যতীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, হেডমাস্টার, বনগাঁ স্কুল।

৫ হরিবোল দাঁ, গোপালনগরবাসী।

৬ গোপালনগরবাসী।

১৮ই মে, ১৯৩৩। ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

আজ বনগাঁ স্কুলের ছুটীর দিন। ১৯১৩ সালের পরে আজ ২০ বৎসর পরে ছুটীর দিনটা স্কুলে গেলুম। ছেলেরা গলায় মালা পরিয়ে দিলে। বাজারে গেলুম। দিনটা ঠাণ্ডা।

বিকেলে একটু bored. বলুর ওখানে বসে সেই গল্প। এর চেয়ে বারাকপুর ভালো। সেখানে ennui নেই। বিকেলটা ও রাত্রটা কাটে খুব ভালো। রাত্রে ওপারে দেবেন[১] ও জিতেনের[২] বাসায় গেলুম। রাত্রে প্রফুল্ল[৩] এসে গল্প করলে। গোপালনগরে আজ যাত্রা হবে না।

রাত্রে গরম খুব।

পরে এই অংশটা লিখচি :—(ছুটী ফুরোবার দিন)

বনগাঁয়ে থাকবার সময় এই boredom আমি ছুটীতে এখানে থাকতে শেষের দিকে বড় বেশি অনুভব করেচি। বারাকপুরে একদণ্ড মন নিস্তেজ বা নিরানন্দ থাকে না সব সময় যেন কিসের একটা মোহে মন ডুবে থাকে—কিন্তু বনগাঁয়ে মন অবসাদগ্রস্থ (অবসাদগ্রস্ত) ও নিষ্প্রভ হয়ে প্রতিদিনের প্রতি-মুহূর্তগুলো বিষময় করে তোলে। ছুটীর প্রথমদিকে যা অনুভব করেছিলাম ছুটীর শেষের দিকে তা ভাল করেই বুঝেছিলাম। যারা পরামর্শ দিচ্চে বনগাঁয়ে বাড়ী কর্ত্তে তারা একথা বুঝবে না।

১৯শে মে, ১৯৩৩। ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। শুক্রবার

সকালে উঠে বন্ধু নাকি খুব মদ খেয়েচে। ওর ডাক্তার খানায় মহেন্দ্র[৪] এল তার সঙ্গে এলুম ওর দেশে যাবো। বাজার করে পড়াশুনা করি। বিকেলে এ [বাক্যটি অসমাপ্ত।]

১ ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বনগাঁবাসী।

২ জিতেন মোহন্ত, গোপালনগরবাসী / জিতেন দফাদার, গোপাল-নগরবাসী।

৩ প্রফুল্ল চট্টোপাধ্যায়, বারাকপুরবাসী। ইনি ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ চট্টো-পাধ্যায়ের কম্পাউণ্ডার ছিলেন।

৪ মহেন্দ্র ঘোষ, বনগাঁবাসী।

২০শে মে, ১৯৩৩। ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। শনিবার

এদিন Mr. Mognaschi[১] আবার এসেচে। বিকেলে দেখা কর্ত্তে গেলুম। রাত্রে গল্প গুজব হোল। সঙ্গে ইটালিয়ান কনসাল ও তার স্ত্রী। বিকেলে টরু ও আমি খয়রামারি বেড়াতে গেলুম। আমি ও টরু? পৈঠায় বসে অনেকরাত পর্য্যন্ত গল্প-গুজব করি।

২১শে মে, ১৯৩৩। ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। রবিবার

সকালে উঠে আমি ও ইটালিয়ান কন্‌সাল ও তার স্ত্রী এলাম বারাকপুরে। গিরিন দাদার বাড়ীতে[২] ফ[illegible] খাওয়া হোল। রাস্তায় কাদায় মোটর গেল আটকে। চড়কতলায়[৩] আমবাগানে কালো প্রভৃতি আম পাড়চে। ওখান থেকে তাকে নিয়ে গোঁসাই বাড়ীতে[৩] গেলুম। যে সব স্থানে ছেলেবেলাতেও কখনো যাইনি—যেমন গোঁসাইপুকুরের পাড়ে বসলুম। তারপর তাদের নিয়ে বনগাঁয়ে ফিরি বাদা বোষ্টমদের বাড়ীর পথে। তারপর আমি সাহেবদের সঙ্গে Lunch খেলুম। বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে বসে গল্প।

২২শে মে, ১৯৩৩। ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। সোমবার

সকালে উঠে বলুর মোটরের অপেক্ষায় থাকি। পরে গরুর গাড়ী করে বারাকপুরে। বড় সর্দ্দি হয়েচে। স্নান করে এসে বকুলতলায়[৩] বসলুম। থাকবার কষ্ট এবার বড় বেশি। বৈকালে খুব ঝড় বৃষ্টি। আম কুড়ুতে গেলুম সলতে খাগী[৪] তলায় ও বড় চারাতলায়[৪] একটা পাওয়া গেল। তারপর রাত্রে নদিদের[৫] দালানে শোয়া গেল।

১ ? রাশিয়ার ভাইস-কন্সাল। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এঁকে বনগাঁ আনেন কাঁচিকাটার খালে (বারাকপুর-গোপালনগরের পথে) যাতে মাছ চাষ করা যায় তারই পরামর্শের জন্যে। ইনি ছিলেন ননী চট্টোপাধ্যায়ের (বনগাঁ) বাড়িতে।

২ গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বারাকপুরবাসী ; ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাবা।

৩ বারাকপুর।

৪ বারাকপুর। পথের পাঁচালীতে ‘সলতেখাগীতলা’র উল্লেখ আছে। (দ্র. ১২শ পরিচ্ছেদ)।

৫ শান্তশীলা দেবী (ঠাকুমা), বারাকপুরবাসিনী।

রাত্রে আমি ও কালো, যাত্রা শোনবার জন্যে কাদা ঠেলে গোপালনগর যাচ্চি—মালপাড়া[১] থেকে ফিরে আসি। পাঁচুকাকা[২], ফনিকাকা[৩], মনো[৪] ওরা সব ফিরচে। বল্লে এ বৃষ্টিতে কখনো যাত্রা হয়?

২৩শে মে, ১৯৩৩। ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। মঙ্গলবার

সকালে উঠে গিরিনদাদার বাড়ী এসে গল্প করি। তারপর ওপাড়ার ঘাটে স্নান সেরে বকুলতলায় বসি। ছেলেমেয়েরা মালা গাঁথচে।...তবে আজ বড় মেঘ—একটু ঠাণ্ডা। একটু পরে খেয়ে ঘুমিয়ে উঠে আমরা সব তৈরি হচ্চি গোপানগরে যাত্রা শুনতে যাবার জন্যে। সন্ধ্যার সর্ব্বকদা ডাকতে পাঠিয়েছিল। গিয়ে চা খেয়ে এলুম। বৈকালে [বৈকাল] আজ সুন্দর—যাত্রা শুন্‌তে গেলুম।

২৪শে মে, ১৯৩৩।১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। বুধবার

আজ সকালে পাঠশালায় প্রথম (?) স্কুল করি। সবাই এল। সকালে খুব ঝড়বৃষ্টি এল। তারপর বিকেলে আমি ও টরু কাঁচিকাটার পুলে[৫] বেড়াতে গেলুম। অনেককাল পরে ঐ পথের সবুজ সৌন্দর্য্য আবার চোখে পড়ল। অনেক পরিবর্ত্তন হয়েচে যদিও। অশ্বিনীর[৬] সঙ্গে দেখা হোল। গঙ্গাচরণ[৭] দোকান করেচে—তার দোকানে আবার কচা করেচে ডাক্তার খানা। সেখানে একজন মুসলমান লোক বসেছিল—বাড়ী নোয়াখালি জেলা। লোকটা ভাল। ওদের সঙ্গে অনেক গল্প গুজব হোল। কথা হোল আমি ওদের রিহার্সেল দেখতে আসবো শনিবার। আমি ও গঙ্গাচরণ রাত্রে আলো ধরে ফিরি।

২৫শে মে, ১৯৩৩।১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

সকালে পাঠশালা। তারপর স্কুল সেরে বকুলতলায় বসে? Journal পড়ছিলুম। খুকু অনেকক্ষণ ছিল। তারপর গঙ্গাহরি[৮] এল। দুপুরের পর করুণা

---

১ বারাকপুর।

২ পঞ্চানন রায় (কালো পাঁচু) বারাকপুরবাসী।

৩ ফণি চক্রবর্ত্তী / ফণি রায়, বারাকপুরবাসী।

৪ মন্মথ (মনু) রায়, বারাকপুরবাসী; খোতনের (সন্তোষকুমার রায়) বাবা।

৫ বারাকপুর-গোপালনগরের পথে।

৬ অশ্বিনী রায়, বারাকপুরবাসী।

৭ গঙ্গাচরণ রায়, বারাকপুরবাসী।

৮ গঙ্গাহরি বন্দ্যোপাধ্যায়, বারাকপুরবাসী।

এল। তারপর আমরা গেলুম বাঁশবাগানের পেছনে আমতলায়। একটা অদ্ভুত ভাব মনে এল। এখানেই এটা আসে—এই বারাকপুর ছাড়া আর কোথাও নয়—একটা রহস্যের ভাব। বৃন্দাবনের ছেলের[১] সঙ্গে দেখা হোল হাটে। ফিরে খুকুর সঙ্গে বসে বসে রোয়াকে গল্প করি। অনেক রাত্রে আমি ও কালো আম কুড়ুতে গেলুম লণ্ঠন নিয়ে। শাঁখারী পুকুরের[২] ধার প্রভৃতি যে সব স্থানে জীবনে কখনো যাইনি সে সব স্থানও আজ গেলুম। কেমন করে ছিরে পুকুরের সঙ্গে আমার কলিকাতার বাল্যজীবনে, অর্থাৎ নন্দরাম সেনের গলির জীবনের সঙ্গে জড়িত হয়ে গিয়েচে।

২৬শে মে, ১৯৩৩।১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। শুক্রবার

আজ সকালে চালকী। দিদির[৩] বাড়ী চা খেলুম। তারপর ফিরে এসে কুঠীর মাঠ ও স্নান। বকুলতলায় বসে পড়া। দুপুরে পাঠশালা। বেলফুলের গন্ধ ভরপুর—এত সুবাস, যে বাতাস যেন ভারাক্রান্ত সর্ব্বস্থানে। বৈকালে হরিপদদা পাগ্‌লা জেলেকে[৪] খুব পিটিয়েছে—তা নিয়ে খুব গুল্‌তান হোল—কি দড়া চুরি না কি নিয়ে। বুড়ী পিসিমাদের উঠানে পাড়ার খুড়ীমা তা নিয়ে খুব গল্প কর্ল্লেন। বিকেলে আমি একা কুঠীর মাঠে বেড়াতে গিয়ে নদীর ধারে চুপ করে বসে রইলুম। এর সৌন্দর্য্য এত সুন্দর যে অভিভূত করে ফেলে।

২৭শে মে, ১৯৩৩। ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। শনিবার

সকালেও আজ কাল কার [কালকার] দড়া চুরি নিয়ে গোলমাল। একটু পরে হরিপদদা এল। তার সঙ্গে কাঁঠালতলায় বসে ভেড়া কেনার কথাবার্ত্তা হোল। দুপুরে ভাত খাওয়ার আগেই ঝড় উঠ্‌ল। আমি, কালো আম কুড়ুতে গেলাম। শ্যামাচরণদাদাদের গাছে আম পাওয়াও গেল। তারপর ভাত খেয়ে একটু শুয়েচি—গঙ্গাহরি এসে তাগাদা করচে—পাঠশালায় চলুন। একটু পরে উঠে গেলুম পাঠশালায়। মনোরমা[৫] বেশ মেয়েটি [—] লাজুক ও বুদ্ধিমতী।

১ শুকদেব/সুবল/গোপাল গোস্বামী, বারাকপুরবাসী।

২ বারাকপুর। পথের পাঁচালীতে এর উল্লেখ আছে। (দ্র. ১ম পরিচ্ছেদ)।

৩ চালকীতে ইনি ছিলেন বিভূতিভূষণের বোন জাহ্নবীর প্রতিবেশিনী। সেই সুবাদে বিভূতিভূষণ এঁকে দিদি বলতেন।

৪ নিতাই হালদার, বারাকপুরবাসী।

৫ মনোরমা হালদার।

পড়ার পরে কালো ও আমি লণ্ঠন নিয়ে গেলুম বেলেডাঙায়। পুলের ওপর কার সৌন্দর্য্য অদ্ভুত—চারিদিকে নতুন আউশ ধানের জাওলায় অতি অদ্ভুত সবুজ দেখ্‌তে হয়েচে। আমি একটু জমি নেবো ভাব্‌চি পুলের মুখে। তারপর রিহার্সেল শুন্‌লাম ওদের রিহার্সেল ঘরে বসে। কচা ও গঙ্গাচরণ কাছে বসে রইল। চা খাওয়ানো হোলো। অনেকরাত্রে বাড়ী এলুম আমি, কালো ও গঙ্গাচরণ।

২৮শে মে, ১৯৩৩। ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। রবিবার

আজ সকালে ওপাড়ার খুড়ীমার কাছে গ্রামের ইতিহাস কিছু কিছু সংগ্রহ করিলাম। 'বিলবিলে'[১] নামের ডোবার নাম কেন হোল এইটাই ছিল আমার জিজ্ঞাসার বিষয়। হিসাব করে দেখলাম উনি ইংরাজী ১৮৮২ সালে এ গ্রামে এসেচেন প্রথম নববধূরূপে। তখনও উনি শুনেচেন 'বিলবিলে' নামটা। সুতরাং ডোবাটা তারও আগের। উনি যখন আসেন তখন গ্রামের বৌ যুগলকাকার[২] মা, যতীশকাকার[৩] মা, সদু কাকার মা, ? কাকার মা ইত্যাদি এবং ওদের ছেলেরা গ্রামের উঠ্‌তি বয়সের তরুণ যুবক। এই মহাকালের গল্প বড় ভাল লাগে [—] আমায় মুগ্ধ করে। আবার এসে দেখ্‌চি চারিধারে জন মজুর, জেলে, নৌকাবাহক—ওদের মুখ আমি মনে রেখেচি যদিও বা বালকরূপে। কাউকে দেখলেই মনে হয় 'ও এ সেই—একে সেই ছোট্ট ছেলে দেখেছিলাম।' শুন্‌লাম হাজারি যুগীর সেই মেয়েটা আবার সেই ভিটেতে বাস করচে—ওর মায়ের মত মোটাসোটা—অবিকল দেখ্‌তে তেম্‌নি। আমি তো জানতাম ওদের ভিটে জনশূন্য হয়ে গিয়েচে—শুনে ভারী আনন্দ হোল।

আজ বিকেলে ছাদে বসেছিলুম। Life in the stars[৪]-খানা পড়ছিলুম। সত্যিই অপূর্ব্ব।

২৯শে মে, ১৯৩৩। ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। সোমবার

আমাদের গ্রামের লোকের মূঢ়তার সীমা নেই। চিন্তার স্বাধীনতা নেই একেবারে। নানা কৃত্রিম বিশ্বাসে চারিধার থেকে মন শৃঙ্খলিত। ছাদে সন্ধ্যায়

১ বারাকপুর।

২ যুগলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বারাকপুরবাসী ; খুকুর বাবা।

৩ যতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বারাকপুরবাসী।

৪ লেখক Sir Francis Younghusband ; ইংরেজ অভিযাত্রী।

পর বস্তে নেই, ফুল বাগানের চেয়ে কচু কুমড়ো পোঁতা ভালো—শতবার ধৌত না কর্লে পেতল কাঁসা শুদ্ধ হয় না—ইত্যাদি।

আজ বিকেলে আমি গেলুম বেলেডাঙায়। ছানা আনবার কথা ছিল কিন্তু ছানা পাওয়া গেল না। 'অবশ্য বিকেলে পাঠশালা হোল। কাঁচিকাটার পুলের ওপর থেকে কি অপূর্ব্ব দৃশ্যই হয়েচে!...কি মেঘের রং অদ্ভুত। আমার মনে হয় এই গ্রীষ্মকালে আমি যেখানেই যাই—বারাকপুরের মত স্থান আর দেখিনি—এখানকার এই অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আমার মনে যে আনন্দ দেয়—এমন আর কোথাও নয়। বাইরে গেলে হয়তো বা একথা ভুলে যাই—কিন্তু বছর অন্তর এখানে এলেই একথা মনে হয়।...

(কলকাতায় বসে এ অংশ লিখচি—তারিখ ৬ই আষাঢ়, ১৩৪০)

সত্যিই বারাকপুরের মত সুন্দর অজ পাড়াগাঁ আমি দেখিনি। বিশেষ করে আমার মন ওখানে এত চমৎকার থাকে! বেলেডাঙার জমিটা কিনে যদি বারাকপুর থাকতে পারি বড় ভাল হয়।

৩০শে মে, ১৯৩৩। ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। মঙ্গলবার

আজ সকালে স্নান সেরে ছাদে বসে খানিকটা পড়াশুনা করলুম। তারপর বকুলতলায় গিয়ে লিখ্চি—ওদের জামাই এল। একটু পরে নীল মেঘ করে বেজায় ঝড় উঠলো। ছুটে আম কুড়ুতে গেলুম—শ্যামাচরণ দাদার বউ[1] ওদের মিছ্রে তলায় আম কুড়ুচ্চে। আমি গেলুম সলতেখাগী তলায়—সঙ্গে ভেলি, কালো, পাগলা বুধো[2]। খুব ঠাণ্ডা পড়ে গেল। আজ আবার ষষ্ঠী। ফলার খাওয়া গেল। বিকেলে গেলুম বেলেডাঙায়—সেখানে অপূর্ব শোভা হয়েচে। ফিরবার পথে ইছামতীর ধারে এক জায়গায় বসলুম আমি, কালো ও রানুর[3] বর। মেঘের রং অপূর্ব। রাত্রে ফিরে গল্প গুজব করা গেল।

রাতে বেশ ঘুম হোল। এবার রাতে ঘুমুবার কোন কষ্ট হচ্ছে না—এত গরম স্বত্বেও। এবার বারাকপুরে কোন কষ্ট হয় নি। রাত্রে ঘুমুবার কোন ব্যাঘাত হয় নি। সবাই একসঙ্গে আমরা শুতাম—কালো, আমি, খুকু, নদি, রানু, পিসিমা। গল্পে গুজবে বেশ কাট্তো।

১ বীণাপাণি বন্দ্যোপাধ্যায়, বারাকপুরবাসিনী।

২ নবীনচরণ চট্টোপাধ্যায়, বারাকপুরবাসী।

৩ রানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বারাকপুরবাসিনী; খুকুর দিদি।

৩১শে মে, ১৯৩৩। ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। বুধবার

আজ সকালে প্রথমে কাঁটালতলায় বসে ফণিকাকার সঙ্গে গল্প করলুম—পুরোনো কথা। ১৩০৫ সালে রামচাঁদ তর্কালঙ্কার মারা যান। ১৩১০ সালে নবীন চক্রবর্ত্তীর চোখ কাটানো হয়। ১৩১৯ সালে নবীন মারা যান। ১৩১০ সালে জগদ্ধাত্রী পুজো হয় ওদের বাড়ী। এসব আমার জীবনের ইতিহাসের Landmark. কারণ বাল্যের এসব ঘটনা আমার আজও মনে আছে। সার্থক দাদাদের বাড়ী গিয়ে তারার বর দেখে এলুম—তারপর খুড়ীমাদের বাড়ী জলখাবার খাই। আজ বড় গরম। সকালে আমাদের ঘাটে নাইতে গিয়েও এই কথাই মনে পড়ল—আমাদের দেশের মত দেশ আর নেই। ইছামতীর জলে স্নান করেও সুখ—ওপারের দিকে চেয়ে ওই উলুখড়ের মাঠ—নদী, বাব্‌লা, শিমুল বন। বনগাঁয়ে ইছামতীর বাঁধাঘাটে স্নান করে দেখেচি—সেখানে কোনো আমোদই হয় না। অথচ এই ইছামতী তো সেখানেও—কেন এমন হয়?

১লা জুন, ১৯৩৩। ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

শেষ রাত থেকে অনেক বৃষ্টি। আমাদের বাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে ছেলেবেলার মত তোড়ে জল চল্‌চে। ভারী আনন্দ হোল দেখে শুনে। আমাদের ঘাট থেকে নীলমেঘের দৃশ্য কি অদ্ভুত! তারপর আমি কালো ও হরিমোহন[১] তিনজনে মাঠ ও জল ভেঙে কাটাখালির পুল পর্য্যন্ত বেড়াতে গেলুম। মরাগাঙে এক জায়গায় মাছ কেনা হোল। চারিধারের দৃশ্য সত্যই অদ্ভুত;······বাড়ী ফিরে ওপাড়ার ঘাটে স্নানের সময় আবার এপারে ঘাসে মোড়া চরভূমি ও শিমুলবন কি চমৎকারই দেখাচ্ছিল। শ্যামাচরণ দাদাদের বাড়ী নিমন্ত্রণ। এখানে এত খাই কিন্তু খুব খিদে হয়—কলকাতায় ভাল ক্ষুধা হয় না লক্ষ্য করেচি। বৈকালে আবার বেলেডাঙা। ফিরে সার্থক দাদার বাড়ী গান শুনে আস্‌চি। রাত্রে আমরা তাস খেল্লুম ও খুকুর গান শোনা গেল।

২রা জুন, ১৯৩৩। ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। শুক্রবার

সকালে উঠে নৌকায় বনগ্রাম। সঙ্গে জগ্‌তী[২] এল জিনিসপত্র নিয়ে। আমাদের বাড়ীর কাঠের বারকোসখানা যেন দেখ্‌লুম যুগলকাকাদের বাড়ী। মৃদুমন্দ বাতাস বইচে—নদীজলে ছলছলাৎ শব্দ হচ্চে—এবার খুব বৃষ্টি হয়েচে—

১ হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বারাকপুরবাসী।

২ ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গৃহভৃত্য।

দুধারের মাঠ নবতৃণে ঘনশ্যামল। বাস্তবিক এ অঞ্চলের দৃশ্য অপূর্ব্ব। তাছাড়া বিশেষ করে আমার মনে এ রকম ভাব আর কোথাও জাগায় না।

বিকেলে টরুদের ডাক্তারখানায় বসে গল্প কর্লুম। তারপর ডাকবাংলার কাছে বেড়াতে গেলুম। সুকুমার[1] এল। সন্ধ্যার দিকে ঘন মেঘ করে এল। খুব ঝড়বৃষ্টি। এখানে তো ইছামতী। কিন্তু এখানকার ইছামতী মনে সে ভাব জাগায় না। কেন কে জানে?

৩রা জুন, ১৯৩৩। ২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। শনিবার

সকালে মাছ খুব সস্তা। খাওয়া করে দিয়ে Cleopatra পড়তে লাগলুম। বাল্যে স্কুলে পড়েছিলুম সেই বইখানাই। কিন্তু এখানে দিন তেমন কাটে না। বারাকপুর থেকে একদিন এসেই কেমন একটু dull ও bored মনে হচ্চে। বিকেলে ওপারে ও পুলের ওপর বেড়ালুম। বিশ্বনাথ এসেচে। বিনয়দার[2] কাছে গিয়ে একটু গল্প করলুম। বেশ জ্যোৎস্না উঠেচে।

এক বারাকপুরের মত স্থান নয়তো কলকাতা—এর মাঝামাঝি জায়গা অর্থাৎ বনগাঁয়ের মত petty সহরগুলো অতীব dull. এখানে না আছে প্রকৃতি, না আছে মানুষ। এদের না আছে গভীর ও deep seated culture—না আছে পাড়াগাঁয়ের মানুষের queerness of character. এরা যেমন dull, তেমনই uninteresting। মহকুমার হাকিম এদের দেবতা।

এবার ন'দি বলতো—'চালাক (?) কচ্চে'—আমরা সবাই হাসতাম। ওঁর ভাসুর বলতো—স্যাকার কত্তি কত্তি এলাম পান্তয়া খেয়ে—

৪ঠা জুন, ১৯৩৩। ২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। রবিবার

আজ সকালে খয়রামারির মাঠে বেড়াতে গেলুম। ব্যায়াম করলুম—ইচ্ছামতীর ঘাটে হাতমুখ ধুলাম। তারপর আগের ঘাটে স্নান করে এলুম। আজ শরীরটা ঝরঝরে মনে হয়েচে। কিন্তু বনগাঁয়ে এসেই dull বোধ করি। সময় কাটতে চায় না। বিকেলে আমি ও টরু একটু বেরিয়ে খয়রামারির দিকে যাচ্ছিলুম—গেলেই হোত কিন্তু আবার স্কুলের ঘাটে এলাম। সেখানে সরোজ, মহেন্দ্র, জিতেশ, যতীশদা,[3] হরিবিলাস, বিশ্বনাথ—আমরা সব বসে একটা club করার কথা ঠিক করলুম।

---

১ সুকুমার মুখোপাধ্যায় (ফুচু), বারাকপুরবাসী।

২ ডাঃ বিনয় দত্ত, বনগাঁবাসী।

৩ যতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন শিক্ষক, বনগাঁ হাই স্কুল।

৫ই জুন, ১৯৩৩। ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। সোমবার

সকালে উঠে স্নান সেরে এলুম। ও লেখাপড়া করি। বৈকালে মাঠ বেড়াতে গেলুম ও আমি ও ভোলানাথবাবু হাট থেকে এলুম। তার পর দুজনে বসে ঘাসের ওপর গল্প করি। রাত্রে টুকুদের বাড়ী এসে অনেকক্ষণ গল্প করি। বেজায় গরম।

৬ই জুন, ১৯৩৩। ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। মঙ্গলবার

সকালে স্নান করে এলুম ও কিছু সামান্য লেখা গেল। বেজায় গরম কিছু ভাল লাগে না। বৈকালে মাঠে ভোলানাথবাবুদের সঙ্গে কিছু আড্ডা দেওয়া গেল। তারপরই হরিপদ দা ও ফণিকাকা [illegible] দারোগা সাহেবের সঙ্গে জল গেলাম। ডেপুটি বাবু দাঁড় টান্‌লেন। সরোজ ও আমি গল্প কর্ত্তে কর্ত্তে পুলের ঘাট থেকে এলুম।

৭ই জুন, ১৯৩৩। ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। বুধবার

এদিন সকালে উঠে স্নান সেরে গাঁড়াপোতার[১] পথে পাটশিমলায়[১] রওনা হলুম। পথে ভয়ানক রোদ—তৃষ্ণাও খুব পেয়েছে। একটা গাছে অনেক জাম পেকে আছে দেখে আমি ও আমার সঙ্গী দুজন লোক জাম পাড়তে লাগ্‌লুম। তারপর সেখান থেকে আর একটা জামগাছের তলায় গিয়ে আবার কিছু জাম খেলুম—দুটো আমও তারা দিলে। গোবরাপুরের মনীন্দ্র চাটুজ্যের পুকুরে জল পান করা গেল। বেশ পুকুরটী, বেশ ছায়া। তারপর মল্লদাসদের বাড়ী গেলুম, সেখানে কেউ নেই। পথে যাচ্চি, আবার সেই লোক দুজনের সঙ্গে দেখা। তাদের সঙ্গে গাঁড়াপোতার বাজারে গিয়ে কাপড়ের দর করচি, এমন সময় মোহিনী মুখুয্যে সেখানে এলেন। তিনি বল্লেন—চল আমার বাড়ী পাটসিম্‌লেতে। সেই দুপুরে রোদে হেঁটে গেলুম পাটশিম্‌লায়। যেমন জলতৃষ্ণা, তেমনি নতুন রবারের জুতো পরে পায়ে হয়েছে ফোস্কা। এঁদের সঙ্গে আমার শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্ক আছে, কাজেই এঁরা জামায়ের মত আদর করলেন। কেনো সেখানে ছিল—সেই পানিতরের পেটমোটা কেনো—আমার বিয়ের সময় এ ছিল দশ বারো বছরের ছেলে। অনেককাল পরে ওর সঙ্গে দেখা। বিকেলে গেলুম বাগান গাঁতে। পিসিমার[২] সঙ্গে দেখা অনেককাল পরে [—] তিনি বেঁচে আছেন। সন্ধ্যা হয়েচে, পিসিমা তখন জল নিয়ে নিকটের নদী থেকে ফিরচেন [—] আমায় দেখে প্রায় কেঁদে ফেল্লেন। সেদিন আবার বাগানগাঁয়ের হাট।

---

১ বনগাঁ।

২ রাখালী দেবী।

কেনো আমার সঙ্গে এসেছিল। সে পাটশিম্‌লেতে ফিরে গেল। আমায় পিসিমা ছাড়লেন না কিছুতে। রাত্রে লুচি খাওয়ালেন। কত পুরোনো দিনের গল্পগুজব হোল। রাত্রে পিসিমার ঘরের মধ্যে শুয়ে রইলুম। বীকেলে [বিকেলে] খুব বৃষ্টি হোল। পিসিমার ঘরে পুরোনো পুরোনো কতকালের গন্ধ—সেই ছেলেবেলার মত। ১৪ বছর পরে পিসিমার বাড়ী এলুম।[১]

৮ই জুন, ১৯৩৩। ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

পরদিন সকালে উঠে নদীতে এলুম। ভারী আরাম। দুধারে বাঁশঝাড়, উঁচু পোতা[২]—নদীটি বেঁকে গিয়েছে—সুন্দর নদীটি—কলকাতার কোনো কর্ম্মব্যস্ততা বা হাঙ্গামা এখানে নেই—আত্মা পরিপূর্ণ অবসরের মধ্যে সতেজ হয়ে উঠে। মনে হোল এই তো বেলা নটা, কলকাতায় এরি মধ্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেচি—এখনই স্নানাহার সেরে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। অপূর্ব্ব আনন্দ ও শান্তি। বিকেলে ঘোড়া নিয়ে এল বৈদ্যনাথ[৩] পাটশিমলে থেকে। তার সঙ্গে বেশ মাঠের মধ্যে দিয়ে ঘোড়া উড়িয়ে পাটশিম্‌লে পৌঁছুলাম সন্দের সময়। বেশ জ্যোৎস্না উঠেচে। তাস ও পাশা খেলা একটু হোল। তারপর শুয়ে পড়লুম। রাত্রে ঘুম হোল না। বেজায় মশা!

৯ই জুন, ১৯৩৩। ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। শুক্রবার

সকালে উঠে চা খাচ্চি, এমন সময় ভট্টাচার্য্য এসে হাজির। গোবরাপুরের মণীন্দ্র চাটুয্যে পাঠিয়েছেন, তাঁর তিনটি বয়স্থা মেয়ে আছে,দেখতে যেতে হবে। আহারটা সেরে আমরা চারজনে বেরুলুম। বেজায় রোদ, বটতলায় বসে একটু বিশ্রাম করে গাঁড়াপোতা এলুম। এখানে শ্যাম পোদ্দারের বাড়ীতে জলটল খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে নাপিত ডেকে দাড়ি কামালুম। তারপর মণীন্দ্র চাটুয্যের বাড়ীতে মেয়ে দেখে ও জলযোগ সেরে বেলা ৫·২৫ মিনিটে বেরিয়ে পড়লাম। আমার সঙ্গে ২।৩ জন লোক মড়িঘাট পর্য্যন্ত এলেন। ও রাস্তাটা অতি চমৎকার। মোল্লাহাটির মাঠ পর্য্যন্ত ও পথটা বাস্তবিক অতি সৌন্দর্য্যশীল। একদিকে বাঁওড়, একদিকে বাঁশঝোড় ভারী সুন্দর দেখতে। বিকেল হয়েচে, পাখী ডাকচে —Joy of life যেন সারা অঙ্গে অঙ্গে অনুভব করছিলুম। হাজরা ময়রা সে আসচে সাইকেলে মহেশপুর থেকে। দুজন একসঙ্গে খেয়াপার হলুম। খুব

১ কুশল পাহাড়ী গ্রন্থের 'বড় দিদিমা' গল্পে এই কাহিনীর ছাপ আছে

২ ভিত (plinth); এখানে নদীর পাড়।

৩ বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, গরীবপুরবাসী (বনগাঁ)।

হেঁটে সন্ধ্যার সময় বেলেডাঙায় গঙ্গাচরণের দোকানে এলুম। সেখানে বিশ্রাম করে জল খেয়ে দুজনে বারাকপুরে। কালোদের বাড়ী রাত্রে খেলুম। খুকু আমার গলা শুনেই বেরুতে যাচ্ছিল। শেষে বল্লে আমায় তো বিভূতি-দা ডাকে নি, আমি যাবো না।

১০ই জুন, ১৯৩৩। ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। শনিবার

সকালে উঠেই দেখি ভববন্ধুমামা এসেচে। কাঁটালতলায় আমি, ফণিমামা ও ভববন্ধু তিনজনে খুব আড্ডা। তারপর বাড়ী ফিরেও আড্ডা। পিসিমার বাড়ী খাই। দুপুরে কালো ও নদির সঙ্গে গল্পগুজব করি। দুপুরের পর আমাদের বাঁশবাগানের পথে আম কুড়ুতে দেখি—কত প্রাচীন খাবরা[১]। পুরোনো ধরণের মাটির ঘট একটা খানিকটা বার হয়ে আছে। তারপর বিকেলে তিনজনে নদীতে বেড়াতে গেলুম সধাইপুরের ঘাট পর্য্যন্ত। কি যে সুন্দর লাগছিল—তা বলবার কথা নয়। সত্যিই আমাদের গ্রামটা ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীগুলি প্রাকৃতিক সম্পদে অতুলনীয়। এ সম্ভব হয়েচে—কি জন্যে তাও আমি আবিষ্কার করেচি। অল্প জায়গার মধ্যে গাছপালার বৈচিত্র্য অনেক বেশী। বিশেষ করে কুঁচবন, সাঁইবাবলা, শিমুল, বাবলা, নলবন ও উলুখড়—সকলের ওপর বাঁশবন আমাদের দেশে নদীর ধারে অত্যন্ত ঘন সন্নিবিষ্ট। নদীর ধারের বাঁশবনের শোভা সত্যই অপরূপ। রাত্রে খুব গল্প ও আড্ডা। খুকুকে গল্প শোনালাম।

১১ই জুন, ১৯৩৩।২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। রবিবার

সকালে স্নান কর্ত্তে ওপাড়ার ঘাটে। সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে গেলুম। সকালে নিথর কালো নদীজলে, ওপারের উলুবনের দিকে চোখ রেখে, পাখীর গান শুনতে শুনতে স্নান কর্ত্তে যা আরাম ও শান্তি। তারপর সার্থক দাদার বাড়ীতে চা খেলুম। যতীশ কাকার সঙ্গে একটু গল্প করলুম। ফণিকাকা অনেক পুরোনো কথা বল্লে। কালোর ঠাকুরদাদার পুরানো ডায়েরীতে গ্রাম সম্বন্ধে ১২৯২—৯৫ সালের অনেক খবর পেলাম। দুপুরে রামপদ ও পুঁটিদিদি ও খুকু তিনজনে এল। খুব গল্প। বৈকালে হাটে গেলাম। ভাণ্ডার কোলায় নিমন্ত্রণ হবে শুনছিলাম—কিন্তু হোল না। হাট থেকে আসবার সময় দ্বারিঘাটার কাছে বিস্তৃত আকাশের সে যে কি বর্ণবৈচিত্র্য, মেঘস্তূপ রঞ্জিত অস্তদিগন্ত। তাড়াতাড়ি বাড়ী এসে কুঠীর মাঠে গেলুম। রাত্রে শ্যামাচরণ দা বল্লে—এগ্রাম

---

১ 'খাবরা' শব্দের অর্থ পোড়া মাটির খোলা বা টালি। শব্দটি এসেছে কর্পর/*খর্পর থেকে।

অনেক পুরানো। থাব্‌রা দেখে বোঝা যায়। পানা পুকুরে এখনও সান বাঁধানো আছে, কাদের বাড়ি ছিল। হরিপদদা বাড়ী তৈরী কর্ত্তে গিয়ে মাটী খুঁড়ে নক্সা করা সেকেলে ইটের [ইটের] গাঁথুনি ? হাত ভিত্‌ পেয়েছিল। এটা আশ্চর্য্য কথা। শাঁখারীপুকুরের ধারেও কোন্‌ পুরানো পাঁচীলের ইট কিনেছিলেন গিরিশ বাঁড়ুয্যে—সেও নক্সা কাটা ইট [—] বহু পুরাতন গ্রাম বটে। এ খবরটা খুব নতুন। রায়েরা এ গাঁয়ের আদি বাসিন্দা। ওদের ঘরের দৌহিত্র আনন্দ রায় ও ছুখিরাম রায়েরা। রায়েদের ঘরের দৌহিত্র বাঁড়ুয্যেরা। সুবর্ণপুরের ভবানী বাঁড়ুয্যে আনন্দ রায়ের ... পিসিকে বিবাহ করেন[১]। তাঁর ছেলে কার্ত্তিক বন্দ্যোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন কাকার পিতামহ। তাঁর পাঁচ ছেলে। তাঁরাই বাঁড়ুয্যেদের পূর্ব্বপুরুষ। রাত্রে অনেক ভূতের গল্প হোল।

১২ই জুন, ১৯৩৩।২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। সোমবার

তারপর আজ ভোরে উঠে আমি ও কালো বনগাঁয়ে এলুম। পথে কিশোরী যাচ্চে বাইকে ভাণ্ডারকোলা নিমন্ত্রণ খেতে। একটা খরগোস পালাতে পালাতে একটা ডোবার মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খেতে লাগল। আমরা ধর্ত্তে যেতেই পালিয়ে গেল। মুটু এসেচে। খোকা খুকীরা চাল্‌কী গিয়েচে আম খেতে। বারাকপুরে দেখে এলুম এখনও সব গাছেই আম আছে। আজ সকালে হাজরী কামারকে গুয়োথলী (?) তলাতে আম কুড়ুতে দেখেচি। বর্ষা নেই—মাটি শুকনো ও খট্‌খটে। কাদা নেই কোথাও। তবে সকালে ঘাসে শিশির পড়ে [।]

১৩ই জুন, ১৯৩৩।৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। মঙ্গলবার

বনগাঁয়ে এসে একটু bored মনে করচি। বৈকেলে কালো এল। বীরেশ্বর বাবু এসে অনেকক্ষণ গল্পগুজব কর্লেন। ভোলানাথবাবুকে পড়তে দিলুম আমার বইখানা। মুটু এসেচে। টরুর সঙ্গে অনেকরাত পর্য্যন্ত গল্প করা গেল।

১৪ই জুন, ১৯৩৩। ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। বুধবার

আজ সকালে উঠে বাজার করে এলুম। একটু পরে এল করুণা। তার সঙ্গে খানিকটা গল্প করার পর ৪টার গাড়ীতে গিয়ে উঠে তার সঙ্গে আকাইপুরে গেলাম। ভোলানাথবাবুও নেমেচেন। ইন্দ্রনারায়ণবাবু[২] স্টেশনে উঠে কোথায় যাচ্চেন। নওদার বিলে[৩] মাঠের ঘাসের উপর গিয়ে দুজনে বসলুম—কি সুন্দর

১ ইছামতীর সঙ্গে মিল লক্ষণীয়।

২ ইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, আকাইপুরবাসী (বনগাঁ)।

৩ আকাইপুর।

সূর্য্যাস্তের দৃশ্য দেখ্‌লুম যে বিলের পশ্চিম আকাশে!

করুণা খুব যত্ন করলে। বাইরের রোয়াকে ক্যাম্পখাট পাতলে—বিছানা করে দিলে। আম কাঁটাল সন্দেশ খাওয়ালে। করুণার মা এসে অনেক গল্প করলেন। করুণার এক ছোট্ট ভাইঝি আমার বড় বশ হয়ে পড়ল। দাসী পিসিমার শ্বশুর বাড়ী দেখ্‌লুম—একটা প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ী একেবারে জঙ্গল হয়ে আছে। রাত্রের আহার হোল গুরুতর গোছের।

১৫ই জুন, ১৯৩৩। ১লা আষাঢ়, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

সকালে উঠে আমার জন্যে করুণা চা [illegible]লুয়া নিয়ে এল। তারপর দুজনে বেরিয়ে সহায়হরি[1] ডাক্তারের বাড়ি গিয়ে বসলুম [—] বরদা চাটুয্যের ভিটে দেখলুম। সহায়হরিদের বাড়ির পাশেই। ওদের একছেলে আমাদের সঙ্গে এল। একটা গাছ থেকে সদ্যপ্রস্ফুটিতবড় চাল্‌তে ফুল একটা সংগ্রহ করে নওদার বিলের ধারে বটের ছায়ায় বস্‌লুম। করুণার সঙ্গে অনেক গল্প হোল। করুণাদের গাঁয়ে কি ভীষণ জঙ্গল! কিন্তু ভারী সুন্দর দেখতে—পথে বনের মধ্যে একস্থানে নীল অপরাজিতা ফুটে আছে—বড় সুন্দর দেখায়। নবগোপালদের বাড়ীও গেলুম। গোপাল নগরের পথে বৃষ্টি এল—এক স্থানে আশ্রয় নিলুম [।] তারপর স্টেশনে পা ধুয়ে [,] স্টেশনে জাম খেয়ে বাজারে এসে হরিবোলের (?) দোকানে বসলুম। পথে রামপদ নাম্‌তে বললে দারিঘাটা পুলের কাছে। আমি আর নাম্‌লুম না। কি সুন্দর আকাশ—গাছপালা—পথে ভারী আনন্দ পেলাম। কি চমৎকার অপরাহ্নটি [অপরাহ্ণটি]। পশুপতি বাবুর একখানা পত্র পেলুম গোপালনগরে। বনগাঁয়ে টুকু ও টবু কোথায় বেড়াতে বেরিয়েচে—ওদের ফিরিয়ে সঙ্গে নিলাম। পুলের ঘাটে মিতের[2] সঙ্গে সন্ধ্যার সময় খানিকটা গল্প করলুম। রাত্রে শরীর বড় খারাপ হোল। গা বমি বমি কর্ত্তে লাগল [—] এমন আমার কখনো হয় নি।

১৬ই জুন, ১৯৩৩। ২রা আষাঢ়, ১৩৪০। শুক্রবার

আজ সকালে উঠে ঘোর বৃষ্টি। আজ ২রা আষাঢ়। একটু পরে বাজার করে এলুম ও স্নান সারলুম। আজ ঘাটে তত ভিড় ছিল না।

১ সহায়হরি মুখোপাধ্যায়, আকাইপুরবাসী।

২ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বনগাঁবাসী। ইনি বিভূতিভূষণের স্কুলজীবনের সহপাঠী ছিলেন।

১৭ই জুন, ১৯৩৩। ৩রা আষাঢ়, ১৩৪০। শনিবার

সকালে মোটরে চালকী গেলুম ভজার[১] সঙ্গে। আমি দিদিদের বাড়ী চা খেলাম। এদিন বিকেলে টুকুর সঙ্গে বসে নানা গল্প করা গেল। অনেক রাত্রে নুটু চালকী থেকে খাট নিয়ে এল।

দুপুরে শুয়ে মনে হল এই তো গ্রীষ্মাবকাশ শেষ হয়ে গেল—এবার যেন বড় তাড়াতাড়ি কাটল। বারাকপুরের মায়ায় এবার আমি মজে ছিলুম। সে দিন ফণি কাকা ও গজন[২] গাড়ী করে বনগাঁয়ে এল—আমার মনে হোল একবার গেলে হোত। আজ সকালে ঘাটের যাত্রী নিয়ে মোটর বাস গেল বেলেডাঙায় না সুন্দরপুরে[৩], আমার মনে হোল—এক সঙ্গে গিয়ে একবার বারাকপুর ঘুরে এলে হোত। বনগাঁটা আমার অতি বিশ্রী লাগে—কিন্তু বারাকপুরের কথা আমি ভুলতে পারি নে—ওখানকার জীবন, সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবন। মনে হোল বারাকপুরের কাছে বিদায় নেওয়া হোল না এবার যাবার আগে—সেখানকার মাঠ বনের কাছে, ইচ্ছামতী নদীর কাছে, বাঁশ বাগান আমবাগানের কাছে, সেখানকার পাখী ফুল-ফল, গাছপালা, ফুটন্ত সোঁদালফুলের বন—এ সকলের কাছে।

১৮ই জুন, ১৯৩৩। ৪ঠা আষাঢ়, ১৩৪০। রবিবার

সকালে উঠে যাওয়ার আয়োজন করলুম। বঙ্কুদের বাড়ীতে চা খেলুম—বঙ্কুর বৌ সিঙাড়া নিয়ে এল। কল্যাণী[৪] আমার সঙ্গে যাবে। দুপুরের গাড়ীতে আমরা এলাম। পথে আম কাঁঠালের ব্যাপারীরা বেজায় ভিড় করলে। মেসে এসে দেখি লাইটের তার কেটে দিয়েচে। মৃজাপুরের এখানে এলেই মনটা নতুন হয়ে যায়—এতটা ফাঁকা জায়গায় একটা নতুন অনুভূতি হয়। কল্যাণীকে বলুর ওখানে নিয়ে গেলুম। সেখান থেকে তিনজনে Captain Symons এর বাড়ী গেলুম প্রিটোরিয়া স্ট্রীটে। Symons রাত্রে খাওয়ার জন্যে থেকে যেতে বললে। খুব গল্পগুজব হোল—Symons এর মেম বড় আমুদে লোক। ডিনারের পর অনেক রাত পর্য্যন্ত Symons সিনেমা দেখালে—তারপর রাত ১১॥০ টার সময় আমরা চলে এলুম। আমি রাত্রে বঙ্কুর মেসেই[৫] শুয়ে রৈলাম। কেন না জানিনে দোর খোলা পাবো কিনা অত রাত্রে।

১ ভজা মুচি, বারাকপুরবাসী।
২ হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, বারাকপুরবাসী।
৩ বনগাঁ।
৪ কল্যাণী মুখোপাধ্যায়, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে।
৫ বিভূতিভূষণের মেসের কাছেই ছিল। (দ্র. ২৪. ৬. ১৯৩৩)

১৯শে জুন, ১৯৩৩। ৫ই আষাঢ়, ১৩৪০। সোমবার

আজ সকালে উঠে চা খেয়ে মেসে এলুম। এসেই—বড় বড় চুল হয়েছিল, নাপিত ডেকে ছাট্‌লাম [ছাঁট্‌লাম]। কাল ট্রেনে ভাগলপুরে ১৯২৬ সালে কেনা বই 'Ghosts and Marvels'[১] এর 'Schalkain the Painter' গল্পটা পড়ছিলুম। সেই ভাগলপুবে যাবার সময় এই জুন মাসেই ৭ বছর আগে বইখানা কিনেছিলুম। কিন্তু দু তিনটী গল্প এখনও সম্পূর্ণ অপঠিত ছিল। মার বড় তোরঙ্গটার মধ্যে পড়েছিল চাল্‌সীতে—এবার নিয়ে এসেচি ও ট্রেনে গল্পটা পড়তে পড়তে এলুম।

বিকেলে বলুর মেসে ও বঙ্গশ্রীতে গিয়ে একটু আড্ডা দেওয়া গেল—সেখানে সুনীতিবাবু এলেন ও উচ্চারণ প্রণালীর বিচিত্রতা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করলেন। মনোজ ও অবনী রায়ও ওখানে।

২০শে জুন, ১৯৩৩। ৬ই আষাঢ়, ১৩৪০। মঙ্গলবার

আজ সকালে উঠে পশুপতি বাবুর ওখানে গেলুম। বেজায় বৃষ্টি সকাল বেলাটা। 'পরলোক তত্ত্ব' বইখানা নিয়ে এলুম ও Cathedral[২] বইখানা ফেরৎ নিয়েও আসি। বাসায় আস্‌তেই এল কৃষ্ণধনবাবু। অনেকক্ষণ গল্পগুজব করা গেল। 'পরলোক তত্ত্ব' বইখানা ভারী উপাদেয় ও সুখপাঠ্য। বৈকালে বঙ্গশ্রী আপিস। বারাকপুর যেমন ভাল লাগে—কল্‌কাতা কিন্তু তেমন ভাল লাগে না। কৃষ্ণধনের সঙ্গে ট্রামে বঙ্গশ্রী থেকে প্রত্যাবর্ত্তন। পরিমলবাবু ভাগলপুর থেকে এসেচে। আজ জ্ঞান রায় ও দেবীও[৩] এসেছিল। ওদের সঙ্গে মণীন্দ্রবাবুর মেয়ের সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হোল। ওরা সবাই ওদের বাড়ীতে সুপরিচিত।

২১শে জুন, ১৯৩৩। ৭ই আষাঢ়, ১৩৪০। বুধবার

সকালে উঠে বন্ধুর ওখানে গেলুম। 'পরলোক তত্ত্ব' বইখানা বন্ধুকে দিয়ে এলুম। বিকেলে গেলুম বঙ্গশ্রীতে। সেখান থেকে আমি, সজনী, নৃপেন চাটুয্যে সবাই মিলে মোহনবাগানের খেলা দেখতে গেলুম মাঠে। সেখানে বিভূতির সঙ্গে দেখা। খেলা শেষ হয়ে গেলে দেখি দেবব্রত Goal net এর কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তার সঙ্গে গল্প করে আবার বঙ্গশ্রীতে দৌড়ুতে দৌড়ুতে আসি। ভয়ানক

---

১ V. H. Collins সম্পাদিত; গল্পটির যথার্থ নাম 'Schalken, the Painter'। লেখক Joseph Sheridan।

২ Hugh Walpole-এর উপন্যাস।

৩ দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যিক।

বৃষ্টি আসচে। এখনও দেশের চমৎকার রেশ রয়েচে মনে। এসে নৃপেনের সঙ্গে ঘোর তর্ক বেধে গেল দান্তে, প্রকৃতি ও Sex নিয়ে। অনেক রাত্রে আবার বন্ধুর ওখানে গেলুম। অন্ধকার ঘরের সামনে বসে অনেকক্ষণ ভাব্লাম।

২২শে জুন, ১৯৩৩। ৮ই আষাঢ়, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

সকালে উঠে গেলুম নীরদের ওখানে। নীরদের ছেলেকে ওর স্ত্রী[1] নাইয়ে দিলে দেখ্লুম। অনেকক্ষণ গল্পগুজব করার পরে এলুম ডাঃ সুশীল দে'র বাড়ী। তিনি বাড়ী নেই। তারপর এলুম উপেন গাঙ্গুলীর বাড়ী। বেলা ১টা পর্য্যন্ত সেখানে গল্প করে বাড়ী এসে খেলুম। বাড়ী এসে একটু ঘুমুই। সন্ধ্যার সময়ে বন্ধুর বাসায় গিয়ে ওর খেঁদির সঙ্গে প্রণয়ের নিভৃত ইতিহাস শোনা গেল। অনেক রাত্রে চলে আসি।

২৩শে জুন, ১৯৩৩। ৯ই আষাঢ়, ১৩৪০। শুক্রবার

ভয়ানক বৃষ্টি। সকালে বন্ধুর ওখানে চা খেয়ে ওর খেঁদি ও নানা অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে গল্প। বেলা ১১টার সময়ে চলে আসি। দুপুরে সাংঘাতিক বর্ষা। ৪৷৷০ টার সময়ে এলেন পশুপতি বাবু ও তারপরে এল রাধাবাবু[2]। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গল্প-গুজব হোল। সারা রাত বর্ষা গেছে।

২৪শে জুন, ১৯৩৩। ১০ই আষাঢ়, ১৩৪০। শনিবার

এদিন সকালে বন্ধুর ওখানে গল্পগুজব করলুম। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে উঠে গেলুম আবার বন্ধুর ওখানে। বন্ধু সঙ্গে আছে—আমার বাসার কাছেই ওর হোটেলটা—ওর ওখানে যাওয়া যেন কেমন একটা নেশা হয়ে পড়েচে। অথচ অত আড্ডা দেওয়া! বৈকালে বেলুড়। ছাদের ওপর থেকে প্রমোদবাবু বল্লেন—বড় পেছল হয়েচে সাবধানে—। ··তারপর চা খেয়ে আড্ডা শুরু হোল। সারা রাত আড্ডা। যেমন ভোর হয়ে ফর্সা হয়ে গেল—তখনও আমি ও প্রমোদবাবু ভূতের গল্প করচি।

২৫শে জুন, ১৯৩৩।১১ই আষাঢ়, ১৩৪০। রবিবার

সকালে খুব বৃষ্টি। আমি ও প্রমোদবাবু কল্কাতায় এলুম। এসেই বন্ধুর বাসায় গেলুম—সেখানে চা খেয়ে স্নান করলুম। এসে বাসায় খুব ঘুম দেওয়া গেল—আবার এলুম বন্ধুর বাসায়। বন্ধুর বৌ এসেচে—তার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প হোল। আমি ছবিঘরে গিয়ে film দেখ্বার বন্দোবস্ত করে এলুম শান্তি পালের সঙ্গে।

১ অমিয়া চৌধুরী।

২ রাধারমণ বিশ্বাস / রাধারমণ মিত্র, সাহিত্যিক।

২৬শে জুন, ১৯৩৩।১২ই আষাঢ়, ১৩৪০। সোমবার

এদিন ভেবেছিলুম স্কুল খুল্‌বে। তা নয়—সকালে বিরাজবাবু এলেন—শান্তি এল—বল্লে, কাল খুল্‌বে। যদি এতদিন পর্যন্ত দেশে থাকতে পারতুম্!…এখানে এসে খুব ভাল লাগচে না। বঙ্গশ্রীর আড্ডা পুরনো হয়ে গেছে। সেখানে এলেন বৈকালে পশুপতিবাবু। সুশীল দেও ছিলেন—অনেকক্ষণ আড্ডা হোল। তারপর আমি হেঁটে বাড়ী এলাম। ছবিঘরে গিয়ে সব ঠিক করে রাখি। কিন্তু বন্ধুরা শুনলুম বেরিয়ে গেছে।

২৭শে জুন, ১৯৩৩।১৩ই আষাঢ়, ১৩৪০। মঙ্গলবার

স্কুল খুলেই ছুটী হোল। তারপর গেলুম বঙ্গশ্রীতে। একটুখানি থাকবো ভেবেছিলুম কিন্তু সেখানে হয়ে গেল বহুক্ষণ। বিকেল ৫টায় সেখান থেকে উঠে এলুম Hogg Market এ Wide World কিন্‌তে। সেখান থেকে বার হয়ে ট্রামে বাসায় এসে বই পড়লুম ও বিকেলে P. C. Sircar এর দোকানে গিয়ে বই ও শরদিন্দুবাবুর manuscript আনি।

মন আমার এখনও রয়েচে বারাকপুরে। এখনও ইছামতীর মাঠে মাঠে। মনে মনে ভাবচি—ঘন বর্ষা [ঘন-বর্ষা] শ্রাবণ ও প্রথম শরৎ-এ কতকাল বারাকপুরে থাকিনি—সেই যা childhood এর অভিজ্ঞতা [।] তার পরে—সে না জানি কত আনন্দদায়ক হবে!

২৮শে জুন, ১৯৩৩।১৪ই আষাঢ়, ১৩৪০। বুধবার

আজ স্কুলে গিয়ে খুব বৃষ্টি। তারপর ছুটীর পর পশুপতিবাবু এলেন—সেখান থেকে তাঁর মোটরে গেলুম অমৃতবাজার আপিসে মৃণালকান্তি বাবুর সঙ্গে[১] আলাপ কর্ত্তে [—] সুকুমারবাবুর[২] সঙ্গে সেখানেই দেখা। তারপর সেখান থেকে দুজনে পশুপতিবাবুর বাড়ী [।] একেবারে ওপরের ঘরে গিয়ে উঠলুম। পশুপতিবাবুর স্ত্রী[৩] সেলাই এর কলে কি একটা সেলাই করছিলেন—ব্যস্ত সমস্ত হয়ে উঠলেন। ভারী ভদ্রমহিলা।…মুড়ি ভাজার কথা উঠিয়ে খুব হাসাহাসি হোল। তারপর চা খাবার নিয়ে এলেন—আমরা দুজনে খুব খেলুম। Venus de

১ মৃণালকান্তি ঘোষ, শিশিরকুমার ঘোষের ভাইপো। ইনি অমৃতবাজার পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন।

২ সুকুমার সেন, অধ্যাপক।

৩ দুর্গা ভট্টাচার্য।

Melo-র একটা প্রতিকৃতি দেখ্‌লুম। পথে শিশিরকুমার Institute[১] এ এলুম। ছেলেরা গল্পগুজব করলে। ওখান থেকে নীরদের বাড়ী। সুনীতিবাবু ও রবীন হালদার[২] বেরিয়ে যাচ্চেন—নীরদের স্ত্রী এসে অনেকক্ষণ গল্প করলে ও খুব খাওয়ালে রাত্রে। বাসে করে চলে এলাম অনেক রাত্রে।

২৯শে জুন, ১৯৩৩। ১৫ই আষাঢ়, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

আজ সকালে পত্র পেলাম—মামুর[৩] বিয়ে আষাঢ় মাসে। সামনের বুধবারে। স্কুল থেকে বার হয়ে আসচি [—] দেবব্রত ও তার বাবা কোথায় যাচ্চে। ছেলেগুলো তাকে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল। আমি বাসে প্রবাসী আপিসে এলুম আমার উপন্যাস খানার[৪] সম্বন্ধে কথা বলবার জন্যে। এসে দেখি কেদারবাবু নেই, নীরদও নেই। ব্রজেনবাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে লাগলুম। কেদারবাবু এলেন ৫॥০ টাতে। তার সঙ্গে কথা সেরে ও সিগারেট খেয়ে আমি ও ব্রজেন দা গেলুম সাহিত্য পরিষদে। মাইকেলের স্মৃতি বাসর উপলক্ষে বেজায় ভীড়[৫]। ডাঃ পি. সি. রায় বসে আছে দেখলুম। নলিনী সরকার বল্লেন আপনাকে শনিবারে রেডিওতে বক্তৃতা দিতে হবে। আমি বাড়ী যাবো মামুর বিয়েতে সুতরাং হবে না। ওখান থেকে হেঁটে রমেশ কবিরাজের আড্ডায় এসে গল্প করলুম। তারপর বাড়ী। আওরঙ্গজেবের দৈনিক জীবন পড়ছিলুম প্রবাসী আপিসে বসে বসে[৬]।

১ বাগবাজার স্ট্রীট।

২ সাহিত্যিক; পাটনা বি. এন. কলেজের মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন। শনিবারের চিঠিতে নিয়মিত লিখতেন।

৩ উমাতারা বন্দ্যোপাধ্যায়, বারাকপুরবাসিনী।

৪ দৃষ্টি-প্রদীপ। প্রবাসীতে এই বছরেই ফাল্গুন মাস থেকে বেরতে শুরু করে।

৫ এইদিনই মধুসূদনের মৃত্যুদিবস।

৬ 'Aurangazibs Daily life', Jadunath Sarkar, Modern Review, October, 1908।

প্রবাসী ও Modern Review অফিস একই বাড়ী ৯১ নং সার্কুলার রোডে ছিল। বিভূতিভূষণ সেই কারণেই প্রবাসী অফিসে লেখাটি পড়ার সুযোগ পান।

৩০শে জুন, ১৯৩৩। ১৬ই আষাঢ়, ১৩৪০। শুক্রবার

আজ স্কুলে গেলুম—সেখান থেকে পরেশের সঙ্গে দেখা করে সোজা বেলুড়। মধ্যে একবার বঙ্গশ্রী আপিসে গেলুম। বেলুড়ে অনেক রাত পর্য্যন্ত গল্প গুজব ও আড্ডা হোল। আজকার দিনটি বড় মেঘলা বা বাদল। সকালে উঠে খুব Spiritualismএর বই পড়ছিলুম।

১লা জুলাই, ১৯৩৩। ১৭ই আষাঢ়, ১৩৪০। শনিবার

আজ সকালের ট্রেনে বনগাঁ যাবো ভেবেছিলুম কিন্তু দেরী হয়ে গেল। স্নানাহার সেরে বনগাঁতে গেলুম। টরুদের সঙ্গে কথা বল্লুম।

ওটা আগে লিখেছিলুম বটে কিন্তু বনগাঁ যাওয়া হয়নি[১]। সকালে উঠে স্নানাহার সেরে আমি ও নীরদবাবু মোটরে কল্‌কাতায় এলুম—ওঁরা বাসা বদলালেন[২]। বেলুড় বাগান বাড়ীর আজই শেষ দিন। ফ্ল্যাটে এসে এক পেয়ালা চা খেয়ে আমি Rasputin and the Empress[৩] দেখলুম Globeএ। তারপর বাসায় এসে সাবান মেখে স্নান করলুম। বৈকালটি স্নিগ্ধ মেঘলা। কত কথা যে মনে আসে! ব্রজ চাটুয্যের কথা মনে আসছিল। এই বর্ষা মেদুর সন্ধ্যায় অনেককাল আগে বর্ষাসিক্ত গাছপালার গন্ধ [পেতুম] ও আমি একটা নতুন শেখা গান গাইতুম—‘বানের জলে দেশ ভেসেচে’। কত দেশে কত লোক আছে—ব্রজ চক্কোত্তির [কথা] এত মনে হয় কেন?

ক’দিন ছুটি আছে। কাল বাড়ী যাবো। আনন্দ হচ্চে বারাকপুরেও যাবো—বেলেডাঙার পুলেও যাবো। নন্দকে খবর দিতে হবে Mr. Rishi এসেচেন এখানে। বীরেশ্বর বাবুকেও।

২রা জুলাই, ১৯৩৩। ১৮ই আষাঢ়, ১৩৪০। রবিবার

আজ সকালে উঠে বনগ্রাম। বলু এখানে আছে—সাহেবও এসেচে। সাহেবের বক্তৃতা হবে। টরুর সঙ্গে গল্প গুজব হোল। নেবেই মুটুর মুখে শুনলাম সাহেব এখনি যাচ্চে গোপালনগরে। জাহ্নবী এখানে নেই। তখনি আমরা

১ সম্ভবতঃ ২রা তিনি ১লা ও ২রা তারিখের ডায়েরি একসঙ্গে লেখেন। সেজন্তে গোড়াতে ভুল লিখে পরে শুধরে দিয়েছেন।

২ নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত বেলুড় থেকে বেণ্টিক স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে উঠে আসেন।

৩ Charles Mac Arthur-এর বই; Director ছিলেন Richard Boleslawski।

মোটরে গোপালনগর গেলুম। কাছারীতে খগেন মামা[1] এসেচেন—ওখান থেকে নৌকাতে আমি, নুটু, জিতেন, বঙ্কু বাওড় দিয়ে কাঁচিকাটার পুলে গেলুম। সেখানে কচুড়িপানা [কচুরিপানা] তোলা হোল। আমি কেবল বঙ্কুর বাড়ীতে এক কাপ চা খেয়েছিলুম। তারপর আবার নৌকা করে মর গাঙ বেয়ে কাটা-খালির পুলে গেলুম—জ্যোৎস্না উঠেচে—বড় সুন্দর দৃশ্য [।] কতকাল যে যাইনি এদিকে [—] বাল্যে সেই যা এদিকে আসতুম পুজোর সময় বাচ্ খেলতে। ওখান থেকে বারাকপুর এলুম। খুকু পিঁড়িতে আলপনা দিচ্চে[2]—আমি যেতেই বল্লে আজ থেকে আমার আল্পনা চাকুরী হোল। আমি পিঁড়িতে খানিকটা আলপনা দিয়ে দিলুম। তারপর আবার এলুম বেলেডাঙায়—সেখান থেকে নৌকাতে গোপালনগর। জিতেনের ওখানে আমি, সাহেব, নুটু ও বলু খাওয়া গেল। তারপর রাত্রে বনগাঁ এসে বলুর বৌকে ওপরে গিয়ে অনুযোগ করা গেল সেদিন কেন ওরা ছবিঘরে যায়নি।

৩রা জুলাই, ১৯৩৩। ১৯শে আষাঢ়, ১৩৪০। সোমবার

সকালে হাজারির মোটরে বারাকপুর এলুম। সবাই মিলে নদীতে স্নান কর্ত্তে গেলুম—আমি, কালো ও রামপদ। কচুরী পানার দাম বড় ভেসে ভেসে যাচ্চে। স্নান করে বড় তৃপ্তি হোল। তবে বর্ষায় আমাদের দেশে বড় কাদা হয়, মাঠে ভাঁটুই[3] হয়, বাঁশতলা অন্ধকার দেখায়—মশা তত অবশ্য পেলাম না। বরং গরমকালে এর চেয়ে মশা দেখেচি। ন' দিদিদের বাড়ীতে সাধারণ পাকশালা খোলা হয়েচে—বিয়ের কাজকর্ম্ম যারা করচে—সবাই এখানেই খাচ্চে। আমি, কালো ওখানেই খেলুম। কাঁটাল বেশ ভাল খাওয়া গেল—পায়েসটা আখের গুড়ের বলে সুবিধে হয় নি। দুপুরের পরে আমি ও কালো বিয়ের বাজার কর্ত্তে নৌকো করে বনগাঁয়ে রওনা হলুম। পথে ভয়ানক মেঘ করে বৃষ্টি এল—তার আগে ছিল গরম। কি অপরূপ নীলকৃষ্ণ ঘন মেঘরাশি চাল্তে পোতা বাঁকের দিক থেকে উড়ে এল। তারপর ঝমঝম বৃষ্টি ও হাওয়া। ছই নেই বলে ভিজ্‌তে লাগ্‌লুম। বনগাঁ হাটে কাদা হাবড়। অতি কষ্টে বাজার সেরে বঙ্কুর বাসায় চা খেলুম তারপর নৌকো করে অন্ধকার রাত্রে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে তিনঘণ্টার

১ খগেন মুখোপাধ্যায়, রানাঘাটবাসী ; মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথমা স্ত্রী হেমাঙ্গিনী দেবীর ভাই।

২ মানুর বিবাহ উপলক্ষে।

৩ চোরকাঁটা।

পরে বারাকপুর। The Great Silent Cape ওসব অনুভূতি ওদের হয়—ঠিক অবস্থায় না পড়লে ঠিক অনুভূতিটুকু হয় না—মেকি হয়। এসে নাড়ু খেয়ে গল্পগুজব করলুম। উমাচরণ মাঝি বল্লে ১৩০৩ সালের চৈত্র মাসে ওরা নৌকোর কারখানা করেছিল ঘাটের ধারের বাগানে—আমি তখন বাবার সঙ্গে সেখানে গিয়ে শ্লোক বলতুম ওদের কাছে। এই ধরনের ঝড়বৃষ্টির অভিজ্ঞতা না থাক্‌লে কখনো তার কথা লেখা যায় না, এইজন্যেই Galsworthy সেদিন সত্যিকার অভিজ্ঞতার মূল্য যে অনেক বেশী সেকথা বলেছেন।

৪ঠা জুলাই, ১৯৩৩। ২০শে আষাঢ়, ১৩৪০। মঙ্গলবার

আজ বিয়ে। সকাল থেকে খুব ঘাঁটুনি হোল—তেমনি বৃষ্টি। আমি ও নীলমণি—স্নান কর্ত্তে গেলুম। নীলমণি ন'দির ভাই অনেককাল পরে এসেচে। সামান্যই খেলুম। তারপর একটু শুয়ে নিলাম কালোদের বাড়ী। কামার বাড়ী বরাসন পাতা হোল। খুকুর সঙ্গে আজ সকালে বিছানা থেকে উঠেই ওদের বাড়ী দেখা হয়েছিল। খুড়ীমা বল্লেন খুকুর ওপর এমন স্নেহ তোমার যেন থাকে। আমি ও নীলমণি কামার বাড়ী বসে রইলুম। বর এল, কিন্তু বরযাত্রী এল না। বরও পছন্দ হোল না কারুর, তাই নিয়ে মহা ঘোট লক্ষণ হোল—নগেন খুড়ো[1] বল্লে [,] ও বর ফেরৎ দিয়ে মামুর সঙ্গে তোমায় সপ্তপাক ঘুরিয়ে দি। বরকর্ত্তা নিতান্ত গ্রাম্য ভদ্রলোক—তাকে দেখ্‌লে মায়া হয়। আমি অবশ্য তাঁর দিকে চেয়েও অস্বীকার করলুম। খুড়ো[2] কেঁদে ফেল্লে [;] এ বরে কেন মেয়ে দেবো বলে [,] পিসিমাও কাঁদ্‌লেন। শেষে বিয়ে হয়ে গেল। আমি ও গঙ্গাচরণ তাস খেলা করে এসে লুচিভাজার বন্দোবস্ত করলুম। সবাই বলে বিভূতি কি ব্যবস্থা করবে করো। সারারাত পরিবেশন করলুম এক্‌া এক হাতে। বরের দুটি ভাই আমার বড় অনুগত হোল। খুকু বাসরে ঘুমিয়ে পড়েচে। অনেকরাত্রে আমি, গজা, গঙ্গাচরণ খেলুম।

৫ই জুলাই, ১৯৩৩। ২১শে আষাঢ়, ১৩৪০। বুধবার

ভোরে ? এসে আমায় ঘুম থেকে ওঠালে—খুড়ো ওঠো ওঠো—ওদের রওনা করার কি ব্যবস্থা করবে করো। আমি উঠ্‌লুম। সকাল থেকে বেজায় বাদ্‌লা সুরু হোল। আমি কামারদের দালানে গিয়ে দেখি বরযাত্রীরা বসে আছে।

১ নগেন মুখোপাধ্যায় (খোকা খুড়ো), বারাকপুরবাসী।

২ পরেশ মুখোপাধ্যায়, বারাকপুরবাসী।

ওদের ছেলেটা বল্লে—তোমাদের দেশ ভাল না—সুখ্যাতি করলে না, যত্ন করলে না কেউ। টাকার গোলমালটা মিটানো গেল। সামান্য ৬৷৮৲ টাকার জন্যে বৃদ্ধ বরকর্ত্তা কি পীড়াপীড়িই না কর্ল্লে! কিন্তু সে অত্যন্ত গরীব বলে। আমার বড় কষ্ট হোল—এই সামান্য টাকা এর কাছে কত টাকা! সেদিন বাদ্‌লার জলে স্নান করে আসবার সময় পথে বৃষ্টির জলের স্রোতের সঙ্গে কত সরু সরু সাপের (?) মত জীব দেখেছিলুম—ঠিক যেন শুটীসূতার মত। তারপর খেয়ে দেয়ে ওদের সঙ্গে গাড়ীতে বনগাঁয়ে এলুম। বাসার চাবি বন্ধ। নুটু বন্ধুদের বাড়ী—বন্ধুরা কল্‌কাতায় রওনা হচ্চে। আমি আবার বেজায় আছাড় খেয়ে চোট পেলুম। তারপর আমি ও নুটু গাড়ী করে স্টেশনে এলুম। নুটু ৪টার গাড়ীতে গেল মামার বাড়ী। আমি এলুম ৫টার গাড়ীতে কল্‌কাতা। মেঘান্ধকার বিকেল, ভাবতে ভাবতে এলুম [—] আজ বারাকপুর থেকে এলেই হোত। বর্ষাকালে বনগাঁ থেকে বাড়ী গেলে একরকম গন্ধ পেতুম—এবার তা পেয়েচি।

৬ই জুলাই, ১৯৩৩। ২২শে আষাঢ়, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

সকালে বড় ঘুম পাচ্ছিল। একটু চোখ বুজে ঘুমিয়ে নিলুম। সকালে এলেন প্রমোদবাবু, কানাই[১] ও কালীর[২] মামাশ্বশুর। বিকেলে ঘুমিয়ে উঠে দেখি বেলা ৪টা। ট্রামে (?) নীরদবাবুর flatএ গিয়ে চা খেলুম—গল্পগুজব করলুম। তারপর সবাই মিলে রূপবাণীতে Sign of the Cross[৩] দেখতে গেলুম। আজ খুব জ্যোৎস্না উঠেচে—আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাত্রি। অনেকরাত্রে বায়োস্কোপ দেখে এসে বাইরে জ্যোৎস্নার আলোতে শুয়ে—শীগ্‌গিরই ঘুমিয়ে পড়লুম।

আজ মনে হচ্চে ইউনিভার্সিটি কবে খুলবে? বাস্তবিকই আজ মনটা অন্যরকম।

সকালে 'ল্যাংড়া আম' হাঁকচে। 'ল্যাংড়া আ—আম'—কত পরিচিত এই ডাকটা। এই মৃজাপুর স্ট্রীটে দশ বারো বৎসর ধরে ওই ডাক শুনচি—প্রতি বৎসরই নূতন মনে হয়।

১ কানাই সাহা, সাহিত্যিক।

২ কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বারাকপুরবাসী।

৩ Wilson Barrett-এর বই ; Cecil B. de Mille বইটির Director ছিলেন।

৭ই জুলাই, ১৯৩৩। ২৩শে আষাঢ়, ১৩৪০। শুক্রবার

সকালে পি. সি. সরকার এসে বইএর সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা? বললেন[১]। বিকেলে স্কুলের পর আমি বঙ্গশ্রীতে গেলুম। সেখান থেকে পশুপতিবাবুর সঙ্গে আমরা Rishiর কাছে গেলুম। সেখানে ৫-৩০ টার সুময় সময় নির্দ্ধারিত করে আমরা গেলুম। সেখান থেকে মোটরে বেলেঘাটা, মুকুন্দবাবু ও তাঁর পুত্রবধূর কাছে। অনেকরাত্রে বাড়ী এলুম।

৮ই জুলাই, ১৯৩৩। ২৪শে আষাঢ়, ১৩৪০। শনিবার

আজ স্কুলের ছুটীর পরে বঙ্গশ্রী আপিসে অনেকক্ষণ আড্ডা দিলুম তারপর সেখানে সুধীনবাবু[২] এল তার বাড়ী কাল যাবার নেমন্তন্ন কর্ত্তে। ওখানে রাম অধিকারী খুব পান্তুয়া খাওয়ালে। তারপর পশুপতিবাবু গাড়ী পাঠালেন। আমি, নৃপেন, সজনী, জ্ঞান রায়, কিরণ সবাই পশুপতিবাবুর হাসপাতালে গেলুম। সেখান অণুবীক্ষণ যন্ত্রে সর্ব্বপ্রথমে জ্বরের জীবাণু দেখলুম। সর্ব্বপ্রথম জীবনে X-Ray যন্ত্র দিয়ে সজনী ও দেবীর বুকের পাঁজরা দেখলুম। তারপর চা ও খাবার খেয়ে ওখান থেকে Rishiর কাছে গেলুম। সেখানে circle[৩] হোল। এও এক নতুন অভিজ্ঞতা। মণি,[৪] রবি, ওদের আত্মা এসে আমার ও সজনীর হাতে লিখলে। বাবা বল্লেন তিনি পথের পাঁচালী দেখেচেন। সবশুদ্ধ মিলে আজ একটা অদ্ভুত দিন জীবনে। বাবা বল্লেন আমার বিয়েতে তাঁর মত নেই। গৌরী বল্লেন তার মত আছে।

৯ই জুলাই, ১৯৩৩। ২৫শে আষাঢ়, ১৩৪০। রবিবার

কাল Circle ব্যাপারটার ঘোর আজও ভাল কাটে নি। সকালে কানাই ও নিরঞ্জন সাহা এল, তারপর খাওয়ার পর সন্তোষবাবু। ঘুম থেকে ওঠার পর ছুটোর সময় এল অমিয়। শ্রীরামপুরে আর একদিন যেতে হবে সেকথা বলে গেল। আমি মুখহাত ধুয়ে ট্রামে নীরদবাবুর flatএ গিয়ে কালকার ঘটনা

---

১ যাত্রাবদল গল্প-সংকলন এখান থেকে বেরয়। প্রকাশকাল ৩০শে নভেম্বর, ১৯৩৪।

২ সুধীন্দ্রলাল রায়, পক্ষিতত্ত্ববিৎ।

৩ প্ল্যানচেটের কথা বলেছেন।

৪ সরস্বতী, বিভূতিভূষণের বোন। ইনি অল্পদিন মাত্র জীবিত ছিলেন। শোনা যায়, পথের পাঁচালীর দুর্গা চরিত্রের পরিকল্পনায় এঁরও প্রভাব আছে।

বিবৃত করলুম ও চা খেলুম। সেখান থেকে বেরিয়ে বঙ্গশ্রী। জ্ঞান রায়ের গাড়ীতে আমরা অতুল বোস আর্টিস্টের বাড়ীতে সান্ধ্য সম্মিলন [সম্মিলনে] গেলুম। সেখানে ডাঃ হরেন রায়[1] চমৎকার কৌতুক দেখালেন। তারপর সুধীন বাবুদের ওখানে মেয়ে দেখতে যাওয়া গেল। প্রথমে খুব ভোজন হোল—ভূরি ভোজন বলা যেতে পারে। তবে খাওয়ার ব্যাপারটা আগেই অতুল বোসের বাড়ী হয়নি। আমি, দেবী, নৃপেন, সজনী খানিকটা বাসে খানিকটা মোটরে[—] বাসায় এলুম রাত ১১টায়। খুব জ্যোৎস্না—কদিন বৃষ্টি হয়নি—খুব গরমও বটে। বাইরে শুয়ে নটরাজ[2] গানটা গাইতে লাগলুম অনেক রাত পর্য্যন্ত। ঘুম আর আসে না। আজ পর্য্যন্ত হৈ হৈ কাটল—কাল থেকে শান্ত ও সমাহিত চিত্তে কাজ আরম্ভ কর্ত্তে হবে।

১০ই জুলাই, ১৯৩০। ২৬শে আষাঢ়, ১৩৪০। সোমবার[3]

সকালে রাধারমণ এল। চা খাওয়ালুম, অনেকক্ষণ রৈল। স্কুলে Spirit's Book খানা নিয়ে গেলুম পড়াতে। সেখান থেকে বঙ্গশ্রীতে। আজ আমার উত্তর পাওয়ার জন্যে জ্ঞান রায়, দেবী সব এসে জুটেচে। সজনীর ঘরে মাদুর পেতে বসে চা খেতে খেতে সিগারেট খেতে আমরা মেয়ের সম্বন্ধে আলোচনা কল্লুম। ওরা আবার চেষ্টা কল্লে মত দেওয়ার জন্যে—কিন্তু আমি খুব দুঃখের সঙ্গেই প্রত্যাখ্যান কল্লুম। দেবীর সঙ্গে Spiritualism নিয়ে খুব তর্ক। ওখানে এক হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের সঙ্গে সজনী আলাপ করিয়ে দিলেন—তিনি আমার বই হিন্দীতে অনুবাদ করার কথা বল্লেন। পশুপতিবাবুও এলেন। অনেকক্ষণ ধরে খুব আড্ডা হোল। রাত্রে আমি College Sq. দিয়ে হেঁটে গোলদিঘী একটু বেরিয়ে বাসায় ফিরলুম। ওবেলা খাইনি। এসে দেখি ঠাকুর পালিয়েচে, রান্না সবে চড়েচে। টক এসে ওর জিনিসপত্র নিয়ে গিয়েচে[4], একখানা চিঠি লিখে

১ বিখ্যাত ইম্প্রেসারিও।

২ প্রলয়নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে,
হে নটরাজ, জটার বাঁধন পড়ল খুলে।

৩ তারিখের ওপরে লেখা, 'স্কুলে ফণিবাবুকে আজিমগঞ্জের চাকরিটার কথা বল্লুম। ভাবলুম ওর জন্যে চেষ্টা করবো।'

৪ ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই সময়ে শ্যামবাজারে বলরাম ঘোষ স্ট্রীটে বাসা করেন। উদ্দেশ্য কলকাতায় প্র্যাকটিস করা। টক (সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়) সে সময় মেসে না থেকে বাবার কাছেই পড়াশুনো করতেন।

রেখে গেছে। হাওড়ার ছেলেরা এল 'ভাবীকাল' এর জন্যে লেখা নিতে।

তারপর এলেন দক্ষিণাবাবু। তিনি টাকা চান—আমি দিতে পারলুম না, হাতে নেই। তিনি আবার মেসে থাকতে চান। তারিণী বাবুর কথা উঠল। বৃষ্টি হোল এক পসলা ঝম্‌ঝম্ করে। জ্যোৎস্না[১] পাশ করেচে।

১১ই জুলাই, ১৯৩৩। ২৭শে আষাঢ়, ১৩৪০। মঙ্গলবার

সকাল এমনি কাটল—বৈকালে বঙ্গশ্রী। সজনী আমি—circle করে বসলুম কিন্তু এত বাধা হতে লাগল যে circle এর বড় ব্যাঘাত হতে লাগল। সন্ধ্যের পর চলে এলুম। বারান্দায় চেয়ার পেতে অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করলুম—এই চিন্তাটা অত্যন্ত দরকার—চিন্তা না কল্লে লেখা ফুটবে কোথা থেকে?

চিন্তার আনন্দ অনেকদিন পরে পেলুম। একেবারে আনন্দের ও অনুভূতির কোন্ সমুদ্রে যেন ডুবে গেলুম। ক্রমে রাত্রি গভীর হোল, ভাঙা চাঁদ উঠল, বারান্দা জ্যোৎস্নায় ভরে গেল—খুব হাওয়া আছে, মাদুর পেতে বারান্দায় শুয়ে পড়লুম। বৃষ্টি হয়নি অনেকদিন [—] বড় গরম।

১২ই জুলাই, ১৯৩৩। ২৮শে আষাঢ়, ১৩৪০। বুধবার

সকালে আশীস্ গুপ্ত এসেছিল—তার সঙ্গে স্কুলে গেলুম। স্কুলের পর বঙ্গশ্রী—সেখানে সুনীতিবাবু এলেন। Spiritualism নিয়ে তর্ক হোল—তারপর আমি আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভা কর্ত্তে গেলুম,[২] তাতেও ঘোর তর্ক উপস্থিত হোল। রাত প্রায় ন'টার সময় আমি ও পরিমল হেঁটে বাড়ী চলে এলুম।

১৩ই জুলাই, ১৯৩৩। ২৯শে আষাঢ়, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার জন্যে স্কুলে গিয়ে ছেলেদের তৈরী করলুম। সকালে হাওড়া থেকে ছেলেরা এসে বল্লে লেখা দিতে হবে। বঙ্গশ্রী আপিসে শৈলজার সঙ্গে বহুকাল পরে দেখা—সে সোমেশবাবুর[৩] অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত কথা বল্লে। সুনীতি বাবুও এসেছিলেন। আজ কাল জীবনের অনেক কথা বুঝতে পারচি। সাহিত্যক্ষেত্রে পরস্পর যে হিংসা, দ্বেষ, সংকীর্ণতা দেখতে পাই আজকাল, ওতে আমার মন আর সায় দিচ্চে না। এক্ষেত্রে ক্রমেই কলকাতাতেই অতি বিষময় শস্যের বীজ উপ্ত হচ্চে—আমি ভাবচি দেশে চলে যাবো। দেশ থেকে আমি দেশের যা সেবা করতে পারবো এমন আর কোথাও নয়। পরিশ্রম,

১ জ্যোৎস্না ভট্টাচার্য, পশুপতি ভট্টাচার্যের পুত্রবধূ।

২ হাওড়া।

৩ সোমেশচন্দ্র বসু, গণিতজ্ঞ।

সেবা সব দিক থেকে। এখানকার এ সৌখীন জীবন যাপন করে পরস্পরকে হিংসা দ্বেষ করে কি হবে ?

রাত্রে আজ শীতলের বিয়ে হোল। আমরা সবাই হাওড়ায় বরযাত্র গেলুম। বাসে ও খেয়ে চলে এলুম।

১৪ই জুলাই, ১৯৩৩। ৩০শে আষাঢ়, ১৩৪০। শুক্রবার

স্কুলের আগে শ্যামাপদ বাবুর[১] ভাগনে এসে শ্যামাপদ বাবুর অদ্ভুত জীবন বল্লেন। সত্যিই ভদ্রলোক প্রথম বয়সে বড় দুঃসহ জীবন কাটিয়েচেন। স্কুলে কিরণ বাবু লিখে পাঠালেন পশুপতি বাবু ফোন করেচেন। আমি স্কুলের পর বঙ্গশ্রী গেলুম [—] সেখান থেকে পশুপতি বাবুর সঙ্গে এলাম সার্পেনটাইন লেনে দেবেন মল্লিক এ্যাড্‌ভোকেটের বাড়ী। সেখানে এক বালক নাকি মিডিয়াম। পরীক্ষা করে দেখে আদৌ সন্তুষ্ট হলাম না। আজ স্কুলে যাবার সময় এক ছোট ছেলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল মৃণাল সর্ব্বাধিকারীর বাড়ীর সামনে জেলেপাড়ার গলিতে। বেশ সুন্দর ছোট ছেলেটি—আজ এবেলা মল্লিকদের বাড়ী ডলি বলে একটি ৪ বছরের মেয়ের সঙ্গে আলাপ হোল—কি সুন্দর মেয়েটি। বল্লে—আমার নাম কমলা, ডলি বলে ডাকে। কেমন চমৎকার হাসে।

আবার কাল ওদের বাড়ী যাবো।

আজ সারাদিন বৃষ্টি।

১৫ই জুলাই, ১৯৩৩। ৩১শে আষাঢ়, ১৩৪০। শনিবার[২]

আজ বেজায় engagement এর ভীড়। কাল থেকে ভাবচি—আজ সকালে উঠে দাড়ি কামালুম তারপর স্নান সেরেই ভাত ও ডাল, মাছভাজা খেয়েই বার হলুম। তারপর স্কুলে যাবার পথে প্রেমরঞ্জন বাবুর বাড়ী গেলুম। spiritualism সম্বন্ধে আলোচনা করলুম। প্রসাদের[৩] যে বোনের গানের খাতা থেকে গান টুকে নিয়েছিলুম সেই বোনটীর সঙ্গে এখানে দেখা হোল—নাম মিনতি—বেশ মেয়েটি। তারপর স্কুলে গিয়েই ছেলেদের নিয়ে গেলুম শোভাবাজারে এরিয়ান স্কুলে। সেখান কার বৃদ্ধ হেডমাস্টার অনেক অদ্ভুত কথা বললে। খুব বৃষ্টি এল। ছুটার সময় সেখান থেকে বেরিয়ে ট্রামে এসে এ্যাসপ্লেনেড নামলুম ও বঙ্গশ্রী

---

১ শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী, অধ্যাপক।

২ তারিখের ওপরে লেখা, '12, Camac St. Fero-concrete Engineer.'।

৩ প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণের প্রথমা স্ত্রী গৌরীর ভাই।

অপিসে হেঁটে এলুম। নৃপেন বসে আছে। তখনি পশুপতি বাবু এলেন—তাঁরই সঙ্গে গাড়ীতে দেবেন মল্লিকের বাড়ী। ডলির সঙ্গে আজ আবার দেখা। ডলি যে কি সুন্দর মেয়ে! কেমন যে হাস্‌লে আমরা যখন তার ভাইকে নিয়ে মোটরে চড়লুম। সেখান থেকে সুপ্রভাদের হোস্টেলের পাশ কাটিয়ে এলুম সরোজবাবুর বাড়ী। সেখান থেকে পশুপতি বাবুর বাড়া গিয়ে চা খেলুম। পশুপতি বাবুর মেয়েটি[১] বড় লক্ষ্মী—চা নিয়ে এল। ওখান থেকে তাঁর গাড়ীতে বিভূতিদের বাড়ী। এখানে এক বুড়ো সাহেব ও তার মেয়ের সঙ্গে আলাপ হোল। মেয়েটির স্বামী নাকি একজন রুশীয় কাউন্ট্। লুচি খেলে খুব [—] আমার সঙ্গে মেয়েটীর খুব আলাপ হোল [-] ঠিকানা দিয়ে গেল 12, Camac St. [—] মেয়েটি সুন্দরী। একজন ভালো আর্টিস্ট।···অনেকরাত্রে বৃষ্টির মধ্য দিয়ে বাসে মেসে এলুম। আজ Younghusband এর God and the Universe বলে সুন্দর প্রবন্ধ পড়লুম মোটরে বসে—পুরোনো ? আপিসের কাছে।

অন্ধকার বাদলের রাত্রি। দেশে এই সময় অনেক বছর আগে গৌরী ও আমি একসঙ্গে থাক্‌তুম—সেই কথা মনে হোল।

১৬ই জুলাই, ১৯৩৩। ৩২শে আষাঢ়, ১৩৪০। রবিবার

রবিবার। আজ সারাদিন অসম্ভব বাদলা। বৃষ্টির একদণ্ড নাই কামাই। দুপুরে খুব ঘুমুলাম, কেননা কাল রাত্রে একটার সময় শুয়েচি। সকালে কৃষ্ণধন এসেছিল। ঘুমিয়ে উঠে দেখি ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি পড়চে। একটু থামল [—] আমি হেঁটে বঙ্গশ্রী আপিসে গিয়ে দেখি আছে নৃপেন, কিরণ ও সজনী। ঘোররবে প্রুফ দেখচে কারণ কাল কাগজ বার কর্ত্তেই হবে। ওখানে চা খেয়ে ডলির গল্প করে গেলাম নীরদবাবুর ওখানে। সেখানে আবার চা খেলুম—নীরদবাবু একটু পরই বেরুলেন—আমি ও তাঁর স্ত্রী বসে বসে নানা গল্প শুরু করলুম। ঈশ্বর ও পরলোক সম্বন্ধে আমাদের দেশের নানা quaint রেওয়াজ সম্বন্ধে, যেমন যে সীম পুঁতবে সে সীমই পুঁতবে ইত্যাদি সম্বন্ধে—নানা কথা বলচি—৯-২৫ এর সময় নীরদবাবুর আগমন। আমি আর ঘণ্টা খানেক থেকে ট্রামে বাসায় এলুম—তখনও বৃষ্টি। বাসায় সবে এসেচি, জল আরও বাড়ল—ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি। ফিস্ট নাকি হচ্চে, রাখাল চাকর ওপরে খাবার দিয়ে গেল।

১৭ই জুলাই, ১৯৩৩। ১লা শ্রাবণ, ১৩৪০। সোমবার

সকাল থেকে অসম্ভব বৃষ্টি। এই বৃষ্টির মধ্যে হেঁটে স্কুলে গেলুম। পথে অখিল

১ কল্পনা ভট্টাচার্য (খুকী)।

মিস্ত্রী লেনে কানাই এর সঙ্গে দেখা। সে একটা ashtray দিলে বল্লে স্বরেশবাবু[1] আপনার কাছে গিয়ে ফিরে এসেচেন। তারপর স্কুলে পরীক্ষা আছে—৫টা পর্য্যন্ত গার্ড দিতে হবে সুতরাং এবেলা ঘুমুলাম। তারপর ৪ টার পর বঙ্গশ্রীতে গেলুম। সেখানে চা খেয়ে খুব আড্ডা দেওয়া হোল। এখান থেকে বৃষ্টির মধ্যে সজনীরা গেল এজ্রা স্ট্রীটে সুশীলবাবুর মেয়েকে[2] পাখা উপহার দেবে তাই কিনতে। আমি বৃষ্টিতে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে মহা আনন্দে বাড়ি চলে এলুম।

ঘোর অন্ধকার রাত—তার ওপর মেঘ ও বৃষ্টি। দালান থেকে কি অদ্ভুত যে দেখায় [!]

ইলেকট্রীক আলো নিভিয়ে দিয়ে চেয়ে রইলুম।

এই শ্রাবণ মাস। বারাকপুরের বাড়ীতে অনেকদিন আগে এই সময়ে আমরা থাকতুম।

১৮ই জুলাই, ১৯৩৩। ২রা শ্রাবণ, ১৩৪০। মঙ্গলবার

ঝম্‌ঝম্‌ বৃষ্টির মধ্যে ট্রামে স্কুল গেলুম—সেখানে oral examination ছিল ছেলেদের—সকাল সকাল খেয়ে ১২॥০ টার সময় বঙ্গশ্রীতে গিয়ে একটা অভিনয় করলুম। আমি, সজনী, নৃপেন ও কিরণ রায় এই ক'জনে মিলে একটা মৃত্যুদৃশ্য অভিনয় করা হোল। তারপর এলেন সুশীল দে। তিনি দুখানা পত্র পড়ালেন। একটু পরে কৃষ্ণনগরের মণীন্দ্র চাটুয্যে (?) মশায় নীচে এসে সজনীকে ডাক দিলেন। তাঁর মেয়ের বিয়ে সম্বন্ধে আমি যে অমত করেছিলুম সে বিষয়ে সজনীর সঙ্গে কথা বলতে। তিনি বনগাঁয়ের বাড়ীখানা মেয়ের নামে লিখে দেবেন, এই কথা বলতে এসেছিলেন। আমি যেন ওই লোভ দেখালেই বিয়ে করবো আর কি! ভদ্রলোকের কি ভুল ধারণা!

তারপর বেলা পাঁচটার সময় বেরিয়ে বউবাজার স্ট্রীট দিয়ে যাচ্চি, বিরাজদের মেস্‌ থেকে সুবোধ ডাকলে। সেখানে গিয়ে খানিকক্ষণ গল্প করার পরে ফিরচি। মেডিকাল কলেজের কাছে সুসার কাকার সঙ্গে দেখা। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বই দিলুম একখণ্ড 'অপরাজিত'। তারপর মেসে চলে এসে Wolf's[3] [Wolfe's]

১ সুরেশচন্দ্র মজুমদার, আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।
সুরেশচন্দ্র দাস, জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স-এর মালিক।
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, উত্তরা পত্রিকার সম্পাদক।

২ সুধীরা দে (বসু); ১৯শে জুলাই এঁর বিবাহ হয়।

৩ Startling Facts in Modern Spiritualism, Napoleon Bonapart Wolfe.

Spiritualism পড়লুম। ক'দিন এই বইখানায় মজগুল হয়ে আছি। অদ্ভুত বই। বৃষ্টি এবেলা একটু ধরেচে।

১৯শে জুলাই, ১৯৩৩। ৩রা শ্রাবণ, ১৩৪০। বুধবার

সকালে স্কুল গিয়ে একবার বঙ্গশ্রীতে গেলুম। তারপর এসে ঘণ্টা দেড় স্কুলের কাজ সেরে আবার গেলুম। ৬৷৷॰ টার পরে হেম বাগচি[১] ও হরেকৃষ্টবাবু[২] এলেন। Spiritualism নিয়ে কথাবার্ত্তা হোল। তারপর সবাই মিলে সুশীলবাবুর বাড়ী নিমন্ত্রণে গেলুম। সুনীতিবাবু আমাকে সুধীনের বোনের বিয়ে ও আমার অসম্মতি নিয়ে খানিকটা ঠাট্টা করলেন। আমি বললুম আমি নির্দ্দোষ—আপনি সজনীকে জিগ্যেস করে দেখুন বরং। তারপর সবাই মিলে ওপরের ছাদে বসে খেয়ে রাত এগারোটার পরে বাড়ী চলে এলুম। বনুদের বাসা খুঁজে পেলাম না। অন্ধকার রাত্রি। বারান্দায় চেয়ার টেনে বসে আকাশের দিকে চাইলুম। আর বঙ্গশ্রীতে বসে বাজে আড্ডা দোব না। আজ থেকে সতর্ক হলুম।

২০শে জুলাই, ১৯৩৩। ৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

আজ সকালে ললিতের সঙ্গে দেখা করে টাকার কথা বলে এলুম। Andrew Jackon Davies এর খানিকটা লেখা পড়ে সত্যই আনন্দ হোল। স্কুলে গিয়ে কাজ সেরেই চলে গেলুন বঙ্গশ্রীতে। তারপর একটার সময় একবার স্কুলে এসে আবার বেরিয়ে গেলুম। নেড়ার কাছে খবর পেলুম যতীশ কাকা মারা গিয়েচেন। আহা সেদিনও মানুর বিয়েতে তাঁকে বসিয়ে খুব সন্দেশ খাইয়েচি। ট্রামে বাসায় চলে এলুম। এসে খুব পড়াশুনো করলুম। মন আজ খুব calm. অনেক রাত পর্য্যন্ত বারান্দায় বসে রইলুম। মেসে আজ বড় গোলমাল —ঠাকুর চাকর পালিয়েচে—রাত ২টার সময় অন্নসংকলে খেলে—আমি অনেক আগেই আহারাদি সেরে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

সন্ধ্যায় সময় আজ শৈলেন এসেছিল—ছায়াসীতার[৩] একটা সমালোচনার জন্যে।

২১শে জুলাই, ১৯৩৩। ৫ই শ্রাবণ, ১৩৪০। শুক্রবার

সকালে স্কুল সেরে বঙ্গশ্রী। সেখান থেকে Imperial Library। হেঁটে এলুম College Square-এ—সেখানে বসে পোড়ানো ভুট্টা খেয়ে Theo-

১ হেমচন্দ্র বাগচী।

২ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

৩ শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষের উপন্যাস।

sophical Society-র ঘরে গিয়ে অনেকদিন পরে বই পড়লুম। যখন সেখানে বসে বই পড়ছি—ভদ্রলোক এলেন—দেখে বুঝলুম খুব শোকগ্রস্থ [শোকগ্রস্ত—] তাঁর সঙ্গে গোলদিঘীর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলচি—এমন সময় পশুপতিবাবুর গাড়ী দেখি যাচ্চে। দাঁড়িয়ে কথা বল্লুম—ও বৃদ্ধ ভদ্রলোকও আমার ঠিকানা নিলেন। তারপর বৃষ্টি এল—আমি যেতে যেতে রেবতীবাবুর সঙ্গে দেখা হোল। বাড়ী ফিরে এসে পড়াশুনো করলুম।

সজনীরা বঙ্গশ্রী থেকে সুশীলবাবুর বাড়ী গেল ফুলশয্যার তত্ত্ব গোছাতে। রাত্রে একটা ছেলে এল—বল্লে মেঘমল্লার অনুবাদ করবো। সে বল্লে—সুপ্রভা এখানে এসেচে খুব অল্পদিন হোল।

২২শে জুলাই, ১৯৩৩। ৬ই শ্রাবণ, ১৩৪০। শনিবার

স্কুলে সকালে কাজ ছিল—সেখান থেকে বেরিয়ে বঙ্গশ্রী আপিসে গেলুম। সকাল সকালই বেরুলাম—ঝড় বৃষ্টি এল। খানিকটা অপেক্ষা করার পরে বেলা ৩টার সময় বেরিয়ে নীরদবাবুর বাসায়। নানা গল্পগুজবে রাত ১০টা। তারপর ট্রামে বাসায় ফিরি [।]

২৩শে জুলাই, ১৯৩৩। ৭ই শ্রাবণ, ১৩৪০। রবিবার

রবিবারে সকালে হুটু এল, কৃষ্ণধন ও পশুপতি বাবু এলেন। তারপর খেয়ে একটু ঘুমুলাম। উঠে প্রথমে গেলুম সুরেশ বাবুর পার্টিতে। সেখানে সুরেশ বাবুর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হোল। বেশ বুদ্ধিমতী মেয়েটি—ওখান থেকে পশুপতি বাবুর বাড়ী। দাদামশায়ের[1] সঙ্গে যোগ প্রভৃতি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হোল। পশুপতি বাবুর মেয়ে খুকী[2] এসে চা ও খাবার দিয়ে গেল। গল্পগুজবের পরে আমি বললুম পথে গিরিজা বাবুর[3] সঙ্গে দেখা হয়েছিল—spiritualism সম্বন্ধে কথা হয়েচে। তারপর সার্কেলে গেলুম—কিছুই হচ্চে না টেবিল নাড়ানাড়ি আর বাজে বকুনি। (?) এক বৃদ্ধ বেজায় sceptic—বেজায় বক্‌চে। অনেক রাত্রে চলে এলুম।

২৪শে জুলাই, ১৯৩৩। ৮ই শ্রাবণ, ১৩৪০। সোমবার

আজ হরতাল। সেনগুপ্ত[4] মারা গিয়েচেন। তাই সকালে সুপ্রভাদের

১ রায়সাহেব দুর্গাচরণ চক্রবর্তী।

২ কল্পনা ভট্টাচার্য।

৩ গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, প্রাবন্ধিক।

৪ দেশনেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত; ২১শে জুলাই বন্দী অবস্থায় তিনি রাঁচি জেলে মারা যান।

হোস্টেলে যাবো বলেও গেলুম না। সকালে এসে অমিয় বলে গেল মিটিং হবে পরের রবিবারে [—] খুব ভালো কথা। কৃষ্ণধন এসে নিয়ে গেল নীলকণ্ঠ কেবিনে ওভালটিন খেতে ও রায়মশায়ের দোকানে খাবার খাওয়াতে। এসে দেখি সুপ্রভার পত্র এসেচে—হোস্টেলে যেতে লিখেচে। আজ আর গেলুম না। সেনগুপ্তের শবদেহ নিয়ে যাচ্চে—তার সঙ্গে যাবো ভাবলুম কেওড়াতলায়। স্কুলে গেলুম—সেখান থেকে ফণি বাবুকে নিয়ে গেলুম বঙ্গশ্রীতে। শোভাযাত্রা চলে গেলে আমি বার হয়ে সমবায় ম্যানসনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। মেয়েরা দেহের ওপর ফুল ছড়াচ্চে ও গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিচ্চে। ভারী impressive দৃশ্য। হ্যারিংটন স্ট্রীট পর্যন্ত হেঁটে গিয়েছি—পেরুর কন্সালের সঙ্গে দেখা হোল। তার গাড়ীতে তার বাড়ী গিয়ে এক গ্লাস অরেঞ্জ স্কোয়াস খেলুম, গল্পগুজব করলুম। তারপর তার মোটর আমায় পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল মৌলালীর মোড়। বঙ্গশ্রী আপিসে খানিকটা আড্ডা দিয়ে ট্রামে বাসায় চলে এলুম। spiritualism এর বইগুলো আজকাল খুব পড়চি—একটা নতুন light পাচ্চি যা এতদিন পাই নি। পশুপতি বাবু ফোন্ করেছিলেন বঙ্গশ্রীতে, কিরণ রায় বল্লে। হেমন্তর[১] সঙ্গে দেখা হোল অনেক দিন পরে। রাত্রে করুণা এল।

২৫শে জুলাই, ১৯৩৩। ৯ই শ্রাবণ, ১৩৪০। মঙ্গলবার

স্কুলে কোনো কাজ ছিল না। সেখান থেকে বঙ্গশ্রী। সুশীল দে এলেন তাঁর সঙ্গে আড্ডা বেলা ৫টা পর্য্যন্ত। তারপর Theosophical Societyতে এসে তাদের ওখানে Andrew Jackon Davis [Davies]-এর বই পড়লুম। নীচে দিয়ে প্রমথ বিশী যাচ্চে, তাকে ডাকলুম—মিথ্যে করে বল্লুম বঙ্গশ্রী আপিসে আজ সুশীল বাবু খুব খাইয়েছেন। সে তো বেজায় বিমর্ষ হোল কথাটা শুনে। তারপর ওখান থেকে মৌচাক আপিসে এসে একখানা মৌচাক নিলুম। তারপর মেস্। একটু একটু বৃষ্টি পড়চে। সারাদিন খুব গরম গিয়েচে।

২৬শে জুলাই, ১৯৩৩। ১০ই শ্রাবণ, ১৩৪০। বুধবার

সকালে সুপ্রভাদের হোস্টেলে সুপ্রভার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে গেলুম—সেখান থেকে বেরিয়ে D. M. Library। সেখান থেকে স্কুল—। স্কুলে থেকে বঙ্গশ্রী হয়ে মেস্। সুপ্রভার হাতে সুনীতি বাবুকে একখানা পত্র দিলুম। বাসায় এসে অতীব আনন্দ পেলুম অনেক দিন পরে ভম্বল এসেচে দেখে। তারপর টক্ ও

১ হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ভাইপো।

মহিম বাবু[১] এলেন।

আকাশ অদ্ভুত ছিল—অনেক রাত পর্য্যন্ত বাইরে শুয়ে ঘুম হোল না।

২৭শে জুলাই, ১৯৩৩। ১১ই শ্রাবণ, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

সকালে স্কুলে যাবার আগে এল আশীষ গুপ্ত। তার সঙ্গে কথা বল্‌তে বল্‌তে স্কুলে গেলুম। স্কুলে Mognaschi সাহেবের ড্রাইভার এসে জানালে তার জ্বর হয়েচে। খবরটা দিতে বঙ্গশ্রী আপিস থেকে ট্রামের পাশ দিয়ে গেলুম প্রথমে ইউনিভার্সিটিতে। তারপর সেখান থেকে বিচিত্রা। ইউনিভার্সিটীতে স্বকুমার বাবু অন্যান্য প্রফেসরদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন—তাঁরা আমার বই সবাই পড়েচেন দেখ্‌লুম এবং খুব ভালও লেগেছে। স্বকুমার বাবু বল্লেন বাংলা উপন্যাসে নতুন ধারা উনি এনেচেন—জগত্তারিণী মেডেল[২] এবার ওঁকেই দেওয়া উচিৎ [উচিত] ছিল। ওখান থেকে বেরিয়ে বিচিত্রা গেলুম [,] সেখান থেকে আবার বঙ্গশ্রী। ইটালিতে যাওয়ার খবরটা দিলে সজনী। ডাঃ কালিদাস নাগকে বল্‌বো। আজ আকাশ অদ্ভুত নীল—যেন শরতের আকাশ—

ভারী আনন্দ হোল মনে—অনেকদিন পরে পুরোনো পথটা দিয়ে ফিরলাম। রাত্রে মুটুর মেসে গেলুম টাকা দিতে—আবার মুটুও এল।

২৮শে জুলাই, ১৯৩৩। ১২ই শ্রাবণ, ১৩৪০। শুক্রবার

পোস্ট আপিস্ হয়ে স্কুলে গেলুম—সেখান থেকে বঙ্গশ্রীতে গেলুম লেখা দিতে। তারপর এসে বরিশাল এক্সপ্রেসে বনগ্রামে। রাত্রে বীরেশ্বর বাবু ও হেড্ মাস্টারের সঙ্গে দেখা করে গল্পগুজব করা গেল।

স্কুলে পৈঠার উপরে বসে হেমবাবু[৩], আমি ও হেড্‌মাস্টারের সঙ্গে spiritualism-এর চর্চ্চা করা গেল।

এ কদিন আকাশের রং অপূর্ব্ব নীল—ঠিক যেন শরত [শরৎ] পড়ে গেছে—মাটী শুক্‌নো (?) খট্‌খটে—এমন চমৎকার বর্ষাঋতুর দৃশ্য অনেকদিন দেখিনি—রৌদ্রের গন্ধ ইছামতীর তীরের বনপ্রান্তে বসে ঘোলাজলের দিকে চেয়ে চেয়ে যদি অনুভব কর্ত্তে পারি—তবেই ছুটীটা সার্থক হবে।

১ সাহিত্যিক মহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য। বিচিত্রা, নবশক্তি প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ ও ছোটগল্প লিখতেন।

২ সাহিত্যে বা বিজ্ঞানে মৌলিক কাজের জন্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত স্বর্ণ টাকা মূল্যের পুরস্কার।

৩ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন শিক্ষক, বনগাঁ হাইস্কুল।

২৯শে জুলাই, ১৯৩৩। ১৩ই শ্রাবণ, ১৩৪০। শনিবার

সকালে উঠে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করা গেল। তারপরে হেড্ মাস্টারের সঙ্গে দেখা কর্ত্তে গিয়ে বীরেশ্বর বাবুর সঙ্গে আলাপ করলুম। হেডমাস্টারের সঙ্গে বোর্ডিং এর মধ্যে গেলুম—আমার সেকালের seat টা দেখলুম। তারপর নির্ম্মল রোদ ভরা আকাশের তলা দিয়ে বেলা দশটার সময়ে বারাকপুরে গেলুম। কালো ও রামপদ বুড়ী পিসিমাদের দাওয়ায় বসে তাস খেলচে। আমি হরিপদ দাদাদের বাড়ী গিয়ে গল্পগুজব করলুম ও খেলুম সেখানে। এসে রামপদদের বাড়ী ঘুমিয়ে ন'দি, খুড়ীমাদের সঙ্গে অপরাহ্ন [অপরাহ্ণ] পর্য্যন্ত তাস খেললুম। তারপর আমাদের ভিটের দিকে বেড়াতে গেলুম। বর্ষায় বৃষ্টিধৌত নির্ম্মল রাঙা রোদভরা অপরাহ্নের [অপরাহ্ণের] সে দৃশ্য সত্যই অদ্ভুত—বাতাসের কি Freshness! কি সুন্দর গন্ধ! তারপর বেলেডাঙার পুলে বেড়াতে গেলুম। সেখানে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। এই সময় আমি বোধ হয় জীবনে কোনদিনই এখানে আসিনি। দৃশ্য সত্যই অপূর্ব্ব—কি soft colour-scheme আকাশের—নীল সে অদ্ভুত নীল—তেমন নীল সত্যই কচিৎ দেখা যায়। চারিধারের মেঘস্তূপ—পাটকিলে—বেগুনি, ধূমল, রাঙা—রাঙা গোধুলির [গোধূলির] রং বটের সারির গায়ে—নীচে ঘন সবুজের প্রাচুর্য্য—থৈ থৈ জল—মাথার ওপরে অপূর্ব্ব রঙীন্ আকাশ। আমার মনে পড়ল কেবলই তাদের কথা যারা পৃথিবী ছেড়ে নানা দুঃখে চলে গিয়েচে—হরি রায়[১], কামিনি বুড়ী, নদীর ধারে শীতের সন্ধ্যায় গ্রামের কত বুড়ীবুড়োদের চিতা জ্বলতে দেখেচি—খুকী, গৌরীর কথাও মনে পড়ল—এই শ্রাবণসন্ধ্যায় সে প্রদীপ হাতে আমাদের ভিটায় সন্ধ্যা দিত—বাবা, মা, পিসিমা[২]—সবাই ওই নীল আকাশের রঙীন মেঘবর্ত্ম দিয়ে বহুদূরের কোন্ পথযাত্রায় বেরিয়ে চলে গিয়েচে—'প্রস্থিতা দূরমধ্বানং'[৩] এই কথাটা বার বার মনে পড়তে

---

১ হরিহর রায়, বারাকপুরবাসী।

২ মেনকা দেবী; ইনি ইন্দির ঠাকরুন চরিত্রটির উৎস।

৩ ওঁ সপ্তব্যা ধাদশার্ণেষু মৃগাঃ কালাঞ্জরে গিরৌ/চক্রবাকাঃ শারদ্বীপে হংসাঃ সরসিমানসে/তেভি যাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রহ্মণো বেদপারগাঃ/প্রস্থিতা দূরমধ্বানং যূয়ং তেভ্যোঽবসীদত (হরিবংশ ২৪।২০)।

এই গ্রন্থে লিখিত, সাত ভাই প্রথম জন্মে ব্যাধ, দ্বিতীয় জন্মে হরিণ, তৃতীয় জন্মে চক্রবাক, চতুর্থ জন্মে হংসদেহ ধারণ করে। কিন্তু পঞ্চম জন্মে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাম্পিল্য নগরীর রাজা এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভ্রাতা তার মন্ত্রী, অবশিষ্ট চার

লাগ্‌ল। স্বর্গে মর্ত্ত্যে বাস্তবিকই যে সম্বন্ধ আছে—এবং খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে—সেকথা সেদিন রঙীন সন্ধ্যা আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে মনে মনে আর অস্বীকার কর্ত্তে পারলুম না। রাত্রে ফিরে অনেক রাত পর্য্যন্ত তাস খেল্লুম ন'দিদিদের দালানে।

৩০শে জুলাই, ১৯৩৩। ১৪ই শ্রাবণ, ১৩৪০। রবিবার

সকালে উঠে আমি কাল্লো বনগাঁয়ে এলুম। এসে জল খাবার খেয়ে বসে লিখ্‌চি। ওবেলা কলকাতায় যাবো।

৩১শে জুলাই, ১৯৩৩। ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৪০। সোমবার

সকালে মহিমবাবু এল। বিকেলে স্কুলের পরে আমি গেলুম বঙ্গশ্রী আপিস। সেখানে সুনীতিবাবু ছিলেন—'জাতিস্মরে'র গ্রন্থকার শরদিন্দু বাবুর সঙ্গে আলাপ হোল—তাঁর বাড়ী মুঙ্গেরে—আমার পিসেমশায় হৃদয় গাঙ্গুলী মশায় তাঁর বাড়ীতে ছেলেদের পড়ান শুনে খুব আনন্দ হোল। ওখান থেকে বেরিয়ে গেলুম 'উদয়ন' আপিসে নিয়োগী পুকুর লেনের ভেতর দিয়ে। সেখানে মুরাতি-পুরের সিধুর [১] সঙ্গে দেখা হোল সে কি একটা কাগজ ছাপতে এনেচে। তারপর বাসে চেপে গেলুম পার্ক সার্কাস মণীন্দ্র বসুর বাড়ীতে। সেখানে মণীন্দ্র খুব আদর অভ্যর্থনা করলে। চা ও খাবার খাওয়া হোল [।] তারপর মণি বর্দ্ধন এল সে চমৎকার নাচ দেখালে। Gifted young man—কালিদাস বাবুকে ইটালির কথা বল্লুম। তিনি খুব খুসি হলেন বললেন, আপনাদের মত creative artist গেলেই তবে ঠিক দেখতে শুনতে পায়, বড় বড় লোকের কাছে পাঠাতেও পারি। সজনীকে নিয়ে একবার ওঁর বাড়ী যেতে বল্লেন। অনেকক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা হোল ওঁর সঙ্গে। বললেন 'পথের পাঁচালী' অনুবাদ করবার লোক

ভাই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করে। ঘটনাচক্রে পরে সাত ভাইয়ের মিলন হয়।

শ্রাদ্ধের সময় যে কটি মন্ত্র পাঠ করা হয় তাতে উল্লিখিত ব্রাহ্মণ তনয়দের পাঁচটি জন্মে ব্যাধাদি দেহধারণের উল্লেখ আছে। বিভূতিভূষণের উল্লিখিত বর্তমান শ্লোকটিও শ্রাদ্ধেরই একটি শ্লোক। অর্থ, যে সাতজন মানস সরোবরে হংস হয়ে জন্মগ্রহণ করে তাদের মধ্যে চারজন কুরুক্ষেত্রে বেদপারগামী ব্রাহ্মণ-রূপে উৎপন্ন হয়ে দূরপথে (মুক্তিপথে) প্রস্থান করে। তোমরা তিনজন তাদের কাছ থেকে সকল বিবরণ অবগত হও।

১ সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণের মামাতো ভাই।

কৈ, শুধু philologically অনুবাদ করলে তো চলবে না। মণি বর্দ্ধন বল্লেন: আমার 'মেঘমল্লার' থেকে সে নাচের inspiration পেয়েচে।

১লা অগস্ট, ১৯৩৩। ১৬ই শ্রাবণ, ১৩৪০। মঙ্গলবার

সকালেই unemployed মাস্টারমশায়টি এলেন। তারপর এলেন শরদিন্দুবাবু 'জাতিস্মরে'র লেখক ও মহিমা বাবু। অনেকক্ষণ গল্পগুজব হোল। লেখা সম্বন্ধেও অনেক কথা হোল। আকাশ বড় চমৎকার পরিষ্কার। আজকাল কলকাতায় অনেক আড্ডা জুটে গিয়েচে—স্কুল, বঙ্গশ্রী, আপিস, পশুপতিবাবুদের বাড়ী, টক্সদের ওখানে, Imperial Library, কিরণ মাসীমার বাড়ী,[১] নীরদবাবুদের flat, নীরদ চৌধুরীর বাসা, Mognaschi flat, মণীন্দ্র বসুর বাড়ী—নানা ধরণের atmosphere—কোথায় কখন যাই! কিন্তু সবখানে গেলেই আনন্দ পাই এই শরতের রোদের মাঝে।

বৈকালে বঙ্গশ্রী আপিসে গিয়ে দেখি শৈলজা বসে গল্প করচে—একটু পরেই সুনীতি বাবু এলেন। তাঁর সঙ্গে গেলুম Mognaschi সাহেবের কাছে। আমার বইএর কথা সুনীতি বাবু তাঁকে বল্লেন। সেখান থেকে সাহেবের গাড়ীতে আমরা ফিরলুম। ফিরেই গেলুম রেডিও স্টেশনে। প্রথমে নৃপেন বাবুর ঘরে এক গ্লাস করে লাৎসী, সরবৎ খেলুম। তারপর ঘরে সুনীতি বাবু 'চণ্ডীদাস' সম্বন্ধে বক্তৃতা করলেন। আমার নাম করলে নৃপেন—তারপরে—ফিরলুম সেখান থেকে অনেকরাতে।

২রা অগস্ট, ১৯৩৩। ১৭ই শ্রাবণ, ১৩৪০। বুধবার

আজ আর বেশী engagement কোথাও ছিল না। স্কুল থেকে গেলুম বঙ্গশ্রীতে। না—ভুল হয়েচে। স্কুল থেকে বেরিয়ে প্রথমে সুধীর ও অজিতের সঙ্গে খানিকটা গেলুম। তারপর Thacker Spink এর দোকানে গেলুম বই দেখতে। অনেক দিন পরে দোকানটা খুলেচে। ওখান থেকে ফিরে মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে pastry ও Wide World কিনলুম। একটা দোকানে বসে চা খেয়ে বঙ্গশ্রীতে এলুম। অজিত এসেচে অনেকদিন পরে এলাহবাদ থেকে। উষার[২] কথা জিগ্যেস

১ বেলেঘাটাতে বিভূতিভূষণের গ্রাম সম্পর্কে দুই কাকা নগেন (খোকা খুড়ো) ও পরেশ মুখোপাধ্যায় (নেড়া খুড়ো) থাকতেন। কিরণ দেবী সম্ভবতঃ সেই সূত্রে বিভূতিভূষণের মাসিমা ছিলেন।

২ উষা চৌধুরী। সম্ভবতঃ পরীক্ষাসূত্রে বিভূতিভূষণের সঙ্গে এঁর পরিচয় হয়।

[জিগ্যেস] করলুম—উষা ভাল আছে। মাথার ওপর দিয়ে এইমাত্র একটা এরো-প্লেন গেল—এই যখন লিখচি। শুয়ে লিখছিলুম, শুয়েই টের পেলুম।

ওখান থেকে আমি ও চৈতন্যদেব বেরিয়ে শাঁখারী টোলা দিয়ে এলুম। বৃষ্টি এল—দুজনে একটা পানের দোকানে দাঁড়ালুম। সেখানে এল অমিয়। তারপরে মেসে এসে চৈতন্যর সঙ্গে গল্প করলুম—সে চলে গেল। তারপর পশুপতি বাবু ও শৈলেন এল। রাত্রে বারান্দায় বেশ ঘুমিয়েছিলুম—কিন্তু বৃষ্টি এল [।]

৩রা অগস্ট, ১৯৩৩। ১৮ই শ্রাবণ, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

সকালে নিরঞ্জন সাহা আর্টিস্ট এল। বৃষ্টি বাদলার দিন—খুব ঝড় হচ্চে—তবে বৃষ্টি মাঝে মাঝে আসচে মাত্র। স্কুলের পর হেডমাস্টার টিচারদের নিয়ে মিটিং করলেন। তারপরে বঙ্গশ্রী আপিসে গেলুম—পশুপতি বাবু phone করলেন তিনি মিডিয়াম ঠিক করেচেন—আমাকে তুলে নিয়ে যাবেন বাগবাজারে। তারপরই অজিত এল—তার গাড়ীর ট্রায়েল রান্ দিয়ে এলুম আমি [,] সজনী ও অজিত—শচীন[১] চালালে। ফিরে এসেই প্রস্তাব করলে মোটরে বনগাঁয়ে যাওয়া যাক্। আমি অস্বীকার করলুম—ওরা সবাই চলে গেল। পশুপতি বাবু এলেন।

আমি পশুপতি বাবুর গাড়ীতে প্রথমে সুপ্রভাদের হোস্টেলের পাশ দিয়ে আতাবাগানে প্রভাত মুখুয্যে[২] নভেলিস্টের বাড়ীতে গেলুম। সেখান থেকে বাগবাজারে মিডিয়মের ওখানে গেলুম। Seance আরম্ভ হোল—একজন সন্ন্যাসীও এলেন—কিন্তু ঘণ্টা দুই বসবার পরেও কোন ফল হোল না দেখে উঠে চলে এলুম আমরা। ভাবলুম বলুর বাসায় যাই—একবারও যাইনি এ পর্য্যন্ত—কিন্তু সময় হোল না, রাত ৯॥০টা। নীরদের বাসাতেও যাওয়া হোল না। বাসে মানিকতলা লাইন দিয়ে ফিরি।

৪ঠা অগস্ট, ১৯৩৩। ১৯শে শ্রাবণ, ১৩৪০। শুক্রবার

আজ সকালে উঠে বেজায় ঝড় ও বাদলা। যেমন ঝড়, তেমনি বর্ষা। জাহ্নবীর চিঠি পেয়ে বরিশাল এক্সপ্রেসে বাড়ী গেলুম। রাত্রে আমি হেড্মাস্টার—স্কুলে প্ল্যানচেট্ নিয়ে বসলুম রাত্রে অতি সুন্দর চাঁদ উঠল।

৫ই অগস্ট, ১৯৩৩। ২০শে শ্রাবণ, ১৩৪০। শনিবার

আজ সকালে খুব বাদ্লা। কিন্তু দুপুরের পরে—বাদ্লা বৃষ্টি থেমে গেল। অপূর্ব্ব শরতের রোদ হোল। দুপুরের পর খয়রামারি গিয়ে একটা ঝোপের ধারে

১ শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, সাহিত্যিক

২ প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক।

কতক্ষণ বসে রইলুম। কি সোনালী রোদ, কি চমৎকার নীল আকাশ। কত কথা যে মনে আসে—অপূর্ব্ব বৈকাল। রাত্রে জ্যোৎস্না অদ্ভুত, পূর্ণিমা আজ। আমি, মিতে, বিনয়দার বাড়ীতে প্ল্যানচেট্ করলুম। বাজে সব, এতে আমার কোন বিশ্বাস নেই।

৬ই অগস্ট, ১৯৩৩। ২১শে শ্রাবণ, ১৩৪০। রবিবার

সকালে কলকাতা চলে এলুম। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নীরোদবাবুর ওখানে গেলুম। ওখান থেকে—খেয়ে বেরিয়ে একটু গল্প করে এলাম বন্ধুর বাসায়। বন্ধুর বৌ ছাদে এসে গল্পগুজব কল্লে—তার মধ্যে ওখানকার বাসার অসুবিধের কথা বল্লে। বাসা করে ভাল করেচে বলে মনে হয় না। আমি ওখান থেকে ট্রামে আবার নীরদবাবুর বাসায় চলে এলাম ও খাওয়া দাওয়া করলাম। অনেকরাত্রে এলাম বাসায়।

এত ভয়ানক গরম আজ রাত্রে, এমন দেখিনি ভাপ্‌সা গরম, একটু হাওয়া নেই। বাইরে শুলাম—জ্যোৎস্নায়।

৭ই অগস্ট, ১৯৩৩। ২২শে শ্রাবণ, ১৩৪০। সোমবার

সকালে পি সি সরকার এসে বাজে বকলে। তারপর করুণা কলেজের ছেলেদের নিয়ে এল—একটি শিলচরের ছেলে বল্লে [,] একটী মহিলাকে জানি তিনি কাঁদচেন অথচ কেঁদে কেঁদে পথের পাঁচালী পড়চেন। স্কুল থেকে বার হয়ে থ্যাকার স্পিঙ্কের দোকানে গেলুম—অনেক দিন পরে দোকানটা খুলেচে। ওখান থেকে বার হয়ে নীরদবাবুর flat-এ এসে চা খেয়ে দুজনে গাড়ী করে বেরুলাম। আমি থিয়েটার রোডে যাবো সাহেবের সঙ্গে দেখা কর্ত্তে—Capt. Symons-এর। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে অনেকক্ষণ গিয়ে বসলুম। বৃষ্টি এল—উঠে, প্রথমে একটা গাছতলায়, তারপর চৌরঙ্গীতে একটা বাড়ীর তলায় এসে দাঁড়ালুম। খানিকটা পরে একটা গাছতলায় অন্ধকারে বেঞ্চিতে বসলুম—তখন বৃষ্টি থেমেচে। একটা উড়ে মুটে এসে কালীঘাটের পথ জিগ্যেস [জিগ্যেস] কল্লে—গল্প কল্লে। আমার মনে হচ্চিল ছোট ছেলেদের যে লোকে মারধর করে—এ আমি সহ্য কর্ত্তে পারি নে কেন? এইমাত্র ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মাঠে ঐ পার্শী মেয়েটা যে তার ছোট খোকাকে ঠ্যাঙাচ্ছিল—ও দেখে আমার বুকের মধ্যে কেমন করে। তারপর উঠে ন'টার সময় Capt. Symons-এর flat-এ গেলুম—ও Ginger Beer খেতে খেতে গল্পগুজব করলুম—বাঁওড়ের film তুলেচে দেখালে—কাঁচিকাটার পুলেরও। রাত্রে জ্যোৎস্না উঠেচে। পার্ক সার্কাস

ফিরে বাড়ী—

৮ই অগস্ট, ১৯৩৩। ২৩শে শ্রাবণ, ১৩৪০। মঙ্গলবার

সকালে রাধা এল। তারপর সজনী এসে দেবেনের[১] বিয়েতে নিমন্ত্রণ কর্ত্তে গেল। তারপর এল কৃষ্ণধন। আমি স্কুল থেকে Thacher Spink-এর দোকানে গেলুম—সেখান থেকে বঙ্গশ্রীতে এসে খেলাম—সুনীতিবাবু, সুকুমারবাবু—সবাই ছিলেন। তারপর আমি, কৃষ্ণধন ও ইউনিভারসিটীর একজন প্রফেসর হেঁটে বাসায় এলুম। আজ তৈতুলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে আমার সঙ্গে থ্যাকার্সের দোকানে গেল।

৯ই অগস্ট, ১৯৩৩। ২৪শে শ্রাবণ, ১৩৪০। বুধবার

স্কুলে খুব বৃষ্টি মাঝে মাঝে। ওখান থেকে ছুটি হোলে ওপরে মাস্টারদের ঘরে বসে—'The Undiscovered Country'[২] পড়ছিলুম। বৈকাল ৫।০টার সময় ছাদে দাঁড়িয়ে অনেকদিন পরে 'জনতার মাঝে'[৩] গানটা গাইতেই গলায় কেমন একটা অদ্ভুত সুর এল [—] চারিধারে মেঘস্তূপ নীল আকাশের মধ্যে মনে এল একটা অপূর্ব্ব শান্তি, এক অদ্ভুত অনুভূতি—বহুদিন এমন হয় নি। বঙ্গশ্রীতে যাচ্চি, পথে আশীস গুপ্তের সঙ্গে দেখা—সে নিয়ে গিয়ে একটা দোকানে চা খাওয়ালে। তারপর বঙ্গশ্রীতে খুব recitation হোল—দেবী 'দেবতার গ্রাস' আবৃত্তি কর্ল্লে। এখান থেকে দেবেনের বিয়েতে সুকিয়া স্ট্রীটে এলুম। খাওয়া দাওয়ার পরে বাসায় ফিরলুম আমি, সজনী, পরিমল। রাত্রে বারান্দায় জ্যোৎস্না পড়েচে—বাইরে শুয়ে এত কথাও মনে এল—দূর আকাশের নক্ষত্র, Space, God—কত সব কথা। উত্তেজনায় ঘুম হয় না। কত রাত্রে তবে এল ঘুম।

---

১ সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য; উপাসনা পত্রিকার মালিকের ছেলে।

২ একই নামে চারজনের বই আছে:

W. P. Dothie।

Rev. G. H. S. Walpole।

Harold Bayley (সম্পাদক)।

William D Howells।

৩ 'জনতার মাঝে জনগণপতি বক্ষের মাঝে দৃপ্ত মন,

জাগ্রত হও স্বাধীন ভারত জাগো মারহাটার পুত্রগণ॥'

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের গৈরিক পতাকা নাটকের গান। গানটির রচয়িতা হেমেন্দ্রকুমার রায়।

১০ই অগস্ট, ১৯৩৩। ২৫শে শ্রাবণ, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

টিফিনের সময় একবার বঙ্গশ্রীতে এলুম। তারপর আবার এলুম ছুটীর পরে। পশুপতিবাবু ফোন কর্লেন ও এলেন। তাঁর গাড়ীতে ঘোরা গেল—মীরা গাড়ীর মধ্যে বসে ছিল—অনেকদিন পরে মীরার সঙ্গে দেখা হোল। এবার ফোর্থ ইয়ারে উঠেচে বল্লে।

খুব বৃষ্টি বাদলের দিন। অনেক রাত্রে শৈলেন ও সুরেশ নন্দী[১] এলেন। তারক গাঙ্গুলীর—জীবনী সম্বন্ধে সুরেশ বাবুর সঙ্গে আলোচনা করলুম। আজও আনন্দ কালকারই মত—একটা আধ্যাত্মিক আনন্দ—এর বর্ণনা দেওয়া যায় না।

১১ই অগস্ট, ১৯৩৩। ২৬শে শ্রাবণ, ১৩৪০। শুক্রবার

Spiritualism এর বইগুলো পড়ে একটা নতুন আলো পাচ্চি জীবনে। তাই একটা চার্ট আজ তৈরী করবো, কি অনুসারে জীবন যাপন কর্ত্তে পারি। জীবনের outlook বদ্‌লে গেছে যেন— আনন্দও বটে। আনন্দও জীবনের দিতে হবে সেখাকে।

এতদিন ফাঁকা আনন্দ নিয়ে ছিলুম—কিন্তু জীবনে Selfish আনন্দের কোনো মূল্য নেই। দুঃখের মধ্যে দিয়ে, পরার্থের মধ্যে দিয়ে, মানুষের সেবার মধ্যে দিয়ে যে আনন্দ, জীবনে তাই হোক পরম সত্যের বাণী। ভগবান বল দিন। Great Angel World সাহায্য করুন।

আজ দুপুরে বঙ্গশ্রী থেকে টিকিট নিয়ে, 'মামি'[২] বলে film দেখতে যাবো ভাবলুম। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যাওয়া হোল না। 'বিচিত্রা'য় গিয়ে পরিমলের লেখাটা আন্‌লুম।

সজনী, প্রমথ বিশী ওদের সঙ্গে অনেকক্ষণ রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা' নিয়ে আলোচনা হোল। আমি 'ক্ষণিকা'র বড় ভক্ত।

সে কথায় রাত হয়ে গেল অনেক। কারণ 'ক্ষণিকা'র কথা একবার উঠ্‌লে আমি স্থির থাকতে পারি না।

১২ই অগস্ট, ১৯৩৩। ২৭শে শ্রাবণ, ১৩৪০। শনিবার

আজ সকালে সুপ্রভাদের হোস্টেলে গেলুম। সুপ্রভাকে Spiritualism এর

---

১ বিখ্যাত ফারশি কবি শেখ সাদীর কবিতার অনুবাদ করেন।

২ The Mummy ; John Balderston-এর বই। Director ছিলেন Karl Freund।

কথা শোনালুম অনেক। ওখান থেকে নীরদের বাসায়। চারুবাবু এলেন সেখানে। নীরদের ওখান থেকে বন্ধুর বাসায় এলুম। বন্ধুর বৌ চা ও খাবার খাওয়ালে। আমি আবার বিছানা এঁটো করে বস্‌লুম। জিতেন এসেচে ওর মেয়ের operation করাতে। বেলা একটায় বাসায় ফিরে খেয়ে Undiscovered Country বইটা শেষ করি। বিকেলে খুব ঝড় বৃষ্টি এল। আমি বেরিয়ে ভাবলুম 'বঙ্গশ্রী'তে যাবো। পথে ইউনিভার্সিটীর হরেকৃষ্ণ বাবুর সঙ্গে দেখা। হরেকৃষ্ণ বাবু বল্লেন সেখানে কেন আর যাবেন, খুব খাওয়া দাওয়া হোল সেখানে জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে [—] আমি সেখান থেকে আস্‌চি—সব শেষ হয়ে গেল [—] ফুটপথে বসে পড়লুম। আমি ও হরেকৃষ্ণবাবু খানিকটা গল্প কর্ত্তে কর্ত্তে খানিকটা গেলুম।

আমি College Square এ পুরনো বইএর দোকানে ঘুরে বাসায় এলুম। একটা অত্যন্ত সুন্দরী মেয়ে মোটরে যেতে দেখলুম। রাত্রে বাদলা এল।

১৩ই অগস্ট, ১৯৩৩।২৮শে শ্রাবণ, ১৩৪০। রবিবার

দুপুরের পরে নীরদবাবুদের flat এ গেলুম। এ বছর এই প্রথম তালের বড়া খেলুম—আজ নন্দোৎসব ভালই হয়েছে—এই সময় ছেলেবেলায় আমার একবার খুব পাঁচড়া হয়েছিল, আমি বসে বসে ইংরিজি ম্যাগাজিন পড়তুম—সেই একটা গল্প পড়ে আমার বালক মনে অদ্ভুত ভাব হয়েছিল। বৃন্দাবনদের[১] বাড়ী—জন্মাষ্টমীর নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলুম নন্দোৎসবের দিন—সে হোল ১৯১২ সালে। তারপর আর কখনও ওদের বাড়ী জন্মাষ্টমীতে নিমন্ত্রণ খাইনি। ২১।২২ বছর আগেকার কথা।

প্রমোদবাবু এলেন, আজ খুব Spiritualism এর চর্চ্চা হোল। তারপর ওখান থেকে বঙ্গশ্রী আপিসে এলুম। হরেকৃষ্ণ বাবু, শৈলজা, নলিনী সরকার—সবাই এসেচে দেবেনের বিয়ের বৌভাতে নিমন্ত্রিত হয়ে।

রাত্রে সবাই গিয়ে খুব আমোদ করে খাওয়া গেল।

ছবিঘরে আজ নীরদ বাবুদের সঙ্গে গিয়ে সিনেমা দেখবার কথা ছিল—সেখানে গেলামও ফিরবার পথে [—] কিন্তু তখন ছবি আরম্ভ হয়ে গিয়েচে—

১৪ই অগস্ট, ১৯৩৩।২৯শে শ্রাবণ, ১৩৪০। সোমবার

স্কুলে ছোট ছেলেরা আমাকে ভারী ভালবাসে। আমাকে জড়িয়ে ধরে ছুটে এসে, ছাড়তে চায় না, ভয়ও করে না।

---

১ বৃন্দাবন গোস্বামী, বারাকপুরবাসী।

স্কুলে যাবার আগে ইউনিভার্সিটী গেলুম ফর্ম্ম নিতে। তারপর এলুম বঙ্গশ্রীতে। সেখানে সুনীতি বাবুর সঙ্গে দেখা হোল—তিনি কাল ঢাকা যাবেন বল্লেন। ওখান থেকে বার হয়ে পুরোনো বইদোকানের কাছে শৈলজা ও সুবলের[১] সঙ্গে দেখা—তাদের সঙ্গে কথা হোল, আগামী কাল রূপবাণীতে "Dr. Jekyl & Mr. Hyde"[২] দেখতে যাবো। তারপর গেলুম নীরদবাবুর flat এ। সেখানে সোমনাথ বাবুর আসবার কথা ছিল—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি এলেন না। আমরা আহারাদি করে আড্ডা দিয়ে অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরলুম। Electric Companyর Show room টা ভারী সুন্দর সাজিয়েচে Victoria House এ।

১৫ই অগস্ট, ১৯৩৩। ৩০শে শ্রাবণ, ১৩৪০। মঙ্গলবার

ছুটির পরে রূপবাণীতে গেলুম, কাল শৈলজার সঙ্গে কথা ছিল দুজনে 'Dr. Jekeyl & Mr. Hyde' দেখবো। কিন্তু আমি গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম কোথায় শৈলজা? দাঁড়িয়ে থেকে থেকে আমি হেঁটে রমেশবাবুর আড্ডায় এসে জমলাম। কাল সেখানে তুমুল তর্ক বাধল রাম অধিকারীর ভাইয়ের সঙ্গে Spiritualism নিয়ে। সে আবার Rationality League এর মেম্বর। সে তো ওসব মানেই না। আমি তাকে বুঝিয়ে দিলুম—চুলচেরা তর্ক রাত ৯৷৷০টা পর্য্যন্ত হবার পরে যে যার বাসায় ফেরা গেল। সে আমার সঙ্গে হ্যারিসন রোডের মোড় পর্য্যন্ত এল।

আজ রাতে বড় গরম।

১৬ই অগস্ট, ১৯৩৩। ৩১শে শ্রাবণ, ১৩৪০। বুধবার

স্কুল থেকে থ্যাকার্স স্পিঙ্কের দোকানে গেলুম। সকালে আশীস্ গুপ্ত ও মহম্মদ কাসেম এল। সিধু—মেজমামার ছেলে সিধুর সঙ্গে দেখা। সে আমার সঙ্গে স্কুল পর্য্যন্ত গেল।

স্কুল থেকে দোকানে গিয়ে বই দেখলুম। তারপর খুব বৃষ্টি এল—বেরিয়ে পরেশদের দোকানে মাংস ও পরোটা খেলুম। তারপর বঙ্গশ্রীতে খানিকটা আড্ডা দিয়ে—চাঁপাফুল[৩] কিনে মেসে ফিরলুম আমি ও পরিমল।

---

১ সুবল মুখোপাধ্যায়, আবৃত্তিশিল্পী।

২ Doctor Jekyll and Mr. Hyde। লেখক Robert Louis Stevenson। Director Rouben Mamoulian।

৩ প্রথম বিবাহের স্মৃতিজড়িত বলে চাঁপাফুলের প্রতি বিভূতিভূষণের একটা দুর্বলতা ছিল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর মেসে থাকার সময় তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যায় চাঁপাফুল কিনতেন। অপরাজিতের অপুরও চাঁপাফুল-প্রীতি লক্ষণীয়।

রাত্রি অন্ধকার। বারান্দায় মাদুর পেতে শুয়ে অনেক রাত পর্য্যন্ত নানা কথা ভাবলুম। আজ ৩১শে শ্রাবণ,[১] কাল ১লা ভাদ্র। দিনটা স্মরণীয় দিন বটে।

১৭ই অগস্ট, ১৯৩৩। ১লা ভাদ্র, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

সকালে P. C. Sircar এল। তারপর স্কুলে গেলুম—টিফিনের সময় একবার গেলুম বঙ্গশ্রীতে। বৈকালে ওদের আপিস্ হয়ে গেলুম থ্যাকার্সের ওখানে বই কিনতে গেলুম। ফিরে বঙ্গশ্রীতে এসে দেখি খুব আড্ডা বসেচে। কৃষ্ণধন বাবু, মনোজ বসু ইত্যাদি। পশুপতি বাবু এলেন—তাঁর মোটরে বাসায় ফিরলুম —বেজায় বৃষ্টি। মীরা ছিল গাড়ীতে, তার সঙ্গে একটু তর্ক হোল। রাত্রে কৃষ্ণধন এসে চপ খাইয়ে গেল। শৈলেনও এল।

১৮ই অগস্ট, ১৯৩৩। ২রা ভাদ্র, ১৩৪০। শুক্রবার

স্কুলের পর আমি, পরিমল, সুকুমার সেন, সজনী সবাই থ্যাকারের ওখানে বই দেখতে গেলুম। ভয়ানক বৃষ্টি-বাদল চল্‌চে। বই কিনে বাইরে এসে দেখি খুব বৃষ্টি—ট্রামে বাসায় চলে এলুম। আজ সকালে সেই মুসলমান গল্প লেখক ছোকরাটী এসেছিল।

১৯শে অগস্ট, ১৯৩৩। ৩রা ভাদ্র, ১৩৪০। শনিবার

এদিন ছুটীর পরে বঙ্গশ্রী আপিসে গেলুম। সজনী ও কিরণ চা আনালে ও তারপর একটা কথা নিয়ে তর্ক বাধালে। আমি সেখান থেকে বেরিয়ে বউ বাজার থেকে খাবার কিনে বরিশাল এক্সপ্রেস ধরলুম। ঝড় বৃষ্টি। তার আগে সিধুকে ১১টার গাড়ীতে বনগাঁয়ে পাঠিয়েছিলুম। মোটর থেকে নেমে দেখি সিধু মোটরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। বাসায় গিয়েই রাত্রে দেখি তালের বড়ার আয়োজন হয়েচে। আমি বীরেশ্বর বাবুর ওখানে গিয়ে অনেকক্ষণ কাটালুম। তারপর বিভূতির সঙ্গে দেখা কর্ত্তে ক্লাবে গেলুম। ক্লাবে সবাই বললে কাল আসতে, বই Selection এর মিটিং আছে। রাত্রে এসে তালের বড়া খাওয়া গেল। মাঝ রাত্রে বৃষ্টি পড়তে লাগলো [—] ঘরে উঠে পড়লুম [।]

২০শে অগস্ট, ১৯৩৩। ৪ঠা ভাদ্র, ১৩৪০। রবিবার

সকালে উঠে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করলুম। সে আজ খুব মদ খেয়েচে। বিপ্রদাস বাবু[২] সেখানে বসে আছে। বেলা ১১টার সময় আমি ও দেবেশ মোটরে বারাকপুরে গেলুম। পুঁটি দিদি বল্লে আজ সইমার তিথি। খাওয়া গেল। পথে

---

১ এই দিনে বিভূতিভূষণের সঙ্গে গৌরীর বিবাহ হয়।

২ বিপ্রদাস বিশ্বাস, বনগাঁবাসী।

বেজায় জলকাদা। এবার বেজায় বর্ষা। দেশ ভেসে গিয়েচে। বাঁশবাগানের বরোজপোতার ডোবার জল আমাদের তেঁতুলতলার কোল পর্য্যন্ত এসেচে। তবুও অদ্ভুত রূপ। ইছামতী দেখলুম না—সময় হোল না। চিন্তের[1] বাড়ীর বাগানের একটা গাছের গায়ে কত মাকাল ফল পেকে গাছ আলো করে আছে। ছেলেবেলায় এই ফল বড় ভালোবাসতুম—এখনও বাসি। দুপুরের পর বনগাঁয়ে এসে খেয়ে ওপারে জিতেনের[2] ডাক্তার খানায় যাই। রাত্রে আমি ও বিভূতি ক্লাবে বই Selection করলুম। বীরেশ্বর বাবুকে বই দিলুম রাত্রে।

২১শে অগস্ট, ১৯৩৩। ৫ই ভাদ্র, ১৩৪০। সোমবার

সকালে সকালে আজ আহারের বন্দোবস্ত হোল কারণ আজ গ্রহণ—কঙ্কণ গ্রাস। সিধু সকালে মুড়ি কিনে আন্‌লে। আমি স্নান করে গিয়ে দেখি ননীদা[3] মাছ ধরবার যোগাড় করচে। একটা নালফুল[4] তুলে আন্‌লুম। তারপরে বসে ? Moses এর বই পড়তে লাগলুম। তিনু এল—বন্ধুর ভয়ে পালিয়ে এসেচে। খাওয়া সেরে অনেকক্ষণ ধরে বীরেশ্বর বাবুর বাসায় গিয়ে আলোচনা হোল নানা বিষয়ে। তারপর সেখানে গ্রহণ দেখলুম। থার্ডমাস্টারের সঙ্গে চাষ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হোল। তিনি বল্লেন চাষে তার সুবিধে নেই—বিশেষ ভদ্রলোকের। বৃষ্টি এল—থামে না। তারপর বাসায় এলুম। তারপর সে কি ঘোর বৃষ্টি! ভোলানাথ বাবু দেশ থেকে এসেচেন—বল্লেন দেশে ধান ভেসে গিয়েচে বৃষ্টিতে। বৈকালে ট্রেনে এলুম—দুধারের কি অপূর্ব্ব শোভা! ? এর বইখানা পড়তে পড়তে চারিধারে চেয়ে সে সবুজ বন ও মাঠ দেখে সন্ধ্যায় সে কি আনন্দ!

২২শে অগস্ট, ১৯৩৩।৬ই ভাদ্র, ১৩৪০। মঙ্গলবার

সকালে পি সি সরকারের ছেলে এল। আমি স্কুল থেকে বঙ্গশ্রীতে গেলুম—সেখানে শুনলুম বুদ্ধদেব বসু আমার নামে এক Lampoon লিখেচে উত্তরাতে। তাই নিয়ে নীরদ প্রবাসী থেকে ফোন্ কল্লে। আমরা অনেকক্ষণ তাই নিয়ে আলোচনা কল্লুম। তারপর ওখান থেকে বেরিয়ে আমি ও চৈতন্যদেব এলুম গলির মধ্যে দিয়ে—M. C. Sircar এর দোকানে। সেখানে গল্পগুচ্ছ নিলুম

১ চিন্তে হালদার, বারাকপুরবাসী।

২ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ছয়ঘরিয়াবাসী (বনগাঁ); বিখ্যাত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যয়ের আত্মীয়।

৩ ননী চট্টোপাধ্যায় (ননী মাস্টার), বনগাঁবাসী।

৪ বাঙলায় অপর নাম কৃষ্ণবীজ; Bomoea hederacea Jacq.

ও P. C. Sircar দোকান হয়ে বাসা।

রাত্রে অন্ধকার আকাশের তলে বাইরের বারান্দায় শুয়ে অনেকদিন পরে নানা চিন্তা করলুম—ঈশ্বর সম্বন্ধে। এ ধরনের গভীর চিন্তা অনেকদিন করি নি।

২৩শে অগস্ট, ১৯৩৩।৭ই ভাদ্র, ১৩৪০। বুধবার

সকালে মহিমবাবু ও আশীষ গুপ্ত এলেন। বেশ বৃষ্টির মধ্যে স্কুলে গেলুম। স্কুলে খুব সুন্দর রৌদ্র উঠল—নীলাকাশ চোখে পড়ল। অনেকদিন পরে ছুটীর পরেই বউবাজার থেকে ভুট্টাপোড়া কিনে বাসায় এলুম—আর বছরের মত। সন্ধ্যার সময় একটু বেরিয়ে P. C. Sircar এর দোকানে গিয়েছিলুম। ফেরবার পথে পরিমলের সঙ্গে দেখা। ? খোঁজ করে চা এর দোকানে পেলুম না।

বাসায় এইমাত্র ফিরি।

২৪শে অগস্ট, ১৯৩৩।৮ই ভাদ্র, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

সকালে এল টরু ও নুটু। নুটুকে বারাকপুরের বাড়ী কেনার প্রস্তাবের কথা বল্লুম।[১] তারপর টরুর সঙ্গে স্কুলে গেলুম। সেখান থেকে বার হয়ে বঙ্গশ্রী আপিসে যাই। তারপর বই কিনে এনে বাড়ী বসে পড়ছিলুম। সন্ধ্যার দিকে মেঘ হোল। সুন্দর মেঘ বারান্দায় বসে দেখ্‌লুম।

২৫শে অগস্ট, ১৯৩৩।৯ই ভাদ্র, ১৩৪০। শুক্রবার

সকালে প্রথমে এল শৈলেন 'ছায়াগীতা'র সমালোচনার জন্যে। একটা দিলুম লিখে। এদিকে Spiritualism এর বই পড়বার জন্যে খুব ব্যস্ত রয়েছি। তারপর এল মহিমা বাবু। বল্‌তে যে অমলের বাড়ী থেকে আপনাকে নিমন্ত্রণ কর্ত্তে আস্‌বে। তারপর এল পি. সি. সরকার। তারপর এল মুসলমান সাহিত্যিক দুটী—তারপর আবার মহিমা ও তার দুই বন্ধু।

স্কুল থেকে বঙ্গশ্রীতে গেলুম। সজনীর সঙ্গে তুমুল তর্ক। তারপর এল দেবী ও জ্ঞান দা। জ্ঞান দা লোকটা সত্যই ভালো। ঈশ্বর সম্বন্ধে কথা খুব আগ্রহ করে শুনলে।

বৃষ্টি এল [—] ক'জনে ওখান থেকে বার হয়ে বাইরে এলুম। জ্ঞান দা একখানা বায়োস্কোপের টিকিট দিলে—আস্‌বার সময় নুটুকে দিয়ে এলুম [—] ?

১ বিভূতিভূষণের বারাকপুরের বর্তমান জমি-বাড়ি মায়ের বন্ধু কাদম্বিনী দেবীর (সইমা) কাছে কেনা। মায়ের অনেকদিনের সাধ ছিল জমিটা কেনার। তারই কথা চলছিল। কেনা হয় অবশ্য আরও পরে ১৯৩৮এর পুজোর সময়।

আলো জেলে পড়চে—অনেকদিন পরে দেখ্‌লুম—কিন্তু তখন বৃষ্টি পড়চে—ছাতা নেই—এজন্যে গেলুম না।

২৬শে অগস্ট, ১৯৩৩।১০ই ভাদ্র, ১৩৪০। শনিবার

নীচের ক্লাসে, অঙ্কের পরীক্ষা নিয়ে ওপরের ছাদে চলে গেলুম। আজ পরিপূর্ণ শরতের রৌদ্র উঠেচে—আকাশের রং অদ্ভুত ধরনের নীল—ছুটীর পরে কতক্ষণ ছাদে একা একা দাঁড়িয়ে 'জনতার মাঝে ".নগণ পতি' গানটা গাইলুম। মেঘস্তূপ চারিধারে—তাদের রংও অতি সুন্দর। তারপর তিনটার পরে বেরিয়ে নেড়ার সঙ্গে দোকানে দেখা করে নীরদ বাবুর flat এ গিয়ে খুব আড্ডা দিলুম ও সেখানেই খেলুম। প্রমোদ বাবুও এলেন। রাত এগারোটার সময় বাড়ী এলুম।

বাড়ী এসেই চক্ষুস্থির। প্রবাসী চিঠি দিয়েচে কালই লেখার কপি চাই[১]। এদিকে আমার লেখা এগুই নি [এগয়নি]। কি উপায় যে করি?

২৭শে অগস্ট, ১৯৩৩।১১ই ভাদ্র, ১৩৪০। রবিবার

সকালে রাধা এল, তারপর এল অমিয় শ্রীরামপুর থেকে। আমি খুব সকালে কালকার রাত্রে রাঁধা পোলাও খেলুম। একটু ঘুমিয়ে নীরদ বাবুদের ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখি শুধু নীরদ বাবুর স্ত্রী আছেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে প্রমোদ বাবু ও নীরদ বাবু এলেন। আমরা মোটরে বেলুড় গেলুম। কিন্তু সে বাড়ীটা অন্য ভাড়াটে এসেচে। আমরা একটা বাঁধাঘাটে গেলুম—কি সুন্দর বৈকালের আকাশ, মেঘস্তূপ [—] দূরে বালি ব্রীজ। সেখান থেকে লিলুয়া একটা বাগান বাড়ী গেলুম। তারপর ফিরে এসে ফ্ল্যাটে জেলি দিয়ে লুচি ও চা খেয়ে রাত সাড়ে নটা পর্য্যন্ত কেবল তর্ক হোল পুজোয় কোথায় যাওয়া যাবে। কেউ বলে নাগপুর, কেউ বলে ভিজাগাপটন্, কেউ বলে চুনার। কিছুই শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হোল না। এইমাত্র ট্রামে বাসায় ফিরে এলুম। হাওয়া নেই আজ, বেজায় গরম।

২৮শে অগস্ট, ১৯৩৩।১২ই ভাদ্র, ১৩৪০। সোমবার

সকালে উঠেই শ্যামবাজারে গেলুম নভেলের কপি নিয়ে প্রবাসীর জন্যে নীরোদের কাছে। সেখানে কতকগুলি ষ্টিরিওস্কোপিক ছবি দেখ্‌লুম অতি অপূর্ব্ব। সত্যিই ভারতবর্ষে এমন সুন্দর সব দেশ আছে। দ্বারিক ঘোষের দোকানে লুচি খেয়ে ট্রামে স্কুলে এলুম। সেখান থেকে বার হয়ে ইউনিভার্সিটীর

১ দৃষ্টিপ্রদীপ। এই বছর ফাল্গুন মাস থেকে প্রবাসীতে উপন্যাসটি বেরতে শুরু করে।

চাকতি খানা নিয়ে গেলুম ইউনিভার্সিটীতে[১]। পথে সঙ্গে গেল শান্তি। চেক্ বার করে নিয়ে প্রেসে ধীরেনের সঙ্গে দেখা করলুম—তারপর বাসায় এলুম। একটু পরে করুণা এল। তার সঙ্গে গল্প কর্ত্তে কর্ত্তে বেরিয়ে পড়লাম—বইয়ের দাম সম্বন্ধে পি. সি. সরকারের সঙ্গে কথা বার্ত্তা হোতে লাগল[২]। আমি ও সরকার গোলদিঘীর বেঞ্চিতে গিয়ে বসলুম।

অনেক রাত্রে এসে দেখি নগেন চাকর মেস্ ছেড়ে পালিয়েচে [—] রান্না হবে অনেক রাত্রে। বসন্ত কোনো রকমে চালিয়ে নিলে।

২৯শে অগস্ট, ১৯৩৩। ১৩ই ভাদ্র, ১৩৪০। মঙ্গলবার

স্কুল থেকে বঙ্গশ্রীতে গেলুম লেখার কপি দিতে।[৩] চা ও সিগারেট খেলুম—সুশীল দে ঢাকা থেকে এসেচেন—দেখা হোল। একটু পরে ব্রজেনদা এলেন প্রবাসী থেকে। বল্লেন কেদারবাবু লেখা শেষ করে দিতে বলেচেন। ভাবলুম পূজোর ছুটীতে বসে বসে লিখবো। ওখান থেকে বাড়ী আসবার পথে বৃষ্টি এল। পথে একটা জায়গায় দাঁড়ালুম। তারপর বাসায় এসে কামিয়ে স্নান করে কাপড় চোপড় পরলুম। একটু পরে অমল ও মহিমা নিতে এল। প্রথমে মণীন্দ্রবাবুর বাড়ী গেলুম। মণি বল্লে আলাদা একটা ভাল ঘরে থাকো। আমিও তাই ভাবচি। তারপর আমরা সবাই হেঁটে বালিগঞ্জে গেলুম। বেশ বড় লোকের বাড়ী। অনেকগুলি ছেলে জুটেছিল। বাড়ীর একটি মেয়ে গান করলে। তারপর বেহালা বাজানো হোল। রাত ১০টার সময় খাওয়ার ডাক পড়ল। আহারাদির পরে ওরাই মোটরে করে পার্কসার্কাসে পৌঁছে দিয়ে গেল। ওখান থেকে বাসে চলে এলুম। মনে ছিল না যে এই সেই জন্মাষ্টমীর রাত্রির পরদিন।[৪] সেই বারাকপুরের ভাঙা ভিটে বাড়িতে আজ—না জানি কত গাছই গজিয়েচে!

৩০শে অগস্ট, ১৯৩৩। ১৪ই ভাদ্র, ১৩৪০। বুধবার

সকালে উঠে সুপ্রভাদের হোস্টেলে গেলুম প্রথম। সেখান থেকে বন্ধুর বাসা। বন্ধুর বউ চা ও পরেটা খেতে দিলে। সেখান থেকে সোজা স্কুলে এল অবনী

---

১ বিভূতিভূষণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলার পরীক্ষক ছিলেন। তারই পারিশ্রমিক অর্থাৎ চেক তিনি আনতে যান চাকতি বা tokenটা দিয়ে।

২ যাত্রাবদল; প্রথম সংস্করণের দাম ছিল দেড় টাকা।

৩ 'সমুদ্রতলে নূতন জগৎ', বঙ্গশ্রী, মাঘ, ১৩৪০।

৪ গৌরী তখন বেঁচে। ১২ই ভাদ্র (১৩২৫) জন্মাষ্টমীর ছুটিতে বিভূতিভূষণ বারাকপুরে গিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

রায়। অবনীবাবু মীরাটে বদলী হয়েচে, শনিবারে farewell হবে, সেকথা বলতে। আমি পড়ছি Wasserman [Wassermann] এর World's illusion[১] নামে নভেলখানা। স্কুল থেকে বেরুচ্চি পণ্ডিত মশাই বল্লেন খাবার নিয়ে যাচ্চি [—] M. A & ? এর মিটিং। আমি প্রথমে বঙ্গশ্রী, সেখানে এলেন সুকুমার সেন। সেখান থেকে ট্রামে আশীস্ গুপ্তের বাড়ী। চা ও খাবার খাওয়া হোল, গল্পগুজবও হোল। তারপরে দুজনে বেরিয়ে দক্ষিণাবাবুর বাড়ী এলুম। জ্যোৎস্না পাশ করেচে, লেক স্কুলে মাস্টারী করচে। সেখান থেকে বার হয়ে দোতলা বাসে আমি ও আশীসবাবু এলুম কলকাতায়। আমি এলুম পি. সি. সরকারের দোকানে। চেকের টাকা আনেনি বল্লে। বাসায় এসে স্নান কর্লুম। খুব রৌদ্র ছিল আজ, খুব হাওয়া আছে। আজও জন্মাষ্টমীর তৃতীয় দিন। তামাক খেতে খেতে সে কথা মনে হোল।

৩১শে অগস্ট, ১৯৩৩। ১৫ই ভাদ্র, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

সকালে স্কুলে গেলুম। Wasserman এর বইখানা পড়চি—খুব ভাল লাগচে। স্কুল থেকে হেঁটে এলাম P. C. Sircar এর দোকানে—চেকে টাকা নিয়ে ঢুকলাম ইউনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউটে, সেখানে আজ Foundation day celebration এর খাওয়া আছে। ওখানে বুড়োর সঙ্গে দেখা হোল —এবার বি. এ. ফেল করেচে। দেখে বড় আনন্দ হোল। তারপর বাসায় এসে বই পড়চি, করুণা এসে বল্লে রিপন কলেজের সাহিত্য ইউনিয়ন থেকে আপনাকে অভিনন্দন দেবে। দুজনে বেরিয়ে কলেজ স্কোয়ার পর্য্যন্ত পৌঁছেচি—এমন সময় ঘোর বৃষ্টি। একটা জায়গায় দাঁড়ালুম। তারপর বাসে ভবানীপুর হরেনের বাড়ী। হরেনের ছেলে বেশ বড় হয়েচে দেখে তো আমি অবাক। সেখানে বসে পুরোনো আমলের গল্পগুজব করলুম। তারপর আহারাদির পরে বাসে চলে এলুম বাসায়। চমৎকার জ্যোৎস্না, বারান্দায় এসে পড়েচে—শুয়ে ভারী আরাম হোল—তাই ভাবি কলকাতা না হোলে রাত্রে ঘুম হবে আর এমন কোথায় ?

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ১৬ই ভাদ্র, ১৩৪০। শুক্রবার

সকালে হুটু ও অবনী রায় এল। স্কুলে গেলুম—১২।।০ টায় ছুটী হয়ে গেল —আমি বার হয়ে বঙ্গশ্রীতে গেলুম। সেখান থেকে কিরণবাবুর কাছ থেকে পয়সা নিয়ে নেড়ার দোকানে গিয়ে ওর দশটা টাকা নিয়ে এলুম। তারপর

---

৩ Jakob Wassermann ; অষ্ট্রীয় সাহিত্যিক।

থ্যাকার স্পিঙ্ক এর দোকানে গিয়ে দেখি বইগুলো ঠিক রেখে দিয়েচে। সাহেব বল্লে তুমি নিয়ে যাবে নাকি? ওখান থেকে ট্রামে স্কুল। একটু পরে চারু বিশ্বাস এলেন। তাঁর সঙ্গে বিলাতের গল্প করলুম। সভা হোল, আমি মানপত্র পড়লুম। তারপর ভূরিভোজন হোল। চা খেয়ে আমি ও ক্ষেত্রবাবু বউবাজার দিয়ে বাসায় চলে এলুম। ক্ষোবাবু একটা কোকো আমাকে উপহার দিলেন।

আজ বৃষ্টি নেই, খুব হাওয়া, আকাশে ঘোলা ঘোলা মেঘ। স্নান করলুম বাসায় এসে। একটু ভাবলুম—অনন্ত বিশ্বের কথা, নক্ষত্র জগতের কথা।

২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ১৭ই ভাদ্র, ১৩৪০। শনিবার

Engagement এর ভিড়ে কলিকাতায় জীবন দুর্ব্বিষহ হয়ে পড়েচে; সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শুধু engagement আর engagement! এ সেই ভাগলপুর নির্জ্জন জীবনের ঠিক উল্টো। আজ সকালে রিপণের ছেলেরা এল আমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে সেই reception দেওয়া সম্পর্কে। তারপর মহিমা এল। তারপর স্কুল থেকে গেলুম নীরদবাবুর ওখানে। পথে দেবব্রতের সঙ্গে দেখা। নীরদবাবুর ওখানে চা খেয়ে গল্প করে এলুম বঙ্গশ্রীতে। সেখান থেকে সবাই মিলে গেলাম ব্রডকাষ্টিং স্টেশনে। করুণাও সেখানে ছিল। সেখানে বক্তৃতা হোল। ওখান থেকে বেরিয়ে সোজা এলুম অবনী রায়ের অভিনন্দন সভায় বেচু চাটুয্যে স্ট্রীটে। উপেন গাঙ্গুলী সভাপতি। সুশীলবাবু এসেছিলেন, আমার খোঁজও করেছিলেন—দেখা হয় নি। জলযোগ সেরে আমি ও রমেশবাবু বেরুলাম। উপেন সিংহ মশায়ের সঙ্গে দেখা হোল অনেককাল পরে। বৃদ্ধকে ভাল লাগে বড়। এসে দেখি রসচক্র সংসদ[১] থেকে ওদের বার্ষিক উৎসবে যাবার জন্যে বলে গিয়েছে।

Engagement এর চোটে আর পারিনে।

৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ১৮ই ভাদ্র, ১৩৪০। রবিবার

সকালে উঠে রাধা এল। দুজনে চা খেলুম—তারপর আমি বাসে গেলুম বনহুগলী O. C. Ganguly[২]-র বাগানবাড়ীতে, রসচক্রের উৎসবে। মুরলী, নৃপেন, কালিদাস রায়, সত্যেন সবাই এল। খুব গল্পগুজব খাওয়া দাওয়া হোল। আমি খুব সকালে গিয়ে পৌছোলাম। সুন্দর ঘরখানি বাগানবাড়ীর—বসে

---

১ কালিদাস রায়ের প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যসভা; ওঁরই বাড়ি ১৫নং রাজা বসন্ত রায় রোডে অধিবেশন বসত। শরৎচন্দ্র এই আসরে আসতেন।

২ অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শিল্প-সমালোচক।

লিখ্‌তে বেশ আরাম। বেলঘরের এক ভদ্রলোক অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে খাওয়ালেন। ওখান থেকে বার হয়ে হেঁটে এসে বালি ব্রিজে এলুম। দুধারে কত সব বাগান-বাড়ী—গঙ্গার জলে ডুবুডুবু হয়ে আছে--আমার শৈশবের কথা, হুগলীর কথা[১] মনে করিয়ে দেয়। নরেন দা বল্লেন চিত্রকূটে যাচ্চেন। বালি পুল পার হয়ে ট্রেনে এলুম শ্রীরামপুরে। দিনটা বেজায় গুমট। রোদ নেই, চাপা রোদ মেঘের আড়ালে। লীলাদিদির সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প হোল। তারপর পাবলিক লাইব্রেরীর মিটিং শেষ করে খুকীদের বাড়ী গেলুম। খুকীর ছেলেটি—যাকে আমি ভালবাসি খুব—তার জ্বর হয়েচে। খুকীর ননদ এসে তার বরের জন্যে চাকুরী করে দিতে বল্লে। অনেকক্ষণ বসে গল্প কল্লে। বেশ মেয়েটা [—] ইংরিজিও জানে। দিদির বাড়ী ফিরে এসে বাইরের ছাদে বসে খাওয়া ও গল্প হোল। বেশ জ্যোৎস্না—তবে হাওয়া নেই। মেসে ফিরে এসে বারান্দায় শোয়া গেল—জ্যোৎস্না ভরা বারান্দা। শেষ রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল—জ্যোৎস্না ফুট ফুট করচে। চাঁদের দিকে চাইতে পারি নে।

৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ১৯শে ভাদ্র, ১৩৪০। সোমবার

সকালে মনটা আজ কেন যে খুসি হোল, তা কিছু বুঝতে পারলুম না। আকাশ ঘন নীল, প্রখর রৌদ্র শরতের—রৌদ্রে বসে বসে রবীন্দ্রনাথের 'উষা দিশাহারা নিবিড় তিমির আঁকা'[২] এই কবিতাটী আবৃত্তি করলুম। মনে যে কি আনন্দ, সে আর বল্‌তে পারি না।

তারপর স্কুলে গেলুম। স্কুল ২-৪০ মিনিটে ছুটী হয়ে গেল। শ্যামবাজার পর্য্যন্ত ট্রামে বেড়িয়ে এলুম। সকাল সকাল তামাক কিনে বাসায় ফিরলুম। স্নান করলুম। কৃষ্ণধন বাবু এলেন। শুনলুম পশুপতি বাবু এসেছিলেন সন্ধ্যাবেলা।

৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ২০শে ভাদ্র, ১৩৪০। মঙ্গলবার

সকালে 'সমাচার' ও 'পূর্ব্বাশা'[৩] থেকে লোক এল লেখা নিতে। আমি দিতে পারবো না বল্লুম অবিশ্যি। স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী। সেখানে এলেন সুনীতি বাবু। ওখান থেকে গেলুম ট্রামে শ্যামবাজার। নীরদের বাড়ী গিয়ে দেখি নীরদ

---

১ কথকতা উপলক্ষে বিভূতিভূষণ বাবার সঙ্গে হুগলি জেলায় শাগঞ্জ-কেওটায় যান।

২ 'দুঃসময়', কল্পনা।

৩ 'অপুর ডায়েরী', ১৩৪০, আশ্বিন। পরে এটি স্মৃতির রেখা গ্রন্থে সংকলিত হয়।

নেই। এলুম বন্ধুর বাড়ী—বন্ধুর বউ একা রয়েচে। নীরদের ওখান থেকে ষ্টিরিওস্কোপ নিয়ে বাসায় ফিরলুম। আজ রবীন্দ্রনাথের ঐ কবিতাটি—আছে শুধু পাখা আছে মহা নভঃ অঙ্গন'[১] মনে বড় আনন্দ দিয়েচে—সর্ব্বদাই ওটার আবৃত্তি করচি মনে মনে।

টকুদের আবৃত্তি করে শুনালুম।

শেষ রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল। চাঁদের জ্যোৎস্না বারান্দায় পড়েচে। ভোরের হাওয়া দিচ্চে। ক্ষুদুর বাবা উঠে বাইরে এল। কত কথা মনে পড়ে যায় এই শরতের প্রত্যূষে। কত শৈশবের মধুর বার্ত্তা, জীবনের কত আনন্দময় অভিযান!

৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ২১শে ভাদ্র, ১৩৪০। বুধবার

স্কুলে যেতে দেরী হয়ে গেল, বঙ্গশ্রীর জন্যে গল্প লিখতে। স্কুল থেকে মোটরে নীরদ বাবুর flat। পথে রঞ্জনের সঙ্গে দেখা, তাকে stereoscope এর ছবি দেখালুম। তারপর চা খেয়ে নীরদ বাবুদের ছবি দেখালুম। খুব বৃষ্টি এল। তারপর ট্রামে বাগবাজারে পশুপতি বাবুর কাছে। চা খেয়ে গল্পগুজব করলুম। ওখান থেকে নীরদের বাড়ী। নীরদের স্ত্রী ছিল—আরও অনেক slide দেখলুম। মলিনা[২] এল, কিন্তু এরা আলাপ করিয়ে দিতে ভুলে গেল। কথা হোল একদিন সুপ্রভাকে নিয়ে আসবে slide দেখাতে। বাসে ফিরলুম ৯॥০ টার সময়ে।

৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ২২শে ভাদ্র, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

এদিন নীরদবাবুর flat এ রাত্রে নিমন্ত্রণ ছিল। স্কুলে Inspector আসার দরুণ সকালে ছুটী হয়ে গেল। বঙ্গশ্রী আপিসে বসে রাত ৮টার পর পর্য্যন্ত আড্ডা দিলুম [।] তারপর নীরদ বাবুর flat এ গিয়ে রাত্রে আহার করে বাড়ী ফিরলুম রাত দশটায়। কাল বাড়ী যাবো।

৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ২৩শে ভাদ্র, ১৩৪০। শুক্রবার

সকালে ৭॥০টার গাড়ীতে বাড়ী এলুম। কি সুন্দর শরতের প্রাতঃকাল—লতায় লতায় শিশির, নবীন সূর্য্যালোক। বাঁধের ধারে ধারে কি চমৎকার বেগুনী বনকলমীফুল ফুটেচে, ভাগলপুরের ধারের একরকম ফুল ফুটেচে—প্রত্যেক খাদে, ডোবাতে নালফুল। তারপর গাছে গাছে—মাকালফল পেকে দুলচে—কি চমৎকার।····· বনগাঁয়ে এসে দেখি সিধু ঝগড়া করে চলে গিয়েচে। বৈকালে হাট করে এলুম—তারপর ক্লাবে গেলাম। বীরেশ্বর বাবুও ছিলেন। পিছনের

---

১ 'দুঃসময়', কল্পনা।

২ ? মলিনা চট্টোপাধ্যায়, বারাকপুরবাসিনী; খুকুর ননদ।

বারান্দাতে বসে আমি ও বীরেশ্বর বাবু গল্প করি। গাড়ী থেকে নেমেই আমি খয়রামারির দিকে বেড়াতে গেলুম—কি সুন্দর, বৈকালেও একবার গেলুম—সেই বেগুনী রং এর বনকলমী ফুল। জল বেজায় বেড়েচে ইছামতীর।

রাত্রে চাঁদ উঠ্‌ল। শিয়ালদহ স্টেশনে একটা ইউরেসিয়ান টিকিট কালেক্টর দেখ্‌লুম—ভারী সুশ্রী চেহারা।

৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ২৪শে ভাদ্র, ১৩৪০। শনিবার

আজ অতি সুন্দর শরতের রোদ। সকালে মোটরে দেবেনের সঙ্গে গোপালনগর গেলুম। হাজারীর অসুখ—ওদের দোতলায় গিয়ে দেখ্‌লুম। পঞ্চানন ঘোষকে[১] জমির কথা বল্‌লুম।

বৈকালে নৌকায় সাতভেয়ে তলায় বেড়াতে গেলাম। এক মুহূর্ত্তে মনে হোল কোথায় লাগে উড়িষ্যার পাল্লাহাড়া স্টেটের বনভূমি, কোথায় বা হিমালয়ের sublime সৌন্দর্য্য। কূলে কূলে ভরা ইছামতী—ঝোপে ঝোপে ভায়োলেট্ বনকলমী ফুল—এদিকে আবার বেতের ঝোপ ঘন সবুজ, সে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। সে সৌন্দর্য্যের তুলনা হয় না। সাতভেয়ে ঠাকুরতলায় যখন গেলাম, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। প্রকাণ্ড বটগাছটা সন্ধ্যায় অন্ধকারে যেমন প্রশান্ত, গম্ভীর—তেমনি রহস্যময় দেখাচ্চে। কিছু খাবার কিনে খেয়ে আবার নৌকায় উঠ্‌লাম। আসবার সময় সে কি অপূর্ব্ব রূপ আকাশের, নদীজলের। মেঘের রং বদ্‌লে গেল—নদী-জল রাঙা হয়ে উঠেচে। ধারে ধারে ক্ষেতে সন্ধ্যায় ঝিঙেফুল ফুটেচে। কত শান্তি মনে এনে দেয়—চারি ধার নিস্তব্ধ, দূরে বহুদূরে পশ্চিম আকাশে শুক্রতারা উঠেচে। মনে হোল আমার স্থান এই পাড়াগাঁয়ে। নদীতীরের ছোট্ট কুটীরে। কল্‌কাতায় নয়—এদেরই কথা আমায় লিখ্‌তে হবে [—] এই ঝিঙেফুলের কথা —এই সহজ জীবনের কথা। জার্ম্মানি থেকে ধার করে আনা complex জীবন সমস্যা আমাদের দেশের নয়। রাত্রে দেবেন ও আমি, মিতে ক্লাবে বসে গল্প করলুম।

১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ২৫শে ভাদ্র, ১৩৪০। রবিবার

সকালে উঠে স্নান সেরে এলাম। বন্ধুর সঙ্গে গল্প করলুম খানিকটা। প্রভাতটা ভারী সুন্দর আজ—নির্ম্মল শরতের প্রভাত। মিতের আড়তে বসে অনেকক্ষণ গল্প করা গেল। সে আধ সের জিলিপী কিনে নিয়ে এল, আমাদের সবারই জন্যে। চা সহ সেগুলির সদ্ব্যবহার করলুম সবাই মিলে। বৈকালের ট্রেনে

১ বারাকপুরবাসী।

কল্‌কাতায় এলুম—আমি, শশধর ও সুনীল। বৈকালের আকাশের শোভা সত্যই অপূর্ব্ব। রাত্রে করুণা এল, তখন বাইরে শুয়ে আছি। রিপণ কলেজের সম্বর্দ্ধনা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলে গেল।

১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ২৬শে ভাদ্র, ১৩৪০। সোমবার

সকালে রিপন কলেজের ছেলেরা আবার এল। নিরঞ্জন সাহা আর্টিস্ট এল, ললিতের ভাই এল। আমি স্কুল থেকে তিনটের সময় বঙ্গশ্রীতে গেলুম। সেখান থেকে আমি, সজনী ও কিরণ রবীন্দ্রনাথের বাড়ীতে রওনা হলুম। বিশেষ কাজ ছিল। পথে সুনীতি বাবু উঠ্‌লেন। আমরা বাইরে বসে আছি, সুধীর কর[1] খবর দিতে গেল ওপরে [—] এমন সময় এলেন পশুপতি বাবুর স্ত্রী মোটরে। একটু পরে পশুপতি বাবুও এলেন। আমি তাঁদের সঙ্গে সঙ্গীত সম্মিলনীতে এলুম। ধূর্জ্জটী বাবুর[2] বক্তৃতা হচ্চে [—] এখানে প্রমথ বাবু আছেন। সোমনাথ মৈত্র এলেন। ওঁদের সঙ্গে আলাপ হোল—গিরিজাপতি বাবুর সঙ্গেও আলাপ হোল। তারপর আমরা সবাই ফিরলুম রাত্রে। এসে শুনলুম করুণা এসেছিল। বসে থেকে থেকে চলে গিয়েচে।

১২ই সেপ্টেম্বর. ১৯৩৩। ২৭শে ভাদ্র, ১৩৪০। মঙ্গলবার

সকালে স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী গেলুম। সেখানে অনেকক্ষণ আড্ডা দেওয়ার পরে ট্রামে বাসায় এলুম। তারপর সুশীল বাবু এলেন রিপণ কলেজে আমায় নিয়ে যেতে। গিয়ে দেখি সুন্দর ব্যবস্থা হয়েচে—কলেজের কমনরুমে। সেখানে ছেলেরা আমায় অভিনন্দন দিলে—প্রমথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতি। দেখ্‌লুম আমার ভূতপূর্ব্ব পূজনীয় অধ্যাপকগণ সকলেই উপস্থিত আছেন [—] রবি ঘোষ, আনন্দ সিংহ, বটুক ভট্টাচার্য্য, দেবপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি। ১৯১৮ সাল আর আজ ১৯৩৩—১৫ বছরের পরে কলেজের কমনরুমে ঢুকে নানা ভাব মনে এল। ওরা অভিনন্দন পাঠ করলে, গলায় ফুলের মালা দিলে—। আমি কিন্তু বসে বসে ভাব্‌ছিলুম ১৯১৮ সালের কথা। অভিনন্দন সভা শেষ হয়ে গেলে জলযোগ হোল। রবি ঘোষ পাশেই বস্‌লেন—তাঁর সঙ্গে গল্পগুজব হোল। তারপর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বই সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হোল। সুশীল বাবু ও সোমনাথ বাবুর সঙ্গে গাড়ীতে ভবানীপুর গেলুম ও সোমনাথ বাবুর বাড়ীতে

১ রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারি ছিলেন; এককালে কবিতায় তাঁর খ্যাতি ছিল। কাব্যগ্রন্থের নাম সুরধনী।

২ ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

রাত ৯॥০ টা পর্য্যন্ত আড্ডা দেওয়া গেল। ফিরবার পথে দেখি বঙ্গশ্রী আপিসে আলো জলচে—ঢুকে দেখি সজনী দাস ও অশোক চাটুয্যে গল্প করচে। অশোক গাড়ী করে পৌছে দিয়ে গেল।

১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ২৮শে ভাদ্র, ১৩৪০। বুধবার

সকালে করুণা, সুধীর, মহিমা, মাখনলাল মুখুয্যে[১] ও মণীন্দ্র বসু এলেন। এদের সঙ্গে গল্পগুজব করে স্কুলে গেলুম। সেখান থেকে বঙ্গশ্রী আপিস। ওখান থেকে রাধিকা গাঙ্গুলীর[২] সঙ্গে সেণ্ট্রাল এভিনিউতে একজন ডাক্তারের ওখানে গেলুম খোকার অসুখের জন্যে। তারপর পথে এলুম পি সি সরকারের দোকানে। মধ্যে সিলেটের ছেলেটার সঙ্গে দেখা হোল। তারপর এলুম কুলদা বাবুর বক্তৃতা শুনতে থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির হলে। পথে অচিন্ত্য[৩] ও শিবরাম বেরুচ্চে M. C. Sircar এর দোকান থেকে। তারপর বাসায় এলুম কাপড় কিনে। পথে রেডিওতে নিউজ শোনবার জন্যে একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, বঙ্গলক্ষ্মীর ধীরেনের সঙ্গে দেখা। নিউজ শুনতে গেলুম না—দেখলাম আরও দেরী। নৃপেন বল্‌ছিল কালকার সভার সংবাদ associated pressএ ও দিয়ে এসেচে। সেখান থেকে রেডিওতে দেবে।

১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ২৯শে ভাদ্র, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

স্কুলে যাবার আগে আমাদের মেসের ছেলেটা আশু সান্ন্যাল নামে আর একটি ছাত্রকে নিয়ে এল। সে বেশ ভাল সনেট্ লেখে। একটা সনেট্ এনেচে বঙ্গশ্রীতে বার করবার জন্যে। বল্লে Ronsard[৪] এর অনেকগুলো সনেট অনুবাদ করেচে।

স্কুল থেকে একটা ছেলে নিয়ে গিয়ে ধর্ম্মতলার মোড়ে খুব খাওয়ালে। তারপর স্কুল থেকে থ্যাকার্সের দোকানে গিয়ে অনেকগুলো বই কিনে আনলুম। সাধু সুন্দর সিংএর একখানা বই এত ভালো লাগলো[৫]! রাত্রে অন্ধকার আকাশে ওপরে ছায়াপথ উঠেচে—আমি বাইরে বসে বইখানা পড়তে লাগলুম—

---

১ অধ্যাপক।

২ রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়; বঙ্গশ্রীর আসরে ইনি নিয়মিত আসতেন।

৩ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

৪ Pierre de Ronsard; ফরাশি কবি।

৫ এঁর নামকরা বই The Search After Reality, The Spiritual Life and the Spiritual World।

এরকম ঘনীভূত আনন্দ কতদিন যে পাইনি। দূরের ভিটের কথা মনে পড়ল: আমার অভিনন্দনের মালাতে বাবার পুঁথির একটা পাতা গুঁজে রেখেছি, সে কথা মনে পড়লো— সমস্ত নাক্ষত্রিক বিশ্বের সুদূর প্রসারী রহস্যের কথা মনে পড়লো—আমি কেমন অভিভূত হয়ে গেলুম।

১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ৩০শে ভাদ্র, ১৩৪০। শুক্রবার

শরতের অতি সুন্দর প্রভাত—কিন্তু শেফালী ফুলের গন্ধ কৈ? শিশির সিক্ত ভাজা গাছপালা কৈ? সকালে বাগবাজারের সেই বৃদ্ধটি সেদিন থিওসফিক্যাল হলে যার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল—সে এল। তারপর এল কৃষ্ণদয়াল বাবু। উলিপুর ধামশ্রেণীর বাল্যের গল্প হোল। স্কুল থেকে গেলুম শিবশঙ্করের সঙ্গে ওদের বাড়ী। পথে দ্বারিকা, আরও কয়েকটি ছেলে আমার সঙ্গে গেল। রঞ্জন থাকে উদয়ন অপিসের পেছনের Flatএ। সে আমায় দেখে দু দুবার ছুটে পালালো। উদয়ন আপিসে চা খেয়ে বসে বসে গল্প করলুম [—] তারপর শিবশঙ্করের বাড়ী গেলুম। ওর বাবা অদ্ভুতধরণের ডাক্তার। ওর ঠাকুরদাদা ১০৬ বছর বয়সে মারা গিয়েচেন ১৯২৫ সালে। সেখানেও খাবার ও চা খাওয়ালে—ওরা একটা কাগজ বার করবে তাই নিয়ে গেছল। ওখান থেকে বেলেঘাটাতে কিরণ মাসীমার বাড়ীতে এলাম। শান্তি কতকগুলো লেখা দেখালে আমায়। তারপর ওখান থেকে অনেককাল পরে প্রবোধ মামার বাসায় এলুম। রাত ৯৷৷০ টা পর্য্যন্ত গল্পগুজবে বেশ কাটল। সেখানেও চা একদফা হোল। রাত দশটায় মেসে ফিরে দেখি টুকু এসেছিল, খাতাবই রেখে দিয়েচ—কাল আবার আসবে। আজ রাত্রে যেমন অসহ্য গুমট গরম, এরকম বায়ুচলাচলশূন্য, বদ্ধ রাত্রি আমি অনেককাল কলকাতায় দেখিনি। অনেক রাত্রে ঘুম ভাঙলে দেখি বসন্ত চাকর বাসন মাজ্‌চে—রাত ৩টা।

১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩।৩১শে ভাদ্র, ১৩৪০। শনিবার

বিশ্বকর্মা পুজোর ছুটী। সকালে টুকু এসেছিল—দুপুরে ঘুমিয়ে বহুকাল পরে একটা ভারী অদ্ভুত স্বপ্ন দেখ্‌লুম। পিসিমা, মা, সইমা এদের দেখ্‌লুম অনেকদিন পরে। পিসিমার বিষয়ে মাকে বল্‌চি যেন—মা, পিসিমা কি ভালো লোক, চলে গেলে আমরা কি করে থাকবো? মা বল্‌চেন— ঠিক, যা বুলিচস্। ভরতদের[1] বাড়ীতে কার বিয়ে হবে। আবার ভাবচি ঘুমিয়ে নি— ওপাড়াতেও

[1] ভরতচন্দ্র / ভারতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বারাকপুরবাসী; কাদম্বিনী দেবীর (সইমা) ছেলে।

যেন কোথাও একটা জাঁকের বিয়ে আছে। ছেলেবেলাকার স্বপ্ন।…ঘুমিয়ে উঠে দেখি দিব্যি শরতের বিকাল—বেলা তিনটে বেজে গিয়েচে, একটা (?) মেঘলা, রোদ নেই।

তারপর শ্যামবাজারে গেলুম। দেশবন্ধু পার্কে বসে অস্ত আলোর রাঙা আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে কত কথা মনে এল।—আমি তখন নিতান্ত ছেলেমানুষ [—] সেই এক পূজোর দিন বাঁওড় থেকে নালফুল তোলা হয়েছিল —সে কথাই মনে পড়ে। বাবা এসময় প্রায়ই অসুখে ভুগতেন। তারপর পার্ক থেকে বার হয়ে সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের বাড়ী গেলুম। সেখানে পানিতরের যজ্ঞেশ্বর মুখুয্যের ছেলে বিভূতি মুখুয্যে ছেলে পড়াচ্চে। ওখান থেকে বার হয়ে বাসে এলুম উদয়ন আপিসে—সেখানে ধূর্জ্জটী বাবুর সঙ্গে বসে গল্পগুজব হোল। হেমেন বল্লেন আমার বাসায় একদিন করে যাবে বলো। প্রমথ চৌধুরী বই পেয়েচেন বল্লেন—আমের বউলের সম্বন্ধে কি একটা কথা জিগ্যোস্ [জিগ্যেস্] কর্ল্লেন—আমি ভাল বুঝতে পারলুম না। রমেশবাবু ও আমি দুজনে এসে St. Jame's Square[১] এ বসলুম। আজ রাত্রে কি ভীষণ গুমট—এমন গুমট এ বছর পড়েনি। আজ হেডমাস্টার যতীনবাবুর বাসায় গেছলুম[২]।

১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ১লা আশ্বিন, ১৩৪০। রবিবার

সকালে উঠে নীরদ চৌধুরীর বাড়ী থেকে ছবির slide আনতে গেলুম—তারপর গেলুম টকুদের বাসায়। সুপ্রভাদের হোস্টেলে এসে দেখি সে আজ সকালে খুব ভোরেই চলে গিয়েচে। বাসায় এসে ? পড়লুম—তারপর ট্রামে নীরদবাবুর ওখানে গেলুম। সেখান থেকে মোটরে বোটানিক্যাল্ গার্ডেন। একটা উঁচু ঢিবি মত জায়গায় বসে চা খাওয়া হোল, ছবি দেখা হোল। আজই ঠিক হোল বিকানীর যাওয়া হবে। বাসায় ফিরে গিয়ে flat এ বসে plan করা হবে ঠিক হোল—অত্যন্ত আনন্দ! এত আনন্দ ও উত্তেজনা অনেকদিন পাইনি। এই কদিনের মধ্যে কত কাজ যে মেটাতে হবে ঠিক করে নিতে হবে। flat [এ] এসে রাত ৯টা পর্য্যন্ত পরামর্শ ও মিটিং এর পরে ট্রামে রওনা হলুম। নামলুম এসে সুধীরদের বাড়ী। মা ও সুধীরের স্ত্রী দেখা করলেন। ওঁরা লোক ভাল। খাওয়ানের [খাওয়ানোর] পর সুধীরের স্ত্রী

১ বর্ত্তমানে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার, বৌবাজার।

২ বনগাঁ স্কুলের হেডমাস্টার যতীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী; মোহনবাগান রোতে এঁর বাড়ি ছিল।

পাশে বসে গল্প করলে—বিকানীর যাবো সে সম্বন্ধে কথা। বেজায় গরম [—] বাইরের বারান্দায় শুয়েছি কিন্তু গরমে ঘুম নেই। শেষ রাত্রে ঘন মেঘ করে এল ও বৃষ্টি সুরু হোল। সকালে খুব বৃষ্টি। গরম একদম পড়ে গিয়েচে।

১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ২রা আশ্বিন, ১৩৪০। সোমবার

বেজায় বৃষ্টিবাদলা সকাল থেকে। সকালে মাখন মুখুয্যে [,]টকু ও নিশিভূষণ মামার ছেলে এল। ভিজতে ভিজতে স্কুলে গেলুম। টিফিনের সময় বঙ্গশ্রীতে গিয়ে টাকার কথা বলে এলুম। সলিল আজ আমার হাতে খুব মার খেলে। ছুটীর পরে হবিবি আলাম বলে ছাত্রটীর সঙ্গে গেলুম Bengal Phototype এর দোকানে[১]। তারপর গেলুম মহৎ আশ্রমে[২] চা ও খাবার খেতে। মেঘভরা বৈকালে মেসে এলুম শোনপাপড়ি কিনে নিয়ে [—] কাপড়খানা দেখি শুকায় নি। দিনটা খুব ঠাণ্ডা। কাল সকালে মহালয়ার ছুটিতে বাড়ী যাবো।

১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ৩রা আশ্বিন, ১৩৪০। মঙ্গলবার

ভোরে উঠে বনগাঁয়ে এলুম ৫টায়। এবেলা বিভূতি আসে নি। এখানে এসে খয়রামারি বেড়িয়ে এলুম—পুকুরে স্নান করলুম। তারপর বৈকালে একবার হেডমাস্টারের কাছে বেড়িয়ে এসে আমাদের গ্রামের ছকু জেলের নৌকাতে সাতভেয়ে তলায় বেড়াতে গেলুম। যাবার ও আসবার সময় গাছপালা বেতঝোপ ও কচুবনের জলের ধারে কি অপূর্ব্ব শোভা! বিশেষ করে যখন— ফিরবার বেলা এ সব ঝোপের গা দিয়ে নৌকা বেয়ে এলুম—সে কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য। সত্যি, বাংলার গাছপালার যে অপূর্ব্ব রূপ, এমন বৈচিত্র্য, এমন শ্যামলতা, এমন প্রাচুর্য্য এক Tropical countries ছাড়া আর কোথাও ভৌগোলিক কারণেও সম্ভব নয়।

সন্ধ্যায় বিভূতির আড়তে বসে অনেক রাত পর্য্যন্ত গল্পগুজব করলুম।

২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩।৪ঠা আশ্বিন, ১৩৪০। বুধবার

সকালে উঠে খয়রা মারির মাঠে বেড়াতে গিয়ে ব্যায়াম করলুম। তারপরে ছ'ঘরেতে কালোর সঙ্গে বেড়াতে গেলুম।[৩] ওদের বাড়ীতে গেলুম ২৬ বছর পরে। খুকুর সঙ্গে দেখা হোল। আজ খুব মেঘ ও ঝড়। কিন্তু বৃষ্টি নেই। দুপুরে স্কুলের একটা ছেলে খুকীকে ঢিল ছুঁড়ে মারলে। আমি ছেলেটাকে বার

১ আমহার্স্ট স্ট্রীটে মেসের কাছে এই দোকানটি ; এখনও আছে।

২ এটি ছিল ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির কাছে একটি হোটেল।

৩ ছ'ঘরেতে ছিল কালো অর্থাৎ পশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্বশুরবাড়ি।

করলুম ওদের ক্লাসে গিয়ে। সে ছেলেটা কেঁদে ফেল্‌লে—বল্লে আর কখনও করবো না। তারপর স্কুলে বসে হেডপণ্ডিতের[১] সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করলুম। ১৮৯৩ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী হেডপণ্ডিত মশায় এই স্কুলে প্রথম আসেন [—] তার ৬ মাস আগে চারুবাবু[২] এসেচেন। সেবার বীরেশ্বর বাবু[৩] নিরঞ্জন বাবু test exam. দিলেন। স্কুলে বসে থাকতে থাকতে ভয়ানক ঝড় ও বৃষ্টি এল। বলচে এবার নাকি cyclone হবে। বাসায় এসে ভাত ও চিড়ের ফলার খেলুম। মধ্যে খয়রামারি বেড়াতেও গেলুম। তারপর শ্যামা[৪] ও খুকী অনেকক্ষণ বসে আমার কাছে গল্প করলে। ৪টার পরে ব্যাগ নিয়ে বেরুলাম ও হেঁটে স্টেশনে এলুম। লালমোহন[৫] এল আমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে। গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে গেল। পথে খুব ঝড় ও বৃষ্টি। যেমন অন্ধকার আকাশ—মেঘান্ধকার সন্ধ্যার শোভা অবর্ণনীয়।

২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩।৫ই আশ্বিন, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

সকালে প্রথমে গেলুম ললিতের বাড়ী। তারপর খানিকক্ষণ পরে স্কুলে গেলুম। স্কুল সকালে ছুটী হয়ে গেল, কে একজন ম্যাজিক দেখাবে সে জন্যে। তারপর বঙ্গশ্রীতে স্নীতিবাবুর সঙ্গে ভাষা নিয়ে তর্ক ও খেলা করা গেল। সে আমাদের নানা রকম মজার খেলা হোল। ওখান থেকে নীরদ বাবুর বাড়ী। চা খেয়ে যাওয়ার দিন ঠিক করা গেল। ওখান থেকে বার হয়ে হেঁটে বাড়ী এলুম। বাসায় এসে তখনি ট্রামে স্কুলের মিটিং এ। আমি, ফণিবাবু ও হরিবাবু[৬] বর্ত্তমান হেডমাস্টারের নানারকম নিন্দা করে বেশ ঘণ্টাখানেক কাটালুম। তারপর ট্রামে টরুদের বাসা শ্যামবাজারে। ওখানে চা খেলুম [—] তারপর আমি ও টরু বার হয়ে হেডমাস্টারের বাড়ীতে বই দিয়ে নীরদের Flat এ। নীরদের স্ত্রী এল—ওরা এখন শিলং যাবে না বল্লে। Botany নিয়ে তর্ক হোল। রাত ১০॥০টায় ফিরলাম—এসে দেখি হুটু বসে আছে—তাকে Slide দেখালুম

১ কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী, কাব্যতীর্থ।

২ চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; বিভূতিভূষণ যখন বনগাঁ হাইস্কুলে পড়তেন ইনি তখন হেডমাস্টার।

৩ বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়, বনগাঁবাসী।

৪ বিভূতিভূষণের ভাগিনেয়ী খুকীর বনগাঁয়ের বন্ধু।

৫ লালমোহন ঘোষ, বারাকপুরবাসী।

৬ হরিচরণ মুখোপাধ্যায়, শিক্ষক, খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইনষ্টিটিউশন।

অনেক রাত পর্যন্ত ; রাত ১২॥০টায় আলো নিবিয়ে শয্যা আশ্রয় করলুম।

২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ৬ই আশ্বিন, ১৩৪০। শুক্রবার

সকালে ঘোর মেঘান্ধকার, টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়চে। স্কুলে গেলুম অন্নপূর্ণা-আশ্রমে[1] ভাত খেয়ে। সকালেই ছুটি হয়ে গেল, পূজার দীর্ঘ অবকাশ ঘোষণা করে হেডমাস্টারের সারকুলার বেরুলো। গেলুম বঙ্গশ্রীতে, সজনী টাকা দেবে, সে নেই। কিরণের কাছে বলে গেলুম ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী—সাধু সুন্দর সিং এর একখানা বই বরি৹করে টিকিট লিখে দিয়ে থ্যাকারের দোকান। আবার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে আস্চি, মতিবাবু প্রাইভেট রিডিং-রুম থেকে ডাকলে। সিগারেট খেতে খেতে গল্প করচি, সেখানে একজন কোথাকার ইংরিজির অধ্যাপক, একজন Ethnologyর অধ্যাপক জুটলেন। তারা আমার বইখানা সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগলেন। ওখানে বেয়ারাকে চারআনা বক্সিস্ দিয়ে এসে একটা দোকানে কিছু খেলুম [—] আবার এলুম বঙ্গশ্রীতে। শৈলজা, অজিত অনেকের সঙ্গে গল্প করার পরে স্ট্যাণ্ডার্ড লিটারেচার কোম্পানীর দালালের মোটরে কলেজ স্কোয়ার এলুম পি. সি. সরকারের দোকানে। তারপর Priestleyর বই কিন্‌লুম। হিন্দুস্থানী সেই বন্ধুটির সঙ্গে দেখা। সে বল্লে এসো চা খাওয়া যাক। চা খেয়ে তারই কাজে তাকে নিয়ে এলুম Book Companyর দোকানে। সেখান থেকে সোজা মেসে। রাত ৭॥০টা। এবেলা আকাশ পরিষ্কার, নীল দেখা যাচ্চে—মেঘ থাকলেও বাদলার মেঘ নেই। এখন দেখা যাক কাল কি হয়। মনে খুব উত্তেজনা। কাল পশুপতিবাবু এসে ফিরে গেছেন। আজ ছেলেরা স্কুলে খাওয়ালে।

২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ৭ই আশ্বিন, ১৩৪০। শনিবার[2]

সকালে বঙ্গশ্রীর লেখা শেষ করিতেছিলাম [করছিলাম]—এমন সময় মহিমা এলেন। তাঁকে মণিন্দ্র বসুর জন্যে লেখাটা দিয়ে স্নানাহার সেরে বঙ্গশ্রীতে গেলুম তাদের লেখা দিতে। ওখান থেকে চাঁদনীর দোকান থেকে জামা কিনে আনি। বাসায় এসে জিনিসপত্র বেঁধে ছেঁদে তৈরী। এমন সময়ে আমার ভাই নুটু এল। বেরিয়ে পড়লুম হাওড়া স্টেশনে। নুটু চা খেলে। তারপর আমরা গাড়ীতে বসলুম। গাড়ী ছাড়ল। বম্বে মেলে ওদের লাইনে—ভারী খারাপ। গিড্‌নি স্টেশনে জনকতক Changer নেমে গেল। রাত গভীর হয়ে এল।

১ শ্যামবাজারে ছিল হোটেলটি।

১ তারিখের ওপরে লেখা, 'মহিমবাবু 43 | 1, amherst st.'।

আহারাদি শেষ করে upper berthএ গিয়ে শুলাম কিন্তু ঘুম আর আসে না। অনেক রাত্রে ঘুম এল।

২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ৮ই আশ্বিন, ১৩৪০। রবিবার

খুব সকালে উঠে দেখি ট্রেন হু হু চলেছে। নীরদবাবু বললেন তিনি বেলপাহাড় দেখেচেন। একটু পরে গাড়ী বিলাসপুর এল। আমরা ওখানে চা খেলুম। বিলাসপুর ছেড়ে দুধারে একঘেয়ে সমতলভূমি, মাঝে মাঝে জলা, ধানক্ষেত ও ভুট্টাক্ষেত, অত্যন্ত বৃষ্টি হয়ে গেছে—জলে ভেসে গেছে সারাদেশ। ডোঙ্গরগড়ের কাছে ভারী সুন্দর দৃশ্য—ডোঙ্গরগড় থেকে তিনটা স্টেশন পর পর্য্যন্ত। ঘন বন, পাহাড়ী বাঁশবন, পার্ব্বত্য নদী ও পর্ব্বতশ্রেণী। তারপর আবার dull, flat plains. সীমাহীন plains—এক চক্রবাল থেকে অন্য চক্রবাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বৈকালে নাগপুর এসে পৌঁছে বাংলোয় এলুম। বেশ বাংলোটা। চা খেয়ে আমি ও প্রমোদবাবু বেড়াতে বেরুলাম। সহরটী বেশ সুদৃশ্য। সব টালির ছাদ, বিলাতী স্থাপত্য পদ্ধতি অনুসারে—অর্থাৎ ? এর পদ্ধতি অনুসারে গড়া। একটা পাহাড়ের তলায় সন্ধ্যার সময় আমরা গিয়ে বসলুম। চাঁদ ও সন্ধ্যাতারা উঠেচে। হাওয়া ভারী তাজা। রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা লাগ্‌ছিল।

২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩।৯ই আশ্বিন, ১৩৪০। সোমবার

আজ সারাদিন বাংলোতে বসে আছি। নীরদ বাবুর অসুখ আজ বেড়েচে। রঙীন সাড়ীপরা মার্হাটী মেয়েরা সাইকেলে করে স্কুলে কলেজে যাচ্চে। বেলা দশটা। নাগপুরে এবার বেশ শরৎ পড়েচে। এখানকার রোদ বাংলা দেশের মত নয়। বড় অদ্ভুত রোদ এখানকার। সন্ধ্যার আগে মোটরে বেরুলুম বাজার দেখতে। বাজার বাংলা থেকে অনেকদূর—আজ সোমবারের হাট হয়। পাড়াগাঁ থেকে গরুর গাড়ী অনেক এসেচে। একজায়গায় খাবার বিক্রী হচ্চে—জিগ্যেস্ করলুম কি খাবার? ···বল্লে, আনন্দ সা। ময়দা ও গুড় দিয়ে ভাজা পিঠের মত। এদেশে ছোলা ও কাব্‌লী মটর (এদেশের ভাষায় বলে ফুটানা) খুব খায়। এখানকার মুড়ি বড় চমৎকার। দোকান পসার ভাগলপুরের মত—কিন্তু Old Town (এতোয়ারী) বড় নোংরা। Civil lines খুব সুন্দর। এখানে সব ঘরই লাল টালি বা খাপ্‌রার। গাছপালার মধ্যে কালকাসুন্দে গাছ দেখ্‌লাম জঙ্গলে। অন্যসব undergrowth—আগাছা। রাত্রে ভোঁসোয়ালী কলার Custard বেশ লাগ্‌ল। একজন ব্রাহ্মণ এল দুপুরে—তার বাড়ী খাণ্ডোয়া রংড়ে ব্রাহ্মণ।

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩।১০ই আশ্বিন, ১৩৪০। মঙ্গলবার

সকালে নেমিচাঁদের সঙ্গে মোটরে পুরোনো নাগপুর সহরে বেড়াতে গেলুম। দুগ্ধমন্দির বলে একটা রেস্টারেণ্টে দুধ, পেস্তাবাদাম দিয়ে ঘোঁটা খেতে দিলে। সনোমা, নমকান বলে সব খাবার। নাম শুনিনি কখনো। মুসাম্বীর কিনলুম নীরদ বাবুর জন্যে—তাঁর খুড় জর। প্রাচীন ভোঁসলাদের একটা দীঘি দেখ্‌লুম —সীতাবল্‌ডীর পাহাড় যেখানে সীতাবল্‌ডীর যুদ্ধ হয়েছিল—তাও দেখ্‌লুম। পুরোনো নাগপুর সহরে সব সেকেলার বাড়ী। একটা ছোট মার্হাটী মেয়ে দোকানে দেখ্‌লুম—বছর পাঁচ ছয় বয়েস—কেমন চমৎকার নীলচোখ—নন্দলাল মেবুলালের দোকানে কি জিনিস কিনতে এসেচে। বিকেলে রস্তমজীর বাংলোতে গেলুম। রস্তমজীর বোনের সঙ্গে আলাপ হয় [হয়ে] গেল। তারপর মহারাজবাগ বেড়াতে গেলুম। মহারাজবাগে একটা খুব বড় সিংহ আছে—ভারী চমৎকার গোলাপ ফুটে আছে। ওধারে একটা ছোট নদী, যেন মেক্সিকো কি পেরুর নদী। দূরে একটা পাহাড়, সূর্য্য অস্ত যাচ্চে—আকাশের রঙের দিকে চেয়ে মনে হোল আজ দুর্গাপুজোর সপ্তমী। গোপালনগরে এখন পুজো হচ্চে—বাঁওড়ের নালফুলের কথা মনে হোল। আমি ও প্রমোদবাবু একটা গাছের তলায় বেঞ্চে বসলুম—অনেকক্ষণ জ্যোৎস্না উঠ্‌ল—তারপর বাড়ী চলে এলুম। মিউজিয়ামে একটা সিংহ ও অজগর দেখলুম।

২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ১১ই আশ্বিন, ১৩৪০। বুধবার

সকালে নীরদবাবুর জর এসেচে—আমরা আর কোথাও বেরুইনি। দুপুরে একটু ঘুমোলাম। বিকেলে যোধপুরী ছাত্রটী[1] মোটর নিয়ে এল ও ডাঃ খারেকে ডেকে আনলে। ডাক্তার চলে গেলে আমরা সেই গাড়ীতে সহরের পিছনে বেড়াতে গেলুম। খুব উঁচু পাহাড়ী জমি, highlands—যখন সেই পাহাড়ী জমির ওপর মোটর উঠ্‌ল—তখন চারিধারের সে বিরাট সমতল ভূমির দৃশ্যের বর্ণনা কর্ত্তে পারি এমন ভাষা আমার নেই। প্রমোদ বাবু বার বার প্রণাম কর্ত্তে লাগলেন—আমিও—অসীমের উদ্দেশে এ প্রণাম আমার বড় ভাল লাগ্‌ল। দূরে দূরে নীল শৈল মালা—যতদূর দৃষ্টি যায় ধূ ধূ প্রান্তর—বাংলা দেশের মত প্রান্তর নয়—উচ্চাবচ প্রান্তর বল্লে ভুল বলা হয়—বিরাট uplands, একটা হ্রদ আছে। হ্রদের ধারে সন্ধ্যায় আমরা গিয়ে বস্‌লুম—জ্যোৎস্না উঠ্‌ল—অনেক

১ তৃণাঙ্কুর-এ এই ছাত্রটির উল্লেখ আছে। এঁকে নিয়ে বিভূতিভূষণ 'মুলো—র‍্যাডিশ-হর্স র‍্যাডিশ' গল্পটি লেখেন।

মোটর বেড়াতে এসেচে—একটা দোল্‌নায় দোল খেলুম। আবার মোটরে চড়ে বাসায় ফিরি।

নাগপুর। ২৭-৯-৩৩।

Note : এইমাত্র নাগপুরের চারিপাশের মালভূমির পথে মোটরে বেড়িয়ে ফিরচি। এ গম্ভীর মহিমার তুলনা নেই, বাংলার সৌন্দর্য্য রমণীয় বটে, কিন্তু বিরাট নয়, মহিমময় নয়। majesticও নয়, pretty. [এই অংশটি ১৯শে সেপ্টেম্বরের পাতায় লেখা।]

২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩।১২ই আশ্বিন, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

আজ সকালে গৌরীরাও (?) হ্রদ দেখ্‌তে গেলুম। South Tiger Gap Road দিয়ে বেরিয়ে একেবারে হ্রদের সাম্‌নে গিয়ে পড়লুম—সে কি বিরাট দৃশ্য ! সকাল থেকে রোগীর ঘরে বসেই আছি। দুপুরে একবার ওষুধ আন্‌তে নিমচাঁদের গাড়ী করে বাজারে গেলুম। বিকেলে আবার গেলুম—ডাঃ খারের কাছে আমি ও প্রমোদ বাবু। পরামর্শ কর্ত্তে যে নীরদবাবুকে নিয়ে যাবো কিনা কল্‌কাতায়। নিমচাঁদ এল রাত্রে। এসে ডাঃ নেরুল করকে নিয়ে এল। আমি ও নেরুল কর প্রথমে হাঁসপাতাল [হাসপাতাল] গেলুম। নিমচাঁদের বড় গাড়ীতে। আজ বিজয়া দশমী—তাই ভাবছি বাংলাদেশ থেকে কত দূরে বেড়াচ্চি। স্টেশনের বড় ব্রিজটা পার হয়ে কতবার এতোয়ারী ও সদর বাজারে যাতায়াত কর্ল্লুম। হাঁসপাতালে এসে ওষুধ নিলুম। রত্তমজির সঙ্গে কাস্টার্ড কিনতে গিয়ে কোথাও পাইনে। আজ দশমীর ছুটী—সব ওষুধের দোকান বন্ধ। অবশেষে একটা দোকানে গেলুম। ···

২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ১৩ই আশ্বিন, ১৩৪০। শুক্রবার

আজ সকালে ডাক্তার এল নীরদবাবুর জন্যে। দুপুরের পর আমরা বেরুবো বলে দুপুরে রোগীর ঘরে বসা গেল। তারপর এল বৃষ্টি। আমাদের বাংলার সাম্‌নে বাব্‌লা তলায় একদল মহিষ রোজ চরাতে আসে—আজও আন্‌লে। তারপর আমরা টাঙা করে বেড়াতে বেরুলাম। C. P. Club এর সাম্‌নে দিয়ে হাজারী পাহাড়ের ওপর গেলুম। পথে কুল ও খেজুর গাছের বন। Highland Drive এ যাবার জন্যে Pultara (?) Diversion Road ধরলুম। ওপরে টাঙা রেখে নীচে নাম্‌লুম। চারিধারে বিরাট দৃশ্য! সন্ধ্যার ছায়ায় চারিধার ঘেরা—পশ্চিমে সূর্য্য অস্ত যাচ্চে। বহুদূর পর্য্যন্ত থৈ থৈ করচে uplands, উঁচু নীচু, বন্ধুর। দূরে নীল পাহাড় শ্রেণী—বৃক্ষ লতা যা আছে সে সব এই মুক্তরূপা

প্রকৃতির কাছে pale হয়ে গিয়েছে। কতক্ষণ আমরা টৌঙার ওপরে উঠে দেখলুম। দূরে একটা দীর্ঘ পাহাড়ের পেছনে সূর্য্য অস্ত যাচ্চে। সে কি বিরাট মহনীয় দৃশ্য! তারপর ওখান থেকে ডাঃ নেরুল করের বাড়ী গেলুম। ডাঃ নেরুল করের বাংলার বাইরে চেয়ারে অনেকক্ষণ বসে রইলুম। ওর মেয়ে বেবির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে।

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩।১৫ই আশ্বিন, ১৩৪০। শনিবার

আজ সকালে উঠে স্নান সেরে মহারাজবাগের পথ ধরে আম্বেঝেরী হ্রদে যাবো বলে বেরুলাম। খুব সকাল [—] মহারাজবাগের গাছে পালায় শিশির পড়েচে—সিংহটা খুব গর্জ্জন করচে। কৃষি কলেজের কয়েকটী ছেলের সঙ্গে আলাপ হোল। একটা বড় গাছে ধুঁধুলের মত বড় বড় ফল অজস্র ফলেছে—ছাত্রেরা বল্লে এ একরকম তেঁতুল। আম্বেঝেরীর পথ ধরলুম। চারিধারে বাংলো। মারাঠী মেয়েরা চশমা পরে সাইকেলে এত সকালে পড়তে যাচ্চে। এখানে পাহাড়ের রাস্তা নয়—সমতল, তবে রাস্তা উঁচুনীচে। দশটার সময় নিমচাঁদের সঙ্গে মোটরে নন্দলাল মেবুলালের দোকানে জিনিস কিন্‌তে গেলুম। বিকেলে নিমচাঁদ গাড়ী পাঠাবে বলে গেল কিন্তু আমরা বসেই রইলুম—গাড়ী আর আসে না। জ্যোৎস্না ফুটল, Highland drive এর সময় চলে গেল, তখন হতাশ হয়ে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়ে প্রথমে গেলুম ডাঃ নেরুরকরের ওখানে। বাস্ স্ট্যাণ্ডে গিয়ে খবর নিলুম রামটেকের বাস্ কখন ছাড়ে। নাগপুরের যেখানে সেখানে 'হিন্দু হোটেলে'র ছড়াছড়ি। অর্থাৎ খাবারের দোকান। রেলের embankment bridge দিয়ে যখন যাচ্চি তখন খুব জ্যোৎস্না। এসে দেখি নিমচাঁদ এসেচে। টাকা হাতে নেই সেকথা বলা গেল। জুতা কিন্‌বার জন্যে চেষ্টা করেছিলুম বাজারে, কিন্তু অত রাত্রে মুচী পাওয়া গেল না। young রস্তমজি গাড়ী করে বেড়াতে যাচ্চে—আমাদের দেখে বল্লে—কি মশাই? নন্দলাল মেবুলালের দোকানে ওবেলা বড় মজা হয়েছিল। জিনিস কিনেচি, নিমচাঁদ চলে গেছে রামকৃষ্ণ স্পিনিং মিল্‌স্-এ। ওখান থেকে আবার টাকা নিয়ে তবে দি। রাত্রে 'বালক কবি'র[১] গল্প করলুম প্রমোদ বাবুর সঙ্গে—

১ যতীন্দ্রমোহন রায় (ওরফে পাঁচুগোপাল চক্রবর্তী), রাজপুরবাসী। বিভূতিভূষণ তখন রাজপুর হরিনাভি স্কুলে শিক্ষকতা করছেন; এই বালককবিই একদিন এসে তাঁকে স্বল্পমূল্য সিরিজের উপন্যাস বার করার কথা বলেন। বিভূতিভূষণ স্বাভাবিকভাবেই তাঁর অক্ষমতা জানান। কিন্তু পাঁচুগোপাল কাউকে

নাগপুর-   মটেকের যাত্রাপথ
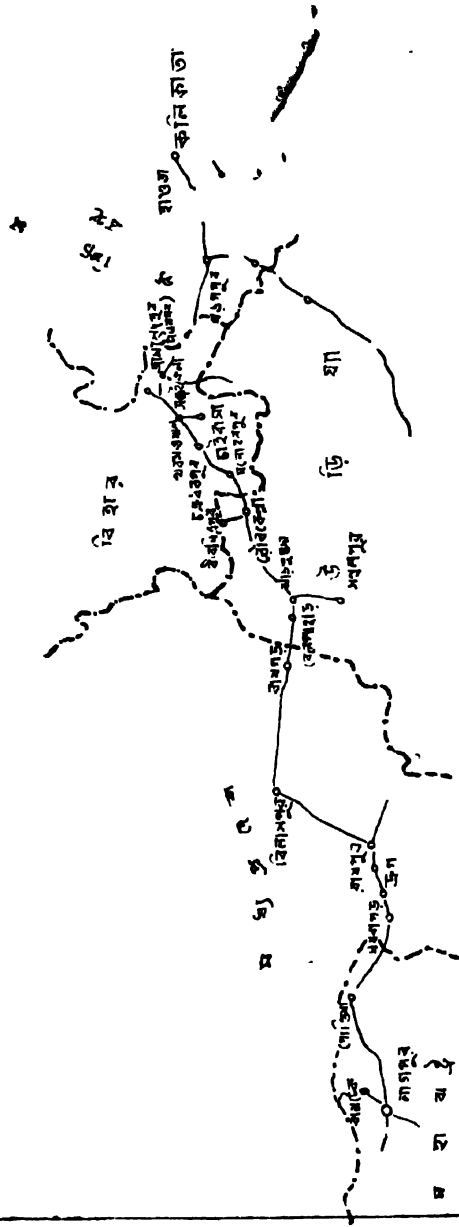
১লা অক্টোবর, ১৯৩৩।১৫ই আশ্বিন, ১৩৪০। রবিবার

আজ সকালে অতি সুন্দর রৌদ্র। স্নান সেরে পোস্টাপিসে গিয়ে বনগাঁয়ের চিঠি ফেলে দিয়ে এলুম। একটু পরে পরে ডাঃ নিরুলকর এল। জুতো সারানো দরকার দেখ্‌লুম। ওবেলা ? 'দুগ্ধমন্দির' এ খেতে যাবো ও জুতা কিন্‌বো। ও সারাবো। বিস্কুট নেই, জ্যাম নেই, এসব জিনিস আন্‌তে হলে হংসাপুরী কি সিতাবল্‌ডির বাজারে যেতে হয়। নিমচাঁদের হাতে টাকা। তার ভরসায় থাকা বড় কষ্টকর। রোজই বিকেলে ভাবি হাইল্যাণ্ড ড্রাইভে যাবো, নিমচাঁদ গাড়ী পাঠাবে। ঠিক সময়ে গাড়ী আসে না, অসময়ে আসে। সাম্‌নে কোতোয়াল সাহেবের বাংলাতে অনেক রাত পর্য্যন্ত কাল ইংরিজিতে কথাবার্ত্তা কয়েচে। ফিরিওয়ালারা মুসাম্বির ও কলা বেচ্‌তে আনে। এখানে কলা ৵০ আনা ডজন। মুসম্বির (Sweet lime) ৷৷৵০ আনা ডজন। জমাদার হংসাপুরী থেকে বরফ নিয়ে এল। কয়লা খানসামা বাজার করে আন্‌লে। মাছ পাওয়া যায় না, মাংস আনলে। কলার কাস্টার্ড রোজ রাত্রে খাচ্চি। আমাদের শঙ্কর বলে একটা মেথর ছোকরা আছে, ভারী বুদ্ধিমান্. রোজ এসে গল্প করে। নীরদ বাবুর জ্বর রোজই ভাবি ছেড়ে যাবে, রোজই আসে, কোনো ডাক্তার বল্‌তে পারে না কি। আজ ডাক্তার নেরুরকর ডাঃ ডুবেকে নিয়ে আস্‌বে।

সন্ধ্যায় সীতাবল্‌ডি বাজারে ওষুধ কিন্‌তে গেলুম—একটা লাইব্রেরীতে সভা হচ্চে—হাতে ফুলের তোড়া ও পান দিলে। একটা গ্রামোফোনের দোকানে মারাঠী গান বাজাচ্চে। দুগ্ধ মন্দিরে শ্রীখণ্ড ও সমোসা খেলুম।

২রা অক্টোবর, ১৯৩৩।১৬ই আশ্বিন, ১৩৪০। সোমবার

আজ মোটরে রামটেক ও কিন্‌সী হ্রদ দেখতে গেলুম। এই এখন লিখচি কিন্‌সী হ্রদের বাংলোর বারান্দায় বসে। সাম্‌নে নীল হ্রদ জঙ্গলাবৃত পাহাড়ে ঘেরা। ঘন বন পাহাড়ের অধিত্যকায়। আমি ও প্রমোদবাবু বেড়িয়ে এলুম বনের মধ্যে। বন্য শিউলি, কেঁদ, সাঁইবাবলা, আরও কত কি বনের নিবিড় ঘন অরণ্য। স্থানে স্থানে অন্ধকার। গন্থু মাহার নামে একটা বৃদ্ধ লোক বুনো গাছ নিয়ে যাচ্চে পাঞ্চালা নামে একগ্রামে। পথে মন্‌সারে ম্যাঙ্গানীজ পাহাড়

কিছু না বলে সর্বত্র পোস্টার দিয়ে দেন, বিভূতিভূষণের স্বল্পমূল্য সিরিজের উপন্যাস চঞ্চলা বেরচ্ছে। মান বাঁচাতে তখন বিভূতিভূষণ একটি গল্প লেখেন, —'উপেক্ষিতা'। তাঁর প্রথম গল্প। বেরয় প্রবাসীতে ১৩৩৮ সনের মাঘ মাসে।

দেখলুম। চারিধার যে কি সুন্দর তা কি বলবো! সামনে নীল হ্রদটা—লিখ্‌চি আর চেয়ে চেয়ে দেখ্‌চি। বেলা পড়ে এসেচে। মেঘের বালিশটা ঠেস দিয়ে হ্রদের দিকে চেয়ে আছি। সাতশো মাইল দূরে বাংলাদেশটার কথা ভাবচি।

আজ মাথার ওপর শরতের আকাশটা কি নীল! পাহাড়ে যখন মোটর উঠ্‌ল—একধারে পাহাড়, একধারে খাদ—সে কি সুন্দর। জীবনে এরকম স্থানে কখনো আসিনি।

একটু পরে রামটেক গেলুম—একধারে অরণ্যানীবেষ্টিত শৈলমালা। আঁকা বাঁকা বন্ধুর পথ দিয়ে অপরাহ্ণে [অপরাহ্নের] ছায়ার মধ্যে তীরবেগে মোটর ছুটেচে। একটা পাহাড় ঘুরে আবার গেলুম। এখান থেকে বনাবৃত অধিত্যকা-ভূমির মধ্যে দিয়ে রামটেক মন্দিরে উঠবার পাষাণময় সোপান শ্রেণী। মন্দিরের চবুতরায় বসে কত কথা মনে পড়ল। 'বিশ্ব যখন নিদ্রামগন' ইত্যাদি গান ওখানেই মনে পড়ল। মন্দিরের ওপর একটা চবুতরার ওপর বসে রইলুম। তারপর পূর্ব্বে পূর্ণচন্দ্র উঠল। নাগপুরের আলো জলে উঠ্‌ল। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বনভূমির মধ্যে দিয়ে আবার আমরা নেমে এলুম। রামটেকে মোটর দাঁড করিয়ে চা খাওয়া গেল। তারপর জ্যোৎস্নাভরা সুপ্ত মাঠপ্রান্তরের মধ্যে দিয়ে কয়েক ঘণ্টার পথ চলবার পরে নাগপুরে এলুম। বাংলার বাইরে আমি ও প্রমোদবাবু বসে গল্প করলুম।

৩রা অক্টোবর, ১৯৩৩। ১৭ই আশ্বিন, ১৩৪০। মঙ্গলবার

আজ কোজাগরী পূর্ণিমা। প্রমোদবাবু ও আমি সকালে ডাক্তারের জন্যে বেরুতে পারিনি। বৈকেলে দুজনে টাঙা করে স্টেশনে গেলুম বার্থ রিজার্ভ কর্ত্তে কারণ প্রমোদবাবু যাবেন ও সেখান থেকে ডাক্তার নেরুলকারের ওখানে গেলুম। দুজনে ডাক্তারের গাড়িতে এলুম। এসে রোগীর কাছেই বসে বাতাস করতে লাগলুম। ক্রমে পূর্ণচন্দ্র উঠল। ভাব্‌তে লাগলুম দূরে বাংলাদেশে ঠিক এই সময়টাতে ঘরে ঘরে শাঁক বেজে উঠেচে—এতক্ষণ লুচিভাজার সত্যি সত্যি গন্ধ বেরিয়েছে—এর ভুল নেই। তারপর রাত নটার সময় দুজনে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নাগপুরের পথ দিয়ে South Tiger Gap Road ও North Tiger Gap Road দিয়ে হাঁটতে লাগলুম। সব নির্জ্জন, বামে জঙ্গলাবৃত নীচু পাহাড়, বন্য শেফালিফুলের ঘন সুবাস। এক স্থানে বসে আমি দেওঘর হাঁটার গল্প করলুম[১]।

১ ১৩৩৭ সালে পুজোর সময় বিভূতিভূষণ তাঁর এক উকিল বন্ধুকে নিয়ে ভাগলপুর থেকে হেঁটে দেওঘর যান। অভিযাত্রিক-এ এর বর্ণনা আছে।

রাত্রে আহারাদির পর বাইরে বসে গল্প জ্যোৎস্নায়। চাটগাঁয়ের মণির[১] কথা হোল।

৪ঠা অক্টোবর, ১৯৩৩।১৮ই আশ্বিন, ১৩৪০।বুধবার

আজ সকালে উঠে যাবেন প্রমোদবাবু। ডাক্তার ফিরে গেলে দুজনে বসে মেলে গেলুম। অতি কষ্টে বার্থ পাওয়া গেল। তারপর দুপুরে খুব ঘুমুলাম। সেই ভাগলপুরের বড়বাসায়[২] দুপুরের মত ঘুম অনেককাল পরে। ঘুম ভেঙেই বিছানায় শুয়ে শুয়েই দেশের কথা ভাবলুম। যেমন আমি করে থাকি। এবার ভাগলপুর নয়—৭৫০ মাইল দূর থেকে ভাবচি ছিরেপুকুরের কথা[৩], ইছামতীতে নৌকা করে বনগাঁ থেকে বারাকপুর যাওয়ার কথা। রৌদ্রালোকিত নীল আকাশের তলায় ইছামতীর দুধারের শ্যামল বন ঝোপের মধ্য দিয়ে। কেমন স্বপ্ন দেখ্‌লুম। মাড়োয়ারীরা এসে জিজ্ঞেস করচে সাহেব কেমন আছেন, আমি ঘুমের মধ্যেই তাদের লাথি মেরে তাড়িয়ে দিলুম। দুপুরে ঘুমিয়ে আমি সব সময়েই এইরকম চমৎকার স্বপ্ন দেখি।[৪] দেশের জন্যে মন একটু উতলাও হয়েচে। আজ ভাবচি হাইল্যাণ্ড ড্রাইভে বৈকেলে যাবো। আবার সদর বাজারে ঘড়ির দোকানে ও মুরুলকরের কাছে যেতে হবে।

বৈকেলে পাহাড়ের উপর উঠলুম South Tiger Gap Road দিয়ে [—] একটা সাঁকোর কাছে বসে রৈলুম। সূর্য্য অস্ত গেল। দূরে রামটেকের পাহাড় —পেছনে পূর্ণচন্দ্র উঠল। শিউলিফুলের গন্ধে ভরা পথ দিয়ে পাহাড় থেকে নামলুম। সীতাবলডির বাজারে ঘড়ি নিয়ে ও রেডিও শুনে নেরুলকরের বাড়ীতে গিয়ে অনেকরাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করলুম। ডাক্তার এল না। Story of Everest[৫] বইখানা পড়লুম।

---

১ মণিকুন্তলা দত্ত, চট্টগ্রামবাসিনী।

২ খেলাতচন্দ্র ঘোষের ভাগলপুরস্থিত বাসার নাম; বিভূতিভূষণ কর্মোপলক্ষে এখানে থাকতেন।

৩ বারাকপুর।

৪ লাথি মারার স্বপ্নকে চমৎকার বলার একটি বিশেষ কারণ আছে। বিভূতিভূষণ গাছ কাটার ব্যাপারটিকে একেবারে বরদাস্ত করতে পারতেন না। অথচ ভাগলপুরে থাকার সময় এই কারণেই মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা বন ইজারা নিতে আসত। বাধ্য হয়ে তাঁকে সম্মতিও দিতে হত। কিন্তু মনে মনে তিনি তাদের অত্যন্ত অপছন্দ করতেন।

৫ লেখক W. H. Murray।

৫ই অক্টোবর, ১৯৩৩। ১৯শে আশ্বিন, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

সকালে উঠে নীরদবাবু ও আমি বারান্দায় গল্প করলুম। ডাঃ সেনগুপ্ত বলে অনৈক বাঙ্গালী ভদ্রলোক এল। রস্তমজী ও প্রভাত রায় বলে একজন ব্যারিষ্টার এল দেখা করতে। একটু ঘুমিয়েচি এমন সময় ডাঃ নেরুলকর এল। ৫॥০ টার সময় তার গাড়ী পাঠিয়ে দিল—আমরা মহারাজবাগের মধ্যে দিয়ে আম্বাঝেরী high land drive ও গোয়ওয়াড়া (?) বেরিয়ে ৭॥০ টায় ফিরি। ঘড়িটা কাল সারিয়ে এনেছিলুম, খারাপ হয়ে গেছে। ধোপা কাপড় দিয়ে যাইনি [যায়নি]—অথচ আমরা কাল কলকাতায় ফিরবো কেমন করে ? মেথর শঙ্করের দাদাকে বলে দিলুম। সকালে বাংলায় রুটিওয়ালা আসে, কলা ও মুসাম্বিরওয়ালা আসে, সীতাফলওয়ালী আসে। আজ একটা আবিষ্কার করেচি North Tiger Gap Road এর ডাইনের রাস্তা যেখানে একটা গেট আছে সেটাই highland drive এ চলে গিয়েচে। রাত্রে বাইরে বসে 'দক্ষিণাপথ ভ্রমণ'[১] পড়লুম। কতকাল আগে আপিসে বসে এখানা পড়তুম। রাত হয়েচে। মিসেস দাশগুপ্ত এসে গল্প করচেন।

৬ই অক্টোবর, ১৯৩৩।২০শে আশ্বিন, ১৩৪০।শুক্রবার

আজ আমরা এখান থেকে চলে যাবো। নাগপুরটা সত্যি সত্যি ভাল লেগেচে। ছেড়ে যেতে মায়া হচ্চে। কাল সন্ধ্যার মোটর ভ্রমণটা আমরা কখনো ভুলবো না। আজ সকালে সীতাবল্‌ডি বাজারে ঘড়ি সারিয়ে নিয়ে ডাঃ সেনগুপ্তের ওখানে গেলুম। তিনি বল্লেন 'চম্বা ও পঞ্চ মৌরীর পথে জঙ্গল খুব। আজব শা এখানকার রাজ? ওদেরই ছিল এ দেশটা। ওদের কাছ থেকে মারাঠারা নেয়।' আজ আকাশ বড় নীল। নেরুলকরের কাছে হাঁসপাতালে গিয়ে টাকা দিয়ে এলুম। দুপুরে মিউজিয়াম দেখতে গেলুম। ফিরে এসে যাবার জন্য তৈরী হওয়া গেল। ৩॥০ টায় নেরুলকর গাড়ী পাঠালে, তাতেই রওনা হওয়া গেল। ওবেলা স্টেশনে রিজার্ভের কথা বলেই এসেছিলুম।

সারা রাত্রি জেগে কাটালুম। অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নারাতে সালকেসা (?) অরণ্যের

২ শরৎচন্দ্র ঘোষের বই। খেলাতচন্দ্র ঘোষের এস্টেটে কাজ করার সময় টেবিলের ড্রয়ারে বিভূতিভূষণ বইখানি রাখতেন। 'কাজের ফাঁকে ফাঁকে চট করে একবার বার করে নিয়ে পাহাড় জঙ্গল দূরদেশের রচনা পড়ে ক্লান্ত ও রুদ্ধ-চেতনাকে চাঙ্গা করে নিতুম।' (তৃণাঙ্কুর)। অপরাজিত-তেও অপু এইরকম করত।

শোভা ও মহিমাও অবর্ণনীয়। বিল্‌হা স্টেশনে ভোর হল [—] রাইপুর স্টেশন ছাড়িয়ে সারাদিন-রাত ট্রেনে আসচি। কান্‌সাবান স্টেশনে বসে এই ডায়েরী লিখচি। চারিধারে পাহাড় ও বনভূমি। বনাকীর্ণ পাহাড়ে ঘেরা নির্জ্জন স্থানটী। বাসের উপযুক্ত। বেলপাহাড়ে আবার নামলুম। স্টেশনমাস্টারটী বল্লেন আপনার নাম বিভূতিবাবু কি ? ইব স্টেশনে নেমে বেড়ালুম।

৭ই অক্টোবর, ১৯৩৩। ২১শে আশ্বিন, ১৩৪০। শনিবার

এই অংশ বনগাঁয়ে বসে লিখচি। খুব বড় বড় বন যেমন ডোঙ্গর গাড়ের অরণ্য জ্যোৎস্নার আলোতে দেখ্‌লুম। কুলুঙ্গারা (?) রাজসাংপুরের (?) একটা Subdivision। রাত হোল চক্রধরপুরে। হিন্দু রিফ্রেশমেণ্ট থেকে আনিয়ে খেলুম—তারপর শেষরাত্রে ঘুম ভেঙে দেখি জ্যোৎস্না ফুটেচে চারিধারে—গাড়ী এসেচে ঝাড়গ্রামে। ভোরবেলা হাওড়ায় পৌঁছে বাসায় স্নান সেরে টক্কদের বাসায় গেলুম। সেখানে লুচি ভেজে খাওয়ালে। নীরদের বাসায় গেলুম। নীরদের স্ত্রীর কাছে গল্প করলুম ওখানে যাওয়ার কথা। বাসায় ফিরে পশুপতি বাবুর নিমন্ত্রণের পত্র পেলুম। নীরদবাবুর Flatএ চা খেয়ে গেলুম পশুপতি বাবুর Flatএ। সেখানে গিরিজাবাবুর সঙ্গে তর্ক হোল। পশুপতি বাবুর স্ত্রী বৌ-ঠাকরুণ খুব যত্ন করে খাওয়ালে।

৮ই অক্টোবর, ১৯৩৩। ২২শে আশ্বিন, ১৩৪০। রবিবার

ভোরের গাড়ীতে বনগাঁয়ে এলুম। এবেলা এসে পুকুরে স্নান করা গেল। বৈকালে খুব ঘুমোনো গেল। মিতে এল। তার সঙ্গে গল্পগুজব করচি এমন সময় মোটর এল, তাতে আমি ও সুরেন গোপাল নগরে গেল্‌ম। কাছারীতে খগেন মামার সঙ্গে দেখাশোনা করলুম। সেখান থেকে হরিবোলের দোকানে এসে চা খেলুম। নন্দ সেক্‌রা ওর ছেলে ও [ছেলেও] মিডিয়মের কথা বল্লে। সেই দেখা ও এই দেখা। তারপর যুগল ময়রার দোকানে[১] তামাক খাওয়ালে। রাত্রে মোটরে ফেরা গেল। হরিপদ বাঁড়ুয্যের সঙ্গে দেখা। বারাকপুরে যেতে বল্লে।

৯ই অক্টোবর, ১৯৩৩। ২৩শে আশ্বিন, ১৩৪০। সোমবার

বনগাঁ অতি dull জায়গা। এখানে তাড়াতাড়ি আসার কোন্‌ দরকার ছিল না। কাজের খাতিরে আসতে হোল। আজ মিতের সঙ্গে সকালে ওর নতুন বাসা দেখতে গেলাম—দুপুরে খুব ঘুমুলাম। বৈকালে থানার ছোকরাটার সঙ্গে ক্লাবের রোয়াকে বসে গল্প করা গেল। কোনো লোকজন নেই ছুটীর সময়—

১ গোপালনগর।

এখানে বড় dull লাগে।

বারাকপুর যাবো বলে নৌকো ঠিক কর্ত্তে গেলুম। কিন্তু নৌকা পাওয়া গেল না। সন্ধ্যার সময় মিতে এল। তার মুখে বিন্ধ্যাচলের গল্প শুনছিলুম। রাত্রে আর একবার clubএ গেলুম।

১০ই অক্টোবর, ১৯৩৩। ২৪শে আশ্বিন, ১৩৪০। মঙ্গলবার

আজ সকালে শরীর তেমন ভালো না। সকালে সাবরেজিস্ট্রার বাবুর সঙ্গে বঙ্কুর ডাক্তারখানায় বসে গল্প হোল। দেখলুম—সমধর্মী লোক। আজ বৈকালে বারাকপুর যাবো। বারাকপুর এলুম নৌকাতে—আসতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। তেঁতুলতলার ঘাটে[১] খুব জল বেড়েচে। কুঁচকাঁটার ঝোপ ডুবে গিয়েচে। চালতেপোতার বাঁকে[১] ঝোপ ঝাপ সব ডুবেচে। রাত্রে সার্থক দাদার বাড়ীতে ছেলের অসুখ [—] দেখ্‌তে গেলুম।

১১ই অক্টোবর, ১৯৩৩। ২৫শে আশ্বিন, ১৩৪০। বুধবার

ভববন্ধু মামাকে দেখ্‌তে গেলাম। বাইরে তক্তপোষ পেতে দিলে। কাঁঠালতলায়[১] চা খাওয়ার আড্ডা দিলাম। বৈকেলে বৃষ্টি ও মেঘ খুব—ভববন্ধু মামার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে গেলাম দাসীঠাকরুণের বাড়ীতে। একটু পরে হরিপদ দা এল। কম্বল পেতে দাসীঠাকরুণের বাড়ীর আড্ডা আমার বেশ লাগল—বঙ্গশ্রীর আড্ডার চেয়ে ভালো। ওখান থেকে হরিপদ-র বাড়ীতে চা খেতে গেলাম ও আড্ডা দিলাম তিনজনে।

১২ই অক্টোবর, ১৯৩৩। ২৬শে আশ্বিন, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

কাঁটালতলায় আড্ডা হোল। সকালে পাঁচুকাকাকে দেখ্‌তে গেলাম বৃন্দাবন ও হরিবোলের সঙ্গে। বৈকালে হাটে গেলাম। হাটে দেবেন এল—তার গাড়ীতে জোড়া বটতলায়[২] নেমে চলে এলাম। রাত্রে সার্থকদার ছেলে ও পাঁচু কাকাকে দেখ্‌তে গেলাম। পাঁচু কাকার অবস্থা ভাল না।

১৩ই অক্টোবর, ১৯৩৩। ২৭শে আশ্বিন, ১৩৪০। শুক্রবার

সকালে চালকী যাবার যোগাড় করচি এমন সময় ভাব্‌লাম পাঁচু কাকাকে দেখে আসি। পাঁচু কাকার অবস্থা ক্রমে খারাপ হয়েচে রাত্রে—আমার সামনেই শ্বাস হয়েচে। মারা গেলেন। আমি চাল্‌কী গেলাম। অনেক বেলায় ফিরে পুকুরে স্নান করে এলাম। বৈকেলে মেঘ ও বৃষ্টি। রাত্রে কালো ও খুড়ীমা

---

১ বারাকপুর।

২ বারাকপুর-বেলেডাঙার পথে।

এলেন। তাস খেলা হোল।

১৪ই অক্টোবর, ১৯৩৩। ২৮শে আশ্বিন, ১৩৪০। শনিবার

সকালে হরিপদ দার ওখানে চা খেলাম। ভববন্ধু মামারা চলে গিয়েচে। কালোর সঙ্গে গল্প করা গেল। দুপুরে তাস খেলা হোল। আমি আর কালো বেলেডাঙায় বেড়াতে গেলুম। গাছপালার সবুজ প্রাচুর্য্য খুব বেশী। ঝোপ ঝাপ খুব নিবিড় ও কালো। নাগপুরে এমন নেই—হোতে পারে না। গাছপালার শোভা বেশী—তবে বড় কিছু নয়—ঝোপ ঝাপ। রাত্রে তাস খেলা হোল।

১৫ই অক্টোবর, ১৯৩৩। ২৯শে আশ্বিন, ১৩৪০। রবিবার

সকালে ? পুকুরে মুখ ধুতে গিয়ে হরিপদদার বাড়ীতে ১১টা পর্য্যন্ত আড্ডা। ভূষণ[1], উপেন জেলেকে[2] ডেকে একটা বিচার হোল। ফণি কাকাও ছিল। ওখানে দুপুরে নিমন্ত্রণ ছিল। বৈকালে তাস খেলার পর বাড়ীর পিছনে বেড়াতে গেলাম। শরতের বৈকাল ভারী সুন্দর হয়েচে। তার পর হাটে গেলাম। খগেন মামার সঙ্গে আলাপ হোল। হরিপদ আমি ও ফণি কাকা অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরি। রাত্রে হরিপদদার ওখানে নিমন্ত্রণ। অনেকরাত্রে আহারাদি হোল।

১৬ই অক্টোবর, ১৯৩৩। ৩০শে আশ্বিন, ১৩৪০। সোমবার

সকাল থেকে খুব বৃষ্টি। বনগাঁয়ে যাওয়ার কথা ছিল হোল না। রাণাঘাটে যাওয়ার কথা বল্‌চে হরিপদ-দা—ওর নায়েবি চাকরীর সুপারিশের জন্যে। ছকু পাড়ুই[2] এসে ঘাটে বসে আছে, আমায় বনগাঁয়ে নিয়ে যাবে বলে। দুপুরে তাস খেলি। তারপর আমি ও হরিপদ দা রাণাঘাটে গেলুম খগেন মামার বাড়ী। ওখান কার কাজ সেরে বাজারে চা খেলাম। সন্ধ্যের গাড়ীতে নেমে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে গোপাল নগর এসে। রাত্রে তাস খেলি।

ভোর রাত্রে বৃষ্টির মধ্যে ছেলেরা চেঁচাচ্চে—['] আশ্বিন যায়, কার্ত্তিক আসে' অনেকদিন এ ডাক শুনিনি।

১৭ই অক্টোবর, ১৯৩৩। ৩১শে আশ্বিন, ১৩৪০। মঙ্গলবার

এদিন নৌকোতে বনগাঁয়ে এলুম। তারপর খেয়ে ঘুমিয়ে বিভূতির আড়তে অনেকক্ষণ গল্পগুজব করি। বনগাঁয়ে ভাল লাগে না। অতি dull জায়গা।

১ ভূষণ মাঝি, বারাকপুরবাসী।

২ বারাকপুরবাসী।

সতীশ মোক্তারের[1] সঙ্গে ওপারে বাসা দেখ্‌তে গিয়ে দেবেনের ডাক্তারখানায় খানিকটা বসে গল্পগুজব করলুম।

১৮ই অক্টোবর, ১৯৩৩। ১লা কার্ত্তিক, ১৩৪০। বুধবার

সকালে হাট বাজার করা গেল। আজ কালীপূজা। বিভূতির আড়তে ও বঙ্কুর ওখানে গল্পগুজব করলুম। বৈকালে ঘুমিয়ে উঠে বেশ (?) ভাল বিকেল হয়েচে। বঙ্কুর জ্বর হয়েচে—সেখানে বসে থাকতে বেলা গেল। ওখান থেকে বিভূতির আড়তে এসে গল্প করচি এমন সময় শোনা গেল দেবেনের স্ত্রীর খুব অসুখ। সেখানে দেখ্‌তে গেলাম সবাই মিলে। তারপরে ক্লাবে গিয়ে আমার পদব্রজে দেওঘর ভ্রমণের কথা বল্লুম। আজ হাজারী জেলেনী[2] এসেছিল টাকা নেওয়ার দরুন—তাকে ৩৲ টাকা দিয়ে দিলাম।

১৯শে অক্টোবর, ১৯৩৩। ২রা কার্ত্তিক, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

সকালে উঠে স্নান সেরে এলুম—ননীদা ধরে নিয়ে গেল নদীতে। তারপর মিতের আড়তে বসে আড্ডা দিলুম। এসে শুনি আদিত্য[3] বাড়ীতে কালীপূজার নেমন্তন্ন। অনেকক্ষণ ধরে পড়লুম Good Companions[4]। তারপর শান্তি[5] ডেকে নিয়ে গেল মিতের আড়ত থেকে নেমন্তন্ন খেতে। আমি, ফটিক সবাই বসে খেলাম। রাত্রে খুব আড্ডা দেওয়া গেল। খুব বৃষ্টি বাদ্‌লা।

২০শে অক্টোবর, ১৯৩৩। ৩রা কার্ত্তিক, ১৩৪০। শুক্রবার

আজ রওনা হব। সকালে বাজার করলুম। বিভূতির ওখানে বসে আড্ডা দিলাম। বৈকালে একখানা কড়া কিনে বাসায় দিয়ে একটা মুটে নিয়ে স্টেশনে এলাম। হাজারী কাকার সঙ্গে দেখা। তিনি বল্লেন গোপালনগরের নায়েব একজন মুসলমান হয়ে গেছে। পথে একজন বাসন ফিরিওয়ালার সঙ্গে দেখা—আবাডুর[6] বাজারে থাকে, বাড়ী গোবরডাঙ্গায়। ট্রেন যখন বারাসাতে এল—তখন মার্টিন লাইনের ছোট গাড়ীর দিকে চেয়ে মনে পড়ল ১৯১৮ সালে ঠিক এই

১ সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ছয়ঘরিয়াবাসী।

২ বারাকপুরবাসিনী।

৩ আদিত্য চট্টোপাধ্যায়, বনগাঁবাসী।

৪ J. B. Priestley-র উপন্যাস।

৫ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের আড়তের কর্মচারী।

৬ বনগাঁ। পথের পাঁচালীতে এই আবাঢ়ুর উল্লেখ আছে। (দ্র. ২৮ পরিচ্ছেদ)
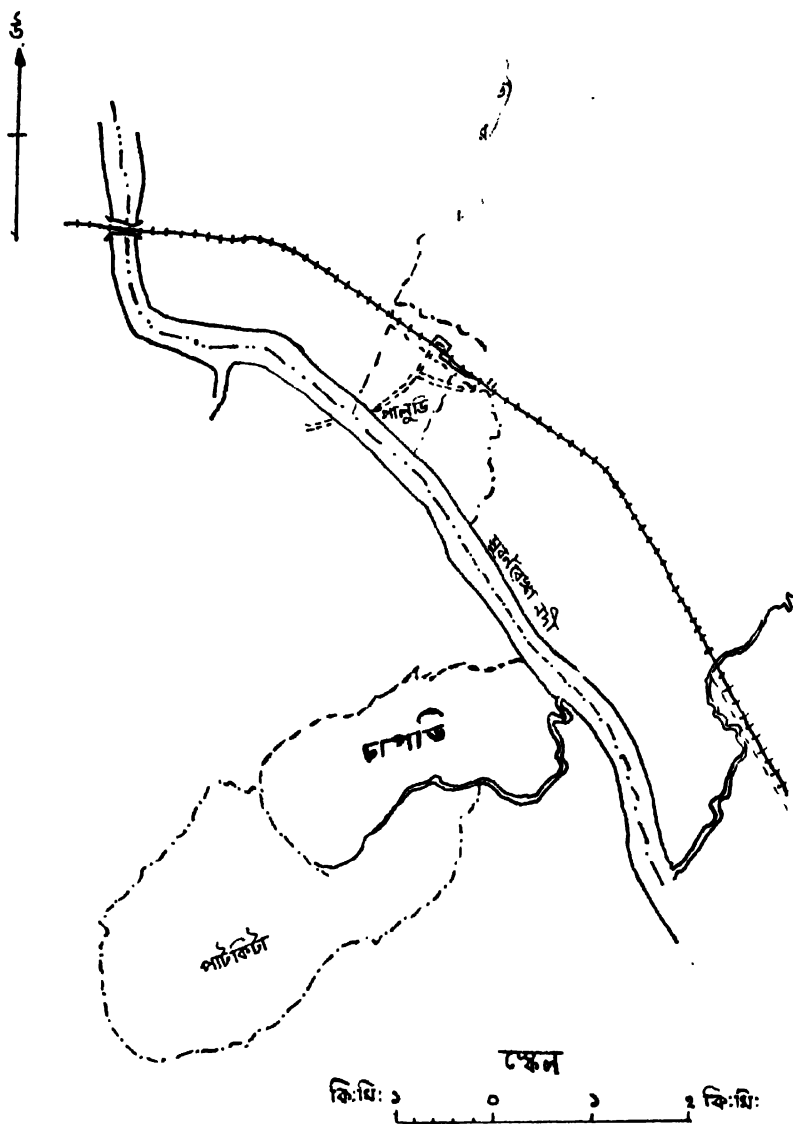
২।২।১৯৩৪ : গালুডি অঞ্চলের স্থানচিত্র

দিনেই বোধ হয় আমি এখান থেকে সন্ধ্যার ট্রেনে বনগাঁ গিয়েছিলুম[১], রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন ভৃত্য' আবৃত্তি কর্ত্তে কর্ত্তে। কত কথাই মনে এল! জীবনের নানা পরিবর্ত্তন ঘটেচে। Great Spiritকেও যেন নক্ষত্রালোকিত মহাশূন্যে দেখ্‌তে পেলুম। এবার দেশ তেমন ভাল লাগে নি। বৃষ্টি, কাদা, স্যাঁতস্যাঁতে ডোবা, জঙ্গল। অপরিচ্ছন্নতা—দেশের লোকে বাস কর্ত্তে জানে না। ওসব স্থানে মন মুসড়ে থাকে। চিন্তা আসে না।

আজ কলকাতা যেন নতুন চোখে দেখলুম। ১৮।১৯ বছরের কত স্মৃতি এর সঙ্গে জড়ানো। এত আলো, এত পরিচ্ছন্নতা—কালীপূজার জের এখনও মেটেনি—হাউই, তুবড়ী এখনও ফুটচে—বড় ভাল লাগ্‌ল। এই সময়টা কত বৎসর ধরে একা enjoy করে এসেচি কল্‌কাতায়। যখন ছাতিমফুল ফুটত তখন। কত রাত পর্য্যন্ত বারান্দাতে অবাক্ হয়ে বসে রইলুম। এ যেন স্বর্গ—নক্ষত্রলোক কাছে কাছে এসেছে। অন্ধকার নেই।

২১শে অক্টোবর, ১৯৩৩। ৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩৪০। শনিবার

কল্‌কাতা এত ভালো লাগেনি আর কখনও। একে এবার যেন নূতন দেখ্‌চি। সকালে বন্ধুর বাসায় গিয়ে ১১টা পর্য্যন্ত রইলুম। এসে ঘুমিয়ে উঠেই বঙ্গশ্রীতে গেলুম। সেখান থেকে Geographies কিনে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে নীরদ বাবুর flat এ। ধর্ম্মতলার স্ট্রীটের মোড়ে যখন গিয়েচি, সন্ধ্যা হোল। ট্রামে লালনীলসবুজ আলো জালিয়েচে—ট্রাফিকের ভিড়, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখ্‌লুম—এত সুন্দর, এত সজীব, এত বিরাট মনে হোতে লাগ্‌ল এই ugly কল্‌কাতা সহরকে। নীরদ বাবুর ওখানে গিয়ে চা খেয়ে আড্ডা দিলুম। তারপর দুজনেই বেরুলাম। নীরদ বাবুর স্ত্রীকে phone করা হোল amed (?) এর Soda Fountain থেকে। তারপর আমরা সব বায়োস্কোপগুলো বেড়িয়ে কোথায় কি আছে দেখে নিলাম। আমি আবার ফিরে গিয়ে stall এ Wide World খুঁজলুম। তারপর মেসে এসে রাত একটা পর্য্যন্ত Good Companions পড়লুম। বইখানা সুন্দর লাগ্‌চে।

২২শে অক্টোবর, ১৯৩৩। ৫ই কার্ত্তিক, ১৩৪০। রবিবার

সকালে উঠে Good Companions পড়চি। একটী ছেলে এল, তার সঙ্গে

---

১ এই দিনটিকে স্মরণ করার একটি বিশেষ কারণ আছে। গৌরী বারাকপুরে থাকতে এই আসাই ছিল বিভূতিভূষণের শেষ আসা। কারণ এর মাসখানেক পরে ৬ই অগ্রহায়ণ ১৩২৫ সালে বাপের বাড়িতে গৌরী মারা যান।

বেরিয়ে রমাপ্রসন্নদের বাড়ী গেলুম। রমাপ্রসন্ন নেই। কৃষ্ণধন বাবুর বাড়ীতে গেলুম। গল্পগুজব সেরে বাড়ীতে স্নান করলুম।

একটু ঘুমিয়ে উঠেই ছবিঘরে White Devil দেখ্‌তে গেলুম। সেখানে মুরারির সঙ্গে দেখা। মুরারি চা খাওয়ালে। মিষ্টি কথা বলতে পারলে মুরারি ছেলেটা মন্দ নয়। ছবিঘর থেকে বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে College Square এ বসলুম। পুরোনো বইএর দোকান দেখ্‌লুম। শিবরাম ও শৈলেনের সঙ্গে পথে দেখা। Advance এর[১] বিজন ও যাচ্ছিল—আলাপ হোল। রমেশ সেনের ওখানে গেলুম ও সেখান থেকে দুজনে চলে এসে রমাপ্রসন্নের বাসায় বসে অনেকক্ষণ গল্পগুজব কর্‌লুম। সদানন্দ আশ্রমে খেয়ে রাত্রি ৯টায় ফিরলুম। Good Companions আজ শেষ হোল। চমৎকার বই। কলকাতা খুব ভাল লাগ্‌চে।

২৩শে অক্টোবর, ১৯৩৩।৬ই কার্ত্তিক, ১৩৪০। সোমবার

সকালে উঠে স্নান ও কামানো সেরে মণীন্দ্র বসুর বাড়ী পার্ক সার্কাসে গেলুম। চা ও খাবার খেয়ে খুব গল্পগুজব হোল। বেলা সাড়ে এগারোটার সময় মণি ট্রামে তুলে দিয়ে গেল। মণির বাড়ী খুব খাবার খাইয়েচে, তবুও মেসে এসে ভাত খেলুম। একটু পরেই Imperial Library তে গিয়ে সাধু সুন্দর সিংএর বই ফেরৎ দিয়ে এলুম। পথে ফলের আইস্‌ক্রিম খাই। তারপরে বঙ্গশ্রী। নীহার রায় এল। অশোকও এল। এ ওর হাত দেখে, সে ওর হাত দেখে। প্রমথ বিশীর হাত দেখে একটা অপ্রীতিকর কথা বল্‌তেই সে বিষণ্ন হয়ে পড়ল। নীহার ও আমি বেরুলুম ওখান থেকে—নীহার গেল কর্পোরেশন ট্রেনিং স্কুলে পড়াতে। আমি পথে সুনীতি বাবুর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা' দু পয়সা দিয়ে কিনলুম।

বাসায় এসে কিছু খেয়ে বাংলা সাহিত্যের কথা খানা অনেক রাত পর্য্যন্ত পড়লুম।

আজ চমৎকার আকাশ। Imperial library তে Oliver Lodge এর My Philosophy বইখানা পড়লুম আজ।

কাপড় ফেলে এসেচি বনগাঁয়ে। আস্‌চে শুক্রবার আন্‌তে যাবো। খুকুকে দেখ্‌লুম আজ।

১ ১৯২৯ সালে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এই ইংরেজি সংবাদপত্রটির প্রতিষ্ঠা করেন।

২৪শে অক্টোবর, ১৯৩৩। ৭ই কার্ত্তিক, ১৩৪০। মঙ্গলবার

সকালে উঠে উপন্যাসের কথা ভাবলুম[১]। তারপর খেয়ে ননীর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে গেলুম রামরাজা তলা। খুরুট রোডের মোড়ে বাস পাইনে—হেঁটে গেলুম অনেকটা। জতু[২] চা খাওয়ালে। সন্ধ্যার পরে ওখান থেকে বার হয়ে বিভূতিদের বাড়ী। এসে শুনি ছোট বৌরাণীর T. B. হয়েচে—ভুগ্‌ছেন, বাঁচেন কি না বাঁচেন। এতদিন পরে Homes Gardens[৩] বই আনার তাগাদা করলুম কারণ ওদের বালীগঞ্জের বাড়ীটা ভাড়া হয়ে গিয়েচে—কে এক বিড়িওয়ালা ৭০০ টাকা ভাড়ায় নিয়েচে। হায় সিধুবাবু! ১৯২৮ সালে তুমি যখন Osler এর বাড়ীর দামী ফার্ণিচার এনে বাড়ী সাজিয়েছিলে—তখন কি জান্‌তে ও বাড়ীর কি পরিণাম হবে? এততেও মানুষ ভাব্‌তে শেখে না কেন, তাই বিস্মিত হই। Homes & Gardens এর কাজ শেষ হয়েচে তাই ফেরৎ চাইলুম।

ওখান থেকে হেঁটে বাসায় এলুম—পথে প্যারীমোহন সেনগুপ্তের দেখা। নাগপুরের গল্প হোল। আসবার সময় দেখি রমেশ কবিরাজের দোকান বন্ধ হয়ে গেছে [।]

২৫শে অক্টোবর, ১৯৩৩।৮ই কার্ত্তিক, ১৩৪০। বুধবার

সকালে বসে কৈলাস ভ্রমণ[৪] পড়লুম। বৈকালে বঙ্গশ্রী গেলুম তারপর ওখান থেকে আমি, মনোজ ও সজনী ছবিঘরে Christina দেখ্‌তে এলুম। শান্তি পাল খুব খাওয়ালে—তারপর ছবি দেখ্‌তে গিয়ে কিন্তু বেশীক্ষণ বস্‌তে পারলুম না—Interval এর পরেই বার হয়ে নীরদবাবুর flat এ এলুম কারণ ওখানে নিমন্ত্রণ ছিল। অনেক রাত পর্য্যন্ত আড্ডা ও খাওয়া দাওয়া [—] ধূমপানের পর বাসে করে বাসায় ফিরলুম। কলকাতার জীবনটা কাটে একটা কাজকর্ম্ম ও Engagement এর ঘূর্ণিপাকের মধ্যে। পাড়াগাঁয়ের মত dull life নয়। জীবনের অভিজ্ঞতাও তাই এখানে বেড়েই চলে।

২৬শে অক্টোবর, ১৯৩৩।৯ই কার্ত্তিক, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

সকালে উঠে বন্ধুর বাসায় গেলাম। বেলা ১১টার সময় সেখান থেকে বার

---

১ দৃষ্টিপ্রদীপ। এই বছরের ফাল্গুন মাস থেকে প্রবাসীতে উপন্যাসটি বেরয়।

২ জতু চক্রবর্তী; বিভূতিভূষণের সহপাঠী ননী চক্রবর্তীর স্ত্রী।

৩ Homes and Gardens of England। লেখক H. Batsford ও C. Fry।

৪ যথার্থ নাম, কৈলাস যাত্রা। লেখক সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায় (শাস্ত্রী)।

হয়ে বিচিত্রা আপিসে উপেনবাবুর কাছে। সুশীল বাবু এলেন। আড়াইটা বেলা পর্য্যন্ত সেখানে আড্ডা। তারপর ট্রামে কলেজ স্কোয়ারের পুরোনো বইএর দোকান দেখ্‌চি, অশ্বিনী বাবুর বোর্ডিংয়ের পুরাতন roommate প্রবোধবাবুর সঙ্গে দেখা। তারপর এলুম P. C. Sircar এর দোকানে। বেলা ৪টার সময়ে বাড়ী। বঙ্গশ্রীর জন্যে লিখলুম। কাল বনগাঁয়ে যাবো কারণ এখনো স্কুল খোলেনি—এই সপ্তাহে না গেলে অনেকদিন আর যাওয়া হবে না। দিদিদের—? thyroid tablets কিনে আনলুম একটা দোকান থেকে। রাত্রে কিছু খাই নি। বারান্দায় বিছানা পেতে শোয়া গেল। বেশ জ্যোৎস্না। সুটু এসে গল্প করছিল বৈকালে।

২৭শে অক্টোবর, ১৯৩৩। ১০ই কার্ত্তিক, ১৩৪০। শুক্রবার

সকালে ৭টার ট্রেনে বনগাঁয়ে এলুম। সকালের এই গাড়ীখানা বেশ ভালো। খুব ফুল ফুটেচে পথে পথে। একটু মেঘ করেছিল সকালে—এখানো [এখন] আর নেই। এবার বনগাঁয়ে এসে সেই গাছপালার অপূর্ব্ব delicious সুগন্ধটা পাচ্ছি। ও সপ্তাহে পাইনি। কার্ত্তিকের মাঝামাঝিই ও গন্ধটা পাওয়া যায়। তবে স্থায়ী হয় না বেশীদিন। দারোগাবাবুর সঙ্গে গল্প করে নাইতে গেলুম দুজনে বাঁধাঘাটে। জল পরিষ্কার হয়ে গিয়েচে। খুব কচুরিপানা ভেসে আস্‌চে—বোধহয় গোপালনগরের বাঁওড় থেকে। এবার দেশে বেশ ভাল লাগ্‌চে।

বৈকেলে মিতের আড়তে বসে খুব গল্প করলুম। জ্যোৎস্না উঠেচে। একটু একটু শীতও আছে। বৈকালে খয়রামারি বেড়াতে গেলুম। বেশ লাগ্‌লো। সবরকম ফুল ফুটেচে ও বন মৌরীর ঘন সুগন্ধ বেরুচ্চে।

২৮শে অক্টোবর, ১০৩৩। ১১ই কার্ত্তিক, ১৩৪০। শনিবার

সকালে উঠে স্নান সেরে চালকী গেলুম দিদিদের বাড়ী। সেখানে চা খেয়ে বারাকপুরে। এবার দেশের শোভা হয়েচে অপূর্ব্ব। গাছপালার সেই ঘন সুগন্ধে ভরপুর। আজ আবার আকাশ অপূর্ব্ব ধরনের নীল। কত কি ফুল ফুটেচে [—] কখনো মিষ্টি গন্ধ, কখনো বা অন্য ধরনের গন্ধ। গাজিতলার[১] পথটায় যেমন ঘন জঙ্গল, সবুজও নিবিড়—তেমনি সুগন্ধে ভরপুর। ও ধরনের বনের নিবিড়তা ও শোভা নাগপুরের বনের নেই। তবে এ woods, আর সে হোল forest. Tropical forest সেখানে সত্যি তার শোভা অনেক বেশী হবে, বোঝাই যায়।

কাঁটাল তলায় বসে হরিপদ, ফণিকাকা সবাই গল্প করলুম, তারপর রামপদদের

---

১ বারাকপুর।

বাড়ীতে গেলুম। ওরা গোঁসাইবাড়ী স্কুলে বেরিয়ে গেল। আমি কালো, খুড়ীমা, নদি বসে তাস খেলা করলুম। পুঁটীদিদি একটা পাগলীর গল্প করলে। বেলা পড়েচে—আমি ও কালো বার হয়ে ওপাড়ার ঘাট দেখে নদীর ধারে এলুম। ফণি কাকা মাছ ধরচে। নদীর ধারে খুব কাদা। ওপাড়ার ঘাট ভেঙে গিয়েচে। আবার গাজিতলার সেই সুন্দর জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে হেঁটে বনগাঁয়ে এলুম। কিছু খাইনি সারাদিন। দারোগার বাড়ী নিমন্ত্রণ খেলুম।

২৯শে অক্টোবর, ১৯৩৩। ১২ই কার্ত্তিক, ১৩৪০। রবিবার

বনগাঁ থেকে বরিশাল এক্সপ্রেসে এলুম। এসে খানিকটা ঘুমিয়ে উঠে রূপবাণীতে একটা বনের ছবি দেখ্‌তে গেলুম। হেঁটে ফিরতে ফিরতে রমেশ সেনের আড্ডায় গেলাম। শিবরাম বাবুও ছিলেন। সেখান থেকে রাত আটটায় বাসায় এলুম। খুব ছাতিম ফুলের সুগন্ধ বেরুচ্চে।

৩০শে অক্টোবর, ১৯৩৩। ১৩ই কার্ত্তিক, ১৩৪০। সোমবার

স্কুল খুল্‌ল। পথে যাচ্চি, দেবব্রতদের সঙ্গে দেখা। সে বল্লে প্যাটেলের[১] দেহ কবে এসে বম্বে পৌঁছুবে। ছুটি হবে কিনা তাও জিজ্ঞেস কর্ল্লে। স্কুলে গিয়ে আজ খুব কাছে ঘেঁসে রইল। সকাল সকাল ছুটি হয়ে গেল। বঙ্গশ্রী আপিসে গিয়ে চা খেলুম। আড্ডাও হোল বিরাট্ (?) [—] ডাঃ মহম্মদ শহীদহুল্লাও এলেন—তাঁকে জিজ্ঞেস্ করে জানলুম তিনি বসিরহাটে practice কর্ত্তেন। আমার শ্বশুরকে[২] চেনেন। সেই শহীদহুলা [—] ১৯১৮ সালে শ্বশুর মশায় এঁর কথাই বল্‌তেন। প্রবোধ বাগচীও এলেন। ডাঃ রায়কে[৩] phone করলুম—কামিনী রায়ের[৪] সভায় preside কর্ত্তে পারবেন কিনা সেজন্যে। পাওয়া গেল না। কৃষ্ণধন বাবুর গাড়ীতে college square এ নামলুম ও কিছু খাবার খেয়ে পুরোনো বইএর দোকান ঘুরে বাড়ী এলাম। রাত্রে জ্যোৎস্না।

১ বিঠলভাই প্যাটেল, প্রখ্যাত কংগ্রেসকর্মী; সর্দার বল্লভভাই এঁর ছোট ভাই। বিঠলভাই ২২শে অক্টোবর মারা যান।

২ কালীমোহন মুখোপাধ্যায়, গৌরীর বাবা। ইনি বসিরহাট কোর্টের মোক্তার ছিলেন।

৩ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।

৪ কামিনী রায়ের স্মরণ সভা। ইনি ১৯৩৩ সনের ২৭শে সেপ্টেম্বর মারা যান।

৩১শে অক্টোবর, ১৯৩৩।১৪ই কার্ত্তিক. ১৩৪০। মঙ্গলবার

সকালে মহিম বাবু ও P. C. Sircar এর ছেলে এল। স্কুল থেকে বঙ্গশ্রীতে। শৈলজা গল্প পড়লে——পশুপতি বাবু এলেন। তাঁর গাড়ীতে শ্যামবাজারে। বল্লেন কাল—রেডিওতে বক্তৃতা দেবেন, মৃণালবাবু বলেচেন তাঁর বক্তৃতাটায় বইয়ের কথা উল্লেখ কর্ত্তে। নীরদের বাসায় নীরদ নেই। হেঁটে বাসায় এলুম। বাইরে জ্যোৎস্নায় বসলুম—ক্লান্তি এল।

১লা নভেম্বর, ১৯৩৩। ১৫ই কার্ত্তিক, ১৩৪০। বুধবার

রাসের ছুটি। সকালে পড়েশুনে কাটানো গেল। বৈকেলে থ্যাকার্সের দোকানে গিয়ে ৫টা পর্য্যন্ত একখানা জঙ্গলের বই পড়লুম। কার্জ্জন পার্কে বসে সিগারেট খেয়ে বঙ্গশ্রী আপিসে আসচি—দেখি সজনী বার হয়ে যাচ্চে মোটরে। আমি হেঁটে Radio office এ গেলুম। নৃপেন এল—৭-৫ মিনিটে আমার বক্তৃতা হোল।

বাসায় এসে 'জঙ্গল [’] সম্বন্ধে বইটার[১] sketch করলুম [।]

২রা নভেম্বর, ১৯৩৩। ১৬ই কার্ত্তিক, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

খুব সকালে এলেন রমেশ বাবু, এসে বিছানা থেকে ওঠালেন। কামিনী রায়ের শোক সভা হবে—তাতে আমার নাম ছাপাবেন কিনা, সে কথা জিগ্যেস কর্ত্তে। একটু পরেই মহিমা বাবু এলেন। স্কুলে গেলুম। সেখান থেকে বঙ্গশ্রীতে। ওখান থেকে কিছু চানাচুর খেয়ে হেঁটে রমেনবাবুর আড্ডায়। চোখের ওষুধ নিয়ে চলে এলুম। পথে বেচু চাটুয্যের স্ট্রীটে শ্যামাসুন্দর জীউর রাস হচ্চে।

৩রা নভেম্বর, ১৯৩৩। ১৭ই কার্ত্তিক, ১৩৪০। শুক্রবার

স্কুল থেকে নীরদবাবুর গাড়ীতে নীরদবাবুর flat-এ। সেখানে সুশীল বাবু ও শঙ্করকে দেখে খুব খুশী হলুম। চা খেয়ে নীরদবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে গাড়ীতে সিমলে এলাম। গাড়ীতে ওঠ্‌বার সঙ্গে খোকা খুড়োর সঙ্গে দেখা হোল। সিমলে থেকে শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের শোকসভায় এলুম। উপেনবাবু আগে থেকেই বসে আছেন। শিবরাম চক্রবর্ত্তী এল—উপেনবাবুকে বল্লুম—কাল শিবরামকে খুব করে বলেচি। শিবরাম হাসতে লাগল। নরেন দেবের সঙ্গে চিত্রকূট সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হোল। চিত্রকূটে রাধারানী দেবী ও নরেনদা গিয়েছিলেন এবার। বল্লেন বেশ সুন্দর জায়গা। চিত্রকূট সেবাসদনে ফনি

১ আরণ্যক।

বাবুর নাম বল্লেই গাড়ী নিয়ে যাবে। সেখানে থাকা যায়। বাঙালী দেখ্‌লে খুব আদর করেন। ঘোড়া ভাড়া পাওয়া যায়। পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে যাওয়া যায়। দূরে দূরে পাহাড় জঙ্গল আছে। কেরায়নি (?) স্টেশনে নাম্‌তে হয়—সেখান থেকে বাস্‌ মোটর একা পাওয়া যায়। কামিনী রায়ের শোকসভা থেকে আমি আর মনোজ বার হয়ে ছবিঘরে এসে Cavalcade দেখলুম—Noel Coward এর বেশ ভাল বই।[1] সজনী, দেবী, জ্ঞানবাবু, নৃপেন, পরিমল সবাই ছিল। অনেক রাত্রে মেসে ফিরি।

৪ঠা নভেম্বর, ১৯৩৩। ১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৪০। শনিবার

ছুটি ছিল—অক্ষয় বাবুর স্ত্রীর পরলোক গমনের জন্যে। বসে বসে লিখ্‌লুম—বৈকেলে হেঁটে বঙ্গশ্রী আপিসে। কেউ নেই—সেখান থেকে বেরিয়ে স্কোয়ারে বেঞ্চিতে বসে সিগারেট খেলুম। তারপর হেঁটে শ্যামবাজার টঙ্কদের বাসায়। ওখান থেকে নীরদের বাসায়। গিরিজাবাবু[2] ও ব্রজেনদা বসে রামমোহনের শ্রাদ্ধ করচে। তারপর—ট্রামে বাসায় এলুম। বেশ জ্যোৎস্না।

৫ই নভেম্বর, ১৯৩৩। ১৯শে কার্ত্তিক, ১৩৪০। রবিবার

সকালে চুল ছেটে [ছেঁটে] মণির বাসায় গেলুম পার্ক সার্কাসে। সেখানে সুধীর সরকার, শচীন সেন এলেন। চা পান আড্ডা হোল। অনেক বেলায় বাসায় এসে খেয়ে একটু বিশ্রাম করলুম। তারপর উঠে নীরদ বাবুদের Flat-এ গিয়ে আড্ডা দেওয়া গেল। মণির কাছ থেকে My [?] Thousand Years বইখানা এনেছি। প্রমোদবাবু এসেছিলেন। আমরা মণিপুর যাবো ঠিক করলুম। তারপর ওখান থেকে বার হয়ে বাসায় এলুম।

৬ই নভেম্বর, ১৯৩৩। ২০শে কার্ত্তিক, ১৩৪০। সোমবার

মণির কাছ থেকে My [?] Thousand Years বলে বইখানা এনেছিলুম—পড়া গেল। স্কুল থেকে বের হয়ে কৃষ্ণধনের গাড়ীতে College Square। ওখান থেকে রমেশ সেনের দোকান। তারপর বাসা। সন্দের দিকে আজ বাসায় কেউ নেই—বসে বসে বইখানা পড়লুম। বেশ লাগ্‌চে। পূর্ব্বাশার ম্যানেজার এল একখানা চিঠি নিয়ে।

৭ই নভেম্বর, ১৯৩৩। ২১শে কার্ত্তিক, ১৩৪০। মঙ্গলবার

স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী আপিস্‌। এক কাপ্‌ কোকো খেয়ে ওখান থেকে College

---

১ Director ছিলেন Frank Llyod।

২ গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী, প্রাবন্ধিক।

Sqr. হিন্দুস্কুলের পাশে বেঞ্চিতে অনেকদিন বসিনি, গাছের তলায়। বসে তারপর বাড়ী ফিরে এলুম। একখানা Wide World কিনে এনেছিলুম। তাই পড়লুম।

আজ ঘরে এসে দেখি বেজায় ভিড় ও আড্ডা চল্‌চে। আমি ভিড় ও আড্ডা একেবারেই সহ্য কর্‌তে পারিনে—বিশেষত পরিচিত লোকের। এ কটা দিন গেলে বাঁচা যায়।

৮ই নভেম্বর, ১৯৩৩। ২২শে কার্ত্তিক, ১৩৪০। বুধবার

স্কুল থেকে বেরিয়ে বঙ্গশ্রীতে গেলুম। সেখানে এলেন সুনীতিবাবু। রবীন্দ্রনাথের জাভা যাওয়ার সময়ে খাওয়ার গল্প কর্ল্লেন। সজনীরা রোনেক (?) মহলে ছবি দেখতে গেল—আমি শিব বাবুর কাছ থেকে ম্যাগাজিনের টাকা নিয়ে ইন্‌স্টিটিউটে এলুম Col. Camild Canali-র বক্তৃতা শুনতে। Fascism ও মুসোলিনী সম্বন্ধে নূতন কথা কিছু বল্লেন না। অনেকদিন পর অনেকক্ষণ লাউঞ্জে বসে রইলুম। বোধহয় এভাবে আজ তিন চার বছর বসিনি—কিংবা বেশী। এদের খাওয়া দাওয়া হোল—তারপর আমি রাত্রে বাসায় এলুম।

৯ই নভেম্বর, ১৯৩৩। ২৩শে কার্ত্তিক, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

আজ স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী হয়ে রোনক্‌ মহলে গেলুম। সেখানে Bird of Paradise [১] বলে ছবিটা দেখি আমি, পরিমল নবশক্তির সরোজ [২] ছিল। আজকাল হেমন্ত [৩] এখানে ম্যানেজার হয়েছে। ছবি দেখার পরে Wide World কিন্‌তে গেলুম মার্কেটে। পথে হেমেন্‌ নায়েবের ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। হেমেন নায়েব মুক্তাগাছাতেই আছে। কোনো চাকুরী পায়নি। সুধীরের সঙ্গেও দেখা। সে যেতে বল্লে ওদের দেশে। তারপর শিখের দোকানে কিছু খেয়ে (আমি ওই দোকানে খেতে খুব ভালবাসি, এটা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ঠিক ফায়ার বিগ্রেডের আড্ডার সামনে) বাসায় এলুম হেঁটে। নক্ষত্রগুলোর দিকে চেয়ে আজ একটা অপূর্ব্ব আনন্দ হোল। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এসে বসলুম খানিকটা। দেশের কথা মনে হোল। এখানে মনটা ভারী active থাকে কিন্তু। কলকাতা এখন বেশ লাগ্‌চে।

---

১ Wells Root-এর বই। Director ছিলেন King Vidor।

২ সরোজকুমার রায়চৌধুরী। ইনি কিছুদিন সাপ্তাহিক নবশক্তির সম্পাদক ছিলেন। (১০. ১০. ১৯৩০—১৬. ১. ১৯৩১)

৩ হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। নিউ থিয়েটার্সের প্রচার-সচিব ছিলেন।

১০ই নভেম্বর, ১৯৩৩।২৪শে কার্ত্তিক, ১৩৪০। শুক্রবার

স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী। আমি আর প্রমথ বিশী হিমালয় ও মণিপুরের গল্প কর্ত্তে কর্ত্তে College Square পর্য্যন্ত এলুম। সজনীরা Song of Songs[1] দেখ্‌তে গেল। আমি তামাক কিনে বাসায় ফিরলুম। অনেক রাত্রে গোপেন মিত্র ও রমেশ সেন এলেন কালকার সভার বিষয় ঠিক করবার জন্যে। আজ কাল কল্‌কাতা বেশ লাগ্‌চে।

১১ই নভেম্বর, ১৯৩৩।২৫শে কার্ত্তিক, ১৩৪০। শনিবার

স্কুলের ছুটী সকালেই হোল। দেবব্রতের একখানা চিঠি নিয়ে এল একটা ছেলে। বঙ্গশ্রী আপিসে মাণিক বাঁড়ুয্যে ও নৃপেনের সঙ্গে আড্ডা দিলাম খানিকক্ষণ। ওরা গেল বায়স্কোপ দেখতে। আমি College Squareএ বসে আছি প্রমথ বিশীর সঙ্গে দেখা। সেখান থেকে বাসায় এসে খানিকটা লিখে সাহিত্য সেবক সমিতিতে সভাপতিত্ব কর্ত্তে গেলুম। ওখান থেকে বেরিয়ে বাসায় এলাম গোলদিঘীর পাশ দিয়ে হেঁটে।

১২ই নভেম্বর, ১৯৩৩। ২৬শে কার্ত্তিক, ১৩৪০। রবিবার

সকালে নীলকণ্ঠ কেবিনে এককাপ্‌ ওভালটিন খেলাম কারণ শরীরটা ভাল নয়। তারপর মহিমা বাবুদের বাড়ী গেলাম। তারাও খাবার আনালে —তারপর গল্পগুজব হোল। বাসায় এসে স্নান সেরে দেখি প্রমোদ বাবু এসে চিঠি লিখে রেখে গেছেন। হেঁটে যেতে যেতে পথে Cow Protection Leagueএর মোহন বাবুর সঙ্গে দেখা। খানিকটা পুরোনো দিনের বিষয়ে গল্প-গুজব করা গেল। তারপর Flatএ গিয়ে খেয়ে দেয়ে খুব আড্ডা। বড়দিনে কোথায় যাওয়া হবে, তাই নিয়ে কথা। ঠিক হোল মণিপুর, দেওঘর, ভুবনেশ্বর, বরাকর ও বেনারস—এদের মধ্যে একটা জায়গায় যাওয়া হবে। সুশীলবাবু এলো অনেকরাত্রে। তারপর ট্রামে বাসায় এলুম।

১৩ই নভেম্বর, ১৯৩৩। ২৭শে কার্ত্তিক, ১৩৪০। সোমবার

স্কুলে আজও নাকি দেবব্রত চিঠি দিয়েছিল, যার কাছে দিয়েছিল সে হারিয়ে ফেলেচে। বঙ্গশ্রী থেকে সজনী খুব খাওয়ালে, প্রমথ বিশী ও আমি পয়সা দিলাম। সজনী এপ্রিকট্‌ কিন্‌লে। তারপর বাসে শেয়ালদা' দিয়ে

১ Hermann Sudermann-এর বই। Director ছিলেন Rouben Mamoulian।

টকদের বাসায় গেলুম সেখানে চা খেয়ে পথে সুরেশানন্দর[১] সঙ্গে দেখা—অনেকক্ষণ কথাবার্তা হোল। তার ঠিকানা ২৫ হেমেন্দ্র সেনের ষ্ট্রীট, মসজিদ্ বাড়ী। আবার বঙ্গশ্রীতে ফিরে দেখি ওরা কেউ নেই। পথে আসবার সময় বেশ আনন্দ হোল—দিনটা বেশী ঠাণ্ডা নয়, বেশী গরমও নয়। ওয়েলিংটন স্কোয়ার জায়গাটা বেশ ভাল লাগে। স্কুলেও আজকাল বেশ লাগে।

১৪ই নভেম্বর, ১৯৩৩।২৮শে কার্ত্তিক, ১৩৪০। মঙ্গলবার

বঙ্গশ্রী আপিস থেকে অক্সিলৃডি (?) হোস্টেলে Annual Socialএ গেলুম। বক্তৃতা করবো না ইচ্ছে ছিল, হঠাৎ পেছন দিক থেকে "আমরা বিভূতিবাবুকে দেখব" আমরা বিভূতিবাবুকে দেখব' শব্দ উঠলো। উঠে অগত্যা কিছু বল্লুম। তারপর খাওয়া দাওয়া সেরে অনেকরাত্রে বাসায় এলুম।

১৫ই নভেম্বর, ১৯৩৩। ২৯শে কার্ত্তিক, ১৩৪০। বুধবার

সকালে সুপ্রভাদের নতুন হোস্টেলে[২] গিয়ে অনেকক্ষণ গল্পগুজব করা গেল। ফিরে এসে স্কুলে যাব এখন সময় রেবতী বাবু ও বুলবুলের সম্পাদক এলেন। স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী। সেখানে সত্যেন বসু[৩] মশায় তাঁর বাড়ীতে সোমবারে খাওয়ার নিমন্ত্রণ কর্লেন, সেখানে তাঁর রচিত একটা নাটক শুনতে হবে।

১৬ই নভেম্বর, ১৯৩৩। ৩০শে কার্ত্তিক, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

আজ কার্ত্তিক পূজার ছুটি। সকালে মণি বোসের বাড়ী গেলুম আমি ও ও মহিমাবাবু। ওখান থেকে এসে দুপুরে একটু ঘুমিয়েই Imperial Libraryতে গিয়ে ? এর Plant Geography[৪] পড়লুম। ওখান থেকে চারু বিশ্বাসের বাড়ী যাবার পথে মুরলী বসুর বাড়ী গেলুম। চারু বিশ্বাসের বাড়ী চা খেয়ে বালীগঞ্জে মন্মথদের বাড়ী গেলাম। রাত্রে নিমন্ত্রণ ছিল। তাস খেলে ও নিমন্ত্রণ খেয়ে রাত ১১টার পরে ওদেরই মোটরে বাসায় এলুম। আজ শীত তত নেই।

১ সুরেশানন্দ ভট্টাচার্য; এককালে সবুজপত্র-এ গল্প লিখতেন। 'হৈরা' এঁর নামকরা গল্প।

২ ১৯ কলেজ রো।

৩ বিভূতিভূষণ উপাধিটা ভুল লিখেছেন; বসু নয়, সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত হবে। ইনি সে সময়ে নাটকও লিখেছেন। মহাপ্রস্থান, মরণে জয় এঁর নাটক। ভাল অভিনয়ও করতেন। শিশির ভাদুড়ির অনুপস্থিতিতে একদিন বিজয়া নাটকে রাসবিহারীর অভিনয় করেছিলেন।

৪ An Outline of Plant Geography, Douglas H. Campbell।

১৭ই নভেম্বর, ১৯৩৩। ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। শুক্রবার

আজ স্কুল খোলা। বঙ্গশ্রী থেকে জ্ঞান বাবুর গাড়ীতে সন্ধ্যার সময়ে সজনীর বাসায় সজনীকে নামিয়ে দিয়ে আমি গেলুম শ্যামবাজারে। জ্ঞান বাবুর বাড়ী থেকে চা খেয়ে বার হয়ে গেলুম নীরদের ওখানে। খানিকক্ষণ গল্পগুজব সেরে দ্বারিকের দোকানে কিছু খেলাম কারণ খিদে পেয়েছিল। তারপর টক্লদের ওখানে এলুম। ওরা তখনই দেশ থেকে এসেচে—শুনলুম নদির অসুখ, বাঁচে না। তারপর অনেকরাত্রে বাসায় এলাম।

১৮ই নভেম্বর. ১৯৩৩। ২রা অগ্রহায়ণ. ১৩৪০। শনিবার

সকালে উঠে গেলুম ট্রেনে বালিগঞ্জে ধূর্জ্জটি বাবুর বাড়ী। একডালিয়া রোডে বেশ বাড়ীখানা করেছে। খানিকটা গল্পগুজবের পরে সাড়ে ন'টার ট্রেন ধরে বালিগঞ্জ থেকে ফিরলুম। তারপর স্কুল, সেখান থেকে বঙ্গশ্রী আপিস—সেখানে সত্যেনবাবু এসে নেমন্তন্ন কর্লেন। বরিশাল এক্সপ্রেসে বনগাঁয়ে গেলুম দিদির রাগ্ কিনে নিয়ে। বনগাঁয়ে ওরা কেউ নেই [---] গেলুম চাল্কীতে। সন্ধ্যার সময় দিদিদের রান্নাঘরে বসে চা খেলাম ও গল্প হোল। তারপরে এ ঘরে এসে তারাপদ ও আমি Spiritualism আলোচনা কর্লুম। রাত্রে শোয়ার বড় অসুবিধা। বড় মশা, গরমও বেশ। দেশে আদৌ শীত নেই।

১৯শে নভেম্বর, ১৯৩৩। ৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। রবিবার

চালকীতে প্রকৃতির মধ্যে বাস—বেশ লাগে আমার। সকালে বাড়ীর পিছনের বন দেখে মনে হোল পয়সা খরচ করে ট্রপিক্যাল ফরেস্ট্ দেখ্তে এখানে ওখানে যাবার দরকার নেই—এই তো ট্রপিক্যাল ফরেস্ট্। তারপরে খুকী ও নিমুর[১] সঙ্গে পথের ধারের সেই সাঁকোর ওপর গিয়ে খেলা করলুম, অনেকদিন পরে। আমি ওদের বসিয়ে রেখে পালিতপাড়ার[২] বনের মধ্যে ঢুক্লাম—বিজন ও গভীর ট্রপিক্যাল ফরেস্ট। এর চেয়ে বন নাগপুরে গভীর নয়। খুকীদের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে আমি গেলুম বারাকপুরে। কচা কাঁটালতলায় বসে আছে [,] সে বল্লে নদিকে দেখ্তে ফণি কাকা গেছে। পুঁটি দিদিদের বাড়ীতে খোকা[৩] বসে

১ ননীবালা চক্রবর্ত্তী। জাহ্নবীর দেওরঝি, সম্পর্কে বিভূতিভূষণের ভাগিনেয়ী।

২ চালকী।

৩ নগেন মুখোপাধ্যায় (খোকা খুড়ো/নগেন খুড়ো), বারাকপুরবাসী। ধর্মতলা ষ্ট্রীটে Globe Vulcanizing Agency-তে কাজ করতেন।

আছে আমতলায়, রামপদ মাছ কুট্‌চে। খুড়ীমার সঙ্গে দেখা পেলাম বিলবিলের জলে, ওরা কাপড় কাচ্‌চে। ওখানেই স্নান সেরে নিলাম নদীতে। কি স্নিগ্ধ ছায়া, ঘাটে নেয়ে কি সুখ! বনলতার কি সৌন্দর্য্য। তারপর বাড়ী এসে দেখি পুঁটিদিদি ও রামপদ দুজনে ঝগড়া বেধেচে। চালকীতে এসে খেলাম ও একটু ঘুমুলাম [।] তারপর জ্ঞানদের[১] উঠানে বসে একটা ডাব খেলাম। বৈকালে বারাকপুরে ইছামতী নদীর ধারে একটা নৌকার ওপর বসে রইলুম। রোদ রাঙা হয়ে গেছে, একটা নিস্তব্ধতা,-Silence of the Jungle—বেড়ে সুন্দর। তারপর আবার নেড়াদের[২] বাড়ীতে এসে মুড়ি খাওয়ালে খুড়ীমা। সন্ধ্যার পরে ঘুটঘুটে অন্ধকারে গাজিতলার পথ দিয়ে আস্‌তে পায়ে কুঁচকাঁটা বেধে [বেঁধে] গেল। পাকারাস্তায়—আগে দেবেনদের গাড়ী যাচ্চে। ডাকলুম শুন্‌তে পেলে না। দিদিদের বাড়ী গিয়ে চা খেলুম। রাত্রে যেমন গরম, তেমনি মশা।

২০শে নভেম্বর, ১৯৩৩। ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। সোমবার

খুব সকালে উঠে হেঁটে বনগাঁয়ে এলুম। জাহ্নবীরাও সকালে গরুর গাড়ী করে বনগাঁয়ে এল। দারোগার বাসায় খেয়ে বরিশাল এক্সপ্রেস্ ধরলুম। তারপর নেয়ে খেয়ে স্কুলে। স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী হয়ে জ্ঞান বাবুর গাড়ীতে—সত্যেন বাবুর বাড়ীতে। সেখানে তাঁর Grazzia [Grazia] Deleddaর[৩] উপন্যাসের অনুবাদ শুন্‌তে শুন্‌তে অনেক রাত হোল। সেখানে আহারাদি করলুম আমি, নৃপেন, সজনী ও কিরণ। তারপর অনেক রাত্রে বাসায় এলুম।

আজ যেমন গরম, তেমনি আলোর পোকা। শীত একটুও নেই। এরকম আমি কখনো দেখিনি।

২১শে নভেম্বর, ১৯৩৩। ৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। মঙ্গলবার

আজ ভোরে উঠে এত গরম যে না নেয়ে পারলুম না। নাওয়ার সময়ে

১ জ্ঞানেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চালকীবাসী। বিভূতিভূষণের ভগিনীপতি; জাহ্নবীর স্বামী।

২ পরেশ মুখোপাধ্যায়, বারাকপুরবাসী। নগেন মুখোপাধ্যায়ের দাদা। ইনিও ধর্মতলায় ঐ একই Agency-তে কাজ করতেন। দুজনেই তখন বেলেঘাটায় থাকতেন।

৩ Grazia Deledda-র নোবেল প্রাইজ পাওয়া উপন্যাস মা-র অনুবাদ করেছিলেন। বঙ্গশ্রীতে উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে বেরয়।

আরাম হোল। কাল রাতে দক্ষিণ হাওয়া দিয়েচে। এ কি অদ্ভুত ধরনের আবহাওয়া!

স্কুলে গিয়ে ওখান থেকে বঙ্গশ্রী। কেউ নেই, সজনী বার হয়ে গিয়েচে। আমি College Square-এ হেঁটে চলে এলুম। নৃপেনের সঙ্গে দেখা। তার সঙ্গে মোস্লেম পাবলিশিং হাউসে[১] গেলুম।

সকালে অনেকগুলো ছেলে এল কোথাকার Post Graduate Hostel থেকে।[২]

২২শে নভেম্বর, ১৯৩৩। ৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। বুধবার

সকালে উঠে কিরণ মাসিমার বাড়ী গেলুম। একটা ভাল নির্জ্জন বাড়ী খুঁজচি। মন সব সময় একটা ভাল বাড়ীর জন্যে উতলা হয়ে থাকে। সবসময়ই বাড়ীর প্ল্যান আঁকচি। বাসায় এসে খেয়ে স্কুলে ও সেখান থেকে বঙ্গশ্রীতে। একবার বার হয়ে পরেশদের দোকানে গেলুম ধর্ম্মতলাতে। তারপর আমি ও পরিমল হেঁটে এলুম নিজের মেসে।

শ্রীরামপুরের পাঁচু আজ এসেচে। টাকার কথা বল্‌লে। কোথায় টাকা তাকে বলে দিলুম।

২৩শে নভেম্বর, ১৯৩৩। ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী। সেখানে চা খেয়ে মণি বোসের ওখানে পার্ক সার্কাসে। সেখানে সোমনাথ বাবু এলেন। মণি বর্দ্ধনের নাচ হোল, খাওয়া দাওয়া হোল। রাত দশটায় বাড়ী ফিরি।

২৪শে নভেম্বর, ১৯৩৩। ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। শুক্রবার

সকালে স্কুল। সেখান থেকে বঙ্গশ্রী হয়ে ভাগলপুরের চারুবাবুর ছেলে, আমি, সজনী, জ্ঞানবাবুর গাড়ীতে Topaz [e] Film[৩] দেখ্‌তে গেলুম। বাস্তবিকই অতি সুন্দর বই। জ্ঞানদার গাড়ীতেই মৃজাপুরের বাসায় ফিরে এলুম।

১৯৩৩ সালে দেখা Topaz ছবিটার কথা আজও ভুলিনি। সামনের শুক্রবারে ঘাটশিলা যাবো। বারাকপুরে বাড়ী সারাচ্চি ১৭. ১১.৪১

---

১ আপার সার্কুলার রোডে ছিল।

২ শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের পোস্ট গ্রাজুয়েট হস্টেলের ছাত্ররা বিভূতি-ভূষণকে সম্বর্ধনা দেবার কথা বলতে এসেছিলেন।

৩ Harry d' Abbabie d' Arrast বইটির Director ছিলেন; লেখক Marcel Pagnol।

২৫শে নভেম্বর, ১৯৩৩। ৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। শনিবার

স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী হয়ে বাসায় এলুম। সেখান থেকে ছেলেরা ইউনিভার-সিটীতে নিয়ে গেল।[১] সেখান থেকে ওদের মেসে খেয়ে অনেক রাত্রে ফিরলুম।

২৬শে নভেম্বর, ১৯৩৩। ১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। রবিবার

সকালে সুপ্রভাদের হোস্টেলে গিয়ে ওকে পেলুম না। সেখান থেকে College Square এ খানিকটা বেড়িয়ে জয়শ্রী কাগজ দেখে শ্যামবাজারে পশুপতি বাবুর বাড়ী গেলুম। ওখানে চা খেয়ে দুজনে সজনীবাবুর বাড়ী। সুধার সঙ্গে দেখা হোল অনেক দিন পরে। তারপর বাসায় এসে খেয়ে নীরদবাবুর flat এ গেলুম। শুনলুম সোমনাথ বাবুর মুখে নীরদবাবুর জ্বর। তারপর আবার সুপ্রভাদের হোস্টেলে। সেখানে গল্পগুজব করে শ্যামবাজারে টরুদের বাড়ী। তার আগে রমেশবাবুর আড্ডায়। সেখান থেকে টরুদের ওখানে চা খেয়ে রমেশবাবুর বাসায় এসে খেলুম। অনেকরাত্রে এসে খেলুম।

আজ শিশির এঘর থেকে অন্য ঘরে চলে গেল। ঘর নির্জ্জন হয়েচে। এমন ভুল আর কখন করবো না। আর কারুর সঙ্গে থাকা কি পোষায়?

২৭শে নভেম্বর, ১৯৩৩। ১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। সোমবার

স্কুল থেকে গেলুম বঙ্গশ্রীতে। সজনী নেই। তারপর বেড়াতে বেড়াতে বাড়ী এসে বসে লিখলুম। বাড়ী এসে বসে লিখ্লাম। অনেকদিন পরে ঘর গুছিয়ে নিয়েচি।

২৮শে নভেম্বর, ১৯৩৩। ১২ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। মঙ্গলবার

সকালে শ্রী গোপাল মল্লিক লেনের হোটেলের ছেলেটী এল। সেদিন ওখানে গেছলুম বহুদিন পরে। স্কুলে গেলুম—সকাল সকাল সেখান থেকে বার হয়ে বঙ্গশ্রীতে বসে আড্ডা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। সত্যেনবাবু ছিলেন [—] দাড়িওয়ালা সত্যেন বাবু। সোমেশ বসু সেখানে এলেন। সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে এলুম গায়ের কাপড় কিনে নিয়ে।

১ শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের পোস্ট গ্রাজুয়েট হস্টেলের ছাত্ররা আশুতোষ বিল্ডিংএ এইদিন বিভূতিভূষণকে এক সম্বর্ধনা দেন। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী।

২৯শে নভেম্বর, ১৯৩৩। ১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। বুধবার

স্কুলে কাজকর্ম নেই। Class 7 আস্‌চে না—অন্য অন্য ক্লাসে ছেলে নেই বল্লেই হয়। সকালে স্কুল থেকে বেরিয়ে প্রথমে নীরদবাবুর বাড়ী গেলুম ভবানীপুরে[১]। নীরদবাবুর বাবা[২] নেমে এলেন। তাঁর সঙ্গে ওপরে গেলুম। যাবার পথে ও আস্‌বার পথে বড় বড় গাছের ছায়াভরা গড়ের মাঠ ও St. Paul's Cathedral এর কম্পাউণ্ডটা ভারী সুন্দর লাগে। পুনরায় এলুম বঙ্গশ্রীতে ও সেখানে থেকে গেলাম flat এ নীরদবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে। সেখানে চা খেয়ে অনেকক্ষণ গল্পগুজব করলুম। তারপর ট্রামে রমেশ সেনের দোকানে ওষুধ আন্‌তে। দুজনে সেখান থেকে হেঁটে বাসায় চলে এলুম। আজও শীত নেই। বরং গরমই যেন। এত কম শীত কখনো দেখিনি কল্‌কাতায়।

৩০শে নভেম্বর, ১৯৩৩।১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

স্কুল সকালে ছুটী হয়ে গেল। সেখান থেকে বঙ্গশ্রীতে গেলুম। খাওয়া হোল। তারপর বেরিয়ে গেলুম—College Squareএ। পথে জসিমউদ্দিনের মেসে খানিকটা কাটানো গেল। দুজনে ওখান থেকে বার হয়ে যাচ্চি, Universityর সাম্‌নে অনেকের সঙ্গে দেখা হোল। প্রথমে অযোধ্যা সিং, তারপর সরোজ চৌধুরী, তারপরে মীরা। আমরা খানিকটা গোলদীঘিতে বসে চানাচুর খেয়ে এলুম Calcutta Hotelএ। সুনীতিবাবু একটা বক্তৃতা দিলেন। ডাঃ প্রবোধ বাগচিও ছিলেন। জলযোগ ও চা পানান্তে বাসায় এলুম। বিমলেন্দু বলে পোস্ট গ্রাজুয়েটের সেই ছেলেটী এল। অনেকরাত পর্য্যন্ত রইল।

১লা ডিসেম্বর, ১৯৩৩।১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০।শুক্রবার

স্কুল সকালে ছুটী। তারপর গেলুম বঙ্গশ্রী। সেখান থেকে রমেশ সেনের দোকানে। ওখান থেকে 'অশোক'[৩] দেখ্‌বার নিমন্ত্রণ পত্র পেলাম রঙমহলে। আমি ও শিবরাম দুজনে বেরুনো গেল। মীরার হোস্টেলে এসে মীরাকে পেলুম না। তারপর থিয়েটারে এলাম। রাত ১০৷৷৵ টা পর্য্যন্ত আমি, শৈলজা, প্রেমেন, দেবী, সবাই মিলে থিয়েটার দেখ্‌লুম। তারপর বাড়ী এসে মেসে ফিস্ট খেলাম।

আশ্চর্য্যের বিষয় আজ ১৯৪১ সালের এই দিনটিতে আমি চাকুরীতে

---

১ কালীঘাট রোডের বাড়ির কথা বুঝিয়েছেন।

২ কুমুদবন্ধু দাশগুপ্ত।

৩ গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটক।

resign দিয়েছি[1]—এর [আর] আজও আমি রমেশ সেনের দোকানে গিয়েছি, সেখান থেকে শিবরামের সঙ্গেই বেরিয়েছি। ১. ১১. ৪১

২রা ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। শনিবার

সকালে উঠে ট্রেনে রওনা। Wide World Magazine পড়তে পড়তে বেশ সময় কাট্‌ল। বনগাঁয় পৌঁছে—কিছু মাছ কিন্‌লুম। বিভূতি ও সুরেন এখানে নেই। বিকেলে আমি ও বিজয়[2] গোপালনগর লাইনের ধারে বেড়াতে গেলাম। খুব চাঁদ উঠল। একখানা মালগাড়ী গেল, ভাগলপুরের কথা মনে গেল আমার। সেও এই শীতকাল। রাত্রে ফিরে বোডিংয়ের [বোর্ডিংয়ের] রান্নাঘরে হেমবাবুর কাছে এসে গল্পগুজব কর্ত্তে লাগলুম। জ্যোৎস্না সুন্দর—পুরোনো বোর্ডিংয়ের হলে আমার সিটে ছোট্ট ছেলে একটা বসে কি পড়চে। তারপর টাউন হলে গিয়ে হরিবাবুর[3] সঙ্গে গল্প করলুম। রাত্রে Wide World পড়া গেল।

৩রা ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। রবিবার

সকালে উঠে ছয়ঘরের পথে বেড়াতে গেলুম?। সুরেন মিত্র উকীলের সঙ্গে পথে গল্পগুজব হোল। তারপর চন্দ্রকান্ত রোড[4] পর্য্যন্ত যাচ্চি, বিশ্বনাথ মোটর নিয়ে আস্‌চে। তারই মোটরে আবার বাজারে এলাম। তারপর বাজার করলুম। বিকেলে খয়রামারির মাঠে বেড়াতে গেলাম। সন্ধ্যার সময় ট্রেনে কল্‌কাতা।

৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। সোমবার

স্কুলে সকালেই ছুটী। তারপর ওখান থেকে বঙ্গশ্রী। সেখানে গিয়ে জ্বর মত এল—তাই হেঁটে বাসায় চলে এলুম। বাড়ী এসে সত্যিই জ্বরের মত হোল। রাত্রে কিছু আর খেলুম না।

৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। মঙ্গলবার

স্কুলে গিয়ে কাজ করি না। উঠে বঙ্গশ্রীতে যাই। তারপর পুলিশ হাঁসপাতালে

---

১ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। জাপানী আক্রমণের আশঙ্কায় কলকাতা ক্রমশঃই জনশূন্য হয়ে পড়ছিল। বিভূতিভূষণও এই সময় কলকাতা ছেড়ে গ্রামে চলে যান। তিনি সেখানে থেকে গোপালনগর স্কুলে চাকরি করতেন।

২ বিজয় মুখোপাধ্যায়, শুকপুকুরবাসী (বনগাঁ); ইনি হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় জামাই / বিজয় বন্দোপাধ্যায়, নকপুলবাসী (বনগাঁ)।

৩ হরিগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বনগাঁবাসী।

[হাসপাতালে] অশোকের গাড়ীতে। সেখানে সাবিত্রীরানীর ভাই—বামনকে (?) দেখলুম। এলুম পুনরায় বঙ্গশ্রীতেই। তারপর—এলুম হেঁটে নবীন কার্ম্মেসীতে ঔষুধ নিতে। পি. সি. সরকারের দোকানে বসে গল্পগুজব করা গেল। দেবতোষ একখানা কাগজ দেখিয়ে বল্লে লেখা দিতে হবে।

এই কৃষ্ণদয়াল, মণীন্দ্র বসু এদের লেখা আগেই প্রবাসীতে পড়েছিলুম। জাঙ্গিপাড়ায় বসে—তখন থেকেই এরা প্রবাসীর লেখক। আমি তখন পাড়াগাঁয়ের স্কুল-মাস্টার, লেখার কল্পনাও করি নি কোনোদিন। এদের তখন কত উঁচু জীব ভাবতুম, প্রবাসীদের সম্বন্ধে কত উঁচু ধারণাই ছিল। এখন এদের আর সে চোখেই দেখি না।—এদের সঙ্গেও ভাব হয়েচে—কত!

৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। বুধবার

আজ অসুখের জন্যে স্কুলে গেলুম না। কিন্তু বৈকেলে বঙ্গশ্রীতে গেলুম। সেখানে দেবীবাবুর বিরুদ্ধে খুব তর্ক ও কথাবার্ত্তা হোল। আমি তাতে সুখী হলুম না। দেবী আমার চুল কাটিয়েছিল সেদিন। তারপর হেঁটে বাহাদুর সিং এর বাড়ীতে এলুম জবাকুসুম হাউসে। অতি চমৎকার রাজপুত ও মোগল ছবি ও অন্যান্য শিল্প দেখে মনটা খুসি হোল। খাওয়া দাওয়া করে চলে এলুম।

৭ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

বঙ্গশ্রী আপিস থেকে গেলুম আমি ও সত্যেন বাবু film দেখ্‌তে—Blue Angel[১] [—] সেখানে সজনীবাবু ও কিরণকেও পেলাম। একসঙ্গে বেরিয়ে আমি অন্যদিকে যাচ্চি, চক্রবর্ত্তী একটা দোকান থেকে ডাক্‌লে। গিয়ে দেখি মিঃ রবি মিত্র ব্যারিস্টারও বসে। সিধু বাবুর মেয়ে কিছু পায় নি সেই গল্প করলে। আমি সবই জানি—১৩২৩ [১৯২৩ হবে] সাল আজ ১৯৩৩—এই এগারো বছরে কতই দেখ্‌লুম। তারপর পুরানো বই দেখ্‌চি – সুনীতিবাবুর সঙ্গে দেখা হোল। তারপর আবার বঙ্গশ্রীতে এসে আমি ও প্রেমেন দুজনে বেরুলুম। প্রেমেন এক বিয়ের গল্প কর্ত্তে কর্ত্তে College Square পর্য্যন্ত গেল। ওখানে রাধারমণের সঙ্গে দেখা। রাধারমণ তার বাসায় নিয়ে গেল [—] সেখান থেকে বাসায় ফিরি রাত ৮টায়।

৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। শুক্রবার

সকালে নীরদের ওখানে গেলুম। নীরদ বেরিয়ে যাচ্চে, ওখান থেকে

---

১ লেখক Heinrich Mann। মূল গ্রন্থের নাম Professor Unrat। Director ছিলেন Josef Von Sternberg।

এলুম সজনীবাবুর বাড়ী। সেখানে হেডমাস্টার যতীনবাবু এসে বইয়ের টাকা দিলেন। তারপর গেলুম আবার নীরদের ওখানে। নীরদের স্ত্রী বল্লে দেখ্‌বেন আসুন। গিয়ে দেখি জন কতক ছেলেমেয়ে নিয়ে গাড়ী করে ভিক্ষে করচে। ওখান থেকে স্কুলে ফিরলুম। এবং সকাল সকাল বার হয়ে বঙ্গশ্রী। ওখান থেকে বাড়ী ফিরলুম।

৯ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। শনিবার

সকালে স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী। তারপর সকলে মিলে পশুপতিবাবুর হাঁসপাতালে —ওখান থেকে Nature Study Exhibition দেখ্‌তে। তারপর ফিরে এসে College Square-এ বসলুম খানিকটা। আশু[1] এল— প্রমথ বিশীর সঙ্গেও দেখা। হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে শরৎবাবুর অভিনন্দন ছিল। সেখানে একবার গিয়ে সেখান থেকে ফিরে এলুম বাসায়।

১০ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। রবিবার

সকালে বসে লিখ্‌লাম। তারপর মণীন্দ্র বসুর বাড়ীতে গিয়ে বারোটা পর্য্যন্ত আড্ডা। সেখানে চারু রায়[2] শচীন সেন, সুধীর সরকার—ওরা এল। তারপর বৈকেলে আবার পার্ক সার্কাসের একটা বাড়ীতে নিয়ে গেল সৌরীন মজুমদার। জ্যোৎস্না বলে একটি মেয়ে বিদ্যাসাগরে না সিটিতে পড়ে, এসে অনেকক্ষণ আলাপ কর্ল্লে। রাতে এসে লিখ্‌লুম।

১১ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। সোমবার

সকালে স্কুল। ওখান থেকে বঙ্গশ্রী। ওখান থেকে উদয়ন আপিসে অনিল দের সঙ্গে [দেখা] করি। আবার বঙ্গশ্রীতে ফিরে আসি। তারপর পশুপতি বাবুর গাড়ীতে মীরা, মীরার বাবা [,] আমি—সবাই এলুম College Street-এ। সেখান থেকে রমেশ সেনের আড্ডায় এলুম গাড়ীতে। গল্প করে ফিরলুম।

১২ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। মঙ্গলবার

স্কুল আজ ছুটী ছিল। সকালে অনেকদিন পরে বাগবাজারের সেই দরিদ্রা স্ত্রীলোকটী এল কিছু ভিক্ষা নিতে। রেবতীবাবু এল গল্পের টাকা দেবে বলে— ২৲ টাকা দিয়েও গেল। গল্প লিখ্‌তে বস্‌লুম—hot boiler (?) নিতান্তই। দুপুরের পরে তিনটার সময় হেঁটে অনেককাল পরে ইডেন্ গার্ডেন বেড়াতে গেলুম। পথে লালদিঘীতে বস্‌লুম একবার—তারপর ইডেন্ গার্ডেনে গিয়ে

১ ? আশু সান্যাল, কবি

২ চারুচন্দ্র রায়, শিল্পী।

তালীকুঞ্জের মধ্যে বসলুম। একটা লোকের সঙ্গে আলাপ হোল। সে বোর্ড অফ অ্যাপ্রেন্টিস এর পরীক্ষা দিতে এসেচে ঢাকা থেকে। ছোকরা—অত্যন্ত গরীব। গড়ের মাঠে কোর্টের কাছে একটা জায়গায় বড় চমৎকার ফুল ফুটেচে—সেখানে খানিকটা বসে একটা বিড়ি ধরালুম। তারপর ওখান থেকে হেঁটে বঙ্গশ্রীতে। অশোক ?, গরম সিঙাড়া আনিয়েচে—সবাই মিলে খাওয়া গেল। ডাঃ রাম অধিকারীর সঙ্গে আমি, সরোজ, পরিমল তিনজনে চৌরঙ্গী গ্রিলে এসে খেলাম। তারপর আমি রামবাবুর সঙ্গে শম্ভুনাথ [শম্ভুনাথ] পণ্ডিতের রোড্ [?] গেলুম ও ট্রামে বাসায় ফিরলুম রাত সাড়ে আটটার সময়।

১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। বুধবার

সকালে গল্প লিখলুম খুব খেটে। স্কুলের কাজ অল্পের মধ্যেই হয়ে গেল। ওখান থেকে বার হয়ে বঙ্গশ্রী। ফিরে আসচি—সতীশের সঙ্গে দেখা। তার বৌবাজারে দোকানে—বসে একটু গল্প করলুম। তারপর ফিরে এলুম।

১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

সকালে শরদিন্দু বাবু এলেন। তারপর গেলুম স্কুলে। সেখান থেকে বঙ্গশ্রীতে। ট্রামে চলে এসে অনেকদিন পরে বিকেলে লিখ্‌লুম [।] তারপরে পার্ক সার্কাসে মণি বোসের ওখানে গিয়ে রাত ৯॥০ টা পর্য্যন্ত আড্ডা।

১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। শুক্রবার

স্কুল থেকে মেসে এলুম। তারপর লিখে মীরাকে পড়াতে গেলুম হোস্টেলে। সেখান থেকে টরুদের বাসা। রাত্রে ফিরি।

১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ১লা পৌষ, ১৩৪০। শনিবার

শীত পড়েচে বেশ। স্কুলে যেতে দেরী হোল। হাতঘড়টা সারালুম। স্কুলে পরীক্ষা। সেরে গেলুম বঙ্গশ্রী। সেখান থেকে নীরদবাবুর flat এ। অনেক রাত্রে ফিরি।

১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ২রা পৌষ, ১৩৪০। রবিবার

ভাগলপুরে যাবার কথা ছিল কাল [—] গেলুম না। আজ বেলা চারটে পর্যন্ত লিখেচি। বেরিয়ে দু'খানা পুরানো বই কিনে Lonely Trails[1] [?]—রমেশ সেনের আড্ডায়। ট্রামে শ্যামবাজার গিয়ে এলুম দ্বারিকের দোকানে। তারপর বাড়ী।

১ Tales of Lonely Trails, Zane Grey।

১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ৩রা পৌষ, ১৩৪০। সোমবার

স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী। রামবাবুর পাল্লায় পড়ে গেলাম তারপর। একবার মীরাকে পড়াতে গেলাম। তারপর বাসায়। সজনীরা ভাগলপুরে গিয়েচে —শুনে আমার কেবলই মনে হচ্ছিল। গেলে হোতো ভাগলপুরে। তবুও হরেন রায় মশায়কে দেখে আসা যেতো।

১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ৪ঠা পৌষ, ১৩৪০। মঙ্গলবার

স্কুলে থেকে বঙ্গশ্রী। আমি আর প্রমথ বিশী বাসায় ফিরে এলুম। তারপর আবার যাই পার্ক সার্কাস। মণি, মহিমা ও আমি দুর্গাশঙ্কর বাবুর[১] বাড়ী গেলুম বালিগঞ্জে। পাহাড় জঙ্গলের কথা শুনে এলাম। অনেক রাত্রে ফিরি।

২০শে ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ৫ই পৌষ, ১৩৪০। বুধবার

স্কুলে মাইনে হবে বলে বসে রইলুম—কিন্তু চেক্ ফেরত দিলে ব্যাঙ্ক থেকে বঙ্গশ্রীতে গিয়ে সজনীদের ভাগলপুর ভ্রমণের গল্প শুনলাম—তারপর উঠে চৈতন্যদেবের সঙ্গে মিউজিয়ামে এক্সিবিষান দেখতে এলুম। ওখান থেকে—নীরদবাবুর Flat-এ। চা খেয়ে গল্পগুজব করে—বাসায়।

২১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ৬ই পৌষ, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

সকাল দশটায় বেরিয়ে Thackers এর দোকানে গেলুম। সেখান থেকে একখানা Hugh Walpole এর Harris Series নভেলের booklet নিয়ে এলুম। ওখান থেকে গেলুম আর্ট স্কুলের প্রদর্শনীতে। মার্কেট হয়ে স্কুল। তখনও রামবাবু মাইনে নিয়ে আসিনি [আসেনি]। ওখান থেকে বঙ্গশ্রীতে। সুশীল বাবু এসেচেন ঢাকা থেকে। আড্ডা চল্‌চে। ওখান থেকে বার হয়ে স্কুলে এসে মাইনে নিলুম। তারপর নেড়ার কাছ থেকে টাকা নিলুম ও ওয়াছেল মোল্লার দোকানে ক্যাণ্টির[২] জন্যে জামার সন্ধানে গেলুম। জামা পাওয়া গেল। তারপর শেয়ালদা এসে টিকিট কিনে বাসা থেকে জিনিসপত্র নিয়ে গাড়ীতে চড়ি। কালোর সঙ্গে দেখা। বনগ্রামে এলুম। বেশ জ্যোৎস্না রাত। পুলের ঘাটে বেড়াতে গেলাম। রস কিনে খেয়ে বিনয়দার ওখানে মুন্সেফ বাবুর সঙ্গে গল্প হোল—তারপর হেডমাস্টারের কাছে। অনেক রাত্রে ফিরে খেয়ে শুই।

২ দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য, শিল্পী।

৩ বিভূতিভূষণের বোন জাহ্নবী যখন চালকীতে ছিলেন তখন এঁরা ছিলেন তাঁর প্রতিবেশিনী। এঁর মাকে বিভূতিভূষণ দিদি বলে ডাকতেন। সেই সুবাদে ক্যান্টি ছিলেন বিভূতিভূষণের ভাগিনেয়ী।

২২শে ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ৭ই পৌষ, ১৩৪০। শুক্রবার

সকালে হাট বাজার করি। খয়রামারিতে খুব সকালে বেড়াতে গেলুম। বীরেশ্বর বাবুর বাড়ীতে বসে গল্প করলুম। তারপর দুপুরে দেবেনের ওখানে গেলাম। সন্ধ্যার সময় মন্মথবাবুর[১] বাসায় বসে গল্প করে বীরেশ্বর বাবুর বাসায় গেলুম রাত্রে।

২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ৮ই পৌষ, ১৩৪০। শনিবার

সকালে টক্কর ওখানে চা খেয়ে বীরেশ্বর বাবুর বাসায় গিয়ে দেখি তিনি চলে গিয়েচেন দেশে। দুপুরে বসে লিখচি, কালো এল। যতীন ডাক্তার[২] এল। খয়রামারিতে জমি দেখে এলুম। বৈকালে আমি ও টক্ক খয়রামারিতে বেড়াতে গেলুম।

২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ৯ই পৌষ, ১৩৪০। রবিবার

সকালে দারোগার ঘোড়া করে বারাকপুর গেলাম। এসে দুপুরে কালো এল। রাত্রে এলুম। যতীন ডাক্তারের কাছে গল্প করা গেল। সন্ধ্যাবেলা জ্যোৎস্না রাত্রে টক্ক আমি তিনু চা খেলুম খয়রামারিতে বসে ষাঁড়াপোলের (?) তলায়।

এবার বনগাঁয়ের মাঠ এবং এই জীবন এত সুন্দর লাগ্‌চে।

এবারকার বড়দিনে এই সুন্দর জীবন এত ভাল লাগ্‌চে। কি সুন্দর জ্যোৎস্না, কি সুন্দর সকালের হাওয়া, মাঠে মাঠে ফুটন্ত রাধালতা[৩] ফুল [,] রাঙা সোনালী রোদ—সবই সুন্দর।

২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ১০ই পৌষ, ১৩৪০। সোমবার

এদিনে সকালে সাহেব এল। সাহেবের সঙ্গে বারাকপুর ও সেখান থেকে বেলেডাঙা গেলুম। বেশ লাগ্‌ল এই শীতের দিনে ঝোপঝাপ।

২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ১১ই পৌষ, ১৩৪০। মঙ্গলবার

বিকেলে আমি ও মহেন্দ্র শিমুলতলার মাঠে[৪] বেড়াতে গেলুম।

২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ১২ই পৌষ, ১৩৪০। বুধবার

আমি [,] টক্ক [,] তিনু রাজনগরে বেড়াতে গেলাম। ফিরবার পথে চমৎকার জ্যোৎস্না—মুক্ত মাঠ, ভাগলপুরের কথা মনে করিয়ে দেয়—মাটীর গন্ধ—সেই রকম গাছপালার গন্ধ।

১ মন্মথ চট্টোপাধ্যায় (মন্মথ মোক্তার), বনগাঁবাসী।

২ যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বনগাঁবাসী ; হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার।

৩ বাঙলায় অপর নাম ঝুমকোলতা। Passiflora foetida Linn.

৪ বনগাঁ।

২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ১৩ই পৌষ, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

কাল বিকেলে আমরা রাজনগরের পথে বেড়াতে গেলাম। আমি, তিন্তু, টক্ক। একটা বটগাছ ঝুরি নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—তার তলায় কি অদ্ভুত ছায়া। বাস্তবিকই বনগাঁয়ের মাঠ, বনের সম্পদ—বারাকপুরের চেয়ে বেশী।

কতকাল আগে বিজয় মামা বলেছিল—যদি আমি কবি হই, এদিককার শোভা আঁকবো—কুটীর মাঠে শুকনো কুল খেতে খেতে।

আমি 'পথের পাঁচালী'তে বিজয় মামার সে কাজ করেচি।

কাল রাজনগরে হরিসংকীর্ত্তন হয়েছিল—বিশু অধিকারীর[১] সঙ্গে দেখা হোল অনেকরাত্রে। তখন সে অাঁটুরি থেকে গান গেয়ে ফিরচে।

২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৩৩।১৪ই পৌষ, ১৩৪০। শুক্রবার

আমি আজ একা রাজনগরের বটতলায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। অনেকক্ষণ মাঠের অনুচ্চ টিলার উপরে বসে রৈলুম। সামনে টকটকে লাল সূর্য্যটা অস্ত গেল। তারপর বটতলাটা একা বেড়িয়ে বাসায় ফিরলুম।

স্টীমারে বেড়াবার জন্যে শ্যামাপদবাবু বেজায় ধরেচে। বোধহয় যাবো না।

সন্ধ্যার সময় বঙ্কুর ডাক্তার খানায় গল্প করচি—মণীন্দ্র চাটুয্যের ছেলে সুধীন এল। তার সঙ্গে গল্প করে বিভূতির আড়তে বসে আড্ডা দিলাম—কলেজের আমলের গল্প করলাম।

৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ১৫ই পৌষ, ১৩৪০। শনিবার

সকালে বারাকপুরে গেলাম। চমৎকার লাগচে এবার দেশ। কাঁঠালতলায় দুই ফণি কাকা (ফণি রায় ও ফণি চক্রবর্ত্তী) ও কচা বসে। কচাকে বল্লুম গুল্মলতা কেটে কলকাতায় চালান দে। পুঁটিদিদিদের বাড়ী তেল মেখে বয়োজপোতার মধ্যে দিয়ে ওপাড়ার ঘাটে। মনে হচ্ছিল কতকাল আগে বাবা মারা গিয়েছিলেন এই সময়ে—এই সেই বাঁশঝাড়। ওপাড়ার ঘাটটা বেশ খালি। তারপর খেয়ে খুড়ীমার সঙ্গে গল্প করচি—ন' দি এল রাণাঘাট আর্চার সাহেবের ডাক্তারখানা থেকে। শ্যামাচরণ দাদা বেড়া পুত্‌চে [পুঁতচে] ওর বাগানে, তাঁর সঙ্গে গল্প করলাম স্নানে যাওয়ার সময়ে।

সন্ধ্যায় বাঁশবন ও ভিটের দিকে বেড়াতে গেলাম। সন্ধ্যা হয়ে আসচে। নিস্তব্ধ, অন্ধকার বাঁশবন। কালো বাঁশঝাড়ের পটভূমিতে প্রজাপতি উড়চে

১ বারাকপুরবাসী।

—জনপ্রাণী নেই কোথায় [কোথাও]। শীতের জনহীন, বিষন্ন সন্ধ্যা। আজও বনভূমি সেই শৈশব স্বপ্ন মাখা—অথচ রক্তমঞ্চ অন্ধকার, বারাকপুর শ্মশান—কেউ নেই—সব পালিয়েচে। স্বপ্ন স্বপ্নই আছে এখনও—তেমনই নবীন, তেমনই মোহময়। পথে আসতে আসতে কাটা গাছের ওপর বসলুম—চাঁদ উঠেছে—চতুর্দ্দশীর চাঁদ [—] মাঠে একটা ছেলে গান করচে। আমাদের ভিটেতেও গিয়ে ছিলাম সন্ধ্যার আগে। সেই নারকোল গাছটা যার ডালে বাল্যে কত জ্যোৎস্না চিক্‌-চিক্ করতো—পিসিমা বলতো মণিকে নিয়ে আয়—ভিটেটা দেখুক।

বারাকপুরের মত নাড়া দেয় না কোনো জায়গা। Depth of Being পর্য্যন্ত দেখা যায় এখানে এলে। কৃত্রিম ভাববিলাস থাকে না। অনিলের[১] আড়তে এসে গল্প করলুম।

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ১৬ই পৌষ, ১৩৪০। রবিবার

ইংরিজি বছর আজ শেষ হোল। বিদায়!

সকালে দারোগার সঙ্গে স্টেশনে এসে আবদুল সত্তরের সঙ্গে দেখা করলুম। ১৯১৮ সালের মার্চ্চ মাসের পর ১৯৩৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর। তারপর কল্‌কাতায় এসে নীরদবাবুর flat এ গেলুম। সেখান থেকে দক্ষিণেশ্বর গিয়ে চা খেলাম। পথে ? কালীপদর (?) সঙ্গে দেখা। তারপর ট্যাবু দেখ্‌তে গিয়ে ফটিকের সঙ্গে দেখা। অনেক রাত পর্য্যন্ত জেগে বসে রইলুম। রাত ১২ টার পর ১৯৩৪ সাল পড়ল—খুব পট্‌কা বাজি ছুঁড়তে লাগ্‌ল চারিদিকে—বাঁশি বেজে উঠল। আজ পূর্ণিমার রাত্রে বহু আনন্দ ব্যথা পূর্ণ ১৯৩৩ সালকে বিদায় দিলুম। একদিন এই দিনটাকে বহুদূরের অতীত বলে মনে হবে। ১৯৩৪ সালও অতি পুরাতন হয়ে যাবে।

Chronicles and Events

এই সালের শ্রাবণ মাসে গ্রামের যতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মারা যান এবং কার্ত্তিক মাসে পঞ্চানন রায় মারা যান।

বুড়ী পিসিমার বিবাহ হয় ওই শ্রাবণ মাসে।

জাহ্নবীর মেয়ে ছোটখুকী মারা যায় ফাল্গুন মাসে।

বড় মামার মেয়ে মান্তী থাইসিসে ভুগে মারা যায় ডিসেম্বর মাসে।

এই বছরে প্রথমে Spiritual seance এ বসি।

---

১ অনিল মুখোপাধ্যায়, বনগাঁবাসী ; বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ভাই।

পাথুরেঘাটার অক্ষয় ঘোষের স্ত্রীর মৃত্যু হয় কার্ত্তিক মাসের শেষের দিকে। জগদ্ধাত্রীপূজার সময়। ভাগলপুরের হরেন্দ্রলাল রায় (ডি, এল, রায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) ডিসেম্বরের শেষে মারা যান। তিনি আমায় অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁর মৃত্যুতে দুঃখের কারণ ঘটেচে আমার।

১৯৩৪

১লা জানুয়ারি, ১৯৩৪। ১৭ই পৌষ, ১৩৪০। সোমবার

আগের দিন কল্‌কাতায় এসেচি বনগাঁ থেকে দারোগার সঙ্গে। অনেক রাত পর্য্যন্ত দেশে আগের (?) রাত্রে পটুকাত (?) সাহা[illegible]র বাঁশী শুনেচি [।]

৮ই জানুয়ারি, ১৯৩৪। ২৪শে পৌষ, ১৩৪০। [illegible]মবার

দেবব্রতের ব্যাড্‌মিণ্টন মাঠে এদিন গিয়ে অ[illegible]দিন পরে খেলেচি।

১০ই জানুয়ারী, ১৯৩৪। ২৬শে পৌষ, ১৩৪০। বুধবার

কানাইএর সঙ্গে রায়চৌধুরীদের বাড়ী গেলাম হরি ঘোষের ষ্ট্রীটে। পথে হোস্টেলে সুপ্রভার সঙ্গে দেখা করে গেলাম।

১২ই জানুয়ারি, ১৯৩৪। ২৮শে পৌষ, ১৩৪০। শুক্রবার

স্কুল থেকে সরস্বতী পূজোর ঠাকুর ঠিক কর্ত্তে পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে কুমারটুলি গেলাম। সঙ্গে যতীন, মোহিত ইত্যাদি। একটা দোকানে চা খাওয়া গেল। তারপর ট্রামে বাসায়। তার আগে বিভূতিদের ওখানে গেছ্‌লাম। বিভূতির সঙ্গে দেখা। মন্মথদের কাছেও গেলুম। বাসায় এসে দেখি দক্ষিণাবাবু ও ছোট-মামা বসে। ছোটমামার সঙ্গে বার হয়ে মানিকতলা গেলুম বাড়ী ঠিক কর্ত্তে। পরে রমেশ কবিরাজের আড্ডায় গেলাম। দক্ষিণ হাওয়া দিচ্চে। গত বছরের ডায়েরী খুলে দেখলুম গতবারও ঠিক আজকার দিনটীতে কুমারটুলিতে ঠাকুর বায়না দিতে গেছ্‌লুম।

১৩ই জানুয়ারি, ১৯৩৪। ২৯শে পৌষ, ১৩৪০। শনিবার

সকালে উঠে খুব কুয়াশা। রাত্রে স্বপ্ন দেখ্‌লুম। একটা পুরানো পথ দিয়ে যেন যাই মাঝে মাঝে। ওই পথের ধারে একটা বাড়ী আছে মাঠের মধ্যে। স্কুল থেকে বঙ্গশ্রীতে গিয়ে খানিকটা আড্ডা দেবার পরে গেলাম সুশীল বাবু ও নীরদবাবুর ওখানে। চা খেয়ে বিভূতিদের ওখানে। তাদের নাটক হবে তাই select করে দিলাম। অনেক রাত্রে পুরোনো সেই গলির মধ্য দিয়ে চলে এলুম। পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে তিলের লাড়ু তৈরী করচে।

১৪ই জানুয়ারি, ১৯৩৪। ৩০শে পৌষ, ১৩৪০। রবিবার

পৌষ সংক্রান্তি, অনেককাল আগে এই কল্‌কাতাতেই[১] কাশী মিত্রের ঘাটে

---

১ ১৯০২ সনে কথকতা উপলক্ষে মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী ও আট বছরের ছেলে বিভূতিভূষণকে নিয়ে কলকাতায় আসেন। থাকতেন বাগবাজারে মদনমোহন তলায়।

মার সঙ্গে নাইতে যেতে যেতে হিন্দুস্থানী ফেরীওয়ালার কাছ থেকে তিলুয়া কিনে খেয়েছিলুম—তিলের লাঠি গোছের—মা কিনে দিয়েছিলেন—মনে পড়ে গেল।

সকালে মণি বোসের বাড়ী গিয়ে সুধীর চৌধুরীদের সঙ্গে দেখা হোল। খেয়ে বেলঘরে গেলুম। এসে আবার মণির বাড়ীতে মণির মা নিমন্ত্রণ করেছিলেন—সেখানেই খেলুম। অনেক রাত্রে ফিরি।

১৫ই জানুয়ারি, ১৯৩৪। ১লা মাঘ, ১৩৪০। সোমবার

সকালে উঠিয়াই স্নান না করে ব্রজেনদার কাছে—প্রবাসীর কপি[১] দিতে। সেখানে ভাগলপুরের জ্যোতিনাথ বাবু বসে। তারপর গেলুম ট্রামে সজনীদাসের কাছ হয়ে স্কুল। স্কুল থেকে ট্রামে বিভূতিদের বাড়ী। পথে কর্জ্জন পার্কে ডালিয়া ফুল দেখ্তে গেলুম। বিভূতিদের বাড়ি ঢুকতে যাচ্চি—এমন সময়ে ভয়ানক ভূমিকম্প। দারোয়ানরা ছুট্তে ছুট্তে বার হয়ে আস্চে। সবাই গিয়ে রাস্তার ওপর দাঁড়ালুম। তারপর থেমে গেলে ওদের বাড়ীর মধ্যে ঢুকে অনেকদিন পরে ইসমাইলপুরের সরম প্রসাদ ও যুগল মণ্ডলের সঙ্গে দেখা। কথাবার্ত্তা হোল [—] বণ্টুকে[২] কাছে নিয়ে বসলুম। তারপর ট্রামে বঙ্গশ্রী—হয়ে নীরদবাবুর flat এ পিঠে খেলুম। সেখান থেকে বঙ্গশ্রীতে। ওয়াছেল মোল্লার দোকান[৩] হেলে পড়েচে দাঁড়িয়ে দেখচে সবাই। ভিক্টোরিয়া হাউস ফেটে গেছে। ওখান থেকে আমি পরিমল, প্রমথ[৪] হেঁটে আমহার্স্ট স্ট্রীট্ দিয়ে বাসা।

১৬ই জানুয়ারি, ১৯৩৪। ২রা মাঘ, ১৩৪০। মঙ্গলবার

সকালে উঠে সিরাজুলের বাড়ী ? স্ট্রীটে হাব্লাকে সঙ্গে নিয়ে। সেখান থেকে উদয়ন[৫] হয়ে স্কুল। তারপর বিভূতিদের বাড়ী [।] স্কুল থেকে প্রবাসী। প্রবাসী থেকে রমেশবাবুর আড্ডা হয়ে—পি সি সরকারের দোকান হয়ে বাসা।

১ ১৩৪০ সালের ফাল্গুন মাস থেকে প্রবাসীতে বিভূতিভূষণের অন্যতম উপন্যাস দৃষ্টিপ্রদীপ বেরতে শুরু করে। সম্ভবতঃ তারই কপি। ফাল্গুন সংখ্যায় 'উইলের খেয়াল' (যাত্রাবদল) নামে তাঁর একটি গল্পও বেরয়। সেটিও হতে পারে।

২ হীরেন মিত্র, খেলাতচন্দ্র ঘোষের নাতি। বিভূতিভূষণ এঁকে পড়াতেন।

৩ দোকানটি এখনও আছে। ঠিকানা, ৮নং ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৩।

৪ প্রমথনাথ বিশী।

৫ ফাল্গুন মাসে উদয়ন-এ বিভূতিভূষণের একটি ছোটগল্প বেরয়। নাম 'বৈদ্যনাথ' (যাত্রাবদল)।

১৭ই জানুয়ারি, ১৯৩৪। ৩রা মাঘ, ১৩৪০। বুধবার

আজও সকালে সুপ্রভার হোস্টেল হয়ে স্কুল। স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী হয়ে উদয়ন—সেখান থেকে হেঁটে প্রবাসী। প্রবাসী থেকে নীরদবাবুদের flat-এ। সেখান থেকে রাত দশটায় মেস্।

১৮ই জানুয়ারি, ১৯৩৪। ৪ঠা মাঘ, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

সকালে ট্রেনে বনগাঁয়ে এলাম। ভয়ানক শীত। এ ধরনের শীত ভাগলপুর ছাড়া দেখিনি। তফাৎ এই যে সেখানে পশ্চিমে হাওয়া এর ওপর [—] বরং এখানে সেটা নেই।

এসে খয়রামারীর দিকে গেলাম তারপর—স্নান সেরে খুকীর চড়ুইভাতি রান্না খেয়ে বেড়াতে গেলাম। বীরেশ্বরবাবুর ওখানে গেলাম। তারপর একটু শুয়ে উঠে দেবেনের সঙ্গে বাড়ীতে গোপালনগর গেলাম। সেখানে হাটে পালং শাক্ আলু সিম্ কিন্‌লাম। হরিপদ দাদা—ফণি কাকা, শ্যামাচরণ দা সবার সঙ্গে আলাপ হোল। মাখনের[1] দোকানে তামাক খেলাম। তারপর চলে এলাম। দেশকে এত ভাল লাগে। দারিঘাটার কাছ থেকেই আমি হাঁ করে চেয়ে থাকি গ্রামের দিকে।

১৯শে জানুয়ারি, ১৯৩৪। ৫ই মাঘ, ১৩৪০। শুক্রবার

সকালে উঠ্‌তে একটু দেরী হোল। যখন খয়ারামারি মাঠে গিয়েচি তখন রৌদ্র উঠেছে। তারপর এসে লিখলাম। স্নান করে খেয়ে একটু ঘুমুলাম। উঠে হাটে গুড় কিনে আন্‌লাম। তারপর—খয়রামারির মাঠে গেলাম। তখন সন্ধ্যা হয়েচে। ফিরে এসে মন্মথ মোক্তারের বাসায় গিয়ে কালীপদ যাদুকরের গল্প শুনলাম। সেখান থেকে মুন্সেফ্ বাবুর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে বিনয় দত্তর বাড়ী গেলাম। রাত্রে ফিরেচি।

২০শে জানুয়ারি, ১৯৩৪।৬ই মাঘ, ১৩৪০। শনিবার

সকালে উঠে সরস্বতী পূজার জন্যে ব্যস্ত রইলুম। সকালে স্নান সেরে এসে স্কুলে অঞ্জলি দিলাম। কালীপদ যাদুকরের খেলার জন্যে সকালে থানায় তাকে ডাকানো হোল। বৈকেলে তার পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়ালুম [—] কিছুই হোল না। টকু ও কালো দুপুরে আমার কাছে এল, আমি ঘুমিয়ে উঠেচি। ওদের নিয়ে স্কুলে গেলাম। যতীশদা খেতে বললে আমি খেলাম না। মন্মথ মোক্তারের

১ ? মাখন ঘোষ।

বাসায় গেলুম। সেখান থেকে ফিরে খয়রামারিতে গেলাম। রাত্রে মন্মথর ওখানে আড্ডা দিলাম।

২১শে জানুয়ারি, ১৯৩৪। ৭ই মাঘ, ১৩৪০। রবিবার

সকালে উঠে খয়রামারি বেড়াতে গেলাম—তখন খুব সকাল—ফেরবার সময় সূর্য্য উঠল। থানার মাঠে কালীপদ খেলা দেখালে। তারপর খেয়ে একটু বিশ্রামের পরে মুন্সেফ্ বাবুর বাসায় কালীপদর খেলা দেখতে গেলাম। ফিরে বীরেশ্বরেরবাবুর বাসায় গল্প করলুম। তারপর মিত্তের মোটরে স্টেশনে এলাম। আমি, সুনীল ও মিত্তে। সারা পথ গল্পে কাটল। কলকাতায় এসেই হেঁটে গেলাম স্কুলে। পথে সরস্বতী পুজোর ধুমধাম। ছেলেরা খাওয়ালে।

২২শে জানুয়ারি, ১৯৩৪। ৮ই মাঘ, ১৩৪০। সোমবার

সকালে স্কুলের ছুটী হোল। বঙ্গশ্রী আপিসে শিশুত্রাণ সমিতি প্রতিষ্ঠার জন্যে আমি, অনাথবাবু[১] ও সজনী বসে রইলুম। অনাথবাবুর মুখে শুনলাম বড় বাসা ভেঙে গেছে—ভূমিকম্পে। তারপর উদয়ন আপিস হয়ে একটা সেলুনে চুল ছেঁটে বাসায় ফিরি।

আজ শীত কম।

২৩শে জানুয়ারি, ১৯৩৪। ৯ই মাঘ, ১৩৪০। মঙ্গলবার

সকালে গিরীন সোম[২] এল বিচিত্র জগতের জন্যে। স্কুলের ছাদে আমি আর মৌলবী রোদ পোয়ালাম। ঘোলা বলে পার্শী ছেলেটাকে ডেকে তার পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করি। বেশ ইংরেজী বলে। তারপর টিফিনের সময় বঙ্গশ্রীতে গেলুম। রঞ্জনের ক্লাসে আজকাল পড়াই। রঞ্জনকে কটা বেজেচে দেখতে পাঠিয়ে সকালে ছুটী দিলাম। প্রবাসী আপিসে গেলাম—আশু সান্যাল সেখানে ছিল। তার সঙ্গে কলেজ স্ট্রীট দিয়ে এলাম। একা P. C. Sircarএর[৩] দোকানে

---

১ শিক্ষাবিদ্ অনাথনাথ বসু। এঁর নামকরা বই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শ।

২ প্রকাশক। এঁর প্রকাশনার নাম কাত্যায়নী বুক স্টল। এখান থেকে বিভূতিভূষণের জন্ম ও মৃত্যু; আরণ্যক বেরিয়েছিল। বিচিত্র জগৎ শেষ পর্যন্ত এখান থেকে বেরয়নি; বেরিয়েছিল মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং ও পাবলিশিং হাউস থেকে। প্রকাশক ছিলেন সুবোধচন্দ্র সরকার।

৩ প্রভাতচন্দ্র সরকার। এখান থেকে বিভূতিভূষণের দৃষ্টিপ্রদীপ, যাত্রাবদল বেরয়। P. C. Sircar-এর দোকান ছিল ১৮নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটে।

গেলুম। সেখান থেকে College Sqr.-এ বসে ভাবলুম ১৯১৮ সালের এই সময়ে[১] এই সব বেঞ্চিতে বসে ভাব্‌তুম।

২৪শে জানুয়ারি. ১৯৩৪। ১০ই মাঘ, ১৩৪০। বুধবার

সকালে পি. সি. সরকার এল বিচিত্র জগতের জন্য। তারপর আমি স্কুলে গেলাম। সেখান থেকে টিফিনের সময় বঙ্গশ্রীতে গেলাম। ছুটীর পরে এলাম প্রবাসীতে। একশো টাকা আদায় করে নিয়ে আবার গেলুম পি. সি. সরকারের সঙ্গে কথা বল্‌তে বঙ্গশ্রীতে। বার হয়ে নেড়ার কাছ থেকে ২্‌ টাকা নিলাম ধার বাবদ। Wide Word কিনে নীরদবাবুর flatএ। সেখান থেকে বার হয়ে সতীশের দোকানে জামা নিয়েই বাসায় এসে দেখি পশুপতিবাবুর 'পরলোকের কথা'[২] ২য় সংস্করণ একখানা দিয়ে গেলেন।

বেজায় ধোঁয়া কল্‌কাতায়।

২৫শে জানুয়ারি, ১৯৩৪। ১১ই মাঘ, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

সকালে উদয়ন প্রুফ[৩] নিয়ে গেল। আমি খাবার উদ্যোগ করলুম। স্কুলে গেলুম। সেখান থেকেই টিফিনে বঙ্গশ্রী ও সকালে বার হয়ে হেস্টিং'স স্ট্রীটের পি. সি. সরকারের বাসায়। সেখান থেকে আবার বিরাজের মেসে এলুম substitute ঠিক কর্ত্তে। তারপর বেরিয়ে ওয়াছেল মোল্লার দোকানে মোজা কিনে একটা দোকানে খাবার খেয়ে ট্রামে বাসায় এসে দেখি তিনু ও বনগাঁয়ের সে কালো ছেলেটা বসে আছে। জিনিসপত্র গুছিয়ে ভাটপাড়ায়[৪] এলুম সাড়ে দশটার সময়। অনেক শীত।

২৬শে জানুয়ারি, ১৯৩৪। ১২ই মাঘ, ১৩৪০। শুক্রবার

খুব সকালে উঠে কুয়াসায় গঙ্গার নদীঘাট হয়ে প্রমোদবাবুর বাসায় গেলুম। প্রমোদবাবু আমায় দেখে অবাক্‌। চা খেয়ে দুজনে গল্প করলুম। ষাঁড়েশ্বর[৫]

১ বিভূতিভূষণ তখন রিপন কলেজে পড়তেন। থাকতেন এই অঞ্চলেই ৬০নং মির্জাপুর স্ট্রীটে রিপন কলেজ হস্টেলে। গৌরী তখন বেঁচে।

২ লেখক মৃণালকান্তি ঘোষ।

৩ 'বৈদ্যনাথ' (যাত্রাবদল) গল্পের।

৪ বিভূতিভূষণের মামার বাড়ি।

৫ বিভূতিভূষণ চুঁচুড়া থেকে গঙ্গা পেরিয়ে মামার বাড়ি ভাটপাড়া আসেন। ষাঁড়েশ্বর সেই চুঁচুড়ার দিকের ঘাট।

পার হয়ে বাসায় এলুম; হাব্লার[১] মা এসে ওদের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। আশার[২] সঙ্গে দেখা হল—সে অতি বিশ্রী দেখতে হয়ে গেছে। তারপর—মাথা ধুয়ে খেয়ে নিলাম। ঘোড়ার গাড়ীতে করে নৈহাটী এলুম। কলকাতায় এসে মেসে এলুম। আমি আর নুটু বেরিয়ে পড়ি। টিকিট করে বম্বে মেলে রওনা। রাত ৯৷৷৹ টায় গালুডিতে নামলুম[৩]। প্ল্যাটফর্মে অনেকক্ষণ বসে রইলুম-- তারপর গাড়ী এল—বাংলোতে এলুম।

২৭শে জানুয়ারি, ১৯৩৪। ১৩ই মাঘ, ১৩৪০। শনিবার

সকালে উঠে দেখি বেশ বাসা। পেছনে একটা পাহাড়। চারিধারেই পাহাড়। একটা দোকানে আমি ও ছোটমামা জিনিসপত্র কিনে সুবর্ণরেখাতে স্নান কর্ত্তে গেলুম। সুবর্ণরেখার জল ভারী চমৎকার। বৈকালে আবার মামীমাদের নিয়ে সুবর্ণরেখার ধারে বেড়াতে গেলুম। রাত্রে অতি চমৎকার জ্যোৎস্না। স্থানীয় পোস্টমাস্টার এলেন। আগে মেদিনীপুর ছিল এদের সহর। ৬০ মাইল দূরে। গরুর গাড়ীতে যেতো। সামনে দিয়ে বরাভূম ও মানভূমের রাস্তা চলে গেছে।

২৮শে জানুয়ারি, ১৯৩৪। ১৪ই মাঘ, ১৩৪০। রবিবার

সকালে উঠে বেড়াতে বেরুলাম। খুব শীত। একটা পাহাড়ের ওপর উঠে খানিকটা বসে রইলুম। তারপর নন্দীবাবুদের[৪] খামারের কাছে আর একটা বড় পাহাড় [—] সেইটার ওপর উঠে রইলুম। ছোটমামার সঙ্গে বলরাম সায়ের[৫] নামে একটা বাঁধের জলে স্নান করতে গেলুম। ইসমাইলপুরের জীবন মনে পড়ে। জ্যোৎস্না রাত্রে জনমানবহীন মাঠের মধ্যে বাংলার কাছে পাহাডটার নীচে বেড়াতে যাই। ভারী ভাল লাগে। বৈকালে ঘুমিয়ে উঠে মামীমাকে নিয়ে আবার সেই পাহাড়টাতে বেড়াতে গেলুম। বাসার সামনে একটা জায়গায় ঢোল বাজাচ্ছে আর নাচ্ছে। গিয়ে দেখি মেয়েরা নাচ্ছে।

১ হাবলা (ভাটপাড়াবাসী), নুটুবিহারীর বন্ধু।

২ হাবলার বোন।

৩ ছোটমামিমা নির্মলা চট্টোপাধ্যায় (ছোটমামা বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়) অসুস্থ হয়ে পড়ায় বিভূতিভূষণ মামা, মামিমা এবং মামাতো ভাই-বোনদের নিয়ে গালুডি আসেন।

৪ বাদল নন্দী, গালুডিবাসী।

৫ গালুডি।

২৯শে জানুয়ারি, ১৯৩৪। ১৫ই মাঘ, ১৩৪০। সোমবার

সকালে উঠে দেখি মামীমা পাহাড়ের উপর—আমিও পাহাড়ের ওপর উঠে বসলুম। তারপর খানিকটা 'দৃষ্টিপ্রদীপ' লিখ্‌লাম। বৈকালে হাট হোল—হাটে গেলাম। এখানে সাঁওতাল মেয়েদের স্বাস্থ্য খুব সুন্দর। কথা বাঁকা বাঁকা বাংলা। হাটে গয়না [,] হরিতকী [হরীতকী] বিক্রী হচ্চে। একটা পাথরের ওপর অনেকক্ষণ বসে রইলুম।

৩০শে জানুয়ারি, ১৯৩৪। ১৬ই মাঘ, ১৩৪০। মঙ্গলবার

আজ বড় মেঘলা দিন। সকালে উঠে স্টেশনে ডাক্তার[১] ডাক্‌তে গেলাম। দুপুরের পরে রাখা মাইন থেকে এক ডাক্তার বেড়াতে এল—তার কাছে সুবর্ণ-রেখার অপর পারের পাহাড় জঙ্গলের বিষয় অনেক কথা শুন্‌লাম। স্থানীয় হেডমাস্টারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে আদিম অধিবাসীদের বিষয় অনেককথা শুন্‌লাম। ডমনচন্দ্র মুরারী বলে একটা মুণ্ডা ছেলেকে ডাকিয়ে বাংলা রিডিং শুন্‌লাম। বাসার চারিধারে পাহাড়—উঁচু নীচু জমি চমৎকার দেখায়। বৈকালে স্টেশনে বেড়াতে গেলুম—স্টেশন মাস্টার আমাদের দেশের লোক—চারুবাবু হেডমাস্টারের[২] ছাত্র। সন্ধ্যায় পূর্ণচন্দ্র উঠ্‌ল। পূর্ব্বদিকের পাহাড়ের মাথায় বেশ দেখালে। রাত্রে একবার খুব জ্যোৎস্না উঠ্‌ল—চারিধারের পাহাড় প্রান্তর চমৎকার দেখায়। ইসমাইলপুরের কথা স্মরণ—কেবল তফাৎ এই যে এখানে সংসার ও ঘর গেরস্থালি আবহাওয়া। আমি রোজই ভাবি সুবর্ণরেখার ওপারের পাহাড় যেন Beaver Dam Mountain[৩]—বুনো হাতী নামে ওপারের জঙ্গলে।

৩১শে জানুয়ারি, ১৯৩৪। ১৭ই মাঘ, ১৩৪০। বুধবার

সকালে ?···গীত গোবিন্দ অর্থাৎ মেঘৈর্মেদুরম্বরং[৪] [—] খুব ঠাণ্ডা হাওয়া

১ হরিপদ ?, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার।

২ বনগাঁ স্কুলের হেডমাস্টার চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

৩ উত্তর আমেরিকার Wisconsin-এ।

৪ মেঘৈর্মেদুরম্বরং বনভুবঃ শ্যামস্তমালদ্রুমৈর্নক্তং ভীরুরয়ং
ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ॥
গীতগোবিন্দম্ ১।১।

দিচ্চে। পাহাড়টার দিকে বেড়াতে যাবো কি মনে হোল মামীমারা ওই ছোট পাহাড়টার ওপরে বসে আছে। একটু বেলা হোলে বুঝলাম সেটা ভুল। স্টেশনে খুকীদের[১] নিয়ে গেলাম। এই ঘর গেরস্থালি, নন্দীবাবু-? — জমি বন্দোবস্ত—এ বাংলায় ও বাংলায় গিয়ে পড়িয়ে—এসব আমার ভাল লাগে না।

রাত্রে কি অপূর্ব্ব জ্যোৎস্না উঠেচে। চারিধারে পাহাড় উঁচু নীচু টিলা, ডুংরী পাহাড়, এক একটা নটরাজের মূর্ত্তি? - weird ও অদ্ভুত দেখায়—জঙ্গলে বুনো হাতী, বনমোরগ, বাঘ, হরিণ, ভালুক—প্রভৃতি আছে এমন পাহাড় ও জঙ্গল—সিংভূম ও ময়ূরভঞ্জ স্টেটের মধ্যে। ডাইনে চাঁইবাসা, নেতার হাটের পাহাড়। একটা পাথরের ওপর কতক্ষণ বসে রৈলুম। ও পাশের পাহাড়টার ওপর দিকে চাঁদ উঠ্‌ছে। ইসমাইলপুরের মনের ভাব আবার ফিরে এসেচে—এ জায়গা প্রাকৃতিক সম্পদে—তার চেয়ে ভাল [—] তবে তেমন নির্জ্জন নয়।

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ১৮ই মাঘ, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

খুব সকালে উঠে পাহাড়ের দিকে গেলাম। আজ খুব শীত। মেঘ কেটেচে। হুহু পশ্চিমে হাওয়া দিলে সারাদিন। ঠায় রোদে খাটিয়া পেতে বসে রইলুম। তবুও শীত কমে না। কাল বাড়ীর পেছনে শিলাসনের ওপর বসে লিখেছিলুম-- আজ শীত [শীতে] আর পারলাম না। বারোটার পরে বলরাম সায়েরের ওপারের ঘাটটাতে নাইতে গেলুম। একটা চমৎকার গাছ ও পাহাড়ের দৃশ্যটা দুপুরে চমৎকার দেখায়। ঝাঁ করে ডুব দিলাম—নৈলে শীত করে। আসবার সময় রাঙা বালির পথ জাঙ্গিপাড়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দুপুরে লিখ্‌লাম ও ভাবলাম। বৈকালে পোস্টমাস্টারের বাড়ী বেড়াতে গেলাম—পথে দামোদরজীর মন্দিরে[২] বসলুম। স্টেশনে হরি ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা হোল—তার ডিস্‌পেন্সারীতে বসে। বেরিয়ে অবাক্ হয়ে গেলাম—কি জ্যোৎস্না উঠে গাছ পাহাড় weird করে দিয়েচে—আসবার পথে মনে হচ্চিল সিংভূম অঞ্চলে এইসব জনহীন

আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, বনভূমি তমালতরুনিকরে শ্যামল, রাত্রিকাল, কৃষ্ণ [অন্য নায়িকাসঙ্গহেতু] ভীত। রাধা, তুমি ইহাকে লইয়া গৃহে যাও। এইরূপ নন্দনিদেশে চলিত যমুনাকূলের প্রতি পথ-তরুকুঞ্জে শ্রীরাধামাধবের বিজনকেলি জয়যুক্ত হউক। (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ)

১ প্রীতি, তৃপ্তি ও আরতি চট্টোপাধ্যায়। এঁরা বিভূতিভূষণের ছোটমামা বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে।

২ গালুডি।

জ্যোৎস্নালোকিত পথে ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে পথের ধারে তাঁবু ফেলে যদি থাকি! বাঘ, বুনোহাতীর মধ্যে।

২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ১৯শে মাঘ, ১৩৪০। শুক্রবার

আজ সকালে উঠে সুবর্ণরেখা পার হয়ে চাপড়ি তামার খনিতে বেড়াতে এসেচি ও সেখান থেকে একটা নদীখাতের ভিতর দিয়ে গেলুম চারিধারে উচ্চ পাহাড় ও জঙ্গল ঘেরা পাটকিটা বলে গ্রামে। যাবার পথে কি অনাবৃত পর্ব্বত দেহ-স্তরগুলো তির্য্যক ভাবে উঠেচে—বিরাট শিলাস্তর—আমরা বাংলা দেশের লোক [—] দেখে অবাক হয়ে থাকি। পাটকিটা যেতে অড়লের ক্ষেতে ও পাহাড়ের তলায় ঝর্ণার জলের ধারে কাদায় বন্যহস্তীর পদচিহ্ন দেখলুম। হাতী তাড়ানোর জন্যে ফসল ক্ষেতের মধ্যে বাসা বাঁধা। বানা (bana)[১] অর্থাৎ বনময়ূর কুল খেতে রাত্রে আসে দলে দলে। শাল পিয়ালের বনের মধ্যে দিয়ে পথ—আমি এখন একটা পাহাড়ের মাথায় বসে বসে লিখ্‌চি আর খস্‌ খস্‌ শব্দ শুনে জঙ্গলের মধ্যে আড় চোখে চেয়ে দেখ্‌চি ভালুক আস্‌চে কিনা। বাঘ, ভালুক, হাতী নেকড়ে—সব আছে। জঙ্গলে জরিল ফুল[২] ফুটেচে—চৈত্র বৈশাখ মাসে ফুলের ঘন সুগন্ধ বার হয়—একজন উড়িয়া খনি ইনস্‌পেকটার আমাকে তামা ore ও mica schist[৩] দেখালে। বলে এ পাহাড়ে ১৪ p.c. তামা আছে। সাগই [?][৪] বলে একটা জাত তামা গলিয়ে তৈরী করতো—পথে হাঁটতে হাঁটতে অসংখ্য তামার ore ও লোহার ore [—] এর সঙ্গে তামা পোড়ানো গুল্ দেখলাম। এই

---

১ অস্ট্রিক ভাষায় পাখি বা বোলতার কালো রং বোঝাতে বন (bana) উপসর্গ ব্যবহৃত হয়। এর থেকে অর্থ বিস্তারে বানা অর্থে ময়ূরকুল হওয়া বিচিত্র নয়। তুলনীয়, প্রাচীন বাঙলায় বান শব্দের অর্থ সাধক সম্প্রদায় বিশেষের লাঞ্ছন বা চিহ্ন। যথা 'জাহের বানচিহ্ন রূব ণ জাণী। সো কইসে আগম বেঁএ বখাণী।' কবীরপন্থী সাধুরা কেউ কেউ পাগড়িতে ময়ূরপুচ্ছ ব্যবহার করেন। উদ্দেশ্য কি? প্রশ্ন করলে বলেন, 'য়হ্‌ ইমারা বানা হ্যায়'।

২ ? জারুল/Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers. ?

৩ প্রধানতঃ অভ্রজাতীয় খনিজ পদার্থে তৈরি ভঙ্গুর ও স্তরযুক্ত এক ধরণের রূপান্তরিত শিলা (metamorphic rock)।

৪ রূপান্তরে 'সাঙ্গা'? ছোটনাগপুর অঞ্চলের অস্ট্রিক ভাষাভাষী মাহিলি-মুণ্ডা উপবর্ণের (sub-caste) একটি শাখা।

পাহাড় ও জঙ্গল এই দিকে ময়ূরভঞ্জ পর্য্যন্ত এইরকম ঘন। এটা অবিশ্যি সিংভূম। সিংভূমের দৃশ্য অপূর্ব্ব।

৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪।২০শে মাঘ, ১৩৪০। শনিবার

সকাল বেলা ছোট মামার সঙ্গে বসে গল্প করলুম। খ্যাঁদা[1] এল ১॥০টার গাড়ীতে টাটানগর থেকে। খ্যাঁদা এল তার সঙ্গে গল্প করলুম। বৈকেলে নন্দীবাবুর গোলার দিকে বেড়াতে গেলুম। শালবনের মধ্য দিয়ে আসতে অন্ধকার হয়ে গেল। রাত্রে বেজায় শীত পড়ল।

৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪।২১শে মাঘ, ১৩৪০। রবিবার

ছোটমামা আজ ১টার গাড়ীতে চলে গেল। আমার পায়ে বড় ব্যথা! পাহাড়টার দিকে আতাগাছটার কাছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে গিয়ে একটু বসি। বাংলোর পিছনে পাথরের স্তূপে একটা পাথরে বেশ ঠেস্ দেবার জায়গা আছে। সন্ধ্যার আগে বাংলোর মেয়েরা এসে মামীমাদের নিয়ে গেল মোহিনী বাবুর[2] বাংলোতে। আমি অতিকষ্টে পাহাড় টপ্‌কে স্টেশনে গেলুম ডাক্তারের কাছে। ওস্তাদজী প্রধানকে সঙ্গে নিয়ে জমি দেখে গেল আমাদের বাংলার। ডাক্তারের ওখানে অনেকক্ষণ বসে রইলুম—তারপর অন্ধকারের মধ্যে খুঁড়িয়ে অতিকষ্টে পাহাড় টপকে বাংলোতে ফিরি।

রাত্রে অন্ধকারের মধ্যে আতাতলার দিকে বেড়াতে গেলুম। আর রোজ এই সময় ? বাংলার সেই স্ত্রীলোকটী দারোয়ান সঙ্গে নিয়ে আস্‌চে। একটু পরে ভাঙা চাঁদ উঠ্‌ল পূবদিকের পাহাড়ের মাথায়—দূরে সিদ্ধেশ্বর পাহাড়ে আগুন দিয়েচে। ভারী চমৎকার দেখাচ্চে—নক্ষত্রই বা কি চমৎকার। হাড় ভাঙা শীত!

৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪।২২শে মাঘ, ১৩৪০। সোমবার

সকালে হাডভাঙা শীত। হাত যেন ফেটে যেতে লাগল। একটু বেলা হোলে এখানে বড় বিপদ। হালুয়া তৈরী করলুম নিজে। তারপর বাংলোর পেছনে পাথরটাতে বসে লিখি। আজ হাটবার। স্কুল সকালে ছুটী হয়ে গেল হাটের জন্যে। গায়ে ভয়ানক ব্যথা হয়েচে সেদিন পাহাড়ে ওঠানামা করে। বাড়ীতে নাইলুম। বৈকেলে হাটে গেলাম। পান পাতার [?] বলে একরকম কি জিনিস বিক্রী করচে। বরাভূম থেকে লোকেরা হাট করতে এসেচে—বাংলা কথা বল্‌তে বল্‌তে ফিরচে। ভারী সুন্দর। একটা পাথরের ওপর বসে বসে

১ মৃণালিনী দেবীর মামাতো ভাই ; সম্পর্কে বিভূতিভূষণের মামা।

২ মোহিনী বিশ্বাস, গালুডিবাসী ; এঁর নার্সারি ছিল, নাম 'লুনা'।

ভাবলুম—আজ বনগাঁয়ে হাট হচ্চে আমাদের দেশে। কেষ্ট[1] শালপাতা একটা বিড়ি তৈরী করে দিলে—তাই বসে বসে টানচি—এমন সময় দেখি মামীমারা হাটে এসেচে। ডাক্তার হরিপদবাবুকেও দেখলুম। তারপর বাড়ীতে আস্‌বার পথে ওদেশের লোকেদের কথা শুন্‌তে শুনতে এলুম।

৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ২৩শে মাঘ, ১৩৪০। মঙ্গলবার

আজ সকালে কন্‌কনে শীত। গায়ের ব্যথা খুব বেশী। বসে রৈলুম সারাদিন। একবার—বাড়ীর পেছনে চেয়ার পেতে খানিকটা বসা গেল। বিকেলে কলসী বাংলা থেকে একটী মহিলা বেড়াতে এলেন। বৈকেলে ডাক্তারও এল।

রাত্রে এখানে আকাশে নক্ষত্রসংস্থান একটা দেখ্‌বার জিনিস। জ্যোৎস্না-রাতগুলো তো আগে অপূর্ব্ব আনন্দ দিয়েচে এখন এই অন্ধকার রাতে কি সব অগণ্য জ্বলজ্বলে নক্ষত্রপুঞ্জ। অসংখ্য জগতের কথা ভাবলে মন কোথায় যে চলে যায়! রাতে টাটানগরের জ্যোতি দেখা যায় আমাদের বাংলোর পিছনের ডুংরী পাহাড়ের পশ্চিমে।

৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪; ২৪শে মাঘ, ১৩৪০। বুধবার

আজ সকালে বাংলোর পিছনে সেই শিলাখণ্ডে রোদে পিঠ দিয়ে বসে লিখচি। ডাইনে সুবর্ণরেখার ওপরে, ও বাঁয়ে বরাভূমের দিকে পাহাড়শ্রেণী। সাম্‌নে শালবনী [—] দূরে রাখা মাইনের চিম্‌নী দেখা যাচ্চে। আজ পা একটু ভাল। তবুও কোথাও বেরুলাম না। বসে বসে 'Gopalpul' এর অংশ লিখচি। 'দৃষ্টিপ্রদীপ' শেষ করবো [—] এখানে বৈকালে পাহাড়ের পেছনে শালবনের রাঙা-মাটীতে গিয়ে বস্‌লুম। একটা সমতল শিলাখণ্ডে কতক্ষণ বসে আছি। সুবর্ণ-রেখার ওপারের পাহাড়ে সূর্য্য অস্ত গেল। নির্জ্জন বৈকাল। রোদপোড়া সোঁদা মাটীর গন্ধ। মনুর[2] সঙ্গে নক্ষত্র জগৎ সম্বন্ধে গল্প করি একটু।

সূর্য্যাস্ত এখানে অপূর্ব্ব ব্যাপার। কতক্ষণ পর্য্যন্ত মহাদেব ডুংরি range এর পেছনে লাল আভা থাকে। আবার এদিকে কালাঝোড়ের গায়ে সিঁদূরে আভা পড়ে অস্ত দিগন্ত থেকে এসে। সে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার।

৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ২৫শে মাঘ, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

সকালে পাথরের ওপর বসে লিখ্‌লুম। দূরে রাখা মাইনের চিমনীটা বেশ দেখায় এসময়। আজ পায়ের ব্যথা কম। বাড়ীতেই গল্প করলুম। তারপরে

---

১ স্থানীয় গৃহভৃত্য।

২ মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়; বিভূতিভূষণের ছোটমামার ছেলে।

খেয়ে শুয়ে রইলুম। বৈকালে বেড়াতে গিয়ে স্টেশনের পাশে একটা পাথরের ওপর বসে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করলুম। তিনি রাজখাওয়নের থেকে দূর জঙ্গলের মধ্যে নোয়ামুণ্ডি মাইনে কাজ করচেন। তিনি বল্লেন, ওখানে বাইসন ও বন্য কুকুর অজস্র থাকে।······[?] Division এর অরণ্য বিখ্যাত। মহাদেব ডুংরি পাহাড়ে হাতীর নাচ দেখেছিলেন কাল তিনি।

অন্ধকার রাত্রিতে পাহাড়ের নীচে আতাতলায় গিয়ে চুপ করে বসি। অদ্ভুত নক্ষত্রখচিত রাত্রি—অন্ধকার প্রান্তরটা নির্জ্জন দেখাচ্চে। পাহাড়ের পেছনে টাটা কারখানায় blast furnace এর glow যেন কোনো আগ্নেয়গিরির আভা।

সকালে একজন লোক আমার সামনের নিমগাছে নিম পাতা পাড়তে উঠেছে—নাম শম্ভু। বল্লে, বেগুন নিম দিয়ে ছেঁচকী করবে।

সিংভূমেও বেশ বাংলা ভাষার প্রচলন। কে জানতো এখানেও বাঙ্গালী! আসানবনীর হাটে সাঁওতালরা বাঁকে চাল বিক্রি করতে যাচ্চে।

৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ২৬শে মাঘ, ১৩৪০। শুক্রবার

সকালে পা সেরে গিয়েছিল। স্টেশনে বেড়িয়ে এলুম। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা। একটা ময়ূর বেড়াচ্ছিল—মজুরা ধরতে গেল। তারপর শিলাখণ্ডে এসে বসে লিখলুম চা ও হালুয়া খেয়ে। দেখি পায়ের ব্যথা বেড়েচে। নাইতে গেলুম বলরাম সায়েরে। ওপারের পাহাড়টা কি চমৎকার দেখায়। বাস্তবিক পাহাড় না থাকলে কখনো কি কিছু ভাল দেখায়? সারাদিন পায়ের ব্যথায় বড় নিরানন্দে কাটল। ফিরে এসে ব্যথা বাড়ল। আসানবনীর[১] হাট। ডাক্তার বাবু এসে গল্প করলেন, এদেশে কচড়ার[২] তেল (মহুয়ার তেল) দিয়ে লোকে খায়। শুট্‌কী মাছ খায়। হাঁড়ী রাখে আর জামবাটী রাখে। রোজ ধান কুটে ভাত খায়। টুসু পুজো[৩] করে বসন্ত পঞ্চমীতে। টুসু ভাসাতে গিয়ে নৃত্য করে যুবকযুবতী। হাটে যাওয়া একটা উৎসবের দিন। সেদিন সবাই ভাল কাপড় পরে হাটে আসবে। লোক কুটুম্বের সঙ্গে দেখা হয় ওই একদিনে। কাজ না

---

১ গালুডির পরে রাখা মাইন্স; রাখা মাইন্সের পরে আসানবনী স্টেশন।

২ বাঁকুড়া অঞ্চলেও শব্দটির ব্যবহার আছে।

৩ পুরুলিয়া জেলার গ্রাম্য লৌকিক দেবী। টুসু-পুজোর অনুষ্ঠান শুরু অগ্রহায়ণের শেষ দিনে আর শেষ সাধারণতঃ পৌষসংক্রান্তিতে। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে বসন্তপঞ্চমী। এই অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ টুসুগান। অনেকের মতে ধানের তুষ থেকে টুসু শব্দের উৎপত্তি।

থাকলেও হাটে আসবে। রাত্রে পা সেরে গেল। আতাতলায় বেড়িয়ে এসে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে মাঠের মধ্যে বসে নক্ষত্রজগৎ সম্বন্ধে কথা হোল।

১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ২৭শে মাঘ, ১৩৪০। শনিবার

সকালে পা সেরে গেছে। মনে খুব আনন্দ। অনেকটা বেরিয়ে এলুম। ওদিক থেকে লাইন ধরে স্টেশনে এলুম। সেখানে মন্নু, খোকা[১] ও খুকী উপস্থিত আছে। তারা কবিতা বলে। তারপর আমি ও ডাক্তারবাবু গল্প করতে করতে বাসায় এলুম। লিখতে বসলুম শিলাখণ্ডে। বেশ মিঠে রোদ। আজ ভাবচি আসানবনী বা টাটানগরে যাবো। আসানবনীর হাট গিয়েচে কাল শুক্রবার। ঘাটশিলার হাট বুধবারে। গালুডির হাট সোমবার। ওদেশে সব স্থানে হাট আছে। গুরুমৈশানি লাইনে হলুদপুকুর বামুনহাটি খুব সুন্দর স্থান—পাহাড় ও জঙ্গল। জলের বড কষ্ট। ঝর্ণা শুকনো, মাটী খুঁড়ে জল। draught একটা চমৎকার subject। বহেড়া গাছের[২] তলে দুপুরে বসলুম চেয়ার পেতে [।] heat haze কাঁপচে—কি চমৎকার দেখাচ্চে মহাদেবডুংরী range। বেকাল চাইবাসা রোড দিয়ে বেড়াতে গেলুম। পোস্টাপিসে প্রমোদবাবুর পত্র দিয়ে এলাম। পাঠশালার ছেলেরা আসচে, বল্লে জগন্নাথপুর পাঠশালায় পড়ি। পড়ে নীতিসুধা। পুঁটুলিতে ভেলাগাছের[৩] কষা ফল নিয়ে আসচে খাবে বলে। অদ্ভুত ধরণের ফল [—] বীচি বার হয়ে থাকে। একটা সাঁওতাল। বাড়ী তাৎপিড়ি। বল্লে, শুধু ভাত দিয়ে খেয়েচি, নুন লঙ্কা দিয়ে। একটা পাথরের ওপর বসলুম। কালাঝোড় পাহাড়ের সামনে।

১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ২৮শে মাঘ, ১৩৪০। রবিবার

দুটী মেয়ে খেলা করচে আমি যেখানে পড়চি তার কাছে ভেলা গাছের তলে। ছোটটী কালো কুচ্‌কুচে—কিন্তু যেন পাথরে খোদা মূর্ত্তি। ওর নাম মংকুরি, জাতে গোঁড়,[৪] বাড়ী রাজগাংপুর। পায়ে পৈরি[৫] হাতে কাঁকনা। পৈরী অবিকল নুপুর। কাঁকনা ভারী কাঁসার বালা।

---

১ সত্যরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়; বিভূতিভূষণের ছোটমামা বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে।

২ Terminalia belerica Retz.। সংস্কৃতে বিভীতক।

৩ Semecarpus anacardium Linn.f.। সংস্কৃতে ভল্লাতকম্, অরুষক।

৪ এরা মূলতঃ মধ্যপ্রদেশের দ্রাবিড় ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী।

৫ হিন্দিতে 'পৈর' অর্থ পা। 'পৈরি' মানে পায়ের গয়না।

শীত নেই। রোদ চড়েচে। বলরামপায়ের থেকে নেমে আসবার সময় দূর থেকে পাহাড়টা সেই কি একটা গাছের ভঙ্গি, কি চমৎকার দেখায়। এইসময় ইছামতীতে আমাদের দেশের ঘাটে ও কুঁচঘাটায় ঝোপের ধারে ফণিকাকা নাইতে নেমেচে—কামারপাড়ায় বৌয়েরা নাইচে।

বহেড়াতলায় বসে লিখচি। সামনের পাহাড়ে আগুন দিয়েচে। heat haze কাঁপচে। সামনের হরীতকী গাছটার নীচে।

সন্ধ্যার আগে পাহাড়টার পেছনে শালবনে বেড়াতে গিয়ে শিলাখণ্ডে বসে রইলুম। সূর্য্যাস্তের রাঙা আভা কতক্ষণ রৈল। আকাশভরা অস্ত দিগন্তের আভা পাহাড়ের বিশাল ঢালুর কেঁদ গাছ, ভেলা গাছ, শাল গাছ, খেজুর ঝোপে পড়েচে। আজ রবিবার। গোপালনগরের হাট—দারিঘাটার পুল দিয়ে লোক ফিরচে হাটে। যেখানে আমের বউলের গন্ধে বাতাস মাতিয়েচে এই বসন্তে। সত্যি, স্মৃতিতে মাধুর্য্যে বারাকপুর যেন ভরা—ওর মত স্থান আর আমার কাছে কৈ? এখানকার এই ডুংরি, টিলা, শালবন, পাহাড়ের মাথায় দাবানল জ্বলা—এও যেমন অপূর্ব্ব—সেও অন্যদিক থেকে তেমনি মহিমময়। সন্ধ্যার পরে ডাক্তারের সঙ্গে কতক্ষণ গল্প করলুম। কলসী বাংলায় দারোয়ান আলো হাতে ওদের বৌকে ডাকতে গেল।

১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ২৯শে মাঘ, ১৩৪০। সোমবার

বৈকালে হাটে গেলুম ও কেঁদ্ ফল, কুল, পেয়ারা কিনে নিয়ে চলে গেলুম রেলের বাঁধের ধারে। চমৎকার সূর্য্যাস্ত হোল সুবর্ণরেখার ওপারে। তারপরে চৌধুরীবাবুদের কাছে বসলুম। বিশ্বনাথবাবু, চৌধুরীবাবু, হেডমাস্টার ওরা সবাই এসে বসেচে। কুলীদের মাইনে নিয়ে কি একটা গোলমাল বেধেচে খুব স্টেশনে। রাত্রে খুব হাওয়া ও ঝড়। মেঘাবৃত আকাশ।

১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ১লা ফাল্গুন, ১৩৪০। মঙ্গলবার

সকালে সুবর্ণরেখার ধারে বেড়াতে গিয়ে একটা উঁচু পাড়ের ওপর বসলুম আমি ও ডাক্তার। পাথর খাদানে গাড়ী যাচ্চে নদী পার হয়ে। ডাক্তার বল্লে, রাখা মাইনে চলুন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ আছে। আমি তো এতদিন যেতুম পা সেরে গেলে। দুপুরে বসে লিখলুম। তারপরে পোস্ট আপিসে ইউনিভার্সিটীর পত্র কিনতে গেলাম। উদয় মুকুটী এখানকার এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ। খুব ধানজমি আছে। নন্দীবাবুর ম্যানেজার। তাঁর ভাগ্নে সঙ্গে সঙ্গে এল। খুব কড়া রোদ। মজলিয়া গ্রামের মাঝটায় বড় বড় বিচালীর বাড়ী—রাস্তায় লাল ধুলো। ওর

ভাগ্নে কাকে বল্লে—ওহে, ও মেহিনটা যোগাড় করলে কোথা থেকে? খোলাডাটির কাছে পাথরের ওপর বসে গল্প করলুম তার সঙ্গে। সে বল্লে, পাটমৈল্লায় জমি আছে। স্টেশনে বসে সাহেবটার সঙ্গে ? ও আফ্রিকার গল্প করি। তারপর এসে তাড়াতাড়ি অন্ধকারে পাহাড়ের কোণে শালবন ও রাঙামাটির টিলাতে বেড়াতে গেলুম। তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েচে। রাত্রে ঝড়া ডাক্তার এসে ডাকলে—আমি বল্লুম আর বাহিরে বসবো না।

১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ২রা ফাল্গুন, ১৩৪০। বুধবার

সুবর্ণরেখার ধারে মোহিনীবাবুর নার্সারিতে বেড়াতে গেলাম। অতি মনোরম স্থান—একটা উঁচু টিলার ওপরে পরিষ্কার ঘরটা। পিচ্ কমলা নানাবিধ ফলফুলের বাগান নীচে। ওপরের পাহাড়ের দৃশ্য বড় সুন্দর দেখায়। ময়ূরভঞ্জে বাড়ী? সাঁওতাল এখানে কাজ করে—সে বল্লে, ওপারের বন ময়ূরভঞ্জ পর্য্যন্ত বিস্তৃত—বন্যমহিষ আছে এবং ? অর্থাৎ বাইসন আছে। রোজ বলরাম সায়েরে নাইতে যাই—ওদিকের পাহাড়শ্রেণী ও একটা অদ্ভুত ধরণের গাছ পাহাড়ের পটভূমিতে ভারী ভাল লাগে। ইছামতীর কথা মনে আসে। বৈকালে পাহাড়টার ওপাশে বেড়াতে গেলুম। আসানবনীর সেই ফুল ফুটেছে পাহাড়ের গায়ে।

রাত্রে আমি ও ডাক্তারবাবু বসে আফ্রিকার গল্প বলি। তারপর পোস্টমাস্টার এলেন। তিনি বলছিলেন ? থেকে Gua পর্য্যন্ত জঙ্গল খুব। নোয়ামুণ্ডিও খুব জঙ্গল ডুইলাইনে। আমাদের বাসায় এই পাহাড়টার নাম নেকড়াডুংরি—এখানে নেকড়ে থাকচে। ? অর্থাৎ বন্য কুকুর থাকচে। টাটার কাছে ভেলা গাছ আছে—খুব জঙ্গল। চক্রধরপুর থেকে রাঁচী মোটরে ফিরেচি [—] পথে খুব দৃশ্য ভাল। বৈতরণী নদীর ওপরে কেওঞ্ঝর স্টেট—ভয়ানক জঙ্গল। সিমলাখালি পাহাড় আছে—ওখানে বারিপদার কাছে—সেখানে সবরকম বন্য জন্তু আছে।

১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ৩রা ফাল্গুন, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

খুব ভোরে উঠে সুবর্ণরেখার ধারে বেড়াতে গেলুম। ভারী সুন্দর জায়গা। উপলখণ্ড সেখানে পড়ে আছে—ওপারের জঙ্গলের দৃশ্য চমৎকার—এপারেও উঁচু পাড় ও গাছপালার ভঙ্গি যেন নৃত্যশীল নটরাজের মত ছন্নছাড়া ও উদ্দাম। জীবন নার্সারীতে গিয়ে পাকাকুল ও কমলালেবু খেলাম।

এইমাত্র রাখা মাইনস্ থেকে ফিরে আসচি। রাখামাইনস্এর সমতল ভূমির আধমাইল পশ্চিমে যে পাহাড় তারই ওপারে গেলুম। সামনে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে সুউচ্চ শৈল চূড়ায় অরণ্যানী-শীর্ষে প্রত্যাসন্ন অপরাহ্নের পীতাভ রৌদ্র,

সামনেশে টকটকে লাল পিরিয়াল ফুলের ঝোপ, নিষ্পত্র শুভ্রকাণ্ড ফরদ্‌গাছগুলো কেমন বেঁকে চুরে নৃত্যশীল নটরাজের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে, মাঝে মাঝে শুকনো বনতুলসীর[১] জঙ্গল। তার সঙ্গে মিশেচে বিরাটত্ব। ধাতুর একটা বিশাল পর্ব্বত, ধাতুরঞ্জিত, রুক্ষ [রুক্ষ], অনাবৃত গগনস্পর্শী স্তর সংস্থান দেখলে মাথা যেন ঘুরে যায়—তার ওপর কল্পনা করো চারিপাশের ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বন্যগজ অধ্যুষিত ঘন আরণ্যভূমি, বিরাট নিস্তব্ধতা—সন্ধ্যায় ছায়ায় নিম্নের উপত্যকার ও অপরাহ্নের রাঙা রোদ মাখানো শৈলশীর্ষের মহিমময় সৌন্দর্য্য। একটা তুঁতে রংয়ের ঝর্ণা দেখলুম—বল্লে, তামা ধোয়া জল আসচে। সন্ধ্যার পরে দুধারের শালবনে ঘেরা মুসাবনী রোড্ দিয়ে বাড়ী ফিরলুম। অন্ধকারে বিদ্যুৎ চমকাচ্চে, তখন সুবর্ণরেখা পার হলাম। পথেরই বা কি সৌন্দর্য্য!

১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৪০। শুক্রবার

বৈকালে চন্দ্ররেখা নামে গ্রামে বেড়াতে গেলুম। চাঁইবাসা রোডের ওপর গ্রামখানি। বেশ সমতলভূমি—আসবার সময় চাঁদ উঠেছে দ্বিতীয়বার। একটা বাঙ্গালী ভদ্রলোক এসে আলাপ করলে। একটা পুকুরের ধারে শিব মন্দির। পুরোনো মন্দির। কাঞ্চন ফুল[২] ফুটেচে। আমের বউলের গন্ধ বার হচ্চে। পারিজাত[৩], শেফালি, বট, নিম—সব রকম ফুল আছে—কাছেই পাহাড়। আমরা পাকা কুল পেড়ে খেলুম গাছ থেকে। বাঁধের জলে মুখ ধুলাম। একটা কাঞ্চন ফুল পেড়ে নিলুম। ফিরবার পথে একটা শিলাখণ্ডে বসে রইলুম। সামনে বহুদূরে কালাঝোর একটু একটু দেখা যায়। বিস্তীর্ণ প্রান্তর, অস্পষ্ট জ্যোৎস্না, নক্ষত্রখচিত সুবিস্তীর্ণ আকাশ, হু হু হাওয়া। নির্জ্জন প্রান্তর ও পথ। আসানবনীর হাট থেকে জনৈক মাড়োয়ারী গালা কিনে ফিরচে। সামনেই পাহাড়টা—বাংলা থেকে দূরে এই পথ সিংভূমের প্রান্তর—বড় ভাল লাগ্‌লো। অথচ বাংলাদেশই এটা। সবাই বাংলা কথা বলচে।

১ Perilla ocimoides Linn.। সংস্কৃতে খরপত্র, মরুবক।

২ [রক্ত] Bauhinia variegata Linn.। সংস্কৃতে অপর নাম কোবিদার, কাঞ্চনার।

[শ্বেত] Bauhinia racemosa Linn.। সংস্কৃতে অপর নাম কোবিদার, বনরাজ।

[দেব] Bauhinia purpurea Linn.।

৩ Erythrina variegata Linn. var. orientalis (L). Merr.। বাঙলায় পালতেমাদার।

১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ৫ই ফাল্গুন, ১৩৪০। শনিবার

পোসোইতা। বেলা ৭॥ টা।

এইমাত্র ট্রেনে এখানে নেমে চাঁইবাসা রোডে ঘন জঙ্গলের ধারে বসে লিখ্‌চি। কি বনস্পতি দুধারে। অনেক জায়গায় লতা ঝোপ ঝোপে। ফুল ফুটে আছে। এত বড় বড় গাছ যে অন্ধকার চারিদিক। পাথর আছে তবে কিছু কম। বনই বেশী। অদ্ভুত বন [—] বনস্পতি গাছই বেশী। তলায় undergrowthও আছে। খুব নির্জ্জন বনের কতরকম পাখী ডাকৃচে। নিবিড় ঘন জঙ্গল—এখন আবার একটা পাথরের ওপর বসে লিখ্‌চি। বনে আমলকী ফলে আছে। বেলা হয়েচে আটটা—এখনও রোদ পড়েনি বনের মধ্যে—কি একটা পাখী ডাকৃচে। কেমন একটা আর্দ্রতা। শাল, কেঁদ, পিয়াল, আমলকী বেশি। ফুল হয় এমন গাছ খুব কম। বসন্তের শোভা কৈ? ন'টা বেজেচে—কল্‌কাতায় এতক্ষণে ছুটতে হোত স্কুলে। মণীন্দ্র বসুর পত্রখানা জঙ্গলে বসে পড়চি। বাবার লেখাটা সেই হিন্দী প্রেফ শুনি। মণীন্দ্রবাবু নামে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হোল। আসবার সময় surrenda-র বন্ পাহাড় দেখে অবাক্ হয়ে গেলুম। জানালায় দাঁড়িয়ে চারিধারে চেয়ে দেখি এ ঠিক যেন আমেরিকার সেই ফটোতে দেখা বনের মত। এরই ফটো তুল্‌লে খুব দেখাবে ভাল। বন খুব denseও আছে যেখানে নদী বা ঝর্ণা। ওরকম জঙ্গল পথে আর কোথাও নেই। চক্রধরপুর, সিনি প্রভৃতি দুপুর রোদে খাঁ খাঁ করচে যেন মরুভূমি। বাংলাদেশের কথা মনে পড়্‌ল—এই প্রথম বসন্তে সেখানে বাড়ী বাড়ী বাতাবী লেবুর ফুল ফুটেচে, কচিপাতা গাছে গাছে গজিয়েচে, শ্যাম ছায়া পড়ে এসেচে বাঁশবনের মাটীর পথটীর পরে—ঘেঁটু ফুল ফুটেচে মাঠের পথের দুধারে—এদেশ ও সে দেশ? এদেশ রুক্ষ, ধূসর কিন্তু বড় সৌন্দর্য্যশালী। এর রুক্ষ সৌন্দর্য্য অদ্ভুত। সিনি স্টেশনে যেতে খানিকটা ওদিকে অর্থাৎ রাজখর্সাওনের দিকে হাতীর মত curious formation এর পাথরের একটা জমি আছে ও বন আছে—অপূর্ব্ব।

বৈকালে আমি ডাক্তার ও ছোট মামা নেকৃড়াডুংরী পাহাড়ে উঠ্‌লাম। খুব শিলা বৃষ্টি হোল। এমন দিন কমই দেখেচি।

১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ৬ই ফাল্গুন, ১৩৪০। রবিবার

রবিবার। এদ্দিন ছোটমামা চলে গেল একটার গাড়ীতে। আমি স্টেশনে বেড়াতে গিয়ে সাপ দেখ্‌লুম। চন্দ্ররেখা গ্রামের কাছে পাহাড়টায়। রাস্তার ধারে কতক্ষণ বসে রইলুম সেদিন রাতে পাহাড়ের ওপর। সাপ দেখি।

১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ৭ই ফাল্গুন, ১৩৪০। সোমবার

কয়দিন পরে সকালে শিলাখণ্ডে বসে লিখ্চি [—] আজ সোমবার।

২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ৮ই ফাল্গুন, ১৩৪০। মঙ্গলবার

সকালে দিঘাগড়া রওনা হওয়া গেল গাড়ীতে। দুধারে শাল, আসান[১], কুচিলা[২], অর্জ্জুন[৩], মহুয়া, বট, হরীতকী, কেঁদ, পিয়ালগাছ। মেঘের ছায়া। মাঝে মাঝে উঁচু ডাঙা। কুলপাগী বলে একটা গ্রাম পেরিয়ে এসে খুব বনঝোপ। শুক্নো পাহাড়ের মাথা দিয়ে গাড়ী ঘুরে গেল। জঙ্গলের শোভা অপূর্ব্ব। অসংখ্য গোলগোলি ফুলের[৪] গাছে ফুটন্ত হল্‌দে আসানবনীর সেই ফুল অজস্র—তাতে অবর্ণনীয় শোভা হয়েচে। রাঙামাটী, শাল, বহেড়া. লোহাঝাড়ি গাছ চারিদিকে। ছোট বড় শিলাখণ্ড। পথে মহুয়া ফুল পেড়ে খাওয়া গেল। বেশ মিষ্টি। ফুলের সুগন্ধ। এই অংশটা লিখ্চি রামচন্দ্রপুর বলে একটা জঙ্গলে ভরা গ্রামের পাহাড়ে বনের ছায়ায় শিলাখণ্ডে বসে। শিমূল ফুল ফুটে আছে—পথে মাঝে মাঝে কুসুমগাছের[৫] কচিপাতা টকটকে রাঙা—দূর থেকে যেন মনে হয় ফুল ফুটেচে। নির্জ্জন, নিরালা, সাঁওতালী গ্রামটা সাম্‌নে।

রামচন্দ্রপুর ছাড়িয়ে জঙ্গলের দৃশ্য অপূর্ব্ব—অনেক দূর পর্য্যন্ত উঁচু নীচু রাঙা মাটী। ··· ? ফুলের ঝাড় ফুটে আছে। বাঁয়ে পাহাড়—বনানী দৃশ্য অতি রমণীয়।

২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ৯ই ফাল্গুন, ১৩৪০। বুধবার

এক জায়গায় বনের মধ্যে গিয়ে কুল খেয়ে একটা গাছতলায় বসে বিশ্রাম করে এলুম ছায়ায়। সাম্‌নেই পাহাড়—গরুর গাড়ীতে আসান গাছের ছায়ায় বসে লিখ্চি। ঘেঁটুফুল দেখেচি রামচন্দ্রপুরে।

দীঘা গিয়ে পাথর কিন্‌লুম। একটা সাঁওতাল তরুণী তুলি দিয়ে দেওয়ালে রং করচে—ভারী সুশ্রী সমস্ত মুখ। একটী পাঠশালায় ব্লাকবোর্ডে বাংলা নতুন পাঠ পড়ানো হয়। স্নান সেরে বেরুলাম। পথে একটা শালবনের ছায়ায়

---

১ Terminalia tomentosa W. A.। সংস্কৃতে ? অসন:। বাঙ্গালায় পিয়াশাল।

২ Strychnos nux-vomica Linn.। সংস্কৃতে তিন্দুক, জলদ, দীর্ঘপত্রক।

৩ Terminalia arjuna Bedd.। সংস্কৃতে ককুভ, ইন্দ্রদ্রু।

৪ ? গলগল / Cochlospermum religiosum (Linn.) Aeston.।

৫ Carthomus tinctorius Linn.। সংস্কৃতে কুসুম্ভ, বহ্নিশিখা।

পাহাড়ের দিকে চোখ রেখে আহার করা গেল। অনেকদিন পরে homely [?] wild life যেন ভোগ করচি। সত্যি এত আনন্দ হোল। বসে বসে ভাবলুম এতক্ষণ আমাদের দেশের বাড়ীর পিছনে বাঁশবনে ছায়া পড়ে গিয়েচে। খেয়ে দেয়ে সতরঞ্চি পেতে শালবনের ছায়ায় বসে লিখ চি এবার। পথে ভালুকের ভয় আছে—দীঘায় সবাই বলেচে।

বুরুডি গ্রাম ছাড়িয়ে জঙ্গলের প্রারম্ভে বসে লিখ্‌চি গাড়ীতে। ঘেঁটুফুলের অপূর্ব্ব সুগন্ধ। আমি যেন কোনো নিরালা বড় ঘেঁটু বনের ধারে প্রথম বসন্তে অপরাহ্নের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছি। এক্ষণে ঘেঁটুবন নিরীহ নয়। পাশেই বিরাট পাহাড়ের সানুদেশের ঘন অরণ্যের প্রান্তবর্ত্তী। বেলা পড়ে এসেচে। বাঁধের ধারে জ্যোৎস্নায় বসে কতক্ষণ আগুনটা দেখ্‌লুম। বাংলা দেশের দিকে চেয়ে কত নির্জ্জন ঘেঁটুফুলে ভরা উঁচু ডাঙার কথা মনে পড়ে—সেই আমাদের দেশ। ইছামতী নদী, শীতে জেলের নৌকা, বাঁশের··· ? মাছ ধরার—কত দূরের কথা সে সব।

২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ১০ই ফাল্গুন, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

মহাদেবডুংরির শিখর দেশে বসে লিখচি। ভয়ানক দুরারোহ পাহাড়—তেমনি কাঁটা গাছ ও জঙ্গল। একটা শিব মন্দির আছে। ভালুকের নাচ দেখতে পেলাম! ভালো দেখা যায় না—বড় জঙ্গল। বড় নিস্তব্ধ। জুতো জোড়া না ফেলে উঠতে পারলুম না—এমনি খাড়া। তখন সকাল বেলা দশটা। তারপর আবার সিদ্ধেশ্বর ডুংরীতে উঠলাম। হাতীতে গাছ ভেঙেচে। সন্ধ্যায় ফিরি।

২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ১১ই ফাল্গুন, ১৩৪০। শুক্রবার

সকালে উঠে লিখতে বসলুম। তারপর খুব তৃপ্তির সঙ্গে বলরাম সায়ের থেকে স্নান করে এলুম। ১টার গাড়িতে মামীমাকে নিয়ে ঘাটশিলা গিয়ে স্টেশনে নামচি—পানিতরের ইন্দুকাকার সঙ্গে দেখা। তারপর মামীমাকে বাসায় দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি এসে গাড়ী ধরি। ইন্দুকাকা স্টেশনে ছিলেন। স্টেশনে নেমে খবরের কাগজ পড়লুম [---] তারপর বাড়ী এসে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শুয়ে রইলুম। সূর্য্য যখন পাহাড়ের ওপারে অস্ত যাচ্চে তখন উঠে নেকড়াডুংরির ওপারের শালবনে কতক্ষণ বসে রইলুম। জ্যোৎস্না পড়ে কি অপরূপ শোভাই হোল— দেখতে দেখতে কত নক্ষত্র ফুটল। বসে বসে দেখছিলুম নির্জ্জন শালবন, পাহাড় —জ্যোৎস্না প্লাবিত মুক্ত টিলা, ডুংরী—দূরে একটা পাহাড়ে আগুন দিয়েচে। বাংলাদেশের কত জ্যোৎস্নালোকিত প্রান্তরের ভাঁটবনের কথা মনে পড়লো।

ইসলামপুরের ঝাউ কাশের বনের মত মনে হোল হঠাৎ যেন ওধারটা। ঝাউ কাশের বনটা কারো নয়—সিধুবাবুর[1] নয় কারুর নয়। মালিক এবার বদ্‌লেচে। আবার তেমনি জ্যোৎস্না—তেমনি সুন্দর। কাশবন যেন হাসচে।

২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ১২ই ফাল্গুন, ১৩৪০। শনিবার

শনিবার আজ চলে যাচ্ছি। সকালে উঠে সেদিন কার পর্ব্বত আরোহণ জনিত দৈহিক ক্লান্তি দেখি আর নাই। নন্দীর গোলার সামনে সেই ছোট পাহাড়টাতে প্রথম দিন এসে উঠেছিলুম—তাই শেষ দিনটা উঠলাম—চারিধারে দৃশ্য বড় চমৎকার। বরাহভূমের দিকে কেবলই পাহাড় ও শালবন। নন্দীর এখানে বাড়ীটা হচ্চে বড় চমৎকার। তারপর ফিরে এসে চা খেয়ে আমি সেই বাংলোর পিছনে শিলাখণ্ডে বসে লিখচি। দূরে রাখা মাইনের সেই চিমনি দেখা যাচ্চে। একটু ঠাণ্ডা আজ। রোদ মিষ্টি লাগচে। বিড়ির কারখানায় লোকেরা ঝগড়া করচে। ছোট পাহাড়টার shiva (?) গাছের নাম লিখলুম।

কলকাতায় এসে শিয়ালদহ স্টেশন থেকেই বঙ্গশ্রী আপিসে গেলুম। সজনীরা হৈ হৈ করে উঠলো। পশুপতিবাবুকে phone করলুম। তারপর হেমন্তের··· কাছে··· ? মহলে গিয়ে Torch Singer[2] ছবি দেখলুম।

২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ১৩ই ফাল্গুন, ১৩৪০। রবিবার

ভোরে উঠে বনগাঁ। পুকুরে স্নান সেরে এসে বিকেলে বারাকপুর গেলাম। খুব বাতাবী লেবু ফুলের গন্ধ, আমের বউলের গন্ধ, কোকিলের ডাক চারিধারে। বেশ soft, pretty আবহাওয়া। কাঁঠাল তলায় বসলুম। গজন নাড়ু নিয়ে এল ও এক গ্লাস জল। হারুর পৈতে হয়ে গিয়েচে তারই শেষ অবশিষ্ট। উঠোনে বসে খুড়ীমা, নদি, বুড়ি পিসিমার সঙ্গে গল্প করলুম। কালো এল। বাঁশবনের দিকে বেড়াতে গেলুম, ভিটের দিকে গেলুম। শুকনো বাঁশপাতা, সজনে ফুল, শিমুল ফুল, কোকিলের ডাক, নদীর ঘাটেও গেলাম। পুঁটী দিদি ঘাটে। খুকুর সঙ্গে রোয়াকে বসে গল্প করলুম। রাত্রে নদি, খুড়ীমা, খুকু, পরেশ সবাই তাস খেলি।

---

১ পাথুরিয়াঘাটার সিদ্ধেশ্বর ঘোষ। এঁদের বাড়িতে এবং জঙ্গালমহালে এককালে বিভূতিভূষণ চাকরি করতেন। এই ডায়েরি যখন লিখছেন তখন তিনি এঁদের প্রতিষ্ঠিত খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইন্সটিটিউশনের শিক্ষক।

২ লেখক Lenore Coffee ও Lynn Starling; Director Alexander Hall।

২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ১৪ই ফাল্গুন, ১৩৪০। সোমবার

সকালে উঠে প্রথমে মাঠের দিকে বেড়াতে গেলুম তারপর ফিরে এসে চালকীর দিদির সঙ্গে দেখা করলুম। বনগাঁয়ে এসে আহারাদি সেরে বেশ ঘুম দিলুম। সন্ধ্যার আগে বীরেশ্বরবাবুর সঙ্গে স্টেশন পর্য্যন্ত বেড়াতে গেলুম। খুব জ্যোৎস্না। গালুডির মত নয়,—তেমন অপূর্ব্বতা নেই। বাংলাদেশ বেশ soft, বেশ pretty [—] কিন্তু সে রকম নয়। রাত্রে মন্মথবাবুর বাড়ীতে আড্ডা হোল। মুন্সেফবাবু এলেন—ভ্রমণের গল্প হোল।

২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ১৫ই ফাল্গুন, ১৩৪০। মঙ্গলবার

বেশ ফাল্গুনের হাওয়া। সারাদিনই বাড়ীতে। বিকেলে খুকীকে নিয়ে নৌকোতে সাতভেয়েতলা গেলাম ছকু মাঝির নৌকোতে। খুব ঘেঁটু ফুল ফুটেচে। আসবার সময় বেশ জ্যোৎস্না। মন্মথবাবুর আড্ডাতে খুব গল্প হোল ভ্রমণের।

২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ১৬ই ফাল্গুন, ১৩৪০। বুধবার

সকালে কল্‌কাতা এলুম। বরিশাল এক্সপ্রেস ১ঘণ্টা লেট্ ছিল। ঘুমিয়ে প্রবাসীতে গিয়ে দৃষ্টিপ্রদীপের Proof দেখলুম। তারপর বন্ধুর বাসায় গিয়ে রাত দশটা পর্যন্ত আড্ডা। বাড়ী এলুম। মেঘ করচে।

অনেকদিন পরে আমার ঘরটা এবং কলকাতা শহরটা সম্পূর্ণ নতুন লাগ্‌চে। ভাল লাগচে না কিন্তু শহরের এই গোলমাল। রাত ১১টা—এখনও খুব গোলমাল। অন্য জায়গা এতক্ষণ ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে গিয়েচে।

২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ১৯শে মাঘ, ১৩৪০। শুক্রবার[১]

সিংভূম ও ময়ূরভঞ্জের সীমানায় একটা জঙ্গলাবৃত পাহাড়শ্রেণীর মধ্যে একটা পাহাড়ের মাথায় বসে এটা লিখচি। আজ সকালে গালুডি থেকে বেরিয়েচি—সারাদিন জঙ্গলে ঘুরচি, পাটকিটা নামক একটা চারিধারে জঙ্গলে ঘেরা ও পাহাড়ে ঘেরা গ্রাম দেখে এলুম। তারপর কতকগুলো লোক টাটা কোম্পানীর খনিতে কাজ করে তারাই চন্দু বলে একজন ছোকরা দিয়েছিল পথ দেখাবার জন্যে। ফিরবার পথে এই জঙ্গলাবৃত প্রকাণ্ড পাহাড়টার ওপর একাই উঠেচি—

---

১ বিভূতিভূষণের স্বহস্ত লিখিত তারিখ, '২রা ফেব্রুয়ারি। ১৯৩৪। শুক্রবার।' সিংভূম অঞ্চল পরিভ্রমণের সময় বিভূতিভূষণ ফেব্রুয়ারি মাসের (২রা থেকে ২৫শে পর্যন্ত) এই অতিরিক্ত দিনলিপিটি লেখেন।

কাল স্টেশন মাস্টারের ভাগ্‌নে ভোলাবাবুকে Stone Quarry[1] থেকে ফেরবার পথে ভালুকে তাড়া করেছিল—গল্প শুনেচি। তাই এই লিখবার সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলে খস্‌ খস্‌ শব্দ হবার সঙ্গে ভয়ে ভয়ে চেয়ে দেখচি—চারিধারে ঘন নির্জ্জন জঙ্গল—অনেকটা উঁচি পাহাড়ের মাথায়—শাল, পিয়াল, কেঁদ, জড়িন কুল, পলাশ, আমলকী, শিরীষ, কুল, আকন্দও দেখেচি—এই গাছের জঙ্গলই বেশী। শুধু হাওয়ায় জঙ্গলের ডালপালার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই কোথাও। সামনে বিশাল পাহাড়ের অধিত্যকা জঙ্গলে ভরা—সামনেই কাঞ্চন ফুলের রং এর জড়ল ফুল ফুটে আছে জঙ্গলে। একা বসে আছি—কেউ নেই। এ ধরণের পাহাড় জঙ্গল আমি কোথাও দেখিনি—পাহাড়ের ঢালুতে ঝোপঝাড় দেখেচি কিন্তু এমন বনস্পতির সমাবেশ কোথায় দেখিচি? বাস্তবিক ভগবান্‌ যে যা চায়, তাকে তা দেন। এখন বেলা ১২-১৫ মিনিট আমার হাত ঘড়িতে —কলকাতার স্কুলে এখন ঘোররবে কাজ চল্‌চে—আমি একা সিংভূম জেলায় এই পাহাড়, জঙ্গলের মধ্যে বসে বসে নীল আকাশের তলায় চারিধারের নিবিড় জঙ্গলের পত্র মর্ম্মরের মধ্যে বসে এই লাইনগুলো লিখ্‌চি। সিংভূম থেকে ময়ূরভঞ্জ পর্য্যন্ত যে পথটা চলে গিয়েচে—সেই পথটার ডানদিকে এই পাহাড়-শ্রেণী। এর পরে পরে চল্লিশ মাইল পর্য্যন্ত চলেচে এইরকম পাহাড়। ঘোর জঙ্গলে ঘেরা, মাঝে উপত্যকায় ভূমিজ[2], মুণ্ডা[3], সাঁওতালদের[4] গ্রাম। অড়রের ক্ষেত

১ পাথর-খাদান।

২ ছোটনাগপুর অঞ্চলের অস্ট্রিক (কোল) ভাষাভাষী জনগোষ্ঠি আদিম জাতি বোঝাতে বর্তমানে আমরা যে 'আদিবাসী' শব্দটির প্রচলন করেছি তারই প্রাচীন রূপ ভূমিজ। তুলনীয়, যবদ্বীপের ভাষায়, 'বুমি-পুত্র' (ভূমি-পুত্র), ডাচ ভাষায় inlander (=native, আদিবাসী), uitlander (= outlander, বিদেশি)।

৩ ছোটনাগপুর অঞ্চলের অস্ট্রিক ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী। মাথা অর্থে মুণ্ডা শব্দ হিন্দি 'মুণ্ড', ওড়িয়া 'মুণ্ড', বাঙলা 'মুড়' শব্দের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। সম্মানার্থে এদের মুণ্ডা বা গ্রামের মোড়ল বলে উল্লেখ করা হত। পরে সেটিই এই জনগোষ্ঠীর সাধারণ নাম হিশেবে চলে যায়। মুণ্ডারা কিন্তু নিজেদের 'হোড়ো' (মনুষ্য) বলে।

৪ ছোটনাগপুর অঞ্চলের অস্ট্রিক ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী। সাঁওতাল শব্দের সম্ভাব্য আদি রূপ * সামন্তপাল, অর্থ সামন্ত বা প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসী। সাঁওতালরা কিন্তু নিজেদের বলে 'হড়্‌' (মনুষ্য)। অপরদের বলে 'দিকু'।

ধানের ক্ষেত—বেশ নিকানো পুছানো ঘরগুলি। বনময়ুর, বন্যগজ, ভালুক, বাঘ, নেকড়ে, বনমোরগ—সবরকমই আছে এ নির্জ্জন আরণ্যপ্রদেশে। দূরে সুবর্ণরেখা ও তারপরে আবার গালুডির উপত্যকা—পরে আবার বরাহভূমের এদিকে কালাঝোর পাহাড়শ্রেণী। এইখানে খুব বাঘের ভয়—ভাগলপুরের মণিবাবু সেই বাঘের গল্প করেছিল—সে এই সুবর্ণরেখার ধারে। সেই পাহাড়ের জঙ্গলের মধ্যে একা বসে লিখ্‌চি। পায়ের তলায় তামার প্রস্তর, লৌহপ্রস্তর, mica schist অসংখ্য—পথে একজায়গায় সাগা (?) ন্যমে আদিম অধিবাসীরা পাথর গলিয়ে প্রাচীন উপায়ে তামা করেচে তার চিহ্ন দেখ্‌লুম। ঝরা[১] বলে জাত আছে—তারা সুবর্ণরেখার বালু থেকে এখনও সোনা বার করে শুন্‌লুম [—] সুবর্ণরেখা পার হবার সময়ে সাঁওতাল গাড়োয়ানের মুখে। জঙ্গলে মোটা মোটা লতাগাছও দেখ্‌চি। হরিতকীও [হরীতকী] আছে। পিয়ালফুল এখন এই মাঘের শেষে ফুটেচে—গন্ধ নেই। আর কিছুদিন পরে নানারকম বনের ফুলে বনভূমি ও পাহাড়ের নীচে আমোদ করবে। আর হয়তো এখানে আসা হবে না—কল্‌কাতার এত কাছে -এত সুন্দর জায়গা আছে! দূরে বনমোরগ ডাক্‌চে। টাটা মাইনের blasting এর শব্দ হচ্চে। সাঁওতাল একজন যুবতী এতক্ষণে এক বোঝা কাঠ ও শালপাতা নিয়ে আস্‌চে জঙ্গল থেকে [,] বল্লে পাটকিটা থেকে আস্‌চি। আর একজন লোক, বল্লে নাম হারাণ, পাট্‌কিটা থেকে দুটো বলদের ঘাড়ে কাঠ চাপিয়ে ফিরচে। জাতে সাঁওতাল। বল্লে হাতী এখন নেই—আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র মাসে ধান পাক্‌লে ধানের ক্ষেতে নামে। পথে আমি অনেক জায়গায় বুনো হাতীর পায়ের দাগ দেখ্‌লুম। চাপ্‌ড়ি Stone Quarryর ওপারে পর্য্যন্তও আছে—বানা অর্থাৎ ময়ূর কুল গাছে পাকাকুল খেতে আসে রাত্রে। কুলামারা, পাট্‌কিটা গ্রামের লোকে বল্লে। কাছেই ওঁরাওগড় বলে একটা জায়গা আছে—সেখানে এখনও কোন্‌কালের তিন চার শো বছর আগেকার বন্য রাজার গড় ছিল। পাহাড়ের ওপর একটা মন্দির আছে—সেখানে তাদের নরবলি ও war dance হোত। বেশী আগে নয়—৫০ বছর আগেও হোত। বলে সেখানে ভূত আছে[২]। রাণীঝর্ণা বলে একটা ঝর্ণা আছে—সেখানে রাণী স্নান কর্ত্তেন। এখানে ময়ূরভঞ্জের

১ রূপান্তরে 'ঝোরা'? ছোটনাগপুর অঞ্চলের দ্রাবিড় ভাষাভাষী গোণ্ড বা গোঁড়দের একটি উপজাতি (sub-tribe) বিশেষ। এই মত ডাল্টনের। কিন্তু রাখালদাস হালদার মনে করেন, এরা নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু-কৈবর্ত্ত।

২ 'রঙ্কিণী দেবীর খড়্গ' (তালনবমী)।

দিকে বুনো বাইসনও আছে। তবে বন বড় deceptive in appearance থাকলেও বাইরে থেকে কিছুই বুঝবার যো নেই। এই যে জঙ্গলে আমি এখন বসে আছি—এটা বন্যজন্তুতে ভরা—অথচ এক ঘণ্টার ওপর বসে আছি—একটা বেড়ালও চোখে পড়ল না। অবিশ্যি সেজন্যে আমি দুঃখিত নই। খুব হতাশ হয়ে পড়িনি। এই বিপদের অনুভূতিটা কিন্তু থাকা ভালো—এটা একটা বড় আনন্দ দেয়। দূরে জঙ্গলের মধ্যে সাঁওতালেরা কাঠ কাট্‌চে—কুড়ুলের শব্দ হচ্চে সাম্‌নের পাহাড়টার ঘন জঙ্গলে।

বেলা একটা বাজে। একরকম পাখী ডাকচে বড় মধুর স্বরে [—] যেন দূরে কোথায় বাঁশী বাজ্‌চে। এক রকম পাখী ডাকচে পিড়িংপিড়িং—এই জঙ্গলের atmosphere টা ঠিকমত জানতে হবে। সাঁওতালদের প্রধান, ভূমিজ, টারবাঁরো, পাহাড়ের পেছনে সূর্য্যাস্ত—অধিত্যকার অপূর্ব্ব জ্যোৎস্না রাত—সিংভূম থেকে ময়ূর ভঞ্জ যাবার পথে ৬০/৭০ মাইল ব্যাপী নির্জ্জন প্রান্তর, নটরাজের ভঙ্গির গাছ, ডুমুরী[১] অর্থাৎ পাহাড়ের টিলা—তামার পাথর ও ম্যাঙ্গানিজ্—ময়ূর ও বন্যহস্তী—বড় বড় cave ও ঝর্ণা—হরীতকী, পিয়াল, শালমঞ্জরীর সুগন্ধ—পলাশের আগুন-জ্বলা বন রঙীন ধাতু প্রস্তর—জ্যোৎস্নালোকিত নির্জ্জন উঁচুনীচু দূরে দূরে পাহাড়শ্রেণী ও শাদা boulder ছড়ানো প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে রাস্তা এঁকে বেঁকে চড়াই উৎরাই এর মধ্যে দিয়ে সিংভূম থেকে ময়ূর ভঞ্জ চলে গেছে—নির্জ্জন প্রান্তরে লতাকাটি কুড়িয়ে রাত্রিযাপন—সাহস চাই—যদি কোনো prospector বা মাইন্ সার্ভেয়ার একাজে লাগে—তার তাঁবু চাই—অশ্বারোহণে কৃতিত্ব চাই। জঙ্গলের মধ্যে চাল্‌তে গাছের পাতার মত চেহারা—কলাপাতার মত বড় একধরণের কি গাছ লক্ষ্য করলুম—চন্দু নামে ওই সাঁওতাল ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলুম—নাম বলতে পারলে না। কি অনাবৃত পাহাড়ের দেহটা এই জায়গায়—তির্য্যগভাবে বেঁকে উঠেচে [—] বিরাট আদিম-যুগের প্রস্তর—অবশ্য এসব igneous rocks[২]—ধাতুপ্রস্তরবাহী স্তর মাত্রেই আগ্নেয়—অর্থাৎ পৃথিবীর আদিম যুগের গলিত ধাতু ঠাণ্ডা হয়ে এরকম হয়েচে।

সৃষ্টির বিরাটত্ব, cosmic scale এর বিশালত্ব—এইসব জায়গায় না এলে মানুষে বুঝবে কি করে? বাংলাদেশের নরম পুতুপুতু স্নিগ্ধ শ্যামল ভূমিশ্রীর মধ্যে

১ ডুমরী শব্দের অর্থ পাহাড়; তুলনীয়, 'ডুঙ্গর' (রাজস্থানী হিন্দী)। রূপান্তরে 'টুংরি'।

২ আগ্নেয় শিলা।

ফুলের গন্ধই অনুভব করা যায়—এসব বর্ব্বর সৌন্দর্য্য সেখানে নেই।

কিন্তু মনে হয়—এর কাছে বাংলার সৌন্দর্য্য লাগে না। তুচ্ছ হয়ে মিলিয়ে যায়। এর বিরাটত্বের কাছে বাংলার নদীবন মাঠের স্নিগ্ধ রূপ দাঁড়াতেই পারে না। কল্‌কাতা থেকে হঠাৎ দেশে গিয়ে প্রথম প্রথম বেশ লাগে—অন্য দেশের সঙ্গে তুলনা কর্ত্তে গেলে কিছু পাওয়া যায় না। তবে সৌন্দর্য্য মাত্রেই মন মুগ্ধ করে—যখন যেখানে থাকে মানুষে, তখন সেটাই ভালো লাগে।

আফ্রিকা, জাভা, সুমাত্রা গিয়ে কি হবে যখন কলকাতার এত কাছে এমন সৌন্দর্য্যভূমি রয়েছে?

নির্জ্জন দুপুর। ওপরে নীল আকাশ। দূর থেকে পাখীটার বাঁশীর মত ক্ষীণ সুর আসচে। সামনে বহুদূরে সুবর্ণরেখার ওপারে কালাঝোর পাহাড়শ্রেণী খররৌদ্রে ধূসর অস্পষ্ট দেখাচ্চে। ওর নাম কালাঝোর পাহাড়।

বেলা প্রায় দেড়টা। কি চমৎকার পাখী একটা ডেকে উঠল জঙ্গলের মধ্যে। বাবার সেই হিন্দী আখরে লেখা শ্লোকের কাগজখানা এইমাত্র আমার খাতা থেকে উড়ে যাচ্ছল—পড়লাম। সেই কতকাল আগেকার বারাকপুর গ্রামের জীবনযাত্রা মনে পড়ে। বাবা এইরকম দুপুরে ঘরে বসে লিখেছিলেন—আর আমি আজ সিংভূমের পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে বসে পড়চি। এতেই আমায় মুগ্ধ করে।

সইমা কালীপদকে খেপাতো—সে সব অদ্ভুত ধরণের কাজ করতো বলে—গুড় খেয়ে গর্ব্ব করতো—বড় মানুষী দেখাতো—সেই একটা জীবনের সময় গিয়েছে তা থেকে কি আনন্দই পেতাম। অনেকদিন পরে সেই কথা মনে পড়ল।

বড় জল তেষ্টা পেয়েচে। কিন্তু এ পাহাড়ের মাথায় জল কোথায়? পাহাড়ের গাছগুলি অতিপ্রকাণ্ড। বনস্পতি প্রায় সবই। এত বড় গাছওয়ালা পাহাড় আমি খুব দেখিনি।

আগে যেখানে বসে লিখছিলুম—সেখান থেকে আরও চলে এসে আর একটা অধিত্যকার ঘন বনছায়ার শিলাখণ্ডে বসে লিখচি। খুব ঘন অরণ্যবৃক্ষেভরা সানুদেশ পিছনে—পাতায় বড় খস্ খস্ শব্দ হচ্ছে। আমার ভালুকের ভয় এখনও যাইনি [যায়নি]। কেবলই চেয়ে দেখচি। এ জায়গাটার দৃশ্য আরও অদ্ভুত। আমার সামনে সুউচ্চ পাহাড়ের চূড়া ঘন বনে ভরা—বনস্পতি সমাকুল সানু-দেশ অতি বৃহৎ। কালো লম্বা কেঁদগাছের গুঁড়ি সামনে দেখা যাচ্ছে। বড় জল তেষ্টা পেয়েচে অনেকক্ষণ থেকে। কোথায় জল পাবো, কাছেই একটা

চারা গাছে আমলকী ফলেচে—গোটাকতক পেড়ে পকেটে নিলুম। দুটো খেলুম। এই জায়গাটা ছায়াচ্ছন্ন। বড় বেশী নির্জ্জন। শুধু পাখীর ডাক ছাড়া ও পত্র মর্ম্মর ছাড়া এই বিজন আরণ্যভূমিতে ও বনস্পতি সমাকুল সানুদেশে অন্য কোনো শব্দ নেই। কেবল দূরের Stone Quarry তে মাঝে মাঝে blasting operation এর আওয়াজ হচ্চি। কি গভীর শান্তি। কলকাতার স্কুলে এখন টিফিন চলচে।

যেখানে সেখানে লক্ষ শিলাখণ্ড—বসবার কি সুবিধে! বসে হেলান দেবারও সুবিধে আছে। অজস্র শিলা ছড়ানো সর্ব্বত্র।

পাট্‌কিটা গ্রামে কচড়া তেল বার করবার জন্যে দুখানা বড় কাঠের press বসানো। এরা মহুয়ার তেলেই রাঁধে। শুধু নুন লঙ্কা দিয়ে ভাত খায়। পাহাড়টা পার হয়ে একটা উপত্যকা। তারপর আবার একটা পাহাড়ের সানু। নির্জ্জন জঙ্গলে ভরা। রোদ চড়েচে—শুকনো পাতায় অদ্ভুত খস্‌খস্ মর মর শব্দ হচ্চে। এই ভীষণ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে অনাবৃষ্টি হয়—সর্ব্বত্র জল শুকিয়ে যায়, ঝরণা শুকিয়ে যায়—উত্তপ্ত পাথরের তাত—বৃক্ষ নিষ্পত্র—কালাঝোরের কাছে একটা পাহাড়ের খাদায় খানিকটা মাত্র জল থাকে—জ্যোৎস্নারাত্রে বাঘ, হাতী, বন-শূকর, নেকড়ে—সব জল খেতে নামে এমন কি একজন সাঁওতাল দেখেছিল বড় বড় পাইথন সাপ কাঠের গুঁড়ির মত পড়ে আছে ঠাণ্ডা কাদায়। গভীর জঙ্গল থেকে জল খেতে এসেচে। কাঞ্চনফুলের পাতার মত ঐ গাছটা খুব বেশী পাহাড়ের সর্ব্বত্র।

শুকনো পাতার গন্ধ বেরুচ্চে। বনের ওপারে চারিধারে সুউচ্চ পাহাড়—পাহাড়ের মাথার ওপরকার আকাশ কি অদ্ভুত ধরণের নীল! বলিহারী নির্জ্জনতা! মানুষের চিহ্ন কোনোদিকে নেই। গাছের তলা পরিষ্কার—শুকনো পাতা পড়ে রাশ হয়েচে—অথচ গাছ ঘন সন্নিবিষ্ট—বেশীদূর একসঙ্গে দেখা যায় না—ছোট বড় শিলাখণ্ডে ভর্ত্তি সবদিক—যেটার ওপর ইচ্ছে বসা যায় আরাম করে।

এতক্ষণ পরে মানুষের শব্দ পেয়েচি। সামনের পাহাড়ের ঢালুর জঙ্গলে কে কাঠ কাটচে—গাছের গায়ে কুড়ালের শব্দ হচ্চে।

আমরা বাংলাদেশের লোক। এ ধরণের পাহাড়, বন, শিলাময় ভূমি—এ ধরণের বনস্পতি কখনো দেখিনি।

এ ধরণের বন বাংলায় নেই। এখানে অত undergrowth নেই—

temperate forest and open Forest এখানে। অথচ বেশীদূর দেখা যায় না ঠিক। পাহাড়ের বিশালতা ও বিরাটত্বে এই অরণ্যভূমিকে অন্যরূপ দিয়েচে। বাংলায় বন তেমন কোথায়? যা আছে সে ঘন tropical ধরণের বটে—কিন্তু এমন বড় মাপকাঠিতে নয়। বন্য গজ দ্বারা যে বন অধ্যুষিত নয়, বাঘ ময়ূর, ভালুক নেই। সে অনেক ছোট scaleএ।

এ বনের অধিবাসীদের কী আসে যায় রাজ্য কখন কার হাতে গেল? যীশুকে যেদিন ক্রুশে বিদ্ধ করে মারা হোল বা অশোক যেদিন রাজা হলেন, সেদিনও সামনের পাহাড়টা অমনি দাঁড়িয়েছিল—তখনকার লোকে অমনি জঙ্গলে কাঠ কাটতো যেদিন আর্য্যরা ভারতে প্রথম প্রবেশ করলেন—সেদিনও এই সুদূর সিংভূমের জঙ্গলে. পাহাড়ের অধিত্যকায় অজ্ঞ জনসাধারণ এই ভাবেই জঙ্গলে ঘেরা শুকনো খটখটে গ্রামের মধ্যে এই ধরণের বিকেলে চ্যাটাই পেতে ধান রোদে দিত -কি শিকার করতো—কাঠ কাটতো—কুল শুকতো—জল আনতো—হাতী তাড়াতো—ভালুক মারতো—পাট্‌কিটার যে বুড়ীটার সঙ্গে আজ সকালে দেখা গেল—ওরি মত সরলপ্রাণ, মূর্খ জীবেরা এখানে সরলজীবন যাপন করতো। কে খবর রাখতো সুদূর খাইবার গিরবর্ত্ম দিয়ে কোন নতুন বিজেতার দল ভারতবর্ষে প্রবেশ করল কি না? সুবর্ণরেখা তখনও এমনি নিঃসঙ্গ নির্ব্বিকারভাবে বেয়ে [বয়ে] চল্‌তো—এইসব পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে—মাঝে মাঝে হয়তো পাহাড়ী রাজাদের গড় ছিল—এদলে ওদলে যুদ্ধ হোত। আর্য্যরা এলেই কি বা না এলেই কি? এরা তাদের গ্রাম বা পাহাড়টার ওপারের জগতের সংবাদই জান্‌তো না।[১]

জীবন এখনও এদের ক্ষুদ্র—অনেকে এই পর্ব্বত প্রাচীরবেষ্টিত উপত্যকা-ভূমির বাইরের বৃহত্তর জগতের খবর এখনও রাখে না—যেমন পাট্‌কিটায় ওবেলায় সেই অশীতিপর বৃদ্ধাটি।

রোদ রাঙা হয়ে আসচে। বেলা পৌনে তিনটে। আমি অনেকদূর এসে বসেচি [—] এ আবার আর একটা জায়গা। ও পাহাড়টা পার হয়ে এসেচি।

১ বিভূতিভূষণ তাঁর দিনলিপিতে বহু ঘটনার ও অনুভূতির নোট রাখতেন এবং সেগুলি অনেক সময় মূলের ভাষাসমেত ব্যবহার করতেন। দিনলিপির এই অংশটির সঙ্গে আরণ্যক-এর ষষ্ঠ অধ্যায়ের মিল লক্ষণীয়। তবে দিন-লিপিতে এই ভাবনা ইতিহাসের দিক থেকে কিছুটা অগোছাল এবং আকারেও ছোট; গ্রন্থে কিন্তু তা নয়।

এবার উঠে যাই। নইলে শীতের বেলা চলে যাবে। সুবর্ণরেখা পার হতে হবে সন্ধ্যার আগেই।

গাছের লম্বা লম্বা ছায়া পড়েচে। আকাশের রং হয়েচে অদ্ভুত ধরণের নীল। পৃথিবীর সৌন্দর্য্য অসীম। এক কথায় কি বর্ণনা করা যাবে। প্রকৃতির রূপের তুলনা নেই।

একটা কাঠঠোকরা পাখী আমার পেছনের একটা গাছে বসে ঠক্ ঠক্ করে গাছ ঠোকরাচ্চে।

এই বৈকালে আমাদের গাঁয়ের ছায়াভরা বাঁশবন ও ভিটের কথা মনে পড়ল—সেখানটার বরোজপোতার ডোবার ওপারটা আমার কাছে পাহাড় ও অজানা বনে ভরা রহস্যময় দেশ বলে মনে হোত—এখনও কিন্তু সেই রকমই আছে। বাল্যের সংস্কার হঠাৎ কি যায়? সেদিনই না বারাকপুরে গিয়ে সন্ধ্যায় বাঁশবাগান দেখে ভেবেছিলাম বনভূমি আজও সেই স্বপ্নমাখা—সেই কথা আজ এই সুদূর সিংভূমের জঙ্গলে বসে মনে হোল।

বারাকপুরের প্রতি ধূলিকণা স্মৃতিমাখানো, করুণা, অশ্রু, স্নেহ মাধুর্য্যে ভরা—সেইজন্যে বারাকপুরের সব ভালো লাগে আমার কাছে।

আর এক জায়গায় এসে বসেচি পথে। চারিধার থেকেই অদ্ভুত দেখায়—যেখানে যাই মনে হয় এটাই ভালো—এখানে একটু বসি। সামনে ওই সিদ্ধেশ্বর পাহাড়—ডাইনে এটার নাম মহাদেব ডুংরি range. রোদ রাঙা হয়েচে।

যাই এবার উঠি, বেলা গিয়েচে।

রোদ রাঙা হয়ে এল।

এই নীলাকাশ অপূর্ব্ব, এই বনভূমি অপূর্ব্ব, এই অশোকের সময় থেকে কিংবা যীশুর ক্রুশে বিদ্ধ হওয়ার দিনটি থেকে, বা বুদ্ধের গৃহত্যাগের দিনটির থেকেও বহু আগে থেকে দাঁড়িয়ে থাকা এই পাহাড়শ্রেণী অপূর্ব্ব।

গত চারহাজার বছরে এই বনভূমিতে কত মানুষের বংশ, বন্যহস্তীর বংশ, বাঘ ভালুকের বংশ, গাছপালার বংশ, গায়ক পাখীর বংশ জন্ম নিয়েচে—তাদের কাজ করেচে—কোথায় মিশিয়ে গিয়েচে—কিন্তু এই পাহাড়—ওই নীলাকাশ ঠিক আছে।

ছায়াচ্ছন্ন বৈকাল। উঠতে ইচ্ছে করচে না—তাই আবার বসেচি। পথের ধারেই এক শিলাখণ্ডে ঠেস্ দিয়ে বসে পড়েচি—এখানে ধূলো নেই [—] বসবার জায়গা সর্ব্বত্র।

রোদ রাঙা হয়ে এসেচে—এই সময়ে কালীপদদের বাড়ী কুঠীর মাঠে যেতো। আমিও অনেককাল আগে এমন একদিনে জ্যাঠামশায়ের[১] সঙ্গে সরস্বতী পুজোর দিন প্রথম দূরে অর্থাৎ কুঠীর মাঠেই কুল খেতে গিয়েছিলুম। [২]

এই বৈকালটীতে সেই সব পুরোনো কথা মনে পড়চে।

বেলা ৪॥০ টা। রোদ রাঙা হয়ে পর্ব্বতচূড়ায় গাছগুলোর মাথায় পড়েচে। পাহাড়ের ওপর খানিকটা উঠে একটা প্রশস্ত শিলাখণ্ডে বসেছি ঘন বৈকালের ছায়ায়।

অনেকদিনের সাধ মিট্‌ল—অনেককাল থেকে ইচ্ছে ছিল—ভাগলপুর থেকে কিউল হয়ে ফেরবার দিনগুলো থেকে শিমূলতলায় বন দেখে ভাবতুম এই সব নির্জ্জন জঙ্গলে, রাঙা রোদ-ভরা বিকেলের ছায়ায় বসে থাকতে কেমন লাগে? আমি বৈকাল ভালবাসি বড়—আর ভালবাসি জ্যোৎস্না রাত। আজ এই পাহাড় জঙ্গলে বৈকাল দেখবো বলে বেলা দশটা থেকে সারাদিন কাটালুম এই বনে, জঙ্গলে, পাহাড়ের উপত্যকায়, অধিত্যকায়। সেই রাঙারোদমাখানো বিকেল নেমেচে ওই পাহাড়ের বনে, উপত্যকায়, গিরিসানুর বনস্পতিশীর্ষে। কি সুগভীর ছায়া পাহাড়ের ঢালুতে—কি শান্তি চারিধারে।

তাই বল্‌চি অনেকদিনের সাধ্ মিট্‌ল। বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে এসেচে। বনের শান্তি ও নির্জ্জনতা গভীরতর হোত যদি না এখনও দূরে B ও L Quarryতে blasting এর আওয়াজ না কানে আসতো।

এইখানে বসে যত চমৎকার জায়গা যেখানকার বিকেল আমি ভালবাসি মনে পড়চে—যেমন খয়রামারি মাঠ, আমাদের বাড়ীর বাঁশতলা, দারিঘাটার পুল—রাজনগরের[৩] খড়ের মাঠের বটতলা, ইসমাইলপুরের মাঠ, আজমাবাদ ওই সব।

এইসব সন্ধ্যায় ইসমাইলপুরের দূরের রাঙারোদমাখানো কাশের বনের দিকে চোখ রেখে Wide World Magazine পড়তুম—সেও অপূর্ব্ব।

---

১ বরদা মুখোপাধ্যায়, বারাকপুরবাসী। এঁর স্ত্রী 'সইমা', মেয়ে পুঁটি'।

২ সরস্বতী পুজোর দিনের এই ঘটনাটি বিভূতিভূষণ তাঁর একাধিক দিনলিপিতে উল্লেখ করেছেন। (দ্রঃ স্মৃতির রেখা, ২৭. ১. ১৯২৮; তৃণাঙ্কুর, চতুর্থ মুদ্রণ, পৃঃ ২) এই প্রসঙ্গে পথের পাঁচালীতে অপুর নীলকণ্ঠ পাখি দেখতে যাওয়ার ব্যাপারটিও স্মরণীয়। (দ্রঃ সপ্তম পরিচ্ছেদ)

৩ বনগাঁ থানার অন্তর্গত গ্রাম।

বিশ্বরূপ অনন্ত—তারই একমূর্ত্তি দেখেচি কুঠীর মাঠে, ইচ্ছামতীর তীরে—একমূর্ত্তি দেখ্‌চি সিংভূমের পাহাড় জঙ্গলে।

আর একটা পাহাড়ের ঢালুতে উঠেচি।

ফেরবার পথে প্রথমটা যে শিলাখণ্ডে ঠেস্ দিয়ে বসেছিলুম—সেখানে এসে বসলুম। চেয়ে দেখলাম ওপারের ছায়া পড়ে গেছে। কালাঝোর পাহাড়ের পেছনে আরও পাহাড় দেখলুম—মৌভাণ্ডার তামার কারখানা ও ঘাটশিলার সাদা সাদা বাংলোগুলো দেখলুম। তারপরে নীচে নামলুম। সন্ধ্যা একেবারে হয়ে গেছে। মাটীর চমৎকার রোদপোড়া গন্ধ—সেই সেবার যেমন বেলপাহাড়ে বেরিয়েছিল তেম্‌নি বেরুচ্চে।

অফুরন্ত শালের বন ছায়াভরা—সন্ধ্যা হয়ে গেল—কুমীরমুড়ী গ্রামের কাছে এসে জিগ্যেস করলুম এটা কোন্ পথে যাবো গালুডিতে। একজায়গায় এসে দেখি কোথায় পথ হারিয়ে ফেলেচি—সুবর্ণরেখার ধারে আর কিছুতেই পৌঁছুতে পারিনে। অন্ধকার হয়ে গেছে, কিছুই দেখতে পাইনে—দীঘ্‌ড়ি গ্রামটাই বা কোথায়? সুবর্ণরেখার ধারে একজায়গায় এসে দেখলুম খাড়া পাড়—জলে নামা যায় না—আবার ফিরে গেলুম। গাড়ীর পথ ধরে সুবর্ণরেখায় নামি। যত যাই, ততই জল বেশী। খরস্রোতা নদী—অতিকষ্টে পথ ঠিক করে পার হলুম। এখন রাত আটটা। সন্ধ্যে ৭॥০ টায় বাংলোতে ফিরেচি।

৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ২৬শে মাঘ, ১৩৪০। শুক্রবার[১]

আজ খোঁড়া পা একটু সেরেচে। স্টেশনের কাছে একটা পাথরের ওপর বসে ছিলুম। কর বাংলোর একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হোল। তিনি চাপ্‌ড়ী খনির foreman-in-charge. তিনি কাল মহাদেব ডুংরীর ওপর উঠেছিলেন—সদ্য হাতীর নাদ দেখতে পেয়েচেন বল্লেন। তাঁরই মুখে শুনলুম রাজখর্সাওন স্টেশান থেকে নোয়ামুণ্ডি লাইন বেরিয়ে গিয়েচে—ওটা ভয়ানক জঙ্গল আর পাহাড়। ওটা সারেণ্ডা ডিভিসনের অন্তর্গত [—] ওর জঙ্গল সিংভূমের বিখ্যাত জঙ্গল। নোয়ামুণ্ডি স্টেশান থেকে টাটা কোম্পানীর ক্যাম্প কিছু দূরে। বিভূতি মিত্রের নাম করাল ট্রলি পাওয়া যায়। মহাদেবনাশা বলে শিব আছে একটা জলপ্রপাতের কাছে। ২॥০ মাইল দূরে। আর মনোহরপুর স্টেশান থেকে দুধিয়া মাইন ও চিড়িয়া মাইন আছে Bengal iron Coর. —সে ভয়ানক জঙ্গল। পাথরপাশা বলে স্টেশান আছে—সেখানে রাত্রে বন্যজন্তুর

১ বিভূতিভূষণের স্বহস্ত লিখিত, তারিখ, '৯-২ ৩৪'।
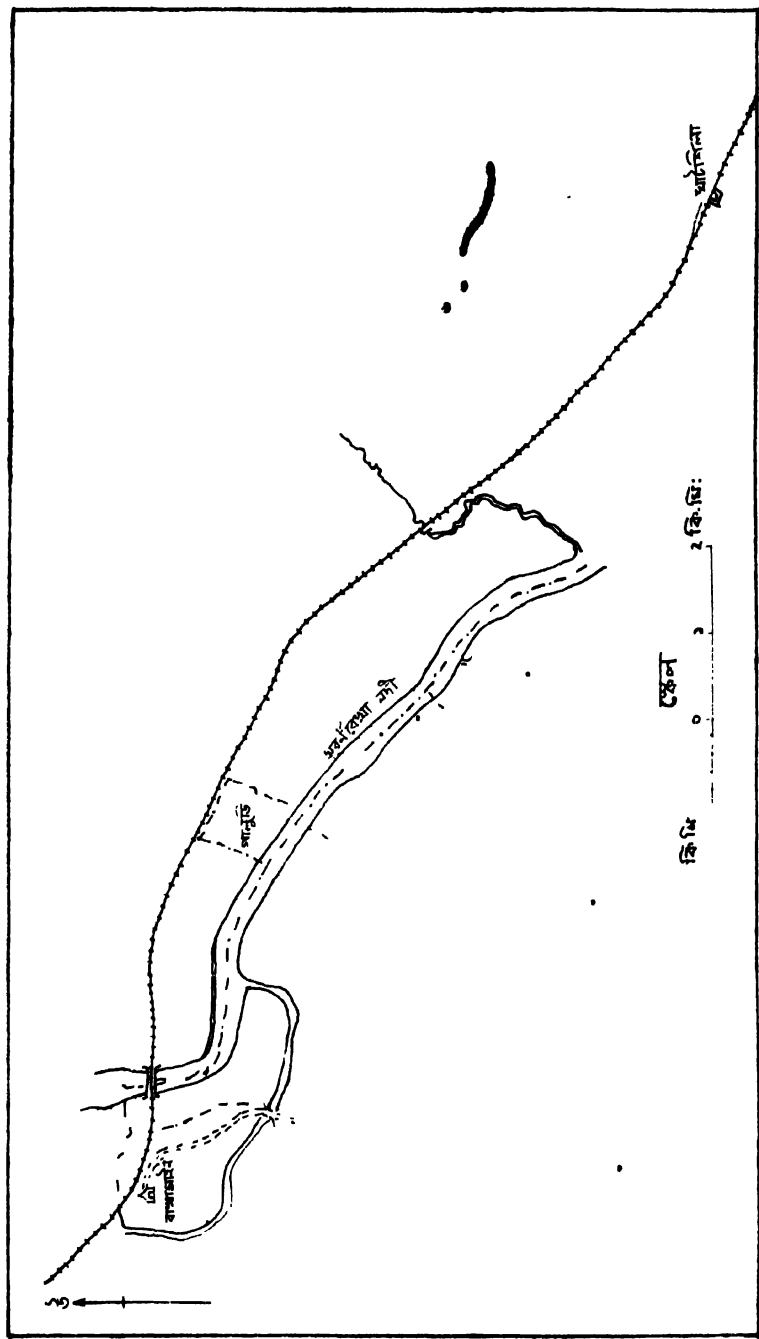
১৭।২।১৯৩৪ (অতিরিক্ত) : রাখামাইনস্ অঞ্চলের মানচিত্র

উঃ
কলাঝোড়
বামুনডেরা
ভুস্কাডি
ফুলপাল
ঝাঁকড়ীগোল
জং
ঘাটশিলা
সুবর্ণরেখা নদী
স্কেল
কি.মি. ১ ০ ১ ২ কি.মি.
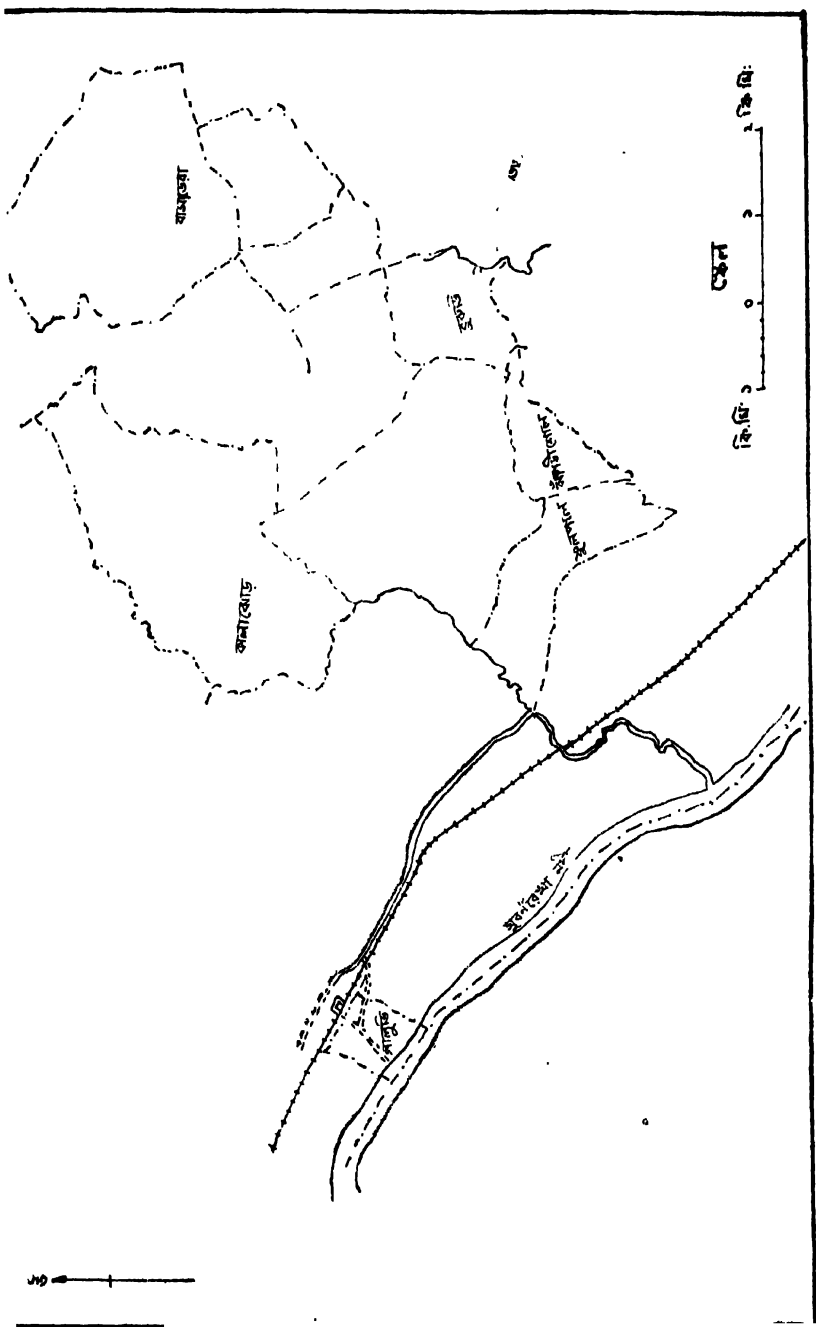
ভয়ে লোক থাকে না। ট্রলি লাইন আছে—মনোহরপুর থেকে পাওয়া যায়। Railway manager আছে Henry সাহেব—তাকে বল্লে পাঠিয়ে দেয়।

টাটানগর থেকে গুরুমৈশানি যে লাইন গেছে—তারই প্রথম স্টেশান হলুদপুকুর—তার কাছে বামুনহাটি বলে গ্রাম আছে। খুব সুন্দর। পাহাড়ের মধ্যে। সাঁওতাল ও কোলের[১] বাস। জঙ্গল নেই, উষর [উষর] পাহাড়।

মহাদেবডুংরি পাহাড়ের ওপর শিবমন্দির আছে—গুহা দিয়ে সেখানে ঢুকতে হয়। দৃশ্য বাস্তবিক অপূর্ব্ব। নীচেই রাণীঝর্ণা ও ঔরাওগড়।

বরাহভূমের জনকতক লোকের সঙ্গে আজ সকালে দেখা হোল—তারা বল্লে ওদিকে পাহাড় নেই। টাটানগরের পিছনে যে দলমা পাহাড়শ্রেণী তারই পূর্ব্বপ্রান্ত এসে মিশেচে কালাঝোর পাহাড়শ্রেণীতে। যা জঙ্গল এখানেই। ওরা বলরামপুর স্টেশনে যায়। মহালিখারূপ স্টেশনে নেমেও যাওয়া যায়।

১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ২৯শে মাঘ, ১৩৪০। সোমবার[২]

নিস্তব্ধ দুপুর। শিবরাত্রির উপবাস করেচি বলে চুপচাপ শুয়েই আছি। কাল সন্ধ্যায় ডুংরি পাহাড়ের ওপারে একটা শিলাখণ্ডে চুপচাপ বসে ছিলুম। রবিবারে আমাদের দেশে হাট, তা ছাড়া এই প্রথম বসন্তে কত আমের মুকুল হয়েচে, ঈষত্তপ্ত দুপুরের বাতাস, বৈকালের ছায়া আমের বউলের গন্ধে মাদর—সেইসব কথা ভাবছিলুম। বেলেডাঙার পথের বড় বড় অশথ বট গাছের তলা দিয়ে লোকেরা হাট করে ফিরচে। গঙ্গাচরণ দোকানে বসে তেলের বোতলে

---

১ ছোটনাগপুর অঞ্চলের অস্ট্রিক ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী। সংস্কৃতে জনগোষ্ঠীবাচক নাম হিশেবে 'কোল্ল' শব্দ পাওয়া যায়; অর্থ সম্ভবতঃ মনুষ্য। কোল <কোল্ল<*কোড়। বিহারি হিন্দীতে 'কোড়ী' শব্দের অর্থ কুড়ি। (হাত-পায়ের সমস্ত আঙুলের সংখ্যাও তাই; অর্থাৎ পূর্ণ মানব।) 'ক' স্থানে 'হ' হয়ে সম্ভবতঃ সাঁওতালী 'হড়' এবং মুণ্ডারী 'হোড়ো' ও 'হো' শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। সবগুলিরই অর্থ মনুষ্য। অস্ট্রিক ভাষায় পুরুষ ও স্ত্রী অর্থে যে 'কোঅ' এবং 'কোই' শব্দ ব্যবহৃত হয় তারও মূলে আছে 'কোড়া' এবং 'কুড়ী'। (বিভূতিভূষণের দিনলিপিতে এবং 'বোতাম' নামে একটি গল্পে 'কুই' শব্দটি আছে —সামান কুই, এলিশাবা কুই।)

২ বিভূতিভূষণের স্বহস্ত লিখিত তারিখ, '১১-২-৩৪। সোমবার।' সোমবার ১১ নয়, ১২ তারিখ। দিনলিপি সোমবারেরই। কারণ পাঠে এক জায়গায় রয়েচে 'সোমবার বনগাঁয়েরও আজ হাট।'

তেল ভর্ত্তি করচে। সত্যি! এমন আনন্দ পাই এসব কথা ভাবতে!

সূর্য্য মহাদেবভুংরী পাহাড়ের নীচে ডুবে গেল। আকাশ ভরা অস্ত দিগন্তের আভায় আমার পাশের পাহাড়টার বিশাল ঢালুটা রাঙা হয়েচে—অথচ অন্ধকার হয়ে গিয়েচে বল্লেই হয়—বাংলাদেশে এতক্ষণ থাকে না অস্ত আভাটুকু। একটা নক্ষত্র উঠেচে, পাহাড়ের মাথায়—ওই দুটো। ওদের চারিপাশের জগতে না জানি কত অজানা রহস্য, কত জীব—যুগে যুগে যে জীবন আর তাদের ভয়ই বা কি?

আজ স্নানের সময় তেল মাখতে মাখতে গুনগুন করে গান করছিলুম "পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিনমধুনা"[১] ওই সব শৈলশ্রেণী, শালবনের দিকে চাইলে কত পুরানো কথাই মনে পড়ে।

তবুও মনে হয় আমার গ্রাম শতমধুরকরুণ সুখদুঃখময় স্মৃতিতে ভরা আমার কাছে। সেই দিনের বাঁশবনে সেই যে মনে হয়েছিল 'বনভূমি আজও সেই স্বপ্নমাখানো'—সত্যিই তাই। সে স্বপ্ন কখনো পুরোনো হোল না, হবেও না আমার কাছে।

অন্ধকার রাত এখানে অপূর্ব্ব। কত জলজলে নক্ষত্র—কাল আমি ও ডাক্তারবাবু যখন পাথরের ওপরে বসে গল্প করচি—সুবর্ণরেখার ওপারের পাহাড়ে দাবানল জলছিল—অনেকরাতে একবার উঠে দেখি তখনও জলচে। ওদিকে পাহাড়ের পেছনে টাটানগরের blast furnace এর glow বড় চমৎকার দেখায়।

দেশের জন্যে এখানে যে চমৎকার homesickness অনুভব করা যায়—কলকাতায় হয় না। অনেকদিন পরে এই homesickness অনুভব করলুম। ইসমাইলপুরের পরে আর এমন হয়নি। এবার শুধু বারাকপুরের জন্যে নয়—আমাদের দেশ—বনগাঁ, গোপালনগরের জন্যেও হয়। কলকাতার জন্যেও মন কেমন করে। কল্‌কাতার গলিঘুঁজি, স্কুল, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি, সভাসমিতি সবটার জন্যে।

বেলা ৫॥० টা। হাট থেকে পাকা কুল, কেঁদ্‌ ও পেয়ারা কিনে এনে রেলের ওপাশে বিস্তৃত পুকুরটার পারে বসে খেলুম। পাহাড়ের ওপারে সূর্য্য অস্ত যাচ্চে। রাঙারোদ—সামনে জলের ওপরে মেঘের ছায়া পড়েচে—পাহাড়ের

---

১ উত্তররামচরিত ২। ২৭। 'পুরা যত্র স্রোতঃ, পুলিনমধুনা তত্র সরিতাং'—আগে যেখানে ছিল নদীর স্রোত, আজ সেখানে চড়া।

কোলে সাদা বক উড়ে যাচ্চে। দিব্যি তৃণাবৃত ঢালু জমিতে বসে লিখচি। একদিকের উঁচু পাড় ভাগলপুরের ? সেই বাঁধের কথা মনে করিয়ে দেয়। ওপারের পাহাড়শ্রেণীর উপর ছায়া পড়ে বড় চমৎকার দেখাচ্চে। এখানকার সব জায়গাই beauty spot [—] ভাগলপুরের মত সেই একটা রেলের ক্যালভার্টটা তার-ঘরের পাশে, আনাচে কানাচে যেমন শিলাবেদী ছড়ানো তেমনি beauty spot ছড়ানো। হাট থেকে এই সব সাঁওতাল মেয়েরা স্বর্ণরেখা পার হয়ে চিমড়ি গ্রামের রাস্তা ধরেচে। এইমাত্র সূর্য্য অস্ত গেল। এখানে দিগন্তের আভা অনেকক্ষণ থাকে। বাঁধের ওপারে হাঁস ডাকচে। এখানকার এই জায়গাটা বাংলাদেশের মত অনেকটা। শিবরাত্রির উপবাস করেছিলুম—বেজায় খিদে পেলে—বাধ্য হয়ে হাটে এসে ফল কিনে খেলুম। বনগাঁয়েরও হাট। গন্‌শা মুচি গাড়ী নিয়ে এসেছিল বোধহয়।

১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ২রা ফাল্গুন, ১৩৪০। বুধবার[১]

আজ দেখি পাহাড়ের ধারে আসানবনীর সেই হলুদফুল ফুটেচে—কি চমৎকার দেখায়। পাহাড়টার এপাশে রাঙামাটি ও শালবনে বেড়ানর সখটা অনেকদিন পরে প্রাণভরে মিটলো। একটা গাছ পাহাড়ের চূড়ায় পূবদিকের আকাশের পটভূমিতে পত্রহীন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে—কি চমৎকার ছন্নছাড়া নৃত [নৃত্য] শীল নটরাজের মত উদাস, সৃষ্টিছাড়া গোছের দেখায়। আমি এই যেখানে বসে লিখ্‌চি এখন থেকেই পাহাড়ের সেই গাছটা দেখা যাচ্চে। সামনে রাখা মাইনের পাহাড়ে কোথায় মেঘের ছায়া কোথাও রৌদ্রের খেলা। অনেকদিন Geographical magazine[২] পড়ে যে সখ ছিল ওইসব অনুর্ব্বর মরুদেশের ওইসব গাছ দেখ্‌বার—tales of lonely trails বলে বই খানা পড়ে যে ভাবটা জেগেছিল—দেখ্‌লুম সে সব স্থান ভারতবর্ষে অভাব কি—কলকাতার এত কাছেই আছে। সমগ্র ময়ূরভঞ্জ, কেউঞ্ঝর, সিমলাখালি পাহাড়, বাসড়া—ছোটনাগপুর ও C. P. র বনভূমি যদি বেড়ানো যায়—তবে তার অভাব কি ?

কলকাতা থেকে week end ২॥৶০ খরচ করলেই গালুডিতে এসে দুদিন থাকা যায় ও সহরের একঘেয়েমি কাটিয়ে যাওয়া যায়। রাজখর্সাওন থেকে [.]

১ বিভূতিভূষণের স্বহস্ত লিখিত তারিখ, '১৪. ২. ৩৪, ২রা ফাল্গুন।'

২ The Geographical Magazine। লণ্ডন থেকে প্রকাশিত মাসিকপত্র; প্রথম প্রকাশকাল ১৯২৭।

নোয়ামুণ্ডি বা মনোহরপুর থেকে ত্বধিয়া মাইন যাওয়া যায়। কুলামাড়ো [১] পাট্রকিটা যাওয়া যায়। কত নিকট!

১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ৫ই ফাল্গুন, ১৩৪০। শনিবার[১]

বেলা ৬টা রাখা মাইনস্‌ বৈকাল—রাখা মাইনে বসে লিখ্‌চি। কি অদ্ভুত দৃশ্য জীবনে কখনো ভুল্‌বো না—এক সাধুর আশ্রমে বসে আছি। পাহাড়ের অধিত্যকায় শুষ্ক বনতুলসীর—জঙ্গল। ধাতুপ ফুল[২] ফুটেচে যেন ডাল ভরে গিয়েচে—মধুতে ভরা। ঝাড়লে মধু পড়ে। বিরাট সমতলভূমি—কি উচ্চ পাহাড়, চারিধারে অভ্র, তামা পাথরের ছড়াছড়ি। বিরাট অধিত্যকায়—অপরাহ্নের ছায়া নেমে এসেচে। পাহাড়ের অধিত্যকা বৃক্ষে ভরা—পাহাড়ের সুউচ্চ মাথায় রাঙা রোদ। দুটো পাহাড়ের মধ্যে উপত্যকা। বড় পরিত্যক্ত চিম্‌নীর পাশে একটা পত্রহীন বৃক্ষে হলুদ ফুলে ভরা - আসনবনীর সেই ফুল। এ সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করি এমন ক্ষমতা নেই। পাঞ্জাবী সাধুনী এখানে একা থাকেন পরিত্যক্ত magazine এ। তাঁর কাছে এসে গল্প করচি, আমি, মাদ্রাজী কবিরাজ ও ডাক্তার। দূরে নীল পাহাড়শ্রেণী। এক জায়গায় তামা পাথর ধুয়ে নদী বয়ে আসচে—হীরাকস্‌[৩] রংএর জল—কি অদ্ভুত স্থান।

ঘেঁটুফুল দেখ্‌লুম রাখা মাইনে—সেদিন পাহাড়ে যে রূপ দেখেছিলুম রাখা মাইনের সৌন্দর্য্য তার চেয়ে বেশী।

পোসোইতা। ১৭-২-৩৪।

আজ সকালে গালুডি থেকে এখানে এসেচি ও ঘন জঙ্গলে চাইবাসা রোডের ধারে বসে লিখ্‌ছি। বড় ঘন বন, মন চোখ বসে। কত কি অপরিচিত পাখী ডাক্‌চে। একটী লোক নেই কোনো দিকে। বনস্পতি গাছ সব দিকেই। বাতাসে আর্দ্রতা কেমন একটী। এত বেলা হয়েছে—ন'টা বাজে—এখনও রোদ ওঠেনি ঘন অরণ্যের মধ্যে ভাল করে। একজন মুণ্ডা Forest Officer এর সঙ্গে দেখা হোল। সে বল্লে এটা আর কি জঙ্গল? ৮।১০ মাইল 'ভেতরে জঙ্গল আরও ঘন। এটা Protected forest—সেটা Reserve Forest. গাছ কি কি

১ বিভূতিভূষণের স্বহস্ত লিখিত তারিখ, '১৭.২.৩৪'।

২ ? ধাই বা ধাতুলি ফুল/Woodfordia fruticosa Kurz.। সংস্কৃতে ধাতুপুষ্পী।

৩ Green Vitriol।

আছে? বল্‌তে বল্লে কেঁদ, শাল, গামারা,[১] আসান, পিয়াল ইত্যাদি। কেঁদই ওখানে বনস্পতি—সুদীর্ঘ, কালো গুঁড়ি। হরিণ আছে, হাতী আসে কেউঞ্জর স্টেটের অরণ্য থেকে।

এখানে গিরীন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় বলে এক ভদ্রলোক থাকেন—বাড়ী ধর্ম্মদহ, নদীয়া। তাঁর এখানে বাড়ী আছে। যদি এখানে আসি, তিনি সন্ধ্যায় নিমন্ত্রণ করলেন।

মাঝে মাঝে জঙ্গল খুব ঘন, মোটা মোটা কাষ্ঠময় লতা ও গড়ান্[২] গাছ (যার পাতা কাঞ্চন ফুলের মত) অত্যন্ত বেশী। অন্ধকার ও আর্দ্র—undergrowth ও আছে। চাঁইবাসার পথটা অত্যন্ত বাঁকা বাঁকা এবং রাঙা ধুলোয়।

১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ৬ই ফাল্গুন, ১৩৪০। রবিবার[৩]

একটা ছোট পাহাড়ের ওপরে উঠেচি—চাঁইবাসা রোডের ধারে। সেটার উপর বসে লিখ্‌চি। আজ হাটে এতক্ষণে দারিঘাটা পুলের কাছ দিয়ে শ্যামাচরণ দাদা হাট করে যাচ্চে। সন্ধ্যা হয় হয়। The whole hill is alive with a sort of insects এবং বোধহয় একটা সাপ দেখেছিলাম।

ভয় হোল—পাহাড়টা wild, কাঁটাগাছ, পিয়াল ফুলের গাছ, পটুপটি ফলের[৪] মত ফল ধরেচে এম্‌নি একটা ঝোপ—এই সবে ভর্ত্তি—বড় দুর্গম, বড় বড় শিলাখণ্ডে ভর্ত্তি। চারিধারের দৃশ্য বড় অপূর্ব্ব। দূরে মৌভাণ্ডা কারখানার চিম্‌নী—ঐ আমাদের বাংলার একটুখানি দেখা গিয়েচে। ভারী সুন্দর ছায়া। আজ আমাদের গোপালনগরের হাট—সেকথা মনে হোল। গৌরী যেন শিলাখণ্ডে পাশেই বসে আছে। নেমে এসে সুন্দর শালবনের পাশ দিয়ে রাস্তার ধারে——সেদিনকার সেই শিলাখণ্ডে বস্‌লুম। বড় ভাল লাগলো। একফালি চাঁদ উঠলো—জ্যোৎস্না উঠল। দুজন লোক আসচে শোলা নিয়ে, বাড়ী তাদের কুল্‌ডিহা—রাখা মাইন্‌স্ স্টেশনের সাম্‌নে। তারা হেঁটে আস্‌চে চাকুলিয়া থেকে, এখান হতে ১৭ ক্রোশ দূরে। বাসার বাইরে এসে চেয়ার পেতে বস্‌লুম—ইসমাইলপুরের রাত্রিগুলোর কথা মনে হোল। এই চেয়ারখানা হয়ে পর্য্যন্তই

১ ? গামারী/Gmelina arborea Linn.। সংস্কৃতে গাম্ভারী, ভদ্রপর্ণা।

২ ? গোড়ান/Ceriops tagal (Perr.) C. B. Robins.

৩ বিভূতিভূষণের স্বহস্ত লিখিত তারিখ, 'রবিবার। সন্ধ্যা ১৮-২-৩৪।'

৪ Limnanthemum cristatum Griseb। বাঙলায় অপর নাম পাঙ্কুলী, চাঁদমাল। পূর্ববঙ্গে বলে পটপটি।

ঘোরাচ্চে।

An adventure on a hill of singbhum. a plot for study.

ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা পাহাড়টার কাছের রাস্তায়—তিনি আমায় খুঁজচেন কিন্তু আমি তা চাইনে। বেড়াবার সময় নির্জ্জনতা পছন্দ করি।

২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ৮ই ফাল্গুন, ১৩৪০। মঙ্গলবার[১]

আজ সকালে গরুর গাড়ীতে দু'ক্রোশ দূরবর্ত্তী দীঘাগড়ার পাথর খাদানে গিয়েছিলুম, এইমাত্র আসচি। পথে বুরুডি, ঝাঁপড়ীশোল, ফুলপাল, রামচন্দ্রপুর, বাদাডেরা, মৃগীচামী প্রভৃতি অরণ্যপাহাড় বেষ্টিত সাঁওতালী গ্রাম পার হয়ে গেলুম। এই পাহাশ্রেণীর নাম কোথাও বেল্‌ডাহি, কালাঝোর, শুক্‌না ইত্যাদি—ওদিকে পাহাড় অনেকদূরে চলে গিয়েচে, বন যেমন ঘন, দৃশ্যও তেমনি অপরূপ। পথে কুল খেতে খেতে গেলুম। এক জায়গায় শুকনো পাতা জ্বালিয়ে বৈকালে জঙ্গলের মধ্যে চা খেলুম। একটা গাছের খুব বড বড় কুল পেড়ে নিয়ে এলুম। আজকাল মহুয়া ফুল ও কুলের সময়—সন্ধ্যার পরে বনের পথে ভালুকের সন্ধান মেলে। জ্যোৎস্নার আলোতে ফুলপাল গ্রামে সন্ধ্যার সময় আজ সাঁওতালেরা কি একটা বাজিয়ে আনন্দ করছিল। আমরা সকালে সেই যে একটা গাছে কুল খেয়েছিলুম, দেখে একটি সাঁওতালের মেয়ে হেসেছিল—সেখানে যখন এসেচি—তখন পাহাড়ে দাবানলের দৃশ্যটী কি অপূর্ব দেখাচ্ছিল। বৈকালে এক জায়গায় শালবনে কঠিন মরুম কাঁকরের ওপর পাটনার সতরঞ্চিটা পেতে খাবার খেলুম।

২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ৯ই ফাল্গুন, ১৩৪০। বুধবার[২]

সকালে এসেচি। মহাদেবডুংরির মাথার ওপর বসে লিখচি। শিখর দেশ অত্যন্ত দুরারোহ। আর বড় জঙ্গল। মাথার ওপর ভালুকের নাদ দেখতে পেলাম। একটা কতকালের শিবমন্দির আছে। দুটো গুহা দুদিক দিয়ে তার মধ্যে গিয়েচে। দূরে সুবর্ণরেখা চলে গিয়েচে—মৌভাণ্ডার দিকে। চাঁইবাসার কাল রাস্তা পাথর খাদানের তলা দিয়ে চলে গিয়েচে। Tales of lonely trails যখন পড়তুম তখন এইসব বন জঙ্গলের কথা ভাবতুম—এতদিনে সার্থক হোল। এবার বনজঙ্গলের অভিজ্ঞতা হোল যথেষ্ট।

১ বিভূতিভূষণের স্বহস্ত লিখিত তারিখ, '২০-২-৩৪'।

২ বিভূতিভূষণের স্বহস্ত লিখিত তারিখ, '২২-২-৩৪ (বুধবার)। বেলা ১০টা'।

পাহাড়ের মাথায় খানিকটা সমতল ভূমি [—] তবে বড় বড় ঝামাপাথরে ভরা। জায়গায় জায়গায় ধ্বস (ধস) নেমেচে। একটু জল নেই কোথাও। রৌদ্রদগ্ধ বৃক্ষপত্রে হাওয়া লেগে শন্ শন্ করে শব্দ হচ্চে—টুপটাপ খস্ খস্ করে ঝরা-পাতার শব্দ। এইমাত্র দুটো বন মোরগ দেখেচে আমার সঙ্গে সাঁওতাল ছোঁড়াটা [—] ওর নাম আনাৎ। সেদিন এই পাহাড়ের মাথাতেই তারাপদ বাবুরা বুনো হাতীর নাদ দেখেছিল। আমি অবিশ্যি কিছু দেখিনি। খেঁকুড়া, আস্কাল[১] বলে পাখী আছে—একটা সাঁই করে উড়ে গেল—বাজপাখীর মত শিকারী। হরিণ আছে।

সিদ্ধেশ্বরডুংরি অর্দ্ধেকটা উঠেচি। আর উঠবো না ভাবচি। ঘন কেঁদ, পড়াশী[২], পলাশ, শালের জঙ্গল। পথে একটা ভালুক ঝোড়[৩] অর্থাৎ ভালুকের গর্ত্ত দেখা গেল। মহাদেব ডুংরিতে এইমাত্র ছায়ায় বসে আছি—ওদিকে ভালুকের শব্দ হোল—খেঁড়লোকে[৪] ভালুক তাড়াচ্চে [—] আমার সঙ্গের লোকটা বল্লে। চারিধারের দৃশ্য অতি অদ্ভুত—তবে বড় বড় বনস্পতিতে দৃষ্টি আটকেচে—দুপুরবেলায় বেশ ছায়া। সিদ্ধেশ্বর ডুংরি এখনও আর অনেকটা উঠতে হবে। আমরা যেন দেবতা—মর্ত্ত্যলোকের কেউ নই এমন দেখাচ্চে। যখন মহাদেবডুংরির ধার থেকে দূরে সুবর্ণরেখাকে রাঁচির দিকে বেঁকে যেতে দেখলাম ও বাঁয়ে রাখামাইনের চিমনী ও খাদ দেখলাম সে একটা experience of a life tonic!

অবশেষে সিদ্ধেশ্বর ডুংরীতে উঠলাম। যেমন দুরারোহ, তেমনি বনস্পতি সমাকুল, খাড়া steep grade—দুর্গম জঙ্গল। কাটাগাছ অনেক বেশী। ওঠা যে কি কষ্ট! তার ওপর বেলা ১২টা বেজেচে। তেমনি তেষ্টা পেয়েচে। কষ্ট শুধু তৃষ্ণায়। এসব পথে জল নিয়ে ওঠা দরকার। এতবড় পাহাড়ে কখনো জীবনে উঠিনি, এক এক জায়গায় শুধু অনাবৃত শিলাস্তর। জুতো নিয়ে ওঠা বড় বিপজ্জনক। গড়িয়ে পড়লে প্রাণ সংশয়। এক জায়গায়—পার্ব্বত্য চীহড়[৫]

---

১ Red Spurfowl / Galloperdix spadicea। হিন্দিতে ছোট জংলি মুরগী বা চকোত্রি।

২ Thespesia populnea Soland.। সংস্কৃতে পরিশ।

৩ ঝোড়, ঝোল, জুলি, জোল—অর্থ জলাভূমি; নীচু জায়গা এই অর্থে গর্ত্ত।

৪ ছোটনাগপুর অঞ্চলের অস্ট্রিক ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী।

৫ Bauhinia vahlii W. & A.।

বৃক্ষের ছায়ায় শিলাখণ্ডে বসে লিখ্‌চি। সঙ্গের সাঁওতাল ছোঁড়াটা চীহড় গাছে ফল পাড়তে উঠ্‌ল। চটকা ফলের[১] মত অথবা খুব বড় মাখম সিমের[২] মত ফল গুলো। মধ্যে টাকার মত চেপটা বড় বড় বীজ থাকে। আনৎ বল্লে পুড়িয়ে খেতে হয়। আমি বল্লুম পোড়া। আগুন জালিয়ে চীহড়ফল পোড়ানো হোল। এক জায়গায় হাতীর নাদ দেখলাম। পকেটে করে নিলাম। চীহড় গাছ লতানে কাষ্ঠময় বৃক্ষ—বড় বড় পাতা। কি একরকম পাখী ডাকচে। মধ্যাহ্নে জঙ্গল নিস্তব্ধ নিঃশব্দ—বাংলাদেশে এ বসন্তে ঘেঁটুফুল ফুটে [—] বড় নিরীহ, গ্রাম্য, শান্ত দেশ। কোনো বিপদ নেই—সুন্দর। বাংলাদেশের কথা গ্রামের কথা মনে হয়ে গেল [—] ওই যে ও এমন একটা দেশ যেখানে ঠাণ্ডা জল খেতে পাওয়া যায়—এত জল তেষ্টা পেয়েচে!

নামবার সময়ে একটা জায়গায় পাহাড়ের সানুদেশে প্রকাণ্ড কেঁদগাছ হাতীতে ভেঙে দিয়েচে। ভালুকের নাদে পা দিলাম আবার [—] পাতায় মুছে ফেলি। সঙ্গের সাঁওতালটি বল্লে—বড্ড ভারী গজাড় আছে বাবু। যেতে পারবি। গজার মানে বন[৩]।

তারপরে একটা পথে নেমে এলাম রাণী ঝর্ণার জল খাবো ও নিয়ে নেবো বলে। কিছুদূরে একটা গোর। খেঁড় জাতির লোক মারা গিয়েচে শুনলুম। এগিয়ে এসে ওদের কুঁড়েঘর—চারিধারে পর্ব্বত ও অরণ্যবেষ্টিত অতি সুন্দর স্থানে। জাম বাটীতে জল নিয়ে এল সেই জল খেলুম। এ জায়গাটা ঠিক যেখানে এসে চাঁইবাসা রাস্তার সঙ্গে গালুডির রাস্তা মিশেচে—তার সাম্‌নেই পাহাড়ের ওপর দিয়ে যে পথ উঠেচে—ওই পথে। পাশেই রাণীঝর্ণা। পাশে অনাবৃত স্তর রাজি।

তারপর এসে একজায়গায় শিলাখণ্ডে ঠেস্‌ দিয়ে বসলুম। সামনে ওই দূরে আমাদের নেকড়াডুংরি [—] পেছনে আমাদের বাংলাটা দেখা যাচ্চে। দূরে ডাইনে মৌভাণ্ডার কারখানা। সাম্‌নে এই কালাঝোর পাহাড়—কাল যে পথ দিয়ে দীঘাগড়া গিয়েছিলুম—সেই পথ ও যেখানে কাল জঙ্গলে আগুন দিয়েছিল—সেটা ওই দেখা যাচ্চে। এখানে সেই কালকার বন-কাটিগ্রাম এরই—সামনের পাহাড়ে কাল রাতে আগুন দিয়েছিল। ওর পেছনেও লম্বা পাহাড়শ্রেণী অনেক-

১ ? চোটকুট / Sagittaria sagittifolia Linn.।

২ Canavalia ensiformis (Linn.) D. C.। সংস্কৃতে মহাশিম্বী।

৩ গজারি নামে গাছ আছে। সম্ভবতঃ তার অর্থব্যাপ্তিতে বন।
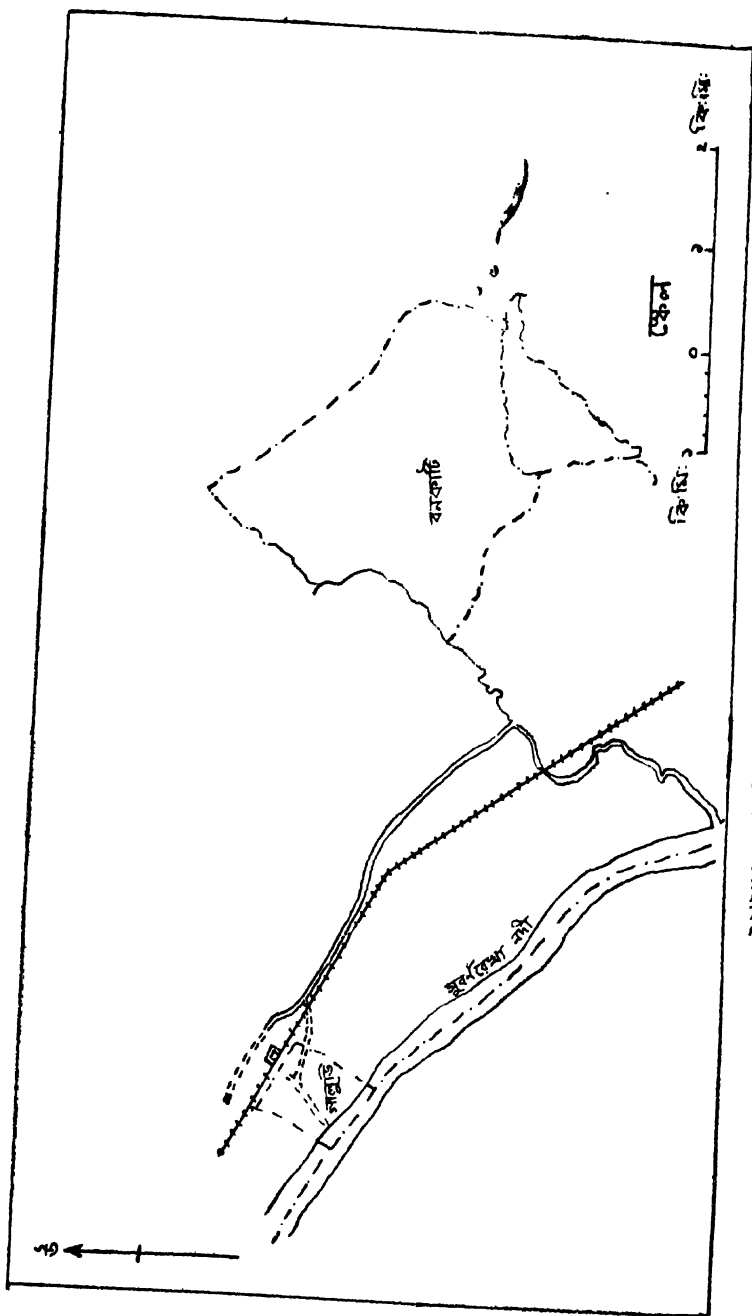
২৭।২।১৯৩৪ (অতিরিক্ত) : গালুডি—বনকাটির স্থানচিত্র

দূর পর্য্যন্ত দেখা যাচ্চে—বোধহয় ধলভূমগড় পর্য্যন্ত। কালাঝোরের পেছনেও আর একটা range of hill দেখা যাচ্চে। এদিকেও অরণ্য খুব বেশী। বেলা পড়ে এসেচে। পেছনের পাহাড়ের সানুদেশে ছায়া পড়েচে। সিদ্ধেশ্বর ডুংরীতে আজ শেফালি বৃক্ষ দেখেচি। পলাশ নেই। পিয়ালফুল ফুটেচে চারিদিকে তার গন্ধ নেই। সেদিন পাটকিটার জঙ্গলে যে গিয়েছিলুম—সে এর তুলনায় অতি নিরীহ ব্যাপার।

বাবার সেই শ্লোক লেখা টুকরো কাগজখানা বার করে দেখ্‌চি। 'অস্মাকং সন্তু গব্যানি, গ্রাসা সন্তু ন শোষণং, অখ্যাতি রিতি [অখ্যাতিরিতি] তে কৃষ্ণ মগ্না নৌনাবিকে [নৌর্নাবিকে] ত্বয়ি।'[১] পাশের শিলাখণ্ডে পাথর চাপা দিয়ে রেখেচি সেটা।

A plot on Thirst—'তৃষ্ণা'। জল পাওয়া যায় না। জিব আটা চটচটে। গা যেন জ্বলচে। কাপড় গা থেকে খুলে দিতে ইচ্চে করচে। গা দিয়ে আগুন বেরুচ্চে। Dreams of cold water······All thoughts in terms of cold water···বাংলাদেশের নদী ঠাণ্ডা জল বকুল বনের ধার—ঠাণ্ডা কাদা। কলকাতায় বরফ সরবৎ।

ওই খেঁড়দের গাঁটাতে বল্লে যে পাটকিটাতে জলের ধারে আজ কদিন থেকে ৪টা হাতী এসে আছে।

A novel on forest[২]।

ওতে নির্জ্জনতার কথা থাক্‌বে। গাছপালার কথা থাকবে। অরণ্যানী—খাড়া উঁচু পাথরের স্তর। ধাতু প্রস্তর। রঙীন ঝর্ণা যা ঘন অরণ্যের মধ্যে দিয়ে নেমে আসচে। পাহাড়ের মাথায় রাঙা রোদ। শিউলি বন। চীহড় ফলের গাছ ও চীহড় ফল। কেঁদ। আমলকী। বিরাট দৃশ্য। বিরাট জাতি। টাঁড়বারো। ভালুক ঝোড়। ওরাম্‌গড় ও রাণীঝর্ণা। পাহাড়ের দেবতা বনময়ূর ও বনমোরগ। দূরে সমতল ভূমির দৃশ্য। অভ্র, তামা ও লোহার পাথর। গুহা যা রহস্যময়, যার মধ্যে দিয়ে কোথায় যেন যাওয়া যায়—বোধহয় তা পাতালপুরীতে। বনকুক্কুর। পোসেইতার সেই ঘন বন। চিমনির মত কেঁদ গাছ। দীঘাগড়ায় নির্জ্জন বন পথে মাঝে মাঝে forest guard এর ঘর, পাহাড়ের মাথায় আগুন। বৈশাখ

১ আমাদের গব্য পদার্থ থাকুক, গ্রাস (খাদ্য) শুষ্ক না হোক। হে কৃষ্ণ, তুমি নাবিক থাকতে (আমাদের) নৌকো ডুবে যাচ্ছে—এটা তোমারই অপযশ।

২ আরণ্যক।

জ্যৈষ্ঠ মাসে draught. কাঠ কাটতে গিয়ে পালিয়ে আসে জলাভাবে। হরিণ ময়ূর তৃষ্ণায় [—] একটি মাত্র ছোট্ট ঝর্ণায় জল জমানো খাদ আছে, সেখানে জল খেতে নামে। বাঘ, ভালুক হাতী সব। বড় শঙ্খচূড়[১] বা অজগর সাপও রাত্রে জল খেতে আসে। বানা। টাঁড়বারো বা বনগড়ার দেবতা অনেকে দেখেছে —গভীর রাত্রের অন্ধকারে খাদানের কাছে দাঁড়িয়ে মহিষের পালকে সতর্ক করছে। লোকের গোর। খেঁড়ীতে শুধু সিম চাষ করে। বাঘের ডাক রাত্রে। হাতীতে গাছ ভাঙচে মড় মড় করে। ভালুক চলেচে। ময়ূর ক্যাঁ ক্যাঁ করে ডাকচে। অনেক রাত্রে একরকম সুস্বর পাখী ডাকে ঠিক যেন রূপোর ঘণ্টা। বন্য শেফালীর সুগন্ধ রুক্ষ [রুক্ষ] কর্কশতা। পুতু পুতু ভাব নেই। কুসুম গাছের রাঙা পাতা।

দুজন সাঁওতাল মেয়ে কয়লা আনতে যাচ্চে [—] খেঁড়দের গ্রামের কাছে জঙ্গলে কাঠ কয়লা পোড়ানো হচ্চে—সেখানে। বল্লে—বাবু ওই যে কুসুম গাছ-টার তলায় কামারের দোকান—ওখানে কয়লা নিয়ে যাচ্চে। কুসুম গাছের রাঙা পাতা দেখা যাচ্চে। অড়র খাচ্চে দুজন ছোট ছেলে খেঁড়েদের ঘরে। সিদ্ধেশ্বর ডুংরির ওপারে অখিলকোচার ঘন জঙ্গলে রাণীঝর্ণার উৎপত্তি স্থানে বন্যহস্তী সব সময়ই থাকে। একটা bill elephant বড় বদমাস, মানুষ দেখলেই তাড়া করে।

রোদ রাঙা হয়ে এসেচে। পাহাড়ের মাথায় অরণ্যানীর রাঙা রোদ মাখানো শোভা অপূর্ব্ব। ছায়া পড়ে আসচে। আমার সামনে ডাইনে পাথর খাদানে কুলীরা কাজ করচে—একজন বলচে—জাম বাটীটা দে ঝর্ণা থেকে জল নিয়ে আয়। ওখানে বৈদ্যনাথ মহন্তি, মহাদেব এরা সব কাজ করে।

প্রথম দিন এখানে এসে নন্দীর গোলার কাছে যে ছোট্ট পাহাড়টাতে উঠি—ওই সেটা দূরে নেকড়াডুংরির ওপাশে বল্মীকস্তূপের মত মনে হচ্চে। একটা পরিচিত জিনিস রয়েচে পাশের একটা গাছের গায়ে—আলকুশি ফল[২]। দেশলাই এর বাক্সের মত মালগাড়ীটা দেখা যাচ্চে দূরে।

ইসমাইলপুরের জঙ্গল এর চেয়ে অনেক নিরীহ—কিন্তু মনোরম। এ যেন বড় বেশী রুক্ষ। অনেক বিরাট। সে নরম মাটীর দেশ আর এ শুধুই পাহাড় আর পাথর। এখানে নানা বিপদ। সেখানে বিপদ নেই। এ দেশে পথ চলবার

---

১ King Cobra / Ophiophagus hunnah।

২ Mucuna pruita Hook. / সংস্কৃতে আত্মগুপ্তা, কপিকচ্ছু, বানরী।

ষো নেই [—] শুধু কাঁকর আর বালি।

ভেবে দেখ্‌লুম আমার কাছে আমাদের গ্রামের বাড়ীর পেছনে বরোজ-পোতার ডোবার ওধারের বাঁশবনটা এখনও অনাবিষ্কৃত ও রহস্যময় দেশ রয়ে গেছে।

বেলা একেবারে পড়েচে। লতাপাতার কটুতিক্ত গন্ধ বেরুচ্চে। আমি পিছিয়ে গিয়ে রাণীঝর্ণার ধারে দাঁড়িয়ে আছি।

সাঁওতাল কুলী যারা কয়লা বইছিল তারা আমার সঙ্গে কতক্ষণ গল্প করলে। কলকাতায় দুতলা দালান আছে বাবু? কল্‌কাতায় গাছ নেই—সেখানে কি সব গাছ কেটে ফেলেচে। বলু আমাদের কল্‌কাতায় গিয়েছিল বাবু, সব দেখে এসেচে। ওই যে মৌভাণ্ডাতে কাজ করে।

গান করতে করতে যাচ্চে দুজনে গভীর বনের ওপারে। ওদের মুখের হাসি বড় মিষ্টি।

পাথর খাদানের অক্ষয় বলে একটা লোক বল্লে যখন নীচে নেমে এসেচি—বাবু আপনি একদিনে দুটো পাহাড়ে উঠ্‌লেন?

অবাক হয়ে গেল।

ধাতুপ্‌ ফুলের অপূর্ব্ব রূপ—বনের সর্ব্বত্র। ডালের গায়ে গুঁড়ির গায়ে পর্য্যন্ত বড় বড় লাল ফুল ধরেচে। কি সৌন্দর্য্য!

নেমে এসেচি। বেলা পড়ে গিয়েচে। সন্ধ্যা হয় হয়। কুমিরমুড়ি গ্রাম ছাড়িয়ে সুবর্ণরেখার তীরের কাছাকাছি এসে একটা শিলাখণ্ডে বসে লিখচি। অনেকদিন পরে ইসমাইলপুরের কথা মনে পড়লো। একাদনের কথা সেই যে যাকে সিং বলেছিলে—হ্যাঁ ওই তো মালিক, কোথাকার জমির যেন দেখ্‌তে গিয়েছিলুম—সেখানকার সেই সোঁটা মাটীর গন্ধ—রাঁচী বইহার, শুওরমারি—সেই সব মনে পড়ে [—] I am feeling homesick for them. আর একবার সেখানে যাবো। সেখানকার চেয়েও ভীষণ আরণ্যজীবন এখানে যাপন করচি বটে—আরও অপরূপ। সে ছিল নন্দনবন, দূরে ছোট ছোট পাহাড়। এ আসল অরণ্য, বন্যগজ ব্যাঘ্র ভালুক অধ্যুষিত—এ পাহাড়ও নিতান্ত মন্দার পাহাড় নয়। তবুও ইসমাইলপুরের কথা মনে হয়। সেই জ্যোৎস্না রাত্রি।

অবিশ্যি এখানেও ভরপুর রোদ—পোড়া সোঁটা মাটীর গন্ধ এখন বেরুচ্চে এবং এটাই মনে করে দিচ্চে ইসমাইলপুরের কথা।

একদিন রাজনগরে গিয়ে মাঠে ও বটতলা ভেবেছিলুম এই ইসমাইলপুর।

হায় কি অনভিজ্ঞতা !

ফিরে এসে জ্যোৎস্না রাতে কতক্ষণ বাইরে বসে রইলাম। হাতের শুকনো পেঁপে ডালের মত ডালটাতে বাঁকা কঞ্চির[১] কথা মনে হোল। সত্যি জীবনটা কি শোক, দুঃখ, সুখ, শান্তি, বিষাদপূর্ণ—কি অদ্ভুত ব্যাপার—আর যাঁকে ভগবান্ বলা হয় তিনি কি বিরাট। আমি এই ভগবানকেই জান্‌তে চাই। কালী, দুর্গা—গ্রাম্য দেবতা। এই মহান্ বিরাটতার সঙ্গে খুকুর কমনীয়তা, গ্রাম্য ঘেঁটুবনের সৌন্দর্য্য সবই তিনি সৃষ্টি করেচেন—এমন কি sprit world এর cosmic either এর সমুদ্র পর্য্যন্ত। তিনি যদি আশীর্ব্বাদ করেন আমি তাঁর সৃষ্টির বিরাটতা কিছু যেন ফোটাতে পারি—এক কণা হলেও তাও worth striving for.

২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ১৩ই ফাল্গুন, ১৩৪০। শনিবার[২]

সকালে উঠে নন্দীর গোলার মাঠে বেড়িয়ে এলুম। কাল ও পরশু অপরাহ্ণে নির্জ্জনে পাহাড়ের পেছনে শালবনটাতে শিলাবেদীর ওপর বসে কি enjoy করেচি। জীবনে ওরকম আনন্দ বেশী পাইনি। কাল খুব যখন জ্যোৎস্না ফুটেচে তখনও শিলাখণ্ডে বসে আছি—পাশের কেঁদচারাগুলোর পাতা জ্যোৎস্নায় চিক্‌চিক্ করচে—দূর পাহাড়ের বনে আগুন দিয়েচে—পেছনের পাহাড়ে গোলগোলি ফুল ফুটেচে—পাহাড়ের মাথায় নক্ষত্র উঠেচে—হাউই বাজির মত একটা trail blazer[৩] খসে পড়ল—খানিকটা যেন দেখালো ইসমাইলপুরের কাশ-

---

১ বাঁকা কঞ্চি একটি বিশেষ কারণে বালক বিভূতিভূষণের কাছে অত্যন্ত প্রিয় জিনিশ ছিল।

ছেলেবয়েস থেকে বিভূতিভূষণের বড় শখ ছিল বাবার মত কথক হবার। কিন্তু শ্রোতা কোথায়? শ্রোতার অভাবে তিনি বাঁকা কঞ্চি হাতে ইছামতীর তীর, ঝোপঝাড় প্রভৃতিকে উদ্দেশ্য করে দিনের পর দিন কথকতা করে যেতেন।

সেই থেকে বাঁকা কঞ্চির ওপর তাঁর এত টান। বিভূতিভূষণ তাঁর আর একটি দিনলিপিতেও লিখেছেন, 'বাঁশের কঞ্চির জন্য আগ্রহটা আমার চিরকাল সমান রইল সেই বাল্যকাল থেকে।' (উৎকর্ণ, পৃঃ ৫৮)

পথের পাঁচালীতেও বিভূতিভূষণ অপুর হাতে তাঁর প্রিয় জিনিশটি দিতে ভোলেননি। (দ্রষ্টব্য, নবম ও অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ)

২ বিভূতিভূষণের স্বহস্ত লিখিত তারিখ, 'শনিবার ২৫-২-৩৪'।

৩ উল্কা।

ঝাউয়ের বনের মত—সে এক অপূর্ব্ব আনন্দের ব্যাপার!

আজ বাংলোর পিছনে শিলাখণ্ডে বসে লিখ্‌চি। আজ এখান থেকে চলে যাবো, কে জানে আবার করে আসবো বা আসবো কিনা?

গালুডিকে বড় ভাল লেগেচে। ঘাটশিলা এর তুলনায় অতি বাজে জায়গা।

১লা মার্চ, ১৯৩৪। ১৭ই ফাল্গুন, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

মেসে রং খেল্‌লে সবাই। দুপুরের পর নীরদবাবুর flat-এ গিয়ে দেখি তাঁর শরীর খুব খারাপ হয়ে গিয়েচে। কালাজ্বরে ভুগ্‌চেন। কোথায় change-এ যাওয়া যায় তা নিয়ে পরামর্শ হোল। রাত এগারোটার সময়ে বাসায় গিয়ে দেখি তখনো রান্না হয়নি। আজ আবার মেসে feast হচ্চে। এদিকে রাত ১২টা বাজে। এত রাত্রে খেলে শরীর তো খারাপ হবে—ভারত বললে। পেছন থেকে পূর্ণিমার চাঁদ উঠলো—ভাল দেখায় না মোটেই।

২রা মার্চ, ১৯৩৪। ১৮ই ফাল্গুন, ১৩৪০। শুক্রবার

সকালে উঠে স্নান সেরে সুপ্রভার সঙ্গে দেখা করে পথে বেরিয়েচি—ফিয়ার লেনের সেই ভুতোর সঙ্গে দেখা। সে চা খাওয়ালে একটা দোকানে—তারপর সেখান থেকে স্কুল। স্কুলের সকলের সঙ্গে খুব আলাপ পরিচয় হোল। দোলা (?) দেখতে এসে জিগ্যেস্ করলে। বেরিয়ে বঙ্গশ্রীতে গেলুম। সেখান থেকে মিউনিসিপ্যাল মার্কেট হয়ে চৌরঙ্গী গিয়ে হেঁটে এসে ট্রাম ধরে এলুম পি. সি. সরকারের দোকানে। দিল্‌খাস্ কেবিনে চা খেলাম অনেককাল পরে। দোকানের থেকে বার হয়ে পি. সি. সরকারের ওখানে এলুম—হরি বোলার সঙ্গে দেখা। সে কোথায় এসেছিল এখানে। রাত্রে দুটো ছেলে অটোগ্রাফ নিতে এল—হোস্টেলের বিমলেন্দু?···অনেক রাত পর্য্যন্ত গল্পগুজব হোল।

৩রা মার্চ, ১৯৩৪। ১৯শে ফাল্গুন, ১৩৪০। শনিবার

সকালে স্কুল—সেখান থেকে বঙ্গশ্রীতে এসে চা খেয়ে বইএর দালালের গাড়ীতে Imperial Library—ওখান থেকে সিংভূমের গেজেটিয়ার পড়ে সন্ধ্যার আগে কর্জ্জন পার্কে বস্‌লুম। বেশ লাগ্‌লো। অনেক ছেলেমেয়ে। well kept Garden—লোকজন, সুন্দর ফুল ফুটে আছে—সিংভূমের জঙ্গলের সঙ্গে অদ্ভুত contrast!

অথচ এর এত কাছে সেদিন সিদ্ধেশ্বর পাহাড়ের উত্তুঙ্গ শিখরে আমি চাঁহড় ফল কুড়িয়ে খেয়েছিলুম। সেখানে বুনো হাতীতে কেঁদ গাছ ভেঙেচে। ওখান থেকে ট্রামে রমেশ বাবুর আড্ডায় এলুম বাড়ী ঠিক করবার জন্যে—সেখান

থেকে বাসা।

৪ঠা মার্চ, ১৯৩৪। ২০শে ফাল্গুন, ১৩৪০। রবিবার

সকালে উঠে মণীন্দ্র বসুর বাড়ী। সেখান থেকে দুজনে সুধীর চৌধুরীর বাড়ী যাচ্চি [—] পথে সীতা দেবীর সঙ্গে দেখা। তাঁর সঙ্গে তার বাড়ী গেলাম। সুধীর এল। গল্প গুজব হোল—একটু পরে শান্তা দেবী এলেন। ঘাটশিলার জমি কিন্‌বার বিরুদ্ধে আমি খুব বক্তৃতা দিলাম। তারপর মণীর বাড়ীতে এসে খুব আড্ডা হোল—খেলুম সেখানে৫ বেলা ২ টার পরে ট্রামে এলুম চৌরঙ্গী। ট্রাম [—] rest Lane এর পেছনে একটা গাছের তলায় বসে বিশ্রাম করে নীরদবাবুর flat-এ। রাত্রি দশটায় ফিরি। প্রমোদবাবু এলো।

৫ই মার্চ, ১৯৩৪। ২১শে ফাল্গুন, ১৩৪০। সোমবার

স্কুল থেকে গেলুম মাণিকতলা। সেখানে অনেকক্ষণ বসে বসে তারপর এলুম মুক্তারামবাবুর স্ট্রীট। তারপর আমি আর কণিষ্কবাবুর ভাই দুজনে বেরিয়ে College Square-এ এলুম। কিছু খেয়ে পুঁটীরামের দোকানে গোলদিঘীতে একটু বসেচি—আশুর সঙ্গে দেখা। তার সঙ্গে আবার গিয়ে গোলদিঘীতে খানিকক্ষণ কাটালুম। তারপর ফিরে আসি। সকালে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য,[১] অবিনাশবাবু[২] প্রভৃতি এল।

৬ই মার্চ, ১৯৩৪। ২২শে ফাল্গুন, ১৩৪০। মঙ্গলবার

সকালে টরু এল। তারপর স্কুলে গেলুম। পথে বিমলেন্দুর সঙ্গে দেখা। তাকে দেবব্রতর কথা জিগ্যেস্ করি। স্কুলের পরে বঙ্গশ্রীতে গেলুম। সুকুমার বাবু বল্লেন, সুনীতিবাবু এবার বাংলার হেড্ এক্সামিনার। ভালোই হোল। নীরদবাবুর flat-এ যাবার জন্য বেরিয়ে B. N. R. আপিসে গেলুম— [?] Water এর বই পড়লুম। flat এ গিয়ে দেখি ভানু[৩] বসে আছে। সে একখানা লটারির টিকিট বিক্রী করলে। চা খেলুম। নীরদবাবু এলেন না—অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে রাত ৯৷৷০ টায় ফিরি।

৭ই মার্চ, ১৯৩৪। ২৩শে ফাল্গুন, ১৩৪০। বুধবার

সকালে স্নান সেরে নীরদবাবুর flat-এ গেলুম। জানু ঘুম থেকে উঠে

১ প্রাক্তন অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ; গল্পিকা পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এঁর বাড়িতে 'বারবেলা ক্লাব' নামে এক সাহিত্য-সংস্থা ছিল।

২ অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল, বাতায়ন সাপ্তাহিকের সম্পাদক।

৩ জনরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়/জনু, বিভূতিভূষণের মামাতো ভাই।

দাঁড়িয়েছিল দোরে। এখান থেকে হাওড়া স্টেশন গেলুম। তারপর সেখান থেকে ওদের তুলে দিয়ে ট্রামে ফিরে এসে কিছু খাবার খেলুম ও নিউমার্কেট থেকে Wide World কিনলুম একখানা। তারপর স্কুলে। ওখান থেকে বার হয়ে আমি, রাম ও মৃত্যুঞ্জয় গোলদিঘীতে এলুম। পথে মোহিত সাইকেলে চেপে অনেকদূর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এল। গোলদিঘীতে কিছু খেয়ে আমি ফিরলুম বাসায়।

৮ই মার্চ, ১৯৩৪। ২৪শে ফাল্গুন, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী হয়ে গেলুম থ্যাকার Spink-এর দোকানে। লর্ড হার্ডিঞ্জ এর বইখানা পড়ে ও তার ফটোতে দেখ্‌লুম মহীশূরের খারাপুর (?) ফরেস্টে হাতী পাওয়া যায় ও অতি চমৎকার জঙ্গলের দৃশ্য। শালবন নয়, অন্য ধরনের বন এবং অনেক সুন্দর। ফিরে ভাবলুম সতীশের দোকানে একবার যাবো। বউবাজার দিয়ে হেঁটে প্রায় মোড় পর্য্যন্ত এলুম, ওর দোকানটা আর পাইনে—তারপর আবার অনেকটা গেলুম। দেখি দোকানটা যেন বন্ধ। পাশে একজন দোকানদারকে জিগ্যেস্ করলুম, সে বল্লে—সতীশ তো মারা গিয়েচে, জানেন না ? গ্রহণের পরদিনের পরের দিন মারা গিয়েচে।

কতক্ষণ বসে রইলুম। কষ্ট হোল স্ত্রীর জন্যে। এই অল্পবয়সে বিধবা হোল।

৯ই মার্চ, ১৯৩৪। ২৪শে ফাল্গুন, ১৩৪০। শুক্রবার

তারপর স্কুল। সেখান থেকে বঙ্গশ্রী, বিকেলে বৃষ্টি পড়তে লাগল। ধর্ম্মতলার মোড়ে একটা রেস্টোরেন্টের কাছে মৃণালের সঙ্গে দেখা অনেককাল পরে। মৃণাল একদিন ওর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেছিল, যেতে পারিনি সেজন্যে ক্রটী স্বীকার করলুম।

মৃণাল স্কুলের চাকুরী নিয়ে রেঙ্গুণ যাচ্চে বল্লে।

১০ই মার্চ, ১৯৩৪। ২৫শে ফাল্গুন, ১৩৪০। শনিবার

স্কুল থেকে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে গিয়ে·· bart এর Chotonagpur, a forgotten province of the Empire[১] বলে বইখানা পড়লুম। বেরিয়ে পশুপতি বাবুর হাসপাতালে গিয়ে দেখি বেরিয়ে গেছেন। আবার একটা দোকানের দোতলায় বেশ খাবার জায়গা করেচে—সেখানে খেয়ে মনোজ বসুর বাসায় গেলুম। মনোজ নেই। ওখান থেকে আবার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী এসে

---

১ Choto Nagpur : a little-known province of the Empire, Francis Bradley Bradley-Birt।

৭টা পর্য্যন্ত পড়া গেল। সেখান থেকে বাগবাজারে পশুপতি বাবুর ডাক্তারখানা। চা খেয়ে ৯॥০ টা পর্য্যন্ত গল্পগুজব করি। তারপর ট্রামে চলে আসি।

১১ই মার্চ, ১৯৩৪। ২৭শে ফাল্গুন, ১৩৪০। রবিবার

সকালে মণির ওখানে গেলুম। বৈকালে নানা জায়গায় বেড়াই। নীরদের কাছেও গেলাম। তাদের বাড়ীতে কেউ নেই। বন্ধুর ওখানে গিয়ে খানিকটা আড্ডা দিলাম ও চা খেলাম। পশুপতি বাবুর বাড়ীতে ফটো তোলা হোল। রাত্রে সেখানে অনেক খেয়ে অনেকরাত্রে ফিরি।

১২ মার্চ, ১৯৩৪। ২৮শে ফাল্গুন, ১৩৪০। সোমবার

সকালে স্কুল ছুটী হয়ে গেল। বেরিয়ে বঙ্গশ্রী। সেখানে সবাই চাঁদা করে খেলে। পশুপতি বাবু Mr. Rishi-র সংবাদ আনবেন বলে ৫॥০ টা পর্য্যন্ত বসে রইলুম। তারপর তাঁর গাড়ীতে প্রথমে মিহিরের[১] বাড়ি এলুম। সেখান থেকে বাসা। জিগ্যেস্ করলুম কেমন এক্সামিন্ দিলে। সেই মিহির, আমি যখন প্রথম এ স্কুলে আসি, তখন এ 5th class এ পড়তো।

আজ সকালে দেবব্রতের সঙ্গে দেখা হয়েছিল যাবার সময়। সে পা টিপে টিপে কেমন যাচ্চে আমায় দেখে!

১৩ই মার্চ, ১৯৩৪। ২৯শে ফাল্গুন, ১৩৪০। মঙ্গলবার

আজ বারুণীর ছুটী। সারাদিন বসে বসে লিখলুম ও পড়লুম। বৈকালে রিশির ওখানে থাকে বলে বঙ্গশ্রীতে গেলুম ৬॥০ টার সময়ে। আজকাল সব সময়ই ভাবি নীরদবাবুরা গালুডিতে গিয়ে এতক্ষণে কি করচেন। এ আমার একটা বাতিক হয়েচে—এ থেকে খুব আনন্দ পাই।

দুপুরে ঘুমুলাম। উঠে লিখলুম দৃষ্টিপ্রদীপের খাগড়াঘাটের অধ্যায়[২]। তারপরে উঠে গোলদিঘীতে বেড়ালুম। গোপালনগরের হেড্‌মাস্টারের সঙ্গে দেখা সেখানে। বঙ্গশ্রীতে গিয়ে দেখি প্রেমেন রয়েচে। ছাদে বসে গালুডির জমি সংক্রান্ত গল্প হোল।

তারপর পশুপতি বাবুর গাড়িতে Mr. Rishi-র কাছে গেলুম। ফল ভাল হোল না। তাঁরই গাড়ীতে ফিরে এলুম।

১ ছাত্র, খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইন্সটিটিউশন

২ অধ্যায় দশ।

১৯৩৪ সনের দিনলিপির একটি পাতা

১৪ই মার্চ, ১৯৩৪। ৩০শে ফাল্গুন, ১৩৪০। বুধবার

সকালে সুপ্রভাদের হোস্টেলে গেলুম। সুপ্রভা আঙুর ও সন্দেশ এবং এক গ্লাস জল নিয়ে এল। ওখান থেকে গেলুম সাতুকাকার খেলাঘরে। কি অপরিষ্কার জায়গাতেই থাকেন সতুকাকা! কিন্তু গ্রামের লোক, বড় ভাল লাগলো। এবার জামা বদলে এসেচে। ইউনিভার্সিটিতে মিটিং ছিল—সেখানে জসীম, মনোজ, ধীরেন, প্রভাত এদের সঙ্গে দেখা। বার হয়ে আইসক্রীম খেয়ে ট্রামে উঠচি…? সঙ্গে দেখা। গ্রে স্ট্রীটের মোড়ে নেমে কিছু খেয়ে বন্ধুর বাসায়। চা খেয়ে বন্ধুর ডাক্তারখানায়। একটা ছেলের মাথা ফেটে গিয়েচে, তাই দেখে ট্রামে বিভূতিদের বাড়ী। ঘণ্টু আছে—তারা কাগজখানা নিয়ে নম্বর দেখা-দেখি করলে। তারপর মন্মথ মঙ্গলবারের নিমন্ত্রণ করলে। ধীরেন এবার পরীক্ষা দিচ্চে। ব্রজদুলাল স্ট্রীট দিয়ে এসে বাস ধরলুম—রিপন কলেজের সহপাঠী সেই ছেলেটা—যার পাশে বসতুম কলেজে—অনেকদিন পরে তার সঙ্গে দেখা। তার পাশে আবার বসলুম—১৯১৪ সালের পরে।

১৫ই মার্চ, ১৯১৪। ১লা চৈত্র, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

স্কুল থেকে ইউনিভার্সিটি এলুম examiner's meeting এ। শোভা সেন এবার examiner হয়েচে। স্কুলে একটি ছেলে দেবব্রতের কথা বলছিল—সে বলেচে আমার যেতে লজ্জা করে। ইউনিভার্সিটী থেকে বার হয়ে জ্ঞানেন্দ্র বাবুর[১] সঙ্গে আলাপ করে জসিমের সঙ্গে দেখা। জসিম বল্লে এসো বিড়ি খাওয়া যাক। তারপর আমি বার হয়ে কিছু খাবার খেয়ে কলেজ স্কোয়ারে বেড়াচ্চি—আশুর সঙ্গে দেখা। আশু দেখা হলেই সিগারেট কিনে খাওয়ায়। কিছুক্ষণ কলেজ স্কোয়ারে দেবদারু গাছের তলায় আমাদের সেই বেঞ্চিখানায় বসে গল্প করলুম। আর একজন fellow examiner খড়্গপুর থেকে আসচে। সে এসে গল্প করলে। তারপর মেসে ফিরলুম।

১৬ই মার্চ, ১৯৩৪। ২রা চৈত্র, ১৩৪০। শুক্রবার

স্কুলে রামকৃষ্ণ আশ্রমের ছেলে দুটী এল। ওখান থেকে বঙ্গশ্রীতে যাই। ওদের টিকিটে চলে গেলুম একবার কর্জ্জনপার্কে। Wide World কিনলুম পুরোনো। কর্জ্জনপার্কের কাছে শোভা সেন উঠচে গাড়ীতে। তারপর আর বঙ্গশ্রীতে এসে ওদের সঙ্গে ? মহলে গেলুম—আমি শৈলজা, প্রেমেন, নৃপেন,

১ জ্ঞানেন্দ্রনাথ বাগচী।

সজনী। সেখানে সুধীর চৌধুরীর সঙ্গে দেখা—সে বল্লে বেশ উপন্যাস[1] হচ্চে—সবাই ভাল বলেচে নৃপেনও বল্লে। বসে বসে ভাবছিলুম দেখতে দেখতে এই আলোকাজ্জ্বল কক্ষে বসে বায়োস্কোপ দেখ্‌চি বন্ধুদের সঙ্গে—আমিই কিছুকাল আগে সিদ্ধেশ্বর ডুংরির মাথায় ঘন বনের মধ্যে বসে পাহাড়ী চীহড় ফল কুড়িয়ে খেয়েছিলুম। জীবনের এই উদারতা ও বিস্তৃতিই আমি চাই। সেদিন ইউনিভার্সিটীতে মিটিংএর সময় আমার একজন fellow-examiner যে কথাটা বলেছেন—সে কথাটা মনে পড়ল। জীবনটা বেশ লাগ্‌চে। এই বসন্তে রামনবমী আসবে—আবার সামনের সপ্তাহের পরের সপ্তাহে রাখা মাইনের পাহাড় দেখবো—তাও বেশ ভাব্‌তে হবে। ওখান থেকে বার হয়ে ট্রামে বাসায় এলুম। আজ বেশ শীত।

১৭ই মার্চ, ১৯৩৪। ৩রা চৈত্র, ১৩৪০। শনিবার

স্কুলের পরে ইউনিভার্সিটীতে কাগজ আনতে গেলুম—পাওয়া গেল না। আবার একবার গেলাম ৬টার সময়—আমি আর প্রভাত সান্ন্যাল। ২ ঘণ্টা অপেক্ষা করবার পর শোনা গেল আমার কাগজ আসেনি।

১৮ই মার্চ, ১৯৩৪। ৪ঠা চৈত্র, ১৩৪০। রবিবার

কোথায় বেরুইনি। Louis Golding এর Magnolia Street[2] পড়ছিলুম। বিকেলে বেরিয়ে লালদিঘীতে হেঁটে গেলাম। ফিয়ার লেনের মধ্যে দিয়ে গেলুম। লালদিঘীতে খানিকটা বসে হেঁটেই ফিরে এলুম।

১৯শে মার্চ, ১৯৩৪। ৫ই চৈত্র, ১৩৪০। সোমবার

কয়দিনই এখানে বেশ শীত। সকালে উঠে আজ গায়ে কাপড় দিয়ে বসতে হোল—এমন শীত। অর্থাৎ গায়ে কাপড় দিলে তবে আরাম হোল। দেবব্রতের সঙ্গে দেখা হল পথে। স্কুল থেকে বঙ্গশ্রীতে। সেখানে চা খেয়ে ইউনিভার্সিটিতে। মুরলীর সঙ্গে দেখা হোল। ফিরে এসে আর কোথাও যাইনি।

২০শে মার্চ, ১৯৩৪। ৬ই চৈত্র, ১৩৪০। মঙ্গলবার

সকালে সিটি কলেজের ছেলেরা এল ওদের কলেজে সাহিত্য সভায় যাবার জন্যে। স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী। সেখানে কেউ নেই। তারপর এসে কাগজ দেখে বিভূতিদের বাড়ীতে গেলুম। ক্ষেত্রবাবু ও আমি একসঙ্গে বসে অনেকদিন পরে

১ দৃষ্টি-প্রদীপ। ফাল্গুন মাস থেকে প্রবাসীতে এটি প্রকাশিত হতে শুরু করে।

২ উপন্যাস।

নিমন্ত্রণ খেলুম মন্মথদের ছাদে বসে।

অনেক রাত্রে বাড়ী।

২১শে মার্চ, ১৯৩৪। ৭ই চৈত্র, ১৩৪০। বুধবার

স্কুলে যেতে কোলার[১] সঙ্গে দেখা। সেও তার ...? যাচ্ছে। বঙ্গশ্রীতে গেলুম। সেখান থেকে Frankenstein[২] দেখতে গেলুম। এই এসে ২ খানা কাগজ দেখে পায়ে সেঁক দিয়ে বসে আছি।

মহুলিয়া থেকে নীরদবাবুর পত্র পেলাম এই মাত্র।

২২শে মার্চ, ১৯৩৪। ৮ই চৈত্র, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

স্কুলে আজ লোক এল। মুচুকুন্দ ফুল একটা আজ কুড়িয়ে পেয়েছিলাম—কোলার মুখে লাগিয়ে দিতে সুড়সুড়ি লাগল—সে বেশ আনন্দের ব্যাপার। ছুটী হলেই বরিশাল এক্সপ্রেসে বনগাঁ।

খয়রামারির মাঠে বিকেলে বাসায় পৌঁছেই বেড়াতে গেলুম—সেই রাজনগরের বটতলায়। ওখান থেকে ফিরে বীরেশ্বর বাবুর বাসায় গেলুম।

২৩শে মার্চ, ১৯৩৪। ৯ই চৈত্র, ১৩৪০। শুক্রবার

সকালে উঠে খাতা দেখ্‌লুম। তারপর বীরেশ্বর বাবুর বাসায় গেলুম। দুপুরে খুব খাতা দেখার পরে খয়রামারি থেকে বেড়িয়ে এসে দেবেনের ডাক্তারখানায় গেলুম। সেখান থেকে বীরেশ্বর বাবুর বাসায়।

২৪শে মার্চ, ১৯৩৪। ১০ই চৈত্র, ১৩৪০। শনিবার

সকালে খাতা দেখে বারাকপুর। আজ রামনবমী। অনেককাল পরে এলাম। খুকুকে ডাক্‌লুম। সে এসে অনেক গল্প করলে। তারপর আমাদের বাড়ীর দিকে গেলুম। কি কোকিলের ডাক সর্ব্বত্র! ঘেঁটুফুলের গন্ধ, শুকনো বাঁশ পাতার খস্‌ খস্‌ শব্দ—মিষ্টি রোদ। বৃন্দাবনদের বাড়ী গেলুম—পথে রাস্তা পার হবার সময় একবার দাঁড়ালুম—জ্যাঠামশায় রাখাল রায় কেউ নেই আজ। বাঁধানো হুঁকোয় তামাক খেলুম। রামপদ সেখানে কর্ম্মকর্ত্তা। সেই পাঁচড়া হয়েছিল যখন থার্ড ক্লাসে পড়ি, তারপরে এই আজ ওদের বাড়ীর মধ্যের দালানে খেতে গেলুম। বৃন্দাবনের ছেলে খুব তোয়াজ করলে। নাটমন্দির ভেঙে গিয়েচে। তারপরে ওখান থেকে আস্‌চি—পথে শুকনো বাঁশপাতা, ঘেঁটুফুল—হরিপদ দাদা

১ ছাত্র, খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইন্সটিটিউশন।

২ লেখিকা Mary Wallstonecraft Shelley; Director James Whale।

দাঁড়িয়ে আছে। সিগারেট খাওয়ালে। পরেশ খুড়ো বিকেলে বাড়ী এল। কালো এল। আমি খুড়ীমা ও খুকুর সঙ্গে দেখা করেই আমাদের বাড়ীর ? দিয়ে কুলুঙ্গিটা দেখে শুকনো বাঁশ পাতা মাড়িয়ে নৌকাতে এসে উঠলুম। নৌকো ছাড়ল। দুধারে অদ্ভুত জঙ্গল—ঘেঁটু বনের গন্ধ—বাংলার বনশোভা সিংভূমের চেয়ে ভালো। ঘাটবাঁওড়ে নেমে হেঁটে বনগাঁ আসচি মকবুল দারোগার সঙ্গে দেখা। বল্লে—আমার ঘোড়ায় গেলে না কেন ?

২৫শে মার্চ, ১৯৩৪। ১১ই চৈত্র, ১৩৪০। রবিবার

কাগজ দেখলুম। তারপর বৈকালে রওনা। এখানে সুনীল, তার মা[১], হরি মোক্তারের ভাই—একসঙ্গে এলাম।

২৬শে মার্চ, ১৯৩৪। ১২ই চৈত্র, ১৩৪০। সোমবার

সকালে উঠে সুনীতিবাবুর বাড়ী এক কিস্তি কাগজ দিতে গেলুম। বেজায় কষ্ট। একটা বাসে বন্দেল নিয়ে গিয়ে থামিয়ে দিলে। সেখান থেকে হেঁটে পৌছতে বড় দেরী হয়ে গেল। সুনীতিবাবু নতুন বাড়ীতে পুরানো গ্রীক্, পুরানো ফিনিসিয়, ইউরিপিডিস্, খ্রীস্ট প্রভৃতি বড় লোকের উক্তি ইটালিয়ান্ মার্ব্বেলে লিখিয়েছেন —পড়ে শোনালেন। হরিদাস চাটুয্যেও সেখানে—তারপর মনোজ বসু এল। দুজনে বেরিয়ে এসপ্ল্যানেডে—সেখান থেকে আমি বলুর বাসায়। কিছু খেয়ে সেখান থেকে বিচিত্রা আপিসে উপেন বাবু ও সুশীল বাবুর সঙ্গে আড্ডা। ওখান থেকে বার হয়ে দ্বারিকের দোকানে কিছু খেয়ে বাসায় এসে একটু ঘুমুনো গেল। তারপর উঠে কাগজ দেখে বৈকালে একটু বেড়িয়ে এলুম। আবার কাগজ।

২৭শে মার্চ, ১৯৩৪। ১৩ই চৈত্র, ১৩৪০। মঙ্গলবার

সকালে উঠে কাগজ দেখে দুপুরে খানিকটা ঘুমুনো গেল। তার আগে প্রবাসী আপিস থেকে ঘুরে এলুম। ঘুমিয়ে কাগজ দেখে বঙ্গশ্রীতে গেলুম। সেখানে বটকৃষ্ণ ঘোষ[২] এল। তার সঙ্গে তার বাবা অরবিন্দ বাবুর কাঁচড়াপাড়ার গল্প করলুম। সন্ধ্যায় মানিকবাবু এল লেখা নিতে।

২৮শে মার্চ, ১৯৩৪। ১৪ই চৈত্র, ১৩৪০। বুধবার

রোজ ভাবি গালুডি যাবার দিন কবে আসবে। আজ ভোরে ঘুম ভেঙে ভাবলুম কাল গালুডি যাবো।

১ কিরণশশী মুখোপাধ্যায়, বনগাঁবাসিনী।

২ গবেষক ও বঙ্গশ্রীর নিয়মিত লেখক ছিলেন। এঁর বই A Survey of Indo-European Languages, Linguistic Introduction to Sanskrit

তারপর স্নানাহার করে স্কুল।…? ওখান থেকে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী গিয়ে বই ফেরৎ দিয়ে মুসলমান ছেলেটীর দোকানে গিয়ে দুখানা Wide World কিনলুম। তারপর বঙ্গশ্রী হয়ে College Square এ এলুম ট্রামে। বই নিয়ে আবার যাই ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। সেখানে মাস্টার নিশিভূষণের ছেলের সঙ্গে দেখা। কিরণ মাসিমার ছেলে বিয়ে করে কি একটা বিপদে পড়েচে বল্লে। তারপরে হেঁটে বাড়ী এলুম। খুব জ্যোৎস্না। শেষ রাত্রে ঘুম ভাঙ্‌ল। মনে হোল রাত পোয়ালেই ভাব্‌বো আজ গালুডি যাবো। খুব আনন্দ। শেষ রাত্রের জ্যোৎস্নায় ক্ষুদ্র গ্রাম সমূহে এরকম কত মানুষ মনে কত কি আনন্দ ও আশা পুষে আছে মনে হোল—ঘেঁটু ফুলের নির্জ্জন ঝাড়ের কথা মনে হোল শেষ রাতের জ্যোৎস্নায়।

২৯শে মার্চ, ১৯৩৪। ১৫ই চৈত্র, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

আজ ভোর হোল আনন্দে। গালুডিতে আজই যাবো। শেষ রাত্রের জ্যোৎস্নায় নদীতীরের কত ঘেঁটু বনের কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এত কথা মনে হোল। তারপর উঠে খাতা দেখ্‌তে বসে গেলুম। স্কুলে? পড়া নিয়ে বেশ কাট্‌ল। মধ্যে সজনীর টিকিট নিয়ে নিজে এস্‌প্ল্যানেডে টিকিট কর্ত্তে গেলুম। ফিরে আবার দুটো ক্লাস করলুম। স্কুলে ছুটী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রবাসী আপিসে টাকা আন্‌তে। সেখান থেকে বেরিয়ে মাণিকতলায় সেই দোকানটীতে কিছু খেয়ে বাসায় এসে আবার দুখানা কাগজ দেখে হাতমুখ ধুয়ে নিলুম। কিছু খেয়ে আটটার সময় বেরুনো গেল। স্টেশনে এসে প্রমোদ বাবু নেই। ভোরে এসে গালুডি পৌঁছানো গেল।

৩০শে মার্চ, ১৯৩৪। ১৬ই চৈত্র, ১৩৪০। শুক্রবার

সকালেই চা খেলুম। তারপর আমি ও বীরেশ্বরবাবু বলরাম সায়রে নেয়ে আসি। বেলা ৩৷৷০ টার গাড়ীতে সবাই মিলে এলুম রাখা মাইন্‌স্‌। সাধু বাবাজী যেখানে থাকেন সেই valley টাতেও বেড়াতে গেলুম। জ্যোৎস্না রাতে সত্যই অপূর্ব্ব দেখতে হয়েচে। অনেক রাত পর্য্যন্ত গল্প করলুম জ্যোৎস্নায় বসে।

৩১শে মার্চ, ১৯৩৪। ১৭ই চৈত্র, ১৩৪০। শনিবার

সকালে উঠে সবাই মিলে গরুর গাড়ীতে গেলুম নেৎড়া, রানীঝর্ণা। খেড়-জাতির বাড়ীতে আবার গেলুম। রানী ঝর্ণার খাদানের নীচে শালবনে চা করে খাওয়া গেল। ক'দিন ঘুম হয়নি। দুপুরে ঘুমিয়ে উঠে দেখি রাখামাইনের পাহাড়শ্রেণীর পিছনে সূর্য্য অস্ত গেছে অনেকক্ষণ। বাইরে বসেই চা খেলুম।

পট্টনায়েক ও কমপাউণ্ডার এল।

১লা এপ্রিল, ১৯৩৪। ১৮ই চৈত্র, ১৩৪০। রবিবার

সকালে উঠে কাপড়গাদি ঘাট[1] বেড়াতে গেলুম। রাখা মাইন ছাড়িয়ে জঙ্গল বেশ ঘন দুধারে। কাপড়গাদির মাঠ দেখ্‌তে ভারী চমৎকার। দুধারে খুব উঁচু পাহাড়—ছোট একটা ঝরণা একদিকে। বড় বড় পাথর ফেলা। এক ধরনের গাছ দেখতে ভারী লতানে। হেঁটে ফিরে এলুম। বৈকালে আমরা পড়লুম বেরিয়ে পায়ে হেঁটে। গালুডির পথের দুধারের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। ওপার থেকে অস্ত সূর্য্যের আভা মাখান গালুডির শোভা কি অপূর্ব্বই লাগ্‌লো! সুবর্ণরেখার জলে হাত মুখ ধুয়ে স্নিগ্ধ হওয়া গেল। মহাদেব ডুংরী ও সিদ্ধেশ্বর ডুংরী আবার কাছাকাছি এসেচে। এবার এখানে কোকিলের ডাক শুনলুম। রাত্রে চমৎকার জ্যোৎস্না উঠল। আমি স্টেশনে আট্‌কে গেলুম—স্টেশন মাস্টারের জামাই এসেচে [—] সেখানে ওরা চা খাওয়ালে। ইউরিপিডিসের কবিতা মুখস্থ বল্‌তে হোল। রাত্রে একা অনেকক্ষণ বসে বাইরে।

২রা এপ্রিল, ১৯৩৪। ১৯শে চৈত্র, ১৩৪০। সোমবার

অনেকদিন পরে আবার সকালে গালুডির বাংলোর পিছনে সেই শিলাখণ্ডের ওপর বসে লিখ্‌চি। দূরে রাখা মাইনের চিম্‌নী দেখা যাচ্চে। দূরে কোকিলও ডাকচে। সকালে উঠে নেক্‌ড়েডুংরী পাহাড়ের ওপারে বেড়াতে যাচ্চি—পাহাড়টা থেকে ডাক্তার নামলে—তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হোল। বিষ্ণু প্রধান এল—তার সঙ্গে জমির কথা বললুম—তারপর চা খেয়ে এসে এখানে বসে লিখচি। একটু বেলা হোল [—] বলরাম সায়েরে কি আরামেই স্নান করে এলুম। স্নান করে যখন ফিরচি—কলসী বাংলোর সাম্‌নের কচিপাতা ওঠা শালবন ও সাঁওতাল পাড়ার বাঁশঝাড়—মাথার ওপর অপূর্ব্ব রং এর নীল আকাশ, দূরের পাহাড়গুলো অস্পষ্ট —ধূসর রেখা—সবশুদ্ধ মিলে বর্ণাঢ্য শ্রী [—] এরকম অতি সুন্দর দৃশ্য অনেকদিন দেখিনি। ট্রেনে খুব ভিড় ছিল না—খড়্গপুর থেকে ভিড় হোল। মেদিনীপুরে কাছে এসে খুব শ্যামল মাঠ গাছপালাতে চোখ জুড়িয়ে দিলে।

৩রা এপ্রিল, ১৯৩৪। ২০শে চৈত্র, ১৩৪০। মঙ্গলবার

সকালে খাতা দেখে স্কুলে গেলুম। কাগজে পড়লুম বিখ্যাত শিকারী K. N. চৌধুরী কালাহাণ্ডি forest এ শিকার করতে গিয়ে বাঘের হাতে মারা গিয়েচেন কাল। কোলা এল—ওখান থেকে বঙ্গশ্রী আপিস হয়ে নীরদ বাবুর কাছে গিয়ে

১ ঘাটশিলার কাছে।

গল্প করা গেল। ট্রামে ফিরে এলুম।

৪ঠা এপ্রিল, ১৯৩৪। ২১শে চৈত্র, ১৩৪০। বুধবার

খাতা দেখে স্কুলে গেলাম। বঙ্গশ্রীতে খুব আড্ডা হোল—বেরিয়ে কলেজ স্ট্রীটে দুখানা বই কিনে আসচি—একটা ছোট গরীব মেয়েকে আর একটা ছেলে ঠ্যাঙাচ্চে—দেখে ভারী দুঃখ হোল। আড্ডি খোলা (?) আনন্দ দেয়, সত্যিকার আনন্দ। আজ কিন্তু ছোট্ট মেয়েটাকে ওরকম মারতে দেখে খুব দুঃখ পেলাম।

৫ই এপ্রিল, ১৯৩৪। ২২শে চৈত্র, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

স্কুল থেকে মৌলবী ও আমি সাঁকারীটোলা দিয়ে ফিরলুম। Kola আগে আগে যাচ্চিল [—] বাড়ী জিগ্যেস্ করি। ৫ খানা কাগজ দেখে ট্রামে চারু বিশ্বাসের বাড়ী গেলুম মিটিংএ। সেখানে এল চাঁদি বাবু। ক'জনে চা সিগারেট খেয়ে গল্প করলুম। তারপর আমি বায় হয়ে মনোজ বাবুর বাসায় গেলুম। অনেকক্ষণ গল্প গুজব করে রাত ৯।৹টার পরে বাসায় ফিরি। ৭ই মে এবার কাগজ দেবার শেষ দিন পড়েচে।

কার্জ্জন পার্কে একটু বেড়ালুম। একটা ছোট্ট সাহেবদের মেয়ে বেজায় দুষ্টুমি করচে তার আয়ার সঙ্গে। হাত দিয়ে রেলিং মুঠো করে ধরচে। শুয়ে পড়চে অথচ কাঁদচে না। ভারী সুন্দর দেখ্‌তে।

সাত ভাই চম্পার কথা·· নাটকাকারে পেয়ে--plot-টা মনে এসেচে।

৬ই এপ্রিল, ১৯৩৪। ২৩শে চৈত্র, ১৩৪০। শুক্রবার

কাগজ দেখে স্কুলে গেলুম।

সেখান থেকে বঙ্গশ্রী হয়ে বাসায় ফিরি। আবার কাগজ দেখি। কলকাতায় ক'দিন ধরে বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া বইচে। বৃষ্টির নামও নেই—তবে আকাশে কোনো কোনোদিন মেঘ দেখা যায়। এবার বৃষ্টি মোটেই হয়নি। বোধ হয় জ্যৈষ্ঠ মাসের দিকে বৃষ্টি হবে।

৭ই এপ্রিল, ১৯৩৪। ২৪শে চৈত্র, ১৩৪০। শনিবার

স্কুল থেকে বেরিয়ে পিয়নের কাছে গল্প করলুম। সুকুমারবাবু ও ডাঃ বটকৃষ্ণ ঘোষও এলেন। আমি ট্রামে বর্দ্ধমান রাজার বাড়ীর কমপাউণ্ডে মুচকুন্দ ফুলের গাছটা দেখতে গেলুম। তারপর গ্রে-স্ট্রীটের ট্রামে শ্যামবাজারের বন্ধুর বাসায় গেলাম। ফিরলুম বঙ্গশ্রীতে। অনাথবাবু প্যারিসের গল্প করলে—(?) ইত্যাদির। সেখান থেকে হেঁটে গোলদিঘী হয়ে বাসায় কাগজ দেখ্‌তে বসলুম।

৮ই এপ্রিল, ১৯৩৪। ২৫শে চৈত্র, ১৩৪০। রবিবার

সকালে মণি বোসের বাড়ীতে Garden & Gardening এর অদ্ভুত ছবি দেখ্‌লুম। তারপরে দুপুরে S.O.S. Icesberg দেখ্‌তে গেলুম Empire এ। বিরাট ছবি উত্তর মেরুর।

কর্জ্জন পার্কে অনেকক্ষণ বসে পড়লুম Wide World, ফিরচি বৌবাজার হয়ে [—] পথে তিনটি নক্ষত্র উঠেচে—মনে হোল এর মধ্যে এমনি যেন উড়ে যাবো—সকলকে ভালবাস্‌বার ইচ্ছে—হোল। একটী ছোট খুকী আমার কাছে পয়সা চাইলে ধর্ম্মতলা স্ট্রীটে—তাকে দিই নি বলে মনে কষ্ট হোল। মনে একটা অপূর্ব্বভাব। কোলা বলেচে তাকে মিউজিয়ামে নিয়ে যেতে। পথে অপূর্ব্ব[১] আর কে কে ফিরচে [—] ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে দেখা।

৯ই এপ্রিল, ১৯৩৪। ২৬শে চৈত্র, ১৩৪০। সোমবার

সকালে আলিপুর দিয়ে ট্রামে সুনীতি বাবুর বাড়ী কাগজ দিতে গেলুম। পথে পথে সুন্দর ছায়াতরু, নতুন পাতা গজিয়েচে, গড়ের মাঠের প্রাতঃকালীন শোভা মনকে স্পর্শ করে—আর আমার কেবলই কাল্‌কার বাগানের সৌন্দর্য্যের কথা মনে হচ্চে—capri islet[২] এর কথা মনে হচ্চে। খিদিরপুর হাউস্। বিজয় মল্লিকের মুচকুন্দ চাঁপার গাছটা দেখে আলিপুর হয়ে বালিগঞ্জে এলুম। সুনীতি-বাবুর বাড়ীতে প্রভাতবাবুর ও দক্ষিণাবাবুর ছেলেও এসেচে—বল্লে জ্যোৎস্নার খুব অসুখ। আমি ৮নং ট্রামে সিদ্ধেশ্বর বাবুর মূর্খতা স্বরূপ—বাড়ীটার সাম্‌নে দিয়ে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এসে একটা হোটেলে ভাত খেলুম। Stewart Island[৩] বলে একটা বই কিন্‌লুম। ছুটীর পর বঙ্গশ্রী। College Sqr. এ সত্যবাবুর সঙ্গে দেখা। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে P. C. Sircar এর দোকানে নিয়ে গেলাম।

১০ই এপ্রিল, ১৯৩৪। ২৭শে চৈত্র, ১৩৪০। মঙ্গলবার

স্কুলে কোলা ফাউণ্টেন পেন নিয়ে বড় গোলমাল করতে লাগ্‌লে। বঙ্গশ্রীতে গেলুম। সেখান থেকে ? কাছে। ট্রামে বাসায় এলাম [—] মহিমবাবু এল, গল্প-গুজব করা হোল। খাতা দেখলুম। Story of San Michel[৪] পড়চি—অতি

১ ? ছাত্র খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইন্সটিটিউশন।

২ দক্ষিণ ইটালি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্যে জায়গাটি বিখ্যাত।

৩ Stewart's Handbook of the Pacific Islands, সংকলয়িতা Percy S. Allen।

৪ Axel Martin-Munthe-এর স্মৃতিকথা। বইটির পুরো নাম The Story of San Michele.

চমৎকার বই।

১১ই এপ্রিল, ১৯৩৪। ২৮শে চৈত্র, ১৩৪০। বুধবার

চুল ছেঁটে স্কুলে যেতে দেরী হোল। অশোক খুব মার খেলে ক্লাসে। স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী—সেখান থেকে নিভার কাছে গেলুম। South Africa animal কিনে এনে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে অমিয় ও খিণ্টুর সঙ্গে দেখা। পথে নগেনদার বাসায় গেলুম। সুসার কাকার সঙ্গে সেখানে দেখা। তাঁর মুখে শুনলুম কালো এবারও বিয়ে পরীক্ষা দেয়নি। বাসায় চলে এলুম। রাত্রে খুব ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হোল। বেশ ঠাণ্ডা পড়্‌ল। এক একটা spark দিতে লাগ্‌ল বিদ্যুতের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড।

১২ই এপ্রিল, ১৯৩৪। ২৯শে চৈত্র, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

স্কুল থেকে বার হয়ে বঙ্গশ্রীতে অল্পক্ষণের জন্যে গেলুম। নীলের জন্যে সকালে ছুটী হোল। সেই নীলের সন্ধ্যা— পিসিমা নৈবিদ্যি নিয়ে যাচ্চেন—সেকথা মনে পড়ে। ইউনিভার্সিটিতে বি. এ. পরীক্ষা হচ্চে—সেখানে গিয়ে খানিকটা দাঁড়ালুম। আমি যেখানটাতে বসে খাবার খেলুম মাধববাবুর বাজার থেকে কিনে —সেখানটার কাছে। Sir P. C. Roy-র সঙ্গে বহুদিন পরে দেখা হোল। তাঁর সঙ্গে সায়েন্স কলেজে গেলুম তাঁর গাড়ীতে। তারপর পুরোনো প্রবাসী আপিসের চায়ের দোকানে চা খেয়ে বাসায় ফিরি।

১৩ই এপ্রিল, ১৯৩৪। ৩০শে চৈত্র, ১৩৪০। শুক্রবার

সকালে উঠে বনগ্রামে রওনা হলুম। মতিকাকার[১] সঙ্গে দেখা স্টেশনে। তিনি যাবেন শ্যামনগরে তাঁর মেয়ের বাড়ী। বল্লুম নাগপুরে আপনার এক বন্ধুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল—তিনি বল্লেন যে বন্ধুটি ঘটনাটা বলেছেন [—] তবে নামটা বল্‌তে পারেনি। এতদিন পরে সে কথাটা মতি কাকাকে বলা হোল। এবার অদ্ভুত লাগ্‌লো বাংলা! Bengal is superb. এই সকালে সঙ্গে সঙ্গে নতুন পাতা গজিয়েচে—শিমুল, ছাতিমগাছের নৃত্যভঙ্গি কি অদ্ভুত—শাখা প্রশাখার কি বিস্তার—কোকিল ডাকচে সর্ব্বত্র—C'est Grande[২]! বিশেষ করে এই চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে। এই ঘাস, এই সবুজ চক্‌চকে পাতার রাশি, এই ঘন ছায়া, এই গায়ক পাখীর ডাক, এই বেলফুলের গন্ধ—কোথাও নেই। যদি এর সঙ্গে জমি পাহাড়ে হোত—দিক চক্রবালে শৈলমালায় নীল দীর্ঘ

১ মতিলাল মুখোপাধ্যায়, বারাকপুরবাসী।

২ হওয়া উচিত c'est grand! [সে গ্রাঁ]; অর্থ—কী অপূর্ব!

রেখা থাকতো—মাঝে মাঝে পাথর থাকতো—বাংলার তুলনা ছিল না—জমিটা যদি উচ্চাবচও হোত—তা হলেও ভাল লাগ্তো। একঘেয়ে সমতল ভূমি সর্ব্বত্র —ঐ একটা মস্ত defect বাংলার। দেখে তো এলুম গালুডি, সিংভূম—গ্রীষ্মে সব মরুভূমি, ঘাসপোড়া, গাছে পাতা নেই, ছায়া নেই—খাঁ খাঁ করচে চারিদিকে, সবুজ নেই কোথাও। তুলনায় বাংলা এখন নন্দন কানন। নেই কেবল ফুল। Showy flower নেই।

১৪ই এপ্রিল, ১৯৩৪। ১লা বৈশাখ, ১৩৪১। শনিবার

এদিন রাত্রে খুব ঝড়-বৃষ্টি। শেষ রাতের দিকে খুব ঠাণ্ডা পড়ল। খয়রামারির মাঠে বৈকেলে বেড়াতে গেলুম—অদ্ভুত গাছের সমাবেশ—এমন গাছপালার বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য্য বাংলাদেশ ছাড়া আর কোথাও নেই—এর সঙ্গে যদি পাহাড় পর্ব্বত থাকতো। বীরেশ্বর বাবুর বাড়ীতে সন্ধ্যায় গল্প করছিলুম—তার পরে হাল খাতা করতে বেরুনো হোল। মিত্তের আড়তে বসে তামাক খেতে খেতে অনেক গল্পগুজব করা হোল। বৈকেলে স্বদেশবাবুর[১] firm [farm]-এ বেড়াতে গিয়ে ওঁদের ঝাঁড়াগাছের[২] ঝোঁপের তলায় বস্লুম। দীর্ঘ বাঁশবনের ডগাগুলোর এক অপূর্ব্ব শোভা!

রাত্রে খুব ঝড়। শেষ রাত্রে একটু বৃষ্টি হোল। বেশ ঠাণ্ডা পড়েচে।

১৫ই এপ্রিল, ১৯৩৪। ২রা বৈশাখ, ১৩৪১। রবিবার

সকালে খুব ঠাণ্ডা। কাগজ দেখলুম। উঠে বিভূতির আড়তে বসে গল্প করলুম। তারপর বীরেশ্বর বাবুর বাসায় ও যতীন ডাক্তারের বাড়ী বসে গেলাম। সে খাবার খাওয়ালে। স্নান করে গিয়ে বড় আরাম হোল। ইচ্ছামতীর কালো জলে অবগাহন স্নান কর্ত্তে কর্ত্তে ভাবলুম ও সপ্তাহে এদিন বলরাম সায়েরে স্নান করেচি। খেয়ে উঠে গজেন এল—তারপর ভোলানাথ বাবু এলেন। বৈকালে বেরুলুম স্টেশনে—কল্কাতায় গেলুম। "The soul requires more space than the body"···স্টেশনে এলুম। আজ আর ট্রেনটাতে কষ্ট লাগ্ল না। 'Story of San Michele' পড়তে পড়তে এলুম। এসে কাগজ তৈরী করলুম। কাল সকালে সুনীতিবাবুর বাড়ী যাবো।

১৬ই এপ্রিল, ১৯৩৪। ৩রা বৈশাখ, ১৩৪১। সোমবার

সকালে খাতা নিয়ে সুনীতি বাবুর ওখানে। সেখানে এলেন বারীনদা[৩]

১ ? স্বদেশ চাকলাদার।

২ Cupressus sempervirens Linn.। সংস্কৃতে সুরভ।

৩ বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, বিপ্লবী নেতা ও যুগান্তর পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা।

সস্ত্রীক। আমি দক্ষিণাবাবুর বাড়ী গিয়ে শুনলুম জ্যোৎস্না পাগল হয়ে গেছে।

পরেশদের দোকানে একটু খেয়ে স্কুলে এলুম। তারপর স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী। হেঁটে গোলদীঘী দিয়ে বাসা।

১৭ই এপ্রিল, ১৯৩৪। ৪ঠা বৈশাখ, ১৩৪১। মঙ্গলবার

সকালে কাগজ দেখি। তারপর নীরদের বাসায় গেলাম। নীরদ নেই। নীরদের স্ত্রীর সঙ্গে খানিকটা গল্প করা গেল। চা খাওয়ালে—একটা গাছ দেখিয়ে বল্লে acacia[১]। ওখান থেকে বন্ধুর বাসায় এলাম। বন্ধুর স্ত্রী আছে—আর কেউ নেই। তারপর ট্রামে স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী। তারপর পরিমলের সঙ্গে হেমন্তের বাড়ী গেলাম। সেখান থেকে বাসায় ফিরি।

১৮ই এপ্রিল, ১৯৩৪। ৫ই বৈশাখ, ১৩৪১। বুধবার

কাগজ দেখে স্কুল। ওখান থেকে বঙ্গশ্রী। সজনী নেই। ৫টার সময় চলে এলুম ও আবার ৫ খানা কাগজ দেখি। তারপর ফিরে এলুম বাসায়। একটু কলেজ স্কোয়ারে বেড়িয়ে। নীরদবাবুরা তখনও গালুডি থেকে ফেরে নি।

১৯শে এপ্রিল, ১৯৩৪। ৬ই বৈশাখ, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

স্কুল থেকে বাসায় এসে কাগজ দেখি ও প্রবাসীর জন্য 'দৃষ্টিপ্রদীপে'র কপি তৈরী করি। আর কোথায় বেরুইনি।

২০শে এপ্রিল, ১৯৩৪। ৭ই বৈশাখ, ১৩৪১। শুক্রবার

কাগজ দেখে স্কুলে গেলুম। সকালে ছুটী হোল। বঙ্গশ্রী আপিসে ছোটমামা এল। ডাঃ বাগচি এলেন। আঙ্কর ভাটের[২] কথা জিগ্যেস্ করলুম। ছোটমামার সঙ্গে ওয়াছেন মোল্লার দোকান হয়ে বৃষ্টি মাথায় ট্রামে বাসা।

২১শে এপ্রিল, ১৯৩৪। ৮ই বৈশাখ, ১৩৪১। শনিবার

আজ প্রথম সকালে স্কুল হোল। কোলাদের পরীক্ষা ও পরের ঘরে গিয়ে ডিবেটিং ক্লাবে গেলুম। বাসায় আসবার পথে সনৎ[৩] ও পঙ্কজ[৩] আমার সঙ্গে বাসার পর্য্যন্ত এল। আমি একটু ঘুমিয়ে উঠে খাতা দেখে প্রবাসীতে গেলুম। সেখান থেকে বার হয়ে ট্রামে ? কাছে গিয়ে উঠে কর্জ্জন পার্কে গিয়ে 'Story of San Michele' এ blue eyed [?] এর কথা ও Messina র[৪]

১ বাবলা।

২ কাম্বোডিয়ার বিখ্যাত মন্দির।

৩ ছাত্র, খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইন্সটিটিউশন।

৪ ইটালির এক বন্দর। ১৯০৮ সনে এখানে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়।

ভূমিকম্পের কথা পড়লুম। হেঁটে বাড়ী চলে এলুম তারপর।

২২শে এপ্রিল, ১৯৩৪। ৯ই বৈশাখ, ১৩৪১। রবিবার

সকালে মণিদের বাড়ী। সেখান থেকে বাসন্তী দেবীর[১] বাড়ী ও কালিদাস নাগের ওখানেও গেলুম। কালিদাস নাগের অসুখ হয়েচে—দেখতে গেলুম। তারপরে বাসায় এসে দেখি—অমিয় বসে আছে। তার সঙ্গে উপেন বাবুর বিচিত্রা আপিসে। সেখানে ডাব সন্দেশ খেয়ে ট্রামে শ্রীরামপুরে। খুকী ও প্রতিমার সঙ্গে দেখা হোল। চা খাওয়ালে। সভায় বক্তৃতা করা গেল। রাত্রে লীলাদির বাড়ীতে খাওয়া হোল। সাড়ে দশটার ট্রেনে চলে এলুম।

২৩শে এপ্রিল, ১৯৩৪। ১০ই বৈশাখ, ১৩৪১। সোমবার

সকালে স্কুল। ওখান থেকে এসে দুপুরে মহিমাবাবু এল। তারপর বিকেলে কাগজ দেখে রামরাজাতলায় ননীর বাড়ী গেলুম। বেশ ছায়া পড়েচে। অনেকদিন পরে গাছপালা বেশ লাগ্‌ল। প্রথমে যখন গেলুম যতু ছিল, ননী আপিসে কাজ কর্ত্তে গিয়েচে। যতু চা খাওয়ালে। গল্প করচি—এমন সময় ননী এল। গালুডির গল্প, হিমালয়ের গল্প নানা গল্প হোল। বাসে ফিরলুম। গাছপালা, জ্যোৎস্না—বেশ লাগ্‌ছিল।

২৪শে এপ্রিল, ১৯৩৪। ১১ই বৈশাখ, ১৩৪১। মঙ্গলবার

সকালে এবারকার মত ইউনিভার্সিটীর কাগজ দেখা শেষ হোল। বঙ্গশ্রীর লেখাও[২] শেষ হোল। স্নান করে এসে More heroes of Adventure বইখানা পড়ছিলুম। দুপুরে খেয়ে শুয়ে রইলুম। কেবলই ভাব্‌চি হাতের কাজ শেষ হোল এতদিনে।

বৈকালে বিভূতিদের বাড়ী। বিভূতিকে ঘণ্টুর চেয়ে খারাপ বলাতে ওর রাগ হোল। তারপর ওর মুখে দার্জ্জিলিং এর গল্প শুনলুম। চা ও খাবার নিয়ে এল। তারপর নিমতলা ঘাটে গেলুম কতকাল পরে। বন্ধুর শ্বশুরকে দাহ করার পরে আর কখনও যাইনি। সে হোল ১৯১৬ সালের কথা। ১৮ বছর পরে গেলুম। গঙ্গার ধার দিয়ে হেঁটে ভগবতী প্রসন্ন সেন কবিরাজের বাড়ী গিয়ে গিরিজা বাবুর খোঁজ করি। গিরিজা বাবু নেই। বৃষ্টি এল। কুমোরদের দোকানে একটু বসে ট্রামে কলুটোলা এসে নামলুম। ফৌজদারী বালাপাতায় (?) তামাক কিনে

১ চিত্তরঞ্জন দাশের স্ত্রী।

২ সম্ভবতঃ বঙ্গশ্রীর 'বিচিত্র জগৎ' ফীচারের লেখা। জ্যৈষ্ঠের বঙ্গশ্রীতে বিভূতিভূষণের 'প্যারিস হইতে স্থলপথে কাশ্মীর' নামে একটি লেখা বেরয়।

বাড়ী এলাম।

২৫শে এপ্রিল, ১৯৩৪। ১২ই বৈশাখ, ১৩৪১। বুধবার

সকালে বসে পড়লুম Heroes of Adventure. দুপুরে ঘুম থেকে উঠে গড়িয়াহাটা রোড্ দিয়ে হেঁটে চলে গেলুম রাজপুরে। মৃত্যুঞ্জয়দের বাড়ী গিয়ে জল খেলাম। ভম্বলের সঙ্গে দেখা হোল। আশু চক্রবর্তী[1] বাড়ী বসে ডাব খেলুম। বোস্‌পুকুরে গিয়ে বস্‌লুম। তারপর ভম্বলদের বাড়ী [—] সেখান থেকে নিয়ে গেল রিপন লাইব্রেরীতে। মোটরে স্টেশনে ফিরলুম। তারপর কলিকাতায়।

২৬শে এপ্রিল, ১৯৩৪। ১৩ই বৈশাখ, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

সকালে স্কুল। তারপর দুপুরে ঘুমিয়ে লাইব্রেরীতে গিয়ে আসাদুল্লার কাছ থেকে private reading room নিলুম। অমূল্য বিদ্যাভূষণের[2] সঙ্গে আলাপ হোল। তিনি Encyclopedia করবেন বাংলায় বল্লে। বেরিয়ে বঙ্গশ্রীতে আস্‌তেই সজনী বল্লে পশুপতি বাবু ফোন্ করেছিলেন তিনি Eskimoর টিকিট কিনেচেন আমার জন্যে। বাসে গেলুম। Eskimo দেখ্‌লুম। পশুপতিবাবু, বৌঠাকুরুণ. দাদামশায়,[3] খুকী[4]। সবশুদ্ধ মোটরে ফিরলুম। আমি নাম্‌লুম College square এ।

২৭শে এপ্রিল, ১৯৩৪। ১৪ই বৈশাখ, ১৩৪১। শুক্রবার

সকালে স্কুল থেকে এসেই খেয়ে দেয়ে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী। মতিলালের সঙ্গে গল্প হোল। Abyssinia সম্বন্ধে ও Mayer Civilization সম্বন্ধে বই পড়চি।

দেখ্‌লুম নীরদবাবুরা এসেচেন। আমি বঙ্গশ্রীতে গিয়ে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ফিরে আস্‌চি—কোলা ও অন্যান্য ছেলেরা আমায় ডাক্‌লে। অদুও ছিল। ফুটবল খেল্‌চে। আমি রেফারিগিরি করলুম। তারপর নীরদবাবুর বাসায় গিয়ে প্রমোদ-বাবু ও আমরা রাত দশটা পর্য্যন্ত আড্ডা ও গালুভির গল্প।

১ রাজপুরবাসী।

২ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ; ইনি বঙ্গীয় মহাবোধি নামে এক বিরাট অভিধানের কাজ শুরু করেন, কিন্তু অকালমৃত্যুতে সে কাজ তিনি শেষ করে যেতে পারেননি।

৩ শরৎকালী মুখোপাধ্যায়, বারাকপুরবাসী; খুকুর শ্বশুর।

৪ খুকু।

২৮শে এপ্রিল, ১৯৩৪। ১৫ই বৈশাখ, ১৩৪১। শনিবার

স্কুলে গেলুম একটু ঘুরে। সেখান থেকে এসেই ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী। ওখান থেকে বেরিয়ে চশমা সারিয়ে সুপ্রভাদের হোস্টেলে। সুপ্রভা সরবৎ ও সন্দেশ খাওয়ালে। আরও ২।৩টী মেয়ে এল। ওখান থেকে বার হয়ে শ্যামবাজারে বন্ধুদের বাসায় গিয়ে পুরোনো গল্প করলুম। ট্রামে বাসায় আসবার পথে রমেশ সেনের আড্ডা দেখে এলাম। ১৭নং বেচু চাটুয্যের স্ট্রীটে রেবতী? দেখতে গেলুম—তিনি নেই।

২৯শে এপ্রিল, ১৯৩৪। ১৬ই বৈশাখ, ১৩৪১। রবিবার

সকালে মণি বোসের বাড়ী। ধূর্জ্জটী এল। সুধীর, শচীন সেন এরাও ছিল। বাড়ী ফিরে শুনি হুটুর কাছে প্রমোদ বাবু এসেছিলেন। খেয়ে Teacher's Conference এ গেলুম বৌবাজার স্কুলে। সেখান থেকে নীরদ বাবুর flat-এ [—] প্রমোদ বাবু এলেন [—] অনেক গল্প করলুম। Conder (?) এর ডিম যোগাড় করা ইত্যাদি। অনেকরাত্রে বাড়ী।

৩০শে এপ্রিল, ১৯৩৪। ১৭ই বৈশাখ, ১৩৪১। সোমবার

স্কুল থেকে ফিরবার পথে ভীমের দাদা ওদের বাড়ী নিয়ে গেল। অনেকদিন পরে গেলুম। খেয়ে একটু ঘুমিয়ে উঠেই লাইব্রেরী। মতিলালের সঙ্গে ইন্‌কামট্যাক্স কোর্টের কাছে গল্প গুজব করচি—সুধীন ও জ্ঞানবাবু এল। আমার সঙ্গে প্রাইভেট রিডিং রুমের সিট্ নিয়ে একজনের সঙ্গে গোলমাল হোল। তারপর আমি একটু পড়ে বঙ্গশ্রীতে এলাম। সেখান থেকে পরিমল, কৃষ্ণধন ও আমি বেরিয়ে বাসায় আসচি। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে অপুর সঙ্গে দেখা। একটা বেঞ্চিতে বসে আমরা পরিমলের গল্প শুনচি। আলুকাবলি খেলুম। চলে এলুম তারপরে। পথে পরিমল অন্যদিকে গেল। আমি ও কৃষ্ণধন সরবত্ খেলুম মৃজাপুরের মোড়ে। খুব ঝড় উঠেচে। ধুলোয় অন্ধকার।

১লা মে, ১৯৩৪। ১৮ই বৈশাখ, ১৩৪১। মঙ্গলবার

১লা মে। সকালে স্কুলে যেতে দেবব্রতের সঙ্গে দেখা হোল। তারপর স্কুলে গেলুম। এসে খেয়েই ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে গেলাম। সুরেন কুমারের সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা হোল। বার হয়ে বঙ্গশ্রীতে এলাম। নিখিল বাবুর[১] গাড়ীতে বার হয়ে আসচি—প্রশান্ত মহলানবিশ গাড়ী নিয়ে ঢুকলো। তার সঙ্গে আলাপ

১ পুস্তক ব্যবসায়ী নিখিলচন্দ্র দাস।

হোল। নিখিলের গাড়ীতে বিচিত্রা আফিসে এসে দেখা পেলুম না কারুর। শরৎ বাবু তামাক খাওয়ালে। বন্ধুর ডিস্‌পেন্সারীতে বস্‌তেই ভয়ানক বৃষ্টি এল। হরিপদ সরকার সেখানে বসে। হেঁটে রমেশ সেনের দোকানে। সরোজ বসে, গোপেন বাবু বসে। ওদের সঙ্গে আস্‌চি—নরেনের সঙ্গে দেখা। নরেন বাসায় এল। অনেক পুরোনো কথা হোল। চারুবাবুর কথা হোল।

২রা মে, ১৯৩৪। ১৯শে বৈশাখ, ১৩৪১। বুধবার

সকালে স্কুল। দুপুরে একটার সময় ঘুমিয়ে উঠে আমহার্স্ট স্ট্রীটে পোস্টাফিসে গেলাম সেভিংস ব্যাঙ্কের খাতার জন্য। তারপর College St. ট্রামে বঙ্গশ্রী। সেখান থেকে বিচিত্রা। উপেনবাবুর কাছ থেকে বহুকাল পরে Geographical Magazine নিয়ে এলুম। আবার বঙ্গশ্রী ও তারপর ইউনিভার্সিটীর কাগজ নিয়ে বঙ্গশ্রী আপিস হয়ে বাসে সুনীতিবাবুর বাড়ী। পথে সিদ্ধেশ্বর বাবুর বালিগঞ্জের বাড়ীটা দেখ্‌লুম। সুনীতিবাবুর ওপরের বারান্দাতে গল্পগুজব হোল। একটা মেয়ের ফটো দেখালেন। ধীরেন এল। হুগলী কলেজের একটা প্রফেসার বল্লে আপনার বই সম্বন্ধে লিখেচে। তারপর বালীগঞ্জে ট্রেনে চড়ে মেসে এলুম রাত দশটা।

৩রা মে, ১৯৩৪। ২০শে বৈশাখ, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

সকালে স্কুল। বৈকালে প্রথমে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে উঠে নীরদবাবুদের flat এ রাত দশটা পর্য্যন্ত আড্ডা হোল।

এদিন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে সুপ্রভার সঙ্গে দেখা হোল।

৪ঠা মে, ১৯৩৪। ২১শে বৈশাখ, ১৩৪১। শুক্রবার

সকালে স্কুল। ফিরবার পথে ভাব্‌লুম দার্জ্জিলিং এর ভাড়া জেনে আসি। দার্জ্জিলিং যাবো না ঠিক করলুম। এদিন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী গিয়ে পড়াশুনো করলুম। তারপর নীরদবাবুর flat এ রাত দশটা পর্য্যন্ত গল্প। খুব ঝড়বৃষ্টি এল।

৫ই মে, ১৯৩৪। ২২শে বৈশাখ, ১৩৪১। শনিবার

সকালে স্কুল থেকে এসে ঘুমুনো গেল। বৈকালে একটা ছেলে এল। তার সঙ্গে বঙ্গশ্রী আফিস। আমি আর পরিমল বেরিয়ে পুরোনো বইয়ের দোকান ঘুরে কলেজ স্কোয়ারে দুজনে বসে Book Company দোকানে গেলুম। তারপর বাসায় এসে গল্প লিখ্‌লুম 'বুলবুলে'র জন্যে।

৬ই মে, ১৯৩৪। ২৩শে বৈশাখ, ১৩৪১। রবিবার

সকালে প্রথমে ললিতের ওখান থেকে এসে মণি বোসের বাড়ী গেলুম।

সেখান থেকে ফিরে লিখ্‌লুম। বৈকালে সাহিত্য পরিষদে গিরীন্দ্রশেখর বাবুর[১] মহাভারতের তারিখ সম্বন্ধে বক্তৃতা শুন্‌তে গেলুম। তারপর যাই নীরদের বাড়ীতে। নীরদের স্ত্রী এসে বস্‌লো। অনেকরাত পর্য্যন্ত ছিলুম। রাত দশটার সময় বাসে ফিরি।

৭ই মে, ১৯৩৪। ২৪শে বৈশাখ, ১৩৪১। সোমবার

সকালে স্কুল থেকে আস্‌বার সময় দেবব্রতের বাড়ীর দোরে দেবব্রত ছিল। দুপুরে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী গেলুম পোস্টাপিস্‌ হয়ে। তারপর কর্জ্জন পার্কে বসে একটী সিগারেট খেয়ে বঙ্গশ্রীতে এসে ডাঃ সুশীল দের সঙ্গে গল্প গুজব করা গেল। ক্ষিতিমোহন সেনের বক্তৃতা শুন্‌লুম। রাত্রে ট্রামে ফিরে এসে আবার লিখ্‌লুম। আজ দুপুরে কলেজ স্ট্রীটে ট্রামে ওঠ্‌বার সময় মতি কাকার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। মতিকাকা retire করেছেন এবং শ্যামনগরে আছেন।

সেই মতিকাকা প্রথম খড়্গপুর চাকুরী নিয়ে বলেছিলেন মাছের দাগা খেতে দেয়। সেইদিন আর আজকার দিন। ১৯০৬ আর ১৯৩৪।

৮ই মে, ১৯৩৪। ২৫শে বৈশাখ, ১৩৪১। মঙ্গলবার

সকালে ললিতের বাড়ী গিয়ে বাইরের রোয়াকে বসে রইলুম। মেয়েরা ছেলেরা স্কুলে যাচ্চে। তারপর গিয়ে ডাকলুম, শুন্‌লুম বেরিয়েচে। আমি একটা নাপিত ডেকে নখ কেটে স্কুলে গেলুম। দেবব্রত মোড় দিয়ে গেল। স্কুল থেকে বেরিয়ে এসে একটু ঘুমিয়ে বিচিত্র জগৎ, প্রবাসীর সমালোচনা[২] লিখ্‌লুম। ৪টার সময় ট্রামে নীরদ বাবুর flat এ গিয়ে চা খাই ও গল্প করি। সুশীল বাবু এলেন। ওখান থেকে নিউ সিনেমাতে প্রেমাঙ্কুর বাবুর[৩] সঙ্গে দেখা করলুম বনগাঁয়ের থানার ছেলেটার জন্যে। ট্রামে ডাঃ সুশীলদের বাড়ী। ঢাকার কথাবার্ত্তা হোল। তারপর নীরদ চৌধুরীর flat এ। নীরদের স্ত্রী খাবার নিয়ে এল। রাত দশটা পর্য্যন্ত ম্যাপ সম্বন্ধে গল্প হোল। বাসে ফিরে লিখ্‌লুম।

৯ই মে, ১৯৩৪। ২৬শে বৈশাখ, ১৩৪১। বুধবার

সকালে ললিতের বাড়ী গেলাম। সেখান থেকে স্কুল। কোলা গল্প শুন্‌তে

---

১ মনস্তত্ত্ববিদ্‌ গিরীন্দ্রশেখর বসু।

২ প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৪১-এ বিভূতিভূষণ তিনটি বইয়ের সমালোচনা লেখেন। মাতৃমূর্তি, রেবতীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের; সোনার খনির সন্ধানে, অমৃতলাল গুপ্তের এবং মৃত্যু ও পরলোকতত্ত্ব, মহেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরীর।

৩ প্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

চাইলে। স্কুলে ম্যাজিক হোল। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে Life of Jesus[১] পড়লুম Midolton [Middleton] Murry-র। ওখান থেকে বঙ্গশ্রীতে এসে স্যানডউইচ ও কেক্ খাওয়া গেল। নিখিলদার গাড়ীতে College Square এ পি. সি. সরকারের দোকান। বারীন্দ্র ঘোষ ও বৌদি পথ দিয়ে গেল। সেখান থেকে বাসা।

১০ই মে, ১৯৩৪। ২৭শে বৈশাখ, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

সকালে স্কুলে থেকে এসে একটু ঘুমিয়েপ্রথমে আমহার্স্ট স্ট্রীট পোস্টাপিসে— তারপর সেখান থেকে G. P. O. ও তার নানা ডিপার্টমেন্টে। ওখান থেকে বার হয়ে কিশোর কাকার আপিসে—২৲ টাকা আদায় করলুম বসে বসে। তারপর ওখান থেকে বার হায় হেস্টিংস স্ট্রীটে P. C. Sircer এর দোকানে। দোকান এলেন রমাপ্রসাদ মুখুয্যে কি বই কিনতে। তারপর এলুম ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে Life of Jesus পড়তে। সন্ধ্যায় সেখান থেকে উঠে কর্জ্জন পার্কে গেলুম এবং ট্রামে উঠে মণীন্দ্রবাবুর বাড়ী পার্ক সার্কাসে। অনেক রাত পর্য্যন্ত সেখানে গল্প করলুম। খেলুম, কত পুরোনো দিনের ঘটনা আলোচনা হোল।

১১ই মে, ১৯৩৪। ২৮শে বৈশাখ, ১৩৪১। শুক্রবার

সকালে ছেলেরা খাওয়ালে। কাল খুব মাংস খাওয়া গিয়েচে। ওখান থেকে বার হয়ে কোলা ও আমি এক সঙ্গে চলে এলুম। এসে দেখি Nash's (?) Magazine ফেলে গিয়েচে। আমি তেল ও দাড়ি কামানোর সাবান নিয়ে ফিরলুম। দুপুরে ভয়ানক গরম। একটু ঘুমিয়ে প্রবাসীর কপি লিখ্‌লুম।

বৈকালে বঙ্গশ্রী। দোকান থেকে Square এ গিয়ে বস্‌লুম—শশধরের সঙ্গে দেখা। সে পড়িয়ে এসে বস্‌লো। বল্লেন থার্ডক্লাসের ছেলের খুব খাইয়েচে। কাল ছুটী হবে।

আমি পুরোনো দোকান দেখ্‌তে দেখতে ? তামাকে কিনে বাসায় এলাম। একটা এ্যাটাসি কেস্ কিনে আন্‌লুম। রাত্রে এসে feast হোল।

খুব খাওয়ালে। আজ খুব গরম [—] পথে হাওয়া খুব। বৃষ্টি হয়নি কতকাল। দুপুরে ঘুমোনো যায় না খাটে।

১২ই মে, ১৯৩৪। ২৯শে বৈশাখ, ১৩৪১। শনিবার

সকালে স্কুল গেলুম। আজকাল বেশ লাগে কোলাকে ? ওরা সব খাওয়ালে।

১ The Life of Jesus, John Middleton Murry।

তারপর কোলাকেও খাওয়ালুম বিভিন্ন ক্লাসে। আমায় দেখে বিশ্বনাথ[১] আবার পালিয়ে গেল। কোলা থামের আড়ালে লুকালো। দুপুরে চুল কেটে একটু শুয়েচি—পশুপতিবাবু এলেন। আমি বার হয়ে পোস্টাপিস্ [—] সেখান থেকে ছাতা সারিয়ে প্রবাসী। বাসায় গিয়ে কাপড় ছেড়ে ট্রামে বঙ্গশ্রী। সেখান থেকে ওয়েলিংটন Sqr.-এ? ট্রামে সুপ্রভাদের হোস্টেলে। সুপ্রভা বল্লে আপনাকে খাওয়াতে ভাল লাগে। তারপর সাহিত্য সেবক সমিতিতে উপেনবাবু, জলধরদা[২], সত্যেন্দ্রবাবু, গোপেনবাবুর ছেলে—এদের সঙ্গে দেখা করে আস্‌চি [—] পথে মতিবাবু ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর আসাদুল্লা ও কুমারের সম্বন্ধে বল্লে। আমি আইস্‌ক্রীম খেয়ে বাসায় এলাম। রাত্রে কত গান গাই। 'বেয়ু হে চল? চল' ইত্যাদি।

১৩ই মে, ১৯৩৪। ৩০শে বৈশাখ, ১৩৪১। রবিবার

এবার কলকাতা এত ভাল লেগেছিল যে ছেড়ে যেতে কষ্ট হোল। affaire de' coeur[৩] এখানে বেশী। ভোরের ৫-৪০ গাড়ীতে রওনা হলাম। বেশ ঠাণ্ডায় বনগাঁয়ে গিয়ে পৌঁছলাম। বাজার কর্ত্তে গিয়ে মিত্তের আড়তে বসে অনেকক্ষণ গল্প করা গেল। বঙ্কু আবার মদ খেয়ে হল্লা করেচে নাকি কালরাত্রে। উঠে নদীতে স্নান করে এলাম। তারপর হেডমাস্টার ও হেডপণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে শ্মশানের কালীঠাকুর দেখে এলাম ও স্বদেশবাবুদের বাংলায় গেলাম। আমি ও হেমবাবু স্কুলের পৈঠায় বসে গল্প করলুম অনেকরাত্রে। তারপর এসে যতীশ ডাক্তারের ওখানে বসে গল্প করলুম। খাওয়া দাওয়ার পর চেয়ার নিয়ে ফুটবলের মাঠে। রাত বারোটা পর্য্যন্ত বসে। মাস্টার সাহেব এল—তার সঙ্গে গল্প করলুম।

১৪ই মে, ১৯৩৪। ৩১শে বৈশাখ, ১৩৪১। সোমবার

কল্‌কাতাকে এখনও মনে হচ্চে—একটা বেশ মধুর স্মৃতির মত—বিশেষ করে এখন। আজ রাত্রে বেজায় গরম—যেন সেদ্ধ করল গরমে। তারপর বঙ্কুর মোটরে বারাকপুর গেলুম। খুড়ীমা আম খাওয়ালে। খুকু এল। রামপদ হালুয়া খাওয়ালে। ফিরে এসে মোটরে বনগ্রাম ও নদীতে স্নান করে এলুম তৃপ্তির সঙ্গে। ঘুম থেকে উঠে বঙ্কুর ওখানে গেলুম। হাট করে ফিরচি—বীরেশ্বরবাবুর সঙ্গে দেখা। তারপর খয়রামারি বেড়িয়ে এসে অনেক রাত পর্য্যন্ত বীরেশ্বরবাবুর

১ ছাত্র, খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইন্সটিটিউশন।

২ সাহিত্যিক জলধর সেন।

৩ [অ্যাফেয়ার দ কার]; অর্থাৎ আকর্ষণ।

সঙ্গে গল্প করি।

রাত্রে ফিরবার পথে যতীন ডাক্তার বসে বসে গল্প করলে কি করে বাড়ী করছিল—সেই সব সম্বন্ধে।

১৫ই মে, ১৯৩৪। ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। মঙ্গলবার

সকালে উঠে খয়রামারিতে বেড়িয়ে এলুম। তারপর—বীরেশ্বরবাবুর সঙ্গে গিয়ে গল্প করি। ফিরবার সময় স্কুলে আবৃত্তি হচ্চে দেখ্‌তে গেলাম। পক্ষধর মিশ্র ও রঘুনন্দনের ভূমিকা অভিনয় করচে সন্তু[1] ও আর একটি ছেলে। বিকেলে নৌকায় বারাকপুর এলাম। দুধারের দৃশ্য অপূর্ব্ব। গাছপালার এত প্রাচুর্য্য ও শ্যামলতা কোথাও নেই—থাক্‌তে পারেও না—এ tropical প্রাচুর্য্য সত্যিই কোথায় পাওয়া যাবে।

ঘাটে জেলি, ন'দি যাচ্চিল—ওদের দিয়ে জিনিসপত্র আনালুম। সন্ধ্যা হয়ে গেল। বাইরে চেয়ার পেতে বসে গালুডি ভ্রমণের গল্প করলুম। রাত্রে ছাদে তাস খেলা হোল ও বেশ হাওয়ায় ঘুমুনো গেল।

১৬ই মে, ১৯৩৪। ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। বুধবার

সকালে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গেলাম। এবার আম পেকেছে খুব শিগ্‌গির। হাজরী জেলে পাগলা জেলে তলায় তলায় আম কুড়িয়ে বেড়াচ্চে। সোঁদালি ফুলের রূপ—সর্ব্বত্রই অপূর্ব্ব। এত বৃক্ষলতার প্রাচুর্য্য ও বৈচিত্র্য, এত শ্যামলতা এই নিদারুণ গ্রীষ্মকালেও। এত ছায়া—কোনো দেশেই নেই। বকুলতলায় পাটী পেতে বসে 'দৃষ্টিপ্রদীপ' লিখ্‌লাম। মনোরমা আম নিয়ে এল আমার জন্যে —বল্লে, জ্যাঠামশায় আমার খাতায় নাম লিখে দেবেন? খুকু এসে গল্প করলে। নগেন খুড়ো বাড়ী এল [—] ওর অক্ষয় তৃতীয়ার কলসী-উৎসর্গ আয়োজন করতে লাগ্‌লো। তারপর আমি স্নান করে এলাম আমাদের পাড়ার ঘাট থেকে, বিকেলে উঠোনে চেয়ার পেতে বসে Wide World এ ? letters of algiers পড়ছিলাম। নদীর ধারে সোঁদালি বনের ছায়ায় দুর্ব্বা [দূর্ব্বা] ঘাসের ওপর গিয়ে অনেকক্ষণ বসলুম। রাত্রে এসে ছাদে শুয়ে পড়ি। রাত্রে অনেকরাত পর্য্যন্ত আমবাগানে আলো হোল [—] সলতে খাগীতলায় আম কুড়ুচ্চে।

১৭ই মে, ১৯৩৪। ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

ভোরে উঠে স্নিগ্ধ হাওয়ায় কুঠীর মাঠে বেড়াতে গেলাম। এত গাছপালা কোথায় আছে! এ বৈচিত্র্য, জাম, খেজুর, কাঁঠাল, নারকেল, বাঁশ, আম—এত

১ সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, বারাকপুরবাসী

ছায়া [—] ডালপালার ভঙ্গি—এসব সত্যিই অপূর্ব্ব। ও পাড়ার ঘাটটী বেশ বালি। এখনও ফণিকাকাদের গাছে আম পাকেনি। ওপাড়ার ঘাট থেকে স্নান করে এলুম—ঘাটের ধারে ঝাড় ঝাড় সোঁদালি ফুল ফুটেচে। ঘাটে বাঁধন দিয়েচে, বেনে জেলের[১] গাছটাতে খেজুর এখনও পাকেনি। কি space এর আনন্দ। বকুলতলায় বসে Galsworthy-র সম্বন্ধে পড়লুম। Galsworthy যে মারা গিয়েচেন—এই প্রথম টের পেলাম। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে হাটে গেলাম। কি বিরাট বনস্পতি পথের দুধারে। এসব দেখ্‌বার যেন নতুন চোখ খুলচে আমার। কি দেশেই বাস করতুম অথচ চিন্‌তুম না—৪০ বছর পরে আজ চিনলাম। সামনের দোকানে তামাক খাওয়ালে। হরিপদ দা আজই শ্বশুর বাড়ী থেকে ফিরচে—আলাপ হোল। খগেন মামার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম নগেন খুড়োর জমির কেসের নালিশ—সম্বন্ধে। রাত্রের ট্রেনে ন'দি ও নগেন রানাঘাটে গেল। আমি ও খুড়ীমা সেকালের গল্প করি ছাদে শুয়ে।

১৮ই মে, ১৯৩৪। ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। শুক্রবার

সকালে কুঠীর মাঠে ঘুরে এলাম। তারপর ছাদের ওপর লিখ্‌তে বসি। অনেকক্ষণ লেখার পরে স্নান করে এসে বকুলতলায় বস্‌লুম। বারাকপুরের জীবনে মজে গিয়েচি—কলকাতা যেন ভুলেই গিয়েচি। পাঠশালা করলুম—অনেক ছেলেপিলে এল। মনোরমাদের পড়ালুম। তারপর নারানদার সঙ্গে গল্প করে এসে লেখা গেল এক পাতা। কুঠীর মাঠে গেলাম তারপরে। খুব মেঘ করেচে। ঝড় উঠচে। কুঠীর মাঠের নদীর ধারে অপূর্ব্ব শোভা। সোঁদালি ফুলের ঝাড় বাতাসে দুলচে। নরম দূর্ব্বা ঘাসের ওপর কতক্ষণ বস্‌লাম। নদীর জলে ঢেউ উঠেচে। রাত্রে খেয়ে আমি জেলি আম কুড়ুতে গেলাম—সল্‌তেখাগী তলায় [—] মধু ভুলদুলে (?) তলায়, চারা বাগানে, মাঠের চারায় কাঁকুড়ে (?)—সব তলায় লণ্ঠন ধরে আম কুড়ুলাম। রাত্রে ছাদে শুই [—] বড় শীত করতে লাগ্‌লো।

১৯শে মে, ১৯৩৪। ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। শনিবার

সকালে হরিপদ দাদার মুখে একটা খবর শুন্‌লুম [—] টক্ক[২] নাকি মারা গিয়েচে—কোথায় মারা গিয়েচে বা কি ভাবে মারা গিয়েচে শুনিনি। কথাটা আমার বিশ্বাস হোল না। এর পরে শুন্‌লাম কথাটা নাকি সত্যি। দুপুরে ঘুমিয়ে

---

১ বারাকপুরবাসী।

২ ইনি সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায় নন।

উঠে হরিপদ দাদার ওখানে বেড়াতে গেলাম—তারপর কুঠীর মাঠে গেলাম। একটা নতুন রাস্তা বেরিয়েচে—তার ধারে মাঠের মধ্যে একটা শিমুলগাছ। ঝোড়ো মেঘ হয়েচে—কি শোভা চারিধারের! পুলের ওপর গিয়ে দাঁড়ালুম, যুগল এসে বল্লে স্কুলের বড় দুর্দ্দশা, মাইনে দেয় না। অশ্বিনী এল। বল্লে বীণাপাণি অপেরা পার্টিতে চাকুরী পেয়েচে। গঙ্গাচরণের দোকানের সামনে বসলাম। কবিরাজ মশায়ও এল। তারপর আমি মাঠের পথ বেয়ে সন্ধ্যার একটু আগে ঝোড়ো মেঘ ও অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে সোঁদালি ফুল দোলানো ঝোপের তলা দিয়ে চলে এলাম। রাত্রে যাত্রা শুনতে গেলাম গোপালনগরে। জিতেনের বাড়ীতে বসে দাস্থ, নায়েব আমি তাস খেল্লুম। যাত্রা আরম্ভ হোল—বৃষ্টি হোতে ভেঙে গেল। ফিরে চলে এলুম।

২০শে মে, ১৯৩৪। ৬ই জ্যেষ্ঠ, ১৩৪১। রবিবার

সকালে হরিপদদাদার বাড়ীতে পটল চা করলে। চা খেয়ে বাড়ী এসে লিখ্‌লাম। তারপর অনেক বেলায় স্নান করে এসে Bird Sanctuary of Capri[১] সম্বন্ধে পড়া গেল। দুপুরে ঘুমিয়ে হাটে গেলাম। সেখানে বড় বৃষ্টি এল। সন্ধ্যার পরে ফিরে এসে একা বসে ভাব্‌লুম ২০ বছর পরে [আগে] একদিন এই বারাকপুর থেকে বেরিয়েছিলুম—তখন বাইরের জগতের কিছুই জানতাম না। এই ২০ বৎসরে কত ধরনের Drama of life দেখ্‌লুম। খুড়ীমাদের বাড়ীর পেছনে হরি রায়ের ভিটের দিকে মুখ করে মুখ ধোয়ার সময়ে পথের খাব্‌রাকুচি গুলো দেখে ওই কথাই আমার মনে হোল। রাত্রে ১॥০ টা পর্য্যন্ত তাস খেলা হোল ছাদে। তারপর আমি ও পরেশ খুড়ো বরোজপোতায় ও সলতেখাগীর তলায় আম কুড়ুতে গেলাম।

২১শে মে, ১৯৩৪। ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। সোমবার

ভোরে উঠে দাঁরিঘাটা পুলে দু ঘণ্টা বসে রইলুম। মেঘ স্নিগ্ধ প্রভাত—সিরসিরে হাওয়া—গাছপালার শোভা অপূর্ব্ব। হাজারীর মোটর এল—তাতে বনগাঁ গেলাম। বিভূতির আড়তে তামাক খেয়ে, গল্প করি। তারপর মোটরে বারাকপুর এসেই আমাদের বাড়ীর পাশের পথটা দিয়ে নাইতে গেলুম। খুকু খুড়ীমা সবাই ঘাটে। দুপুরে লিখলুম—ঘুমোনোও গেল। বৈকালে খুব ঝড় ও বৃষ্টি। তারপর কি চমৎকার সিঁদুরে মেঘ উঠ্‌ল [—] আমি ছাদে গিয়ে বস্‌লুম।

১ সুইডিশ লেখক Axel Munthe-র বইয়ের রয়্যালটির টাকা দিয়ে Capri-র (দক্ষিণ ইটালি) এই বিখ্যাত Bird Sanctuaryটি তৈরি হয়েছিল।

সোঁদালি ফুলগাছ, বাঁশগাছ, খাপরা ওঠা ভিটে, ফিঙে পাখী—সব যেন মায়াময়। আমার আর উঠে আস্‌তে ইচ্ছে করে না। রাত্রে হাজারির বাড়ী যাত্রা দেখ্‌তে গেলুম। অতি ill-written বাজে বই। ডেপুটী, সার্কেল অফিসার এরাও এল। রাত এগারোটাতে এসে ছাদে শোয়া গেল। অনেকরাত্রে খুড়ীমার ওখানে খেতে গেলাম এসে। হরিরায়ের ভিটের দিকে মুখ করে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলাম।

২২শে মে, ১৯৩৪। ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। মঙ্গলবার

পটল চা করলে—খেয়ে রামপদর পাঠশালা দেখ্‌তে গেলাম গোঁসাই বাড়ী। রঘুদাসীদের বাড়ী খালি পড়ে আছে। হরিপদ বল্‌চে—হায় হায় রঘুদাসী উঠে গেল গাঁ থেকে? তবে আর গাঁয়ে রইল কে? দুপুরে রোদের তাতে ঘুম হয় না। বিকেলে আবার গোঁসাই বাড়ী গিয়ে হাতের লেখার পরীক্ষা নিলাম। ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি এল—থামলে এসে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গেলুম। কী নীলকৃষ্ণ মেঘ, কি বিদ্যুৎ, মাধবপুরের চরের শ্যামলতা—আমার উপাসনা ঐ ঝোড়ো মেঘে—দু হাত তুলে আনন্দে প্রায় নাচি আর কি। অমন কাল বৈশাখীর রূপে মনের মধ্যে যে ভাব জাগায় দেবতার আশীর্ব্বাদের মত তা আসে। সাবান মেখে ঘাটে গিয়ে স্নান করে বড় আরাম হোল। ছাদে এলুম রাত্রে [—] অনেকরাত পর্য্যন্ত লিখলুম।

২৩শে মে, ১৯৩৪। ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। বুধবার

সকালে হরিপদদাদের বাড়ী চা খেয়ে এসে লিখ্‌তে বস্‌লুম। আম কুড়ুতে গিয়েছিল বলে গোপালনগরের যতীনের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল হাজরা ঘাটার সম্বন্দি—বাগানে (?) পাড়ার। সেই লোকটা এসে হাজির। তার সম্বন্ধে ব্যবস্থা করতে হবে। লিখে উঠে ও পাড়ার ঘাটে। অনেক বেলায় স্নান করে এসে বকুলতলায় বসে Living age এ (?) Slavery in China পড়ছিলুম। বেলা একটার পরে খেয়ে একটু গড়ানো গেল বিছানায়। বিকট গুমট গরম—ঘুমোয় কার শক্তি? বিকেলের জগদের[১] আমতলায় বসে কালো ও আমি গল্প করচি—একটা খুব ভালো ঘোড়া গেল। ও বল্লে মৎপুরের কালীপদ যাচ্চে। তারপর আমরা কুঠীর মাঠে বেড়াতে গেলুম। পুরোনো কুঠীর আল ঘরের পৈঠাতে বস্‌লুম। নোনা খেলুম গাছ থেকে পেড়ে। নোনার সন্ধানে ঝোপে ঝোপে ঘুরলাম। তারপর বেলেভাঙায় গিয়ে গঙ্গাচরণের দোকানে তামাক খেয়ে বৃদ্ধ

১ শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বারাকপুরবাসী; 'পুঁটীদি'র (সুনয়নী) ছেলে।

কবিরাজটীর সঙ্গে রাঢ় অঞ্চলের দোতলা মাঠ কোঠা ঘরের গল্প করছিলুম। সন্ধ্যার সময় মাঠের পথ দিয়ে এসে নদীতে স্নানের জন্যে যখন নামলুম তখন নদীজলে জ্যোৎস্না চিক্ চিক্ করচে। অপূর্ব্ব দৃশ্য এই গাছপালা. নদী, বন মাঠের।

২৪শে মে, ১৯৩৪। ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

সকালে উঠে হরিপদদাদের বাড়ী চা খেতে গিয়ে কাউকে পেলাম না। ছাদে এসে লিখতে বসলুম। মাথার ওপরে কি পাখীর ডাক! মেঘলা সকাল—খুব মেঘ নয়। বেশ ঠাণ্ডা। অনেক বেলা পর্য্যন্ত লিখে মাঠে বেড়িয়ে এসে স্নান করলুম আমাদের পাড়ার ঘাটে। এই ঘাটটী নির্জ্জন [—]কেউ কোথায় নেই। গালুডি ও চক্রধরপুর অঞ্চলের মরুময় উষর [উষর] দেশের ও…? শালবনের পরে বাংলার এই উদ্ভিদ সংস্থান এমন সুন্দর লাগে। বৈকালে হাটে গিয়ে গৌর কলুর মুখে খিরকিচের ইতিহাস শুনলাম। বাড়ী কাল এসেচি, আজ সন্ধ্যা হয়েচে। জ্যোৎস্না উঠেচে। তখন মাঠে বেড়াতে গেলুম—বেড়িয়ে জ্যোৎস্নালোকিত ইছামতীর নির্জ্জনঘাটে স্নান করতে নাম্‌লুম। আমাদের ঘাটেই। জোনাকী জলচে ঝোপে ঝোপে—মাথার ওপর নক্ষত্র লোক। হু হু হাওয়া বইচে। স্নিগ্ধ নদীজল। ছাদে শুই।

২৫শে মে, ১৯৩৪। ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। শুক্রবার

কালরাতে আমি ও জেলি সিঁদুর কোটো ও সল্‌তেখাগী তলায় আম কুড়িয়ে এলাম। অনেকক্ষণ বসে লিখ্‌লুম। তারপর গেলাম কুঠীর মাঠে [—] সেখান থেকে স্নানে আমাদের ঘাটে। নদীজল, তীরের **tropical woods** আমাকে যেন এবার নতুন চোখ দিয়েচে—যত বয়স হচ্চে, তত যেন চোখের আলো খুলে যাচ্চে। দুপুরে খুব ঘুম হোল, ঘুমিয়ে উঠে খুড়োদের উঠোনে ঘাসের উপর বুড়ো আম গাছটার ছায়ায় বসে আছি—এমন সময় রান্থ এল। আমি ছাদে উপর গিয়ে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লিখলুম। 'দৃষ্টিপ্রদীপে'র মালতীর অধ্যায় লিখচি। তার পর ঘন ছায়ার দুধারের ঝোপ, বনের মধ্যে দিয়ে শান্ত সন্ধ্যায় কুঠীর মাঠে হাওয়া খেতে গেলাম ও সেখান থেকে এসে আমাদের ঘাটে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নদী-জলের ঢেউয়ের সঙ্গে সাঁতার দিয়ে নাইলাম। ছকু মাঝি ঘাটের পাশে ভাত রাঁধচে—তাকে বলাম তুমি কাল আমাকে নিয়ে যাবে সবাইপুরের ঘাটে। রাত্রে খুকু গান করলে। রান্থ, আমি খুকু ন' দি অনেকরাত পর্য্যন্ত তাস খেলা করলুম।

২৬শে মে, ১৯৩৪। ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। শনিবার

সকালে বসে লিখচি আর জীবগোস্বামীর গান গাইচি—এমন সময় করুণা এসে বল্লে আকাইপুরে চলুন। বিকেলে তার সঙ্গে আকাইপুরে রওনা হোলাম। পথে পোস্টাপিসে কাজ ছিল [—] মিটিয়ে দুজনে মাঠের মধ্যে দিয়ে চল্লুম। খুব মেঘ উঠল—খুব হাওয়া; রৌদ্রের উত্তাপ কমে গেল। নওদার বিলের ধারে আমরা বসে পদ্মফুল—পদ্মের চাঁকা তুললাম—জল খেলুম পদ্মপাতায়। তারপর কাল-বৈশাখীর মেঘ উঠল—কি অপূর্ব্ব নীলকৃষ্ণ মেঘ উড়ে আসচে—শ্যামবট বাঁশ আম গাছের মাথা দিয়ে। আম কুড়ুতে গেলুম একটা আম বাগানে। ওদের বাড়ী পৌঁছে—আমি সন্দেশ ক্ষীর খেয়ে শাস্তিময়ের গান শুনলাম। রাত্রে আমি ও করুণা চণ্ডী মণ্ডপে এলাম। ভোরে উঠে আবার আম খেয়ে বিলের ধার দিয়ে রওনা।

২৭শে মে, ১৯৩৪। ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। রবিবার

এ দোকানে ও দোকানে বসতে বস্তে এলাম—বাজারের সবাই ডাকে। প্রথমে নারান দাঁ, তারপর হাজারী সিং, তারপরে গজন, শেষে যুগল। বাড়ী এসে স্নানে গেলাম। বেলা ন'টার বেশী নয়। খুব মেঘ করেচে—ঠাণ্ডা দিনটা। দুপুরে লিখবার পরে খেয়ে, খুব ঘুমুনো গেল। মোট ১২ দিন এসেছি বারাকপুরে [—] এরই মধ্যে কলকাতা মিলিয়ে মুছে গিয়েচে যেন। বারাকপুরেই চিরকাল আছি মনে হচ্চে। কি সুন্দর লাগে এখানে! boredom বলে পদার্থ নেই এখানে। বৈকালে একটু পুঁটিদিদিদের আমতলায় বস্বার পরে কুটীর মাঠে বেড়াতে গেলাম আমি আর (?)। মাঠের মধ্যে দৌড়ানো গেল। বেলেডাঙ্গার গঙ্গাচরণের দোকানে বসে গল্প করলুম। তারপর খুব ছুটে দুজনে আমাদের ঘাটে এলাম কিন্তু নাইলাম না। আজ খুব ঠাণ্ডা। সন্ধ্যার সময় খুকু এল গল্প করলাম। মেঘে আকাশ ঢেকেছে চাঁদ দেখা যায় না।

২৮শে মে, ১৯৩৪। ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। সোমবার

সকালে উঠে ও পাড়ার ঘাটে থেকে মুখ ধুয়ে এলাম। নুটু এল সকালে। দুপুর বেলা তাস খেলা হোল। বৈকালে মাঠে গিয়ে বেড়িয়ে এলাম, তারপর খুকু এল—তার সঙ্গে নানা গানের সুর ভাঁজলাম। তারপর খেয়ে এসে জগদের বাড়ী সত্যনারায়ণ পূজোতে গেলুম। জেলে পাড়ারা সেখানে কীর্ত্তন করচে। বসন্ত এসেচে পাটনা থেকে—মতিকাকা বাড়ী এসেচেন, সেই সব গল্প হোল। ফিরে এসে দেখি শ্যামাচরণদার বৌ লণ্ঠন হাতে আম কুড়ুচ্চে—রাত এখন

এগারোটা প্রায়। অনেকরাত পর্য্যন্ত তাস খেলা হোল। রাম্বু, আমি খুকু, ন'দি খুড়ীমা কালো। খুকু গান করলে। তারপর রাত ১২টার সময় শোয়া গেল খেলা বন্ধ করে।

২৯শে মে, ১৯৩৪। ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। মঙ্গলবার

কি ভয়ানক গরম আজ! চারিদিকে কুয়াশা করেচে শীতকালের মত। দুপুরে স্নান করবার সময় মাঠের ধার দিয়ে যাবার সময়ে গরম দুপুরে প্রজাপতি উড়চে। আকন্দফুলের ঝোপে—সে এক আনন্দ। দুপুরে খুব ঘুমুলাম। উঠে দেখি পাঁচটা। খুব মেঘ করে এল। কাল বৈশাখীর ঘন কৃষ্ণ নীল মেঘ ঈশান-কোণে জমে এল—বৃষ্টি পড়তে লাগল—আমি বৃষ্টি মাথায় নিয়ে নদীজলে পড়লাম—ওপরে ওপরে সাঁতার দিতে লাগলুম। কি আনন্দ! ওপারের নীল চরে বিদ্যুৎ চমকাচ্চে, অপূর্ব্ব সবুজ শিমুলগাছ ওধারে, নদী জলের গন্ধ—জলের কালো ঢেউ···সে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার।

অনেকরাত পর্য্যন্ত লিখলাম। রাত্রে খুব ঠাণ্ডা। 'দৃষ্টি প্রদীপে'র লোচনদাসের আখ্‌ড়া অধ্যায়[1] শেষ করলুম।

৩০শে মে, ১৯৩৪। ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। বুধবার

সকালে উঠে মাঠে বেড়িয়ে এসে সুপ্রভাকে পত্র লিখ্‌তে বসলাম। খুকুর কাল থেকে দেখাই নেই—আমস্বত্ত [সত্ব] নিয়ে ব্যস্ত আছে। 'দৃষ্টিপ্রদীপে'র একটা অংশ কাল শেষ হয়ে গিয়েচে। আজ আমি ছুটী নেবো। পুকুরে নেয়ে এসে বকুলতলায় [—] বসে পড়লুম। খেতে অনেক বেলা হোল [—] ২৷৷০টা। তারপর রাম্বু, আমি, কালো তাস খেলা করি। খুকুকে কলার কাস্টার্ড করতে শেখালুম। খেলে উঠে বেলা ৫টা আন্দাজ সময়ে বনগাঁ রওনা হলুম। চাল্‌কীতে দিদিদের সঙ্গে গল্প করে আম খেয়ে উঠে বনগাঁয়ে গিয়ে দেখি—ক্লাবের মাঠে সাবরেজিষ্ট্রার ডেক্‌-টেনিস খেল্‌চে—যতীন ডাক্তার বসে আছে। মেয়েদের ড্রিল দেখ্‌লাম। বাসা থেকে বীরেশ্বর বাবুর বাড়ী গেলাম। অনেকক্ষণ গল্প করার পরে ও ১৩০৪।৫ সালে রবীন্দ্রনাথের··· ? শুন্‌বার পরে বসে যতীন ডাক্তারের বাসার সামনে তামাক্ খেলাম। সাব্‌-রেজিষ্ট্রার এসে বস্‌লে ও চেয়ার উল্‌টে পড়ে গেল। আমি সাইমন মুচির গল্প[2] করলুম। রাত্রে পরেটা খেয়ে শুয়ে পড়লুম। বেজায় গরম।

---

১ অধ্যায় এগার।

২ 'What Men Live by', L. N. Tolstoy।

৩১শে মে, ১৯৩৪। ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

রাত্রে গরমে ও মশায় ঘুম হয় নি। বারাকপুরে এবার এত ভয়ানক গুমট গরমেও একদিনও ঘুমের ব্যাঘাত হয়নি—ছাদে শুই বলে। গিরীন দাদার কাছে গিয়ে চা খেলাম ও বন্ধুর কীর্ত্তি শুনলাম। আমি আর শান্তি দুজনে বার হয়ে হেঁটে রাস্তা দিয়ে দিব্যি আসচি। বারাকপুর পৌঁছে স্নানে গেলুম। ঘাটে খুকু আর পুঁটীদি। গল্প গুজব করে নাইতে দেরী হোল। এসে সুপ্রভাকে চিঠি লিখলাম। তারপর John Bull[১] পড়লুম। খেয়ে এসে একটু তাস খেলা হোল—রাম্মু, আমি, কালো, ন'দি। বিকেলে হাটে গেলাম। সেখান থেকে ফিরবার পথে অনেকেই জিগ্যেস করলে আমি কবে এলাম ? আমি তাদের অনেককে চিনি নে। মাঠে বেড়াতে গেলুম। পুঁটীদিদিদের বাড়ীর পিছনের পথটাতে অপূর্ব্ব ছায়া ঘনিয়েচে—গাছপালা, বাঁশবন শান্ত, বৈকালের ছায়ায় মায়াময়। এবার বৃষ্টি একেবারে নেই—পথে ঘাটে কাদা নেই। কি ঘন সবুজ মাঠ! কি সোঁদালিফুল দোলানো বনঝোপ! মাঠে একটা জায়গায় গিয়ে এক্সারসাইজ করি ফাঁকা হাওয়ায়। ? জায়গার বনঝোপ দূরের শিমুলগাছ, বাঁশবন দেখে মনে হচ্ছিল এর চেয়ে সুন্দরতর শান্তির, দেশ আর কোথায় ?

স্নান করতে গিয়ে আমি আর রাম্মু সাঁতার দিলাম অনেকটা পর্য্যন্ত। অন্ধকার হোলে ফিরে এলাম। খুকু এল—মাছ মাংস (?) দুধারের গল্প হোল। দুপুরে খুকু অনেকক্ষণ ছিল।

১লা জুন, ১৯৩৪। ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। শুক্রবার

Brightest of Summer Vacation।

এবারকার মত চমৎকার ছুটীর দিনগুলি আর কোনোবার বোধ হয় নি। বৃষ্টি নেই, জল কাদা নেই। রাস্তাঘাট শুকনো খট্‌খট্ করচে। সর্ব্বত্র অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য। সকালে শিবু এসে বল্লে আম খাবেন। আমি বল্লাম ওবেলা। ছাদে বসে লিখলাম। তারপর ফণিকাকার বাড়ীতে পেঁয়াজ আনতে গিয়ে বন্ধুর সম্বন্ধে গল্প করলাম। ফিরে এসে লেখা গেল। স্নান করতে গিয়ে আমি ও কালো সাঁতার দিলাম। দুপুরে তাস খেলা হোল—আমরা দুখানা ছক্কা ধরলাম—ন'দি ও রাম্মুদের ওপরে। খুকু এল দুপুরে [—] অনেকক্ষণ গল্প করলুম। বিকেলে কুঠীর ওপাশে বেড়াতে গিয়ে একটা অতি সুন্দর স্থান আবিষ্কার করলুম। কি গাছপালা, কি

১ George Bernard Shaw-র নাটক। পুরো নাম John Bull's Other Island।

উলুখড়ের ফুল—দুবার একটা সাপের হাতে পড়লুম। সন্ধ্যায় সাঁতার দেবার সময় মনে ভগবানের প্রতি অদ্ভুত ভাব হোল। রাত্রে খুকুকে কবিতা পড়তে দেখলাম। পুঁটাদিদি কথার মানে জিগ্যেস্ কর্লে। বৃষ্টি।

২রা জুন, ১৯৩৪। ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। শনিবার

সকালে শ্যামাচরণ দাদাদের বাড়ী আম আর চিঁড়ে খেয়ে এসে লিখ্তে বস্লুম। হরিপদ দাদা এল মাংসের পয়সা নিতে। তারপর সকালে সকালে স্নান সেরে এসে বকুলতলায় বসে Sigrid (?) Self এর বইটা পড়তে সুরু করি। দুপুরে খেলাম না। খিদে ছিল না। খুব ঘুমুনো গেল। ৫টার সময় উঠে রামপদ দেখি এসেচে। দেউলে-সয়াবপুর[১] কোন্ শিষ্য বাড়ী গিয়েছিল বৃন্দাবনের সঙ্গে। সেখান থেকে আমি বেলেডাঙা বেড়াতে গেলুম। পথে মাঠের মধ্যে exercise করলুম। মাঠের শোভা অপূর্ব্ব—এবার বৃষ্টি নেই কোনো দিকে, উলুঘাসের ফুল ফুরফুরে হাওয়ায় দুল্‌চে—তবে এবার বেলফুলের গন্ধ নেই। স্নান করে এসে বস্লুম—খুকু এখনও আজ এল না—তারপর নলে নাপ্‌তির বাড়ী কলের গান শুন্‌তে গেলাম। এসে লিখ্‌লাম—তারপর ছাদে অনেকরাত পর্য্যন্ত তাস খেলা হোল।

ছাদে খুব হাওয়া। কিন্তু আজ মন বড় খারাপ ছিল। একটা অদ্ভুত ধরণের emotional experience হোল—সেটা painful হোলেও ভাল করে বিশ্লেষণ করে দেখ্‌লাম। মিতের ছেলে বেশ ভজন গায়…"ওগো [?] শিবনামে…"।

৩রা জুন, ১৯৩৪। ২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। রবিবার

সকালে খুকু কাছে এসে বসে গল্প করলে। তারপর লিখ্‌লাম। সকালে সকালে স্নান করতে গেলাম। Sigrid (?) and Self পড়লুম। স্নান করে আসার সময় একটা মাঠে গাছের ধারে বস্‌লাম। সেটাও অপূর্ব্ব স্থান। দুপুরে তাস খেলা হোল। বৈকালে কি কালবৈশাখীর মেঘই করে এল। নদীতে স্নান করে এলুম। অনেক রাত পর্য্যন্ত খুকুর সঙ্গে গল্প করলাম। রাত্রে তাস খেলাম। এই রাত্রে রামপদর ঘরে চুরি হয়ে আমার কিছু টাকা চুরি গেল।

৪ঠা জুন, ১৯৩৪। ২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। সোমবার

সকালে শুন্‌লাম আমারও কিছু টাকা চুরি গিয়েচে—ওদের বাড়ীতে সুটকেস্ ছিল—তাই ভেঙে কে রাত্রে নিয়েচে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। এদিন আর মাঠে বেড়াতে গেলাম না। এসে কিছু লিখ্‌লাম। তারপর খুকু ডাকতে এল—

১ রানাঘাট।

বল্লে আমি ঘাটে নাইতে যাব কি না। ওর সঙ্গে নাইতে গেলাম। সাঁতার দিলাম। তারপর সকালে সকালে নেয়ে এসে বসে sigrid (?) and self এর বই পড়লুম। খেয়ে ঘুমুনো গেল। তারপর তাস খেলা। ৪টার গাড়ী যেতেই আমি, কালো, জেলি তিনজনে প্রথমে গেলুম বেলেডাঙা গঙ্গাচরণের দোকানে। সেখানে মুসলমান মাস্টারটি অতি সজ্জন। তার সঙ্গে গল্প করে ৪ জনে খাণ্ডে ঘাটায় (?) গেলাম। খেয়া নৌকায় ওপরে গিয়ে একজন বুড়ীকে পার করে দিলাম। তারপর একসঙ্গে নৌকাতে আমাদের ঘাটে এসে মাধবপুরের চরে নাম্‌লুম। বহুকাল পরে—ভরতের সঙ্গে বাল্যে একবার গিয়েচি। কি সুন্দর উলুবনের দৃশ্য ওপারে! এ দৃশ্যের তুলনা হয় না। সন্ধ্যায় খুকু এল—গল্প করে রাত্রে তাস খেলা ও 'খাই, খাই'[১] গল্প।

৫ই জুন, ১৯৩৪। ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। মঙ্গলবার

সকালে কুঠীর মাঠে গিয়ে ওপাড়ার ঘাটে উঠ্‌লুম। ছাদে এসে দেখি খুকু তখনও ছাদে রয়েচে। তারপরে লিখে উঠে রামদাসের সঙ্গে গল্প করলাম। নাইতে গেলাম। তারপরে মাঠ থেকে নদীতে নেমে মনে অপূর্ব্ব আনন্দ হোল—দুপুরে তাস খেলা হোল। খুকু খেল্লে। বিকেলে পাঁচীদের আমতলায় বসে পাঁচী খুকু রানুদের সঙ্গে লেখাপড়ার চর্চ্চা হোল। বিকেলে কুঠীর মাঠে বেড়িয়ে ও এক্সরসাইজ করে এসে আমি খুকু রানু সাঁতার দিয়ে নাইলুম। পথে আমি উঠে আসছি—খুকু আমায় ডাক্‌লে পথের মধ্যে।

রাত্রে তাস খেলা হোল। খুকু সন্ধ্যে বেলা এসে গল্প শুন্‌লে অনেকক্ষণ বসে। তাকে scorpio.[n] চেনালুম।

৬ই জুন, ১৯৩৪। ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। বুধবার

সকালে উঠে ছাদে লিখ্‌তে বস্‌লাম। অনেক বেলা পর্য্যন্ত লিখ্‌লুম—। এর মধ্যে বার দুই খুকু এল। তারপর খুব কড়া রোদে নাইতে গেলুম এ পাড়ার ঘাটে। কুঠীর মাঠে রোজ নাইবার আগে খেজুর কুড়িয়ে আন্‌তে যাই—একটা মাঠের ধারে সাদা ডানা প্রজাপতি ওড়ে, পাখীরা ডাকে, নীল আকাশ মাথার ওপর, কুঠীর পাইন গাছটা দেশী গাছের মাথার ওপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে—এমন দেখায়। আমি কেবলই ঈশ্বর সম্বন্ধে ভাবি। আমার সমস্ত চিন্তা এখন তার সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে তাঁর কথাই ভাবায়। স্নান করে এসে তাস খেলা হোল। জাহ্নবী যে কাঁঠালটা পাঠিয়েছিল সেটা আজ পেকেচে। ন'দির

১ সুকুমার রায়ের কাব্যগ্রন্থ।

কাছে একটা কাঁঠাল কাল দিয়েছিলুম। বিকেলে হরিপদদাদের বাড়ী থেকে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গেলুম। ফিরে এসে দেখি ঘাটে রানু, পাঁচী, খুড়ীমা [—] সাঁতার দিয়ে অনেকদূর পর্য্যন্ত গেলুম। একটা অপূর্ব্ব সিঁদুরে মেঘ হোল সন্ধ্যার আগে—ওপার থেকে জেলেরা বল্লে—এ যে জয়দ্রথ বধের মত হোল।[১] সন্ধ্যার ছাদে চেয়ার পেতে রানু, খুকু আমি গল্প করি।

৭ই জুন, ১৯৩৪। ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

সকালে উঠে কুঠীর মাঠে গেলুম। কাল ছাদে শুয়েছিলুম অবিশ্যি। ছাদে বসে লিখ্‌বো ভেবেছিলুম কিন্তু কাঁঠালতলায় প্রকাণ্ড আড্ডা বস্‌লো। ফটিক, আমি, বসন্ত, ফণিকাকা ইত্যাদি। এসে লিখ্‌লুম। কালোরা এল। আড্ডা হোল। কাল রাত্রে ছাদে খুকুকে scorpio শব্দটা উচ্চারণ করতে শেখাচ্ছিলুম —ফটিকেরা ছাদ থেকে শুন্‌তে পেয়েচে। দুপুর এ খুব বৃষ্টি—এ বৎসরের এই প্রথম বৃষ্টি। খানা ডোবা ভেসে গেল। তারপর হাটে। যাচ্চি—তাস খেলার পরে—পাঁচী বল্লে—এক গাল চাল ভাজা খাবেন? সে তার নিজের বাটী থেকে দিলে। হাট থেকে ফিরে সন্ধ্যে হয়ে গেল। মাঠে বেড়াতে গিয়ে আমাদের ঘাটে স্নান করে ফিরে এলুম। রাতে আজ সকালে সকালে শুয়েছিলুম।

৮ই জুন, ১৯৩৪। ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। শুক্রবার

সকালে উঠে বেড়াতে গেলুম গাজিতলার মাঠে [—] কারণ কুঠীর রাস্তায় খুব জল। মনে পড়ল এই কাঁঠাল বাগানের পথে আমি আর কালী ১৭ বৎসর আগে গাইতাম—'চলে তো যাবে মেরা নাইয়া কাহ্নাইয়া বেণু'—তখন তো মনেও ছিলাম বালক। এসে লিখ্‌লাম—একটু পরে খুকু এল—তাকে গল্প করলাম। তারপর নাইতে গিয়ে ও পাড়ার ঘাটে সাঁতার দিয়ে গেলাম। তার আগে কালীর স্বামী আমার এখানে এসে গল্প করলে। খেয়ে তাস খেলা হোল। দুপুরে নীল মেঘ করে খুব বৃষ্টি এল। খেতে গিয়ে ভিজে গেলুম খুড়ীমার রান্নাঘরে। মেঘভরা শ্যাম বৈকালে আমি আর কালো মোল্লাহাটীর পথে অনেকদূর বেড়াতে গেলুম। এ দৃশ্যের তুলনা নেই—কি শ্যামলতা, কি বাঁশগাছের দৃশ্য—কত ধরনের

১ অভিমন্যুবধের প্রতিশোধ নেবার জন্যে অর্জুন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সূর্যাস্তের আগেই তিনি জয়দ্রথ বধ করবেন। কৃষ্ণ যোগবলে সূর্য আচ্ছাদিত করলে জয়দ্রথ ভাবলেন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, অর্জুন প্রতিজ্ঞা রক্ষায় ব্যর্থ। ঠিক সেই অসতর্ক মুহূর্তে অর্জুন তাঁকে নিহত করেন। সন্ধ্যার আগে সন্ধ্যার সিঁদুরে মেঘ হওয়ায় জেলেরা জয়দ্রথের এই প্রসঙ্গ এনেছে।

ঝোপগাছ—একটা ধরনের গাছ দেখলুম—বড় বড় মখমলের মত পাতা—কেমন বাঁকা ডাল পালায় ঝোপ সৃষ্টি করে—আমি ওর নাম জানিনে। সন্ধ্যায় খুকুকে Rip Van Winkle এর[1] গল্প বলি। রাত্রে একটু তাস খেলা গেল।

৯ই জুন, ১৯৩৪। ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। শনিবার

সকাল থেকেই আজকার দিনটা খুব ভাল যায় না। কারণ তিনটী। সকালে বিকালে ও রাত্রে। এদিন বইখানা খুব পড়া গেল। Sigrid [?] and Self এর বইখানা আজ শেষ হোল। দুপুরে প্রথমে কুঠীর মাঠ ও শেষে সাঁতার দিয়ে ও পাড়ার ঘাটে। দুপুরে একটু তাস খেলা করলুম। বৈকালে আম কুড়ুতে কুড়ুতে ঝিনুকে, গুরোচনী এই সব আম পাড়তে লাগলুম। রাত্রে তাস খেলা গেল।

১০ই জুন, ১৯৩৪। ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। রবিবার

এবার বারাকপুর খুব ভাল লেগেছে—এত যে এ জায়গা ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছে নেই। সকালে সুসার কাকার মেয়ে এল – তাকে পড়া জিজ্ঞাসা করলুম। নেয়ে এসে বকুলতলায় বসেচি – খুকু অনেকক্ষণ গল্প করলে। দুপুরে বিমলা ও খুকু গান করছিল—পাঁচীদের[2] জানলায় দাঁড়িয়ে পাঁচী শুনচে – আমায় বল্লে—আসুন বিভূতি মামা, এখানে দাঁড়ান। আমি লুকিয়ে খুকুদের রান্নাঘরের সিঁড়িতে বসেছিলুম। খুকু দোর খুলতেই আমায় টের পেয়েচে—আমি পালিয়ে গেলাম। তারপর হাট থেকে এসে কুঠীর মাঠে বেড়াতে যাচ্চি। খুকু কুয়োতে জল তুলচে [—] আমি বল্লুম, একটু জল দে খুকু। খুকু জল দিলে—আমার সঙ্গে দেখা হোলেই ওর চোখে মুখে হাসি ফুটে ওঠে। পাঁচী বলচে, চাল ভাজা খাবেন, ভাজ্‌বো। আমি বল্লুম—কাল খাবো। খুকু বল্লে—না না আজই খাবেন, ভাজুন, পাঁচী মাসী। সন্ধ্যায় পিঙ্গলবর্ণের মেঘ হয়েচে। মনে একটা strange bliss—এ ধরনের জীবনে খুব হয় না। মাথার ওপরে একটা নক্ষত্র উঠেচে। কোথায় দূরে কী একটা পাখী ডাকচে—সমস্তটা মিলিয়ে একটা অদ্ভুত শান্তি। খুকুর সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা কত কথা হোল। আমি বল্লুম, তুই বাঁড়ুয্যে না হোলে তোকে বিয়ে করতুম। ও হাস্‌লে—বল্লে, আপনি চলে গেলে আমার মন পালাই পালাই হবে। কত কথাই হোল। মেয়েরা না হোলে সৃষ্টি মিথ্যে হোত—কথাটা ঠিক। তেমনি পুরুষ না হোলেই তাই।

১ Washington Irving-এর গল্প।

২ অন্নপূর্ণা মুখোপাধ্যায়, বারাপুরবাসিনী ; পুঁটিদেবীর মেয়ে।

১১ই জুন, ১৯৩৪। ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। সোমবার

সকালে উঠে কুঠীর মাঠে বেড়িয়ে এসে লিখ্‌তে বসেচি রামমণি এসে বল্লে—কি করচেন? তারপর ওর 'কাকাবাবু'[১] বই আনবার জন্যে গেলুম শ্যামাচরণ দাদাদের বাড়ী। সকালে বসে লিখ্‌চি—কি শোভা হয়েচে জেলিদের বাড়ীর দিকের বাঁশঝাড়ের ওপার ঘন কালো মেঘ হয়ে!

বিকেলে বেড়াতে গেলুম, মোল্লাহাটীর পথে। বাস্তবিক বড় হয়ে চোখ ফুটে পর্য্যন্ত এ পথে বেড়াতে আসিনি। এ পথের সৌন্দর্য্য অতুলনীয়ই বটে। আজ আবার সকালেই একটা অস্বাভাবিক ধরনের নীল ও মেঘের রং, [—] সূর্য্যের আলো রাঙা। চারিধারের শ্যামলতার প্রাচুর্য্য—বটগাছের contour ও কেঁয়ো ঝাকা[২] ও ষাঁড়া গাছের ঝোপ—সে যে কি রং হয়েচে। কি প্রসারতা, কি মুক্তি, কি আনন্দ! গঙ্গাচরণের দোকানে বসে তামাক খেলুম। সন্ধ্যায় স্নান করে এসে গিরীনদাদা ডাকলেন হরিপদ দাদাদের বাড়ীতে। ডাক্তার? এসেচে। রাত্রে তাস খেলা হোল। ন' দি আজ সকালে চলে গেল।

১২ই জুন, ১৯৩৪। ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। মঙ্গলবার

সকালে আমরা উঠ্‌লাম—আমি, কালো, রাম্নু—খুকু সব এক সঙ্গে। তারপর একটু লিখে বৃষ্টি এল—প্রথমটা ছাদে বসেছিলুম। ছাদের শোভা অপূর্ব্ব হয়েছিল—বর্ষায় ঘন মেঘে। আমরা স্নান করতে গেলুম—সাঁতার দিয়ে বৃষ্টি মাথায় এ পাড়ার ঘাট থেকে গেলুম ও পাড়ার ঘাটে—সে এক অপূর্ব্ব আনন্দ। ও পাড়ার ঘাটে পাঁচী নাইচে। আমরা উঠে বাড়ী এলুম। খুব বৃষ্টি পড়তে লাগল। দুপুরে খুব ঘুম হোল। বৈকালে আমি একা গঙ্গাচরণের দোকানে গেলুম। সেখানে বসে অভিনয় সম্বন্ধে গল্প হোল। রামধনু উঠেচে—বসে থাক্‌তে থাক্‌তে একটু একটু বৃষ্টি এল। বেশ রৌদ্র ছিল এতক্ষণ—এইবার মেঘে ঢেকে গেল।

সন্ধ্যায় খুব অন্ধকার। আমি কালো বসে তাস খেললুম। রাম্নুও। খুকু একটা গান করলে।

১৩ই জুন, ১৯৩৪। ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। বুধবার

সকালে খুব বর্ষা। তা সত্ত্বেও কুঠীর মাঠে গেলুম। আমাদের ঘাটটাই ভাল—তাই স্নানের সময় আমি ও পাগলা জেলে সাঁতার দিয়ে ও পাড়ার ঘাটে

---

১ লেখক তারকনাথ বিশ্বাস।

২ Leea acquata linn.। সংস্কৃতে কাকজঙ্ঘা, নদীকান্তা।

গেলুম। সকালে খুকু এল—তাকে বই দিলাম। দুপুরে লিখে একটু ঘুমুনো গেল। সকাল সকাল বার হয়ে বেলেডাঙায় গঙ্গাচরণের দোকানে গল্প করলুম। সুন্দরপুরের পথে অনেকটা বেড়িয়ে এলাম। তারপর গঙ্গাচরণের দোকান থেকে তামাক কিনে আমাদের ঘাটে সাবান মেখে চান করলুম। তামাকটা ঘাটে ফেলে রেখেছিলুম। সন্ধ্যাতে খুকু চাল ভাজা নিয়ে এল। অনেকটা গল্প গুজব করি। তারপর আমরা তাস খেললুম। কালো আজ বনগাঁয়ে গেছে। ছাদে গিয়ে অনেকক্ষণ ভূতের গল্প হোল। খুকু বাজি ফেলে রোয়াকে গেল অন্ধকারের মধ্যে। অনেক রাত্রে আবার গল্প করলুম সবাই মিলে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে দেখি বৃষ্টি পড়চে। সবাই নীচে নেমে আসি।

খুব বর্ষা, বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে আজ অমল মুখুয্যের বিবাহের পত্র পেলাম।

১৪ই জুন, ১৯৩৪। ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

সকালে কুঠীর মাঠে—তারপর এপাড়ার ঘাটে। একটু পরে লিখতে বসলাম। খুকু এল—তাকে বসুমতীর ছবি দেখালুম। তারপর ও এসে ডাক্‌লে—ঘাটে যাবেন না? আমি নাইতে গেলুম। ও সাঁতার দিতে দিতে বেশী জলে যায় দেখে আমার ভয় হোল। তারপর আমি সাঁতার দিয়ে ওপারে গেলাম। শ্যামাচরণ দাদা ঘাটে নাম্‌ল।

আজ কাল প্রকৃতির শোভা আর তেমন দেখিনে, মন সঙ্কুচিত হয়ে একটা সঙ্কীর্ণ কেন্দ্রে আবদ্ধ থাকে। এ রকম মন নিয়ে চিন্তা বা কোনো বড় লেখা আসে না। সর্ব্বদাই মন ব্যস্ত, উড়ু উড়ু ভাব। বারাকপুরের প্রকৃতির মধ্যেও আজ গত ৬।৭ দিন আমি সদাই অন্যমনস্ক। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার বটে।

বিকেলে হাটে গেলাম। মেঘাচ্ছন্ন দিন। হাট থেকে এসে ঘাটে স্নানে গেলাম। বৈকালে খুকু গা ধুতে যাচ্চে; কবিতা দেখে দাঁড়াল। তাকে পড়ে শোনাবো বল্লুম। সন্ধ্যায় এসে অনেকক্ষণ বস্‌ল। তাকে আজকাল ডাকি। ভূতের গল্পও বলি। রাত্রে তাস খেলা হোল—আমি আর খুকু [,] খুড়ীমা আর রামু। কত রাত পর্য্যন্ত গল্প হোল।

১৫ই জুন, ১৯৩৪। ৩২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। শুক্রবার

সকালে হরিপদদাদাদের বাড়ী গিয়ে চা খেয়ে এলুম। রামমণি অনেকক্ষণ আসেনি—মনটা উড়ু উড়ু করছিল। জেলি আগুন নিয়ে এল। আমি বল্লুম—কে রাঁধচে? রামমণি। খুড়ীমা কোথায় রে? ঘাটে। রাণু কোথায়? ও ও

ঘাটে। একটু তামাক টেনে আমি ছুতো করে আগুন আনতে গেলুম। খুকু হাসি মুখে আগুন দিলে। বল্লেন—ছোঁবেন না তাহলে মা আমার রান্না খাবেন না। আপনার এড়া কাপড় আলাদা। তারপর ও সমস্ত দিন এল না বলে আমার মনে ভারী রাগ হোল। একবার কুয়োর কাছ থেকে ফিরে গেল।

বিকেলে বিভূতি এল। বৃষ্টি মাথায় ভিজতে ভিজতে আমি আর কালো গঙ্গাচরণের দোকানে গেলাম। বৃষ্টিতে চারিধার ধোঁয়া ধোঁয়া—তারপর মাঠে এক্সারসাইজ করে নদীতে নাইতে নেমে সাঁতারি দিয়ে ওপারে গিয়ে মাধবপুরের চর দেখলুম—কি শোভাই হয়েচে। রাত্রে খুব ঠাণ্ডা। সারারাতই বৃষ্টি।

১৬ই জুন, ১৯৩৪। ১লা আষাঢ়, ১৩৪১। শনিবার

সকালেই পাঁচীর অসুখ নিয়ে রামপদ ঝগড়া করচে পুঁটীদিদির সঙ্গে। বল্লে—তোমার একখানা চিঠি আছে। দেখি সুপ্রভার চিঠি। খুকুকে ডাকাতেই সে এল—কারণ তার নামেও সুপ্রভাও লিখেচে। খুকুকে দিয়ে বসে পত্র লেখালুম। তারপর ও আবার এল রুমাল দিতে। বসে রইল খানিকক্ষণ। একবার বল্লে—আপনার তো এতদিন ছুটী আছে, এত সকালে যাবেন কেন? দুপুরে প্রায় আমি গেলুম গোপালনগরে। সুপ্রভার চিঠি দিতে। হাজারি সিংএর দোকানে বসে প্রেততত্ত্বের আলোচনা করা গেল। তারপর রানা সেক্‌রার দোকানে বসে মহেন্দ্র ছুতোরের কথা শুনলাম। ডাব কিনে আন্‌লুম খুকুর জন্যে। সন্ধ্যায় নৌকো নিয়ে বেড়াতে গেলুম ওপারে। ওপারে এক জায়গায় নৌকা লাগিয়ে মাঠে বেড়িয়ে এলাম। বেশ সুন্দর সবুজ ঘাস। স্নান করে বাড়ী এলুম। একতারা নিয়ে গান করা হোল খানিকক্ষণ। রাত্রে খুকু এল—বল্লে ওপরে যাবেন না। আসুন তাস খেলি। অনেক রাত পর্য্যন্ত তাস খেলা গেল। 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' উচ্চারণ করলুম আজ কালিদাসকে স্মরণ করে।

১৭ই জুন, ১৯৩৪। ২রা আষাঢ়, ১৩৪১। রবিবার

সকালে উঠে কুঠীর মাঠে গেলুম। আমার মন সর্ব্বদাই ব্যস্ত—কেন তা কি জানি? সম্প্রতি মনের এ ভাব হয়েচে। কোনো কাজ হয় না। একই বিষয়ের চিন্তা শুধু সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। ঘাটে যাবার সময় খুকু দেখি কাপড় কেচে মায়ের সঙ্গে আসচে। দুপুরে একবার ছাদে কি কাজে এল। আমি কাছে ডাকলুম। দুপুরে আমি ঘুমিয়েচি ও এল—চোখাচোখি হোলেই কেমন হাসে। আরও একবার অমনি হোল। ওকে বলেচি—তুই তিনবার আসবি, একা বসে থাকি। ও এলে তবুও আমার আগের বিষয়ের চিন্তাটা কমে। নয়তো সেটা

বেড়ে যায়। দুপুরের পর কি ভয়ানক বর্ষা। ওই চিন্তায় আমার কাজ মাটী হবার উপক্রব হয়েচে। আমি যে এত highly impassioned তা এর আগে জানতাম না। এটা একটা উগ্রবেদনার মত বুকে এসে বিঁধেচে—দিন রাত কত কষ্ট দিচ্চে আমায়। আমি একেবারে helpless, হাটের আগে ভয়ানক বৃষ্টি। হাট থেকে বৃষ্টি মাথায় এসে নির্জ্জন বারান্দাতে বসে ভাবলাম অনেকক্ষণ। পোকার উপদ্রবে রাত্রে খাওয়া হোল না। অত্যন্ত অন্ধকার। সন্ধ্যার পরই বিছানায় শুয়ে পড়লাম। কিন্তু রাত ১১টায়? ঘুম এল না। শুধুই সেই উগ্র বেদনা বোধ ও ভাবনা। ঈশ্বরকে কেন সাকাররূপে উপাসনা করে সে সত্য কাল মনে অস্পষ্ট ভাবে উদয় হয়েচে। চিরসুন্দরকে লোকে আপনার ভেবে পেতে চায়, এর মধ্যে মানুষের হৃদয়ের দিক থেকে একটা need আছে। কত রাত পর্য্যন্ত ওই সব ভাবতে লাগলুম। পড়ে গিয়েচি ফেরে, উপায় কি? মানুষের নিজের ইচ্ছায় কিছুই হয় কি?

১৮ই জুন, ১৯৩৪। ৩রা আষাঢ়, ১৩৪১। সোমবার

আজ সকালে খুব মেঘ। বৃষ্টিও হোল খুব [---] বেলা ৭।৮টার সময়ে বৃষ্টি এল। খুকু জল খাবার নিয়ে এল তারপর। আজ যেন মেজাজ ভাল নয়। বাড়ীতে কি হয়েচে। তারপর আবার জলখাবার দিয়ে গেল। বৈকালে আমি আর কালো গঙ্গাচরণের দোকানে গিয়ে যুগলের সঙ্গে নানা যাত্রাদলের গল্প করলুম। ফণী অধিকারী ইত্যাদি—নানা দলের কথা। ফিরবার পথে কুঠীর মাঠে একটা লতা ঝোপ ঘেরা নিভৃত স্থানে এক্সারসাইজ করলুম। তারপর স্নান করতে নামলুম—জল খুব ঠাণ্ডা।

মনের অবস্থা আজ আরও খারাপ। রাত্রে তাস খেলা হোল না। আমি আর কালো গল্প করতে লাগলুম—ওরা যখন এল। আমি ইচ্ছে করেই বাজে গল্প করে কাটালুম।

ওই চিন্তাটার জন্যে এবার গ্রীষ্মের ছুটীর শেষ দিকটা বড় নিরানন্দে এবং বেদনার মধ্য দিয়ে কাটল। কি জানি মনের এভাব কবে দূর হবে। এবার গাছ-পালা, নদী বন কিছুই দেখেও দেখিনে। মন থাকে কোথায়, চোখ থাকে কোথায়।

১৯শে জুন, ১৯৩৪। ৪ঠা আষাঢ়, ১৩৪১। মঙ্গলবার

সকালে উঠে কুঠীর মাঠে গেলুম। এসে দেখি ওরা উঠে গিয়েচে। সকালে একটু পরে খুকু এসে বল্লে—কি কচ্ছেন? তার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করা গেল।

নাচ শিখে এসেছে—বল্লুম, নাচ দেখাবি? সে বল্লে—না। তারপর তাকে কাছে ডাকবার পরও এসে অনেকক্ষণ রইল। লক্ষ্মীডাক্তার এসে গল্প করলে। আমি কালো নাইতে গেলুম। বাঁধাল ধরে স্নান করতে লাগ্‌লাম। পাগ্‌লা জেলে সাঁতার দিয়ে বাঁধালের কাছে এল। আমি বাঁধালের ওপরের নীল আকাশ, এক ঝাড় বাঁশ, ঝোপের দিকে চেয়ে গুন্‌গুন্ করে গাইতে লাগলুম—'বসিয়া বিজনে, কে [কেন] একা মনে পানিয়া ভরনে চললো গৌরী।'[1] বল্‌তে বল্‌তে এমন আনন্দ—পেলুম! চিরসুন্দরের সঙ্গে, নারীর সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে ভুবনে ভুবনে কি আশ্চর্য্য আনন্দ সম্বন্ধ রয়েচে। ওদের মুখের হাসি—সে চিরসুন্দরের দান—বৃষ্টি—এই নীল আকাশ, এই সুন্দর জল, বাঁশবন, তার মধ্যে স্নেহ প্রেম সেবা দয়া—এরা আছে বলেই এ পৃথিবীই সুখ। আগুন আন্‌তে গেলুম দুপুরে খুড়ীমার কাছে। খুকু বকুলতলায় বই পড়চে—আমায় দেখে হেসে বল্লে—বই পড়চি। তারপর এসে আগুন দিয়ে গেল। সন্ধ্যায় কাঁচি কাটা থেকে এসে কাপড় ছাড়চি—ও আবার এল। পাঁচীর কাছে গিয়ে বসে তিনজনে গল্প করলুম। ঝিম্ ঝিম্ বৃষ্টি। রাত্রে আমি খুকু, কালো খুড়ীমা তাস খেল্‌লুম।

২০শে জুন, ১৯৩৪। ৫ই আষাঢ়, ১৩৪১। বুধবার

মনের পূর্ব্বের মত দুশ্চিন্তা নেই। আমার একটা মীমাংসা হয়েচে। অনেক ভাববার পরে কাল বই খানার সম্বন্ধে একটা পথ বার করেচি।

সকালে আমরা নাইতে গেলুম। খুকু ঘাটে গিয়ে দেখি নাইচে। তাকে সাঁতার দিতে বল্লে—সে বেশী জলে যায়। তাকে গোটাকতক বার ডুব দেওয়ালে সে ভয় পেয়ে জল থেকে উঠতে রাজী হোল। একসঙ্গে আমরা ঘাট থেকে এলাম। বৈকালে খুব মেঘ। আমরা খাব্‌রাপোতা[2] পর্য্যন্ত হেঁটে গেলাম। খুব বর্ষায় ঝোপ ঝাপ, তার তলা অন্ধকার, রাঙা ব্যাঙের ছাতা গজিয়েচে। বড় বড় বট গাছ—ছায়ানিবিড় ঘন কালো মেঘ আকাশে। খুব বেলা থাকতে বাড়ী ফিরে এলাম। বসে আছি, রাঙা রোদ উঠ্‌ল বাঁশবনের মাথায়, নারিকেল গাছের মাথায়। খুকু আসে না আসে করে খুকু এল সন্ধ্যার সময়। খুড়োদের দাওয়ায় কতক্ষণ গল্প করলাম। পাকা আম খেলাম, খুকু নিয়ে এল। ভারী সুন্দর আম। রাত্রে গল্প হোল—ছাদে বসে তাস খেলা হোল—আমি আর খুকু, কালো আর খুড়ীমা। রাত্রে কি বেজায় গুমট গরম।

১ নজরুল-গীতি

২ বনগাঁ।

২১শে জুন, ১৯৩৪। ৬ই আষাঢ়, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

সকালে বৃন্দাবনের ছেলে এল—সে অনেক ছড়া বলতে লাগল। খুকুকে ডাকলুম। সে দুপুর বেলা গল্প শুনলে পাঁচীর কাছে বসে। বিকেলে হাটে গেলাম [—. সেখানে খুব বৃষ্টি এল—সারাদিনটা মেঘলা। আমায় দেখলেই খুকু হাসে—হাট থেকে এসে খুব বৃষ্টি, একলা বসে আছি। এমন সময় ও চা নিয়ে এল—বাইরে দাঁড়িয়ে ভিজচে—আমি বল্লুম—ভিতরে আয়। রাত্রে খেলা হোল।

তারপর আমি বই পড়তে লাগলুম। এ সময় আমার মনে অন্যরকম ভাব হয়। এই সব নির্জ্জন অন্ধকার রাত্রে মন আমার বদলে যায়। আমার মধ্যে এই তীব্র আবেগ ও impassioned মনোভাব—এটা আমাদের জাতের লোকের স্বভাব। It is the old fire, the sacred fire, that God Prometheus brought from heaven.

বুঝলাম that fire is not dead—it is the undying fire.

অন্ধকার রাত্রে বিশ্বদেবকে মনে মনে শত ধন্যবাদ দিলাম। তিনি এ fire দিয়েচেন।

২২শে জুন, ১৯৩৪। ৭ই আষাঢ়, ১৩৪১। শুক্রবার

আজ সকালে বৃষ্টি। খুকু এল বিছানা তুলতে ওদের ঘরে। তারপর হাঁ করে আমার জানলাতে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। ওদের ঘাটে নাইতে গেলাম—খুকু খুব সাঁতার দিলে। বৈকালে কালো মেঘ করে ঘন বৃষ্টি। বৃষ্টি মাথায় আমি আর কালো বেলেডাঙ্গায় বেড়াতে গেলুম। কি সুন্দর আকাশের রং। একটা মাঠে দাঁড়িয়ে অপূর্ব্ব বিদ্যুতের খেলা দেখলুম—নীল মেঘ উড়ে উড়ে যাচ্চে—অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়চে—গাছপালার রং সবুজ —] তার ওপরে নীলকালো মেঘ—বৃষ্টির কুয়াশা, মনে আজ কিছু আনন্দ—কিছু খারাপ। বেড়িয়ে এসে পাঁচীদের বাড়ী বসে গল্প বল্লুম। একবার ওর ওপর রেগে উঠলাম—দুবার রেগে উঠলাম। দুবারই ও ভয় খেলে! রাত্রে এসে তাস খেলা হোল।

আজ নদীতে সাঁতার দেবার সময় খুব আনন্দ। আমার মনের সেই তীব্র ভাবটা যেন আজ অনেকটা চলে গিয়েচে। সেই বেদনাটা আজ আর নেই। মন অনেকটা হাল্কা। মাঠে মেঘান্ধকার আকাশের তলে হাত জোড় করে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। বল্লুম বিশ্বদেব তোমার এই অনন্ত পথে—নিয়ে যাও—কত মধুর সঙ্গী—সামনে—পুণ্যে, তোমার পথই পথ।

২৩শে জুন, ১৯৩৪। ৮ই আষাঢ়, ১৩৪১। শনিবার

সকালে খুব মেঘ আকাশে। খুকু একবার ডাক্‌তেই এলো। তারপর আমায় খাওয়ালে। গল্প বল্‌বার জন্য ডাকাডাকি করতে পাঁচীদের বাড়ী গিয়ে গল্পটা শেষ করলুম। বিকেলে আমি আর কালো সুন্দরপুর পর্য্যন্ত বেড়াতে গেলাম। বৃষ্টিতে ভিজে গাছপালার গুঁড়ি সব কালো হয়ে রয়েচে—তলায় তলায় ব্যাঙের ছাতা আর কি গাছপালার প্রাচুর্য্য! বেলেডাঙার ওপারটা [—] পুলের ওপারের মোড়টা একটা beauty spot. কি সুন্দর রাঙা রোদ উঠ্‌ল—আমরা যখন গঙ্গাচরণের দোকানে বসে গল্প করচি। মাঠে যখন এক্সারসাইজ করচি তখন গাছপালার রোদের কি সোনার রং। আমাদের ঘাটে নাইতে গিয়ে বাঁধালের কাছ দিয়ে ওপারে দেখ্‌লাম একটা চারা সাঁইবাব্‌লা গাছে রোদ পড়ে কি রং হয়েচে

সন্ধ্যাবেলায় খুকুকে ডাক্‌লাম। সে আস্‌তে পারলে না। বল্লে—এখন যাবো না। সে এখন রাঁধচে। আজ রাত্রে আর তাস খেলা হোল না। মনটা আজ কলকাতার জন্যে চঞ্চল হয়েচে। ভারী খারাপ।

২৪শে জুন, ১৯৩৪। ৯ই আষাঢ়, ১৩৪১। রবিবার

সকালে সুসার কাকা এলেন। আমি গিয়ে কালোদের বাড়ীতে ছোট খুড়ীমার সঙ্গে গল্প করলাম। কালকার মন খারাপ আজও আছে—অতি ভয়ানক মন খারাপ—কেমন একটা চাপা মনের ভাব—এই বর্ষার দরুনই। রোদ না উঠ্‌লে ভাল লাগে না আমার। সকালবেলাটা যেন মনে পাষাণের ভার চাপানো রয়েচে। দেখি আজ রোদ ওঠে কি না। সাঁতার দিয়ে ওপাড়ার ঘাটে গেলুম। আমার পেছনে পেছনে কালো গেল। নদীর মাঝখানে দড়ি ধরে অনেকক্ষণ এপারে ওপারে নাইতে লাগলুম। দুপুরে চালকী গেলাম। ফিরে এসে সুসার কাকার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করা হোল। সন্ধ্যায় রানু বল্লে—আজ যাবেন না দাদা, আপনি গেলে পাড়া আঁধার হয়ে যাবে। খুকুকে ডেকে দিল—কে বলেচে দাদার গা ঘিন্‌ঘিন্ করবে, গা ধুয়ে আসি। আবার রানু সন্ধ্যাবেলা বল্লে—যাবেন না কাল দাদা। সন্ধ্যাবেলা খুকু আস্‌ছিল—আমি ওকে ধমক দিয়ে বল্লাম বিকেলে এলিনে কেন? আজ ওদের জামাই এসেচে। ছোট খুড়ীমা আমি যখন যাচ্চি, গিয়ে বল্লেন—একটু মাংস দেবো এখুনি খাওয়া হয়ে গেল? রামপদ বাড়ী এল সন্ধ্যার ট্রেনে।

২৫শে জুন, ১৯৩৪। ১০ই আষাঢ়, ১৩৪১। সোমবার

ওদিন সকালে নাইতে গেলাম। বৃষ্টি নেই। খুকু নেয়ে আস্‌চে—রানুও

নেয়ে আসচে। আমায় বল্লে—যেন ছোঁয়া না যায়। আমি ইচ্ছে করে ছুঁয়ে দিলাম। যদিও খুকু আবার শ্যামাচরণ দাদাদের আমগাছের দিকে পালালো। আমরা নিজেরা নাইতে গেলাম—আমি একা। সাঁতার দিয়ে ওপাড়ার ঘাটে গেলুম। বিকেলে বাইরে বস্লে রইলুম। বকুলতলায় খুকুরা ? খেল্‌তে লাগ্‌ল। আমার কাছে বিমলাকে নিয়ে ⋯ল গল্প শুনতে। রাত্রে তাস খেলা হোল না। সবাই পরিশ্রান্ত ছিল।

২৬শে জুন, ১৯৩৪। ১১ই আষাঢ়, ১৩৪১। মঙ্গলবার

সকালে উঠে স্নান করে বেরিয়ে পড়লাম। শম্ভুর গাড়ীতে। খুকু এসে প্রণাম করল। গাড়ী চালকীর কাছে এসে দেখি [—] জাহ্নবী ও খুকী দাঁড়িয়ে আছে লেবু ও কাঁঠাল নিয়ে। তারাপদ বাবুদের বাসায় যাবো, খেয়ে ট্রেন ধরলুম। ট্রেনে মন এত ভার যে সে রকম মন ভার বহুকাল হয়নি। ১৬ বছর বয়েসে এই ট্রেনে এই গরুর গাড়ীতে একবার বনগাঁয়ে এসেছিলুম—সেই কথা মনে হোল। কলকাতায় এসে বিকেলে নীরদবাবুদের flat-এ গেলাম। ফিরে গেলাম বন্ধুর বাসায়। অনেকক্ষণ গল্প করলুম।

২৭শে জুন, ১৯৩৪। ১২ই আষাঢ়, ১৩৪১। বুধবার

সকালে উঠে সুপ্রভার সঙ্গে দেখা করে এলাম। হেঁটে দেখে এলাম স্কুল আজ খুলচে কিনা। হরিবাবুর সঙ্গে দেখা হোল। স্কুল খোলেনি। বঙ্গশ্রীতে গিয়ে ট্রামে খেয়ে ঘুম দিলাম। ঘুম থেকে উঠে মন উদাসীন। বিকেলে বঙ্গশ্রীতে যাচ্চি—বিমলেন্দু ইন্টারন্যাশনাল বোর্ডিং থেকে ডাক্‌লে। চা খাবার খাওয়ালে। বঙ্গশ্রীতে গেলাম—সেখান থেকে মোটরে আমি সুনীতিবাবু, পরিমল, মনোজ সবাই গেলাম বাগবাজারে স্টুডিওতে। পশুপতি বাবুর বাড়ীতে গেলাম। সেখান থেকে নীরদ চৌধুরীর বাড়ী গিয়ে ঘণ্টা টিপে—সাড়া নেই। বাড়ী ফিরে এলুম —সঙ্গে A Gentleman from San Francisco[১] বলে একখানা Ivan Bunin এর গল্পের বই।

২৮শে জুন, ১৯৩৪। ১৩ই আষাঢ়, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

স্কুলে গেলুম। কোলা যেন বদ্‌লে গিয়েচে—ওকে আর যেন চিন্‌তে পারা যায় না। —ভালও লাগ্‌ল না। সকালে ছুটীর পর বঙ্গশ্রীতে গেলাম। সুনীতি-বাবুর সঙ্গে দেখা। সেখান থেকে বার হয়ে Wide World কিন্‌তে গেলাম। ভাল লাগ্‌ল না। Wide Worldএর taste আর নেই। কেন্দ্রবিন্দুতে মন

১ A Gentleman from San Francisco and other Stories।

এসেচে। মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত energy—rejuvenation [—] আমি জীবনকে দেখেচি—এই দেড় মাসে। Nothing else matters।

২৯শে জুন, ১৯৩৪। ১৪ই আষাঢ়, ১৩৪১। শুক্রবার

সকালে উঠে বঙ্গশ্রীর লেখা লিখলাম। তারপর স্কুল থেকে বঙ্গশ্রীতে গিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। বলাইবাবুর শালীদের দেখে সজনী ও কিরণ upset হয়ে গিয়েচে—সেই কথাই বলচে। ওখানে অনেকক্ষণ থাকবার পর আমি College Square দিয়ে হেঁটে P. C. Sircar এর দোকানে এলুম। অবিনাশ বাবুর সঙ্গে দেখা। কালিদাস রায়ের সঙ্গে দেখা হোল। কমলা বুক ডিপোর মালিক চা টোস্ট খাওয়ালে—খুব খাতির করলে।

৩০শে জুন, ১৯৩৪। ১৫ই আষাঢ়, ১৩৪১। শনিবার

সকালে গিরীন সোম এল। বই চাই—টাকা দিতেও রাজী। আর একজন প্রকাশক এল। আমি ছুটীর পর বঙ্গশ্রী—সেখান থেকে নীরদবাবুর flat এ। অনেক রাত্রে আড্ডা দিয়ে ফিরি। নীরদবাবু উঠে চলে গেলেন কাজে। আমি আর তাঁর স্ত্রী অনেকরাত পর্য্যন্ত বসে আড্ডা দিলুম।

১লা জুলাই, ১৯৩৪। ১৬ই আষাঢ়, ১৩৪১। রবিবার

সকালে মণি বোসের বাড়ীতে হেঁটে যাবার সময় মনে একটা অপূর্ব্ব আনন্দ। আমি সব যেন দিতে পারি ওর[১] জন্যে। ওকে যখন পছন্দ করেচি—তখন সবই ত দিয়ে দিতেও পারি। ও বাস্তবিকই বড় বন্ধু।

৫০০০ হাজার টাকা যদি আমার থাকতো [—] উইল করে তাও যেন ওকে দিয়ে দিতুম। এই রকম মনের ভাব। বাড়ীতে এসে খেয়ে একটু ঘুমিয়ে উঠে নীরদবাবুর flat এ। সেখানে প্রমোদ বাবুর সঙ্গে কত রাত পর্য্যন্ত আড্ডা।

২রা জুলাই, ১৯৩৪। ১৭ই আষাঢ়, ১৩৪১। সোমবার

আজ ছুটী। সকালে নীরদের বাড়ী গেলাম। নীরদের স্ত্রী চা খাবার আনলে। নীরদের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করা গেল। তারপর বাড়ী এসে Road Back[২] পড়লুম। একটু ঘুমিয়ে উঠে বঙ্গশ্রীতে গেলাম।

মনে সব সময়ই সেই ভাবটা আছে। কেমন একটা অদ্ভুত ভাব—ঠিক

---

১ সম্ভবতঃ খুকু। আরও বিশেষ করে ৩রা জুলাইয়ের ডায়েরি পড়লে এটা বেশি মনে হয়। লিখেছেন, 'মনে এত loneliness বোধ করছি শুধু বারাকপুর থেকে এসে।'

২ Erich Maria Remarque-এর উপন্যাস।

বর্ণনা করা যায় না। যেন সেই কথাটাই ভাব্‌চি। এ একটা মুস্কিলে পড়ে গিয়েছি এবার। এটাও সত্যি যে জীবনের সুখ আমি যা চাই তাতেই হয়তো নেই। কারণ সে তো ছেলেমানুষের জীবন। সেদিকে সুখ নেই, জানি। তবু মনের চঞ্চলতা ও ভাব যায় না। জানি না কতদিনে যাবে। তবে আবার বলেছিল যে কিছুই চিরকাল থাকে না—খুব কড়া কথাই বলেছিল।

অনেকদিন পরে নরেনের সঙ্গে দেখা। মির্জ্জাপুর পার্কে অনেককাল আগে তার সাথে কথা হয়েছিল—লেখা নিয়ে। এখন সেই [১৯৪০ সালে এই দিনটীতে কল্যাণীর[১] সঙ্গে কত কথা হোল। কল্যাণী আসতে দিলে না বনগাঁ থেকে। ১৯৩৪ সাল এর অস্তিত্ব··· ? দিলই।]

৩রা জুলাই, ১৯৩৪। ১৮ই আষাঢ়, ১৩৪১। মঙ্গলবার

সকালে একটু Road Back পড়ে স্কুলে গেলুম। মন চঞ্চল—কোথাও বস্‌তে পারিনে—কোনো কাজে মন লাগে না। মনে হচ্ছে এসবে শান্তি নেই।

কলকাতায় বদ্ধ, নির্জ্জন জীবন ভাল লাগে না। এর চেয়ে পাড়াগাঁয়ে জীবনের মূল্য অনেক। স্কুল থেকে একটু বঙ্গশ্রী গিয়ে আমি আর নীরদ চৌধুরী বার হয়ে গেলুম College Square পর্য্যন্ত। সেখান থেকে আমি ট্রেনে বন্ধুদের বাড়ী গিয়ে ছাদে বসে টরু, আর বন্ধুর বৌ—সকলের সঙ্গে গল্প করলাম। ওদের রান্না ঘরটা তেতলার ছাদে—বেশ cosy·· রান্নাঘরে বসে কথা বল্‌তে বেশ লাগে—যদি তার সঙ্গে হোতো। এর কথা মনে হয়। A little silence—হয়ত তামাক সাজ্‌বো আর বসে বসে গল্প করলো। loneliness বোধ করছি শুধু বারাকপুর থেকে এসে।

৪ঠা জুলাই, ১৯৩৪। ১৯শে আষাঢ়, ১৩৪১। বুধবার

এদিনও মন খুব ভাল নয়। স্কুলে গেলুম সেখান থেকে বঙ্গশ্রীতে। হরেকৃষ্ণ ও সুকুমারবাবু এলেন। সজনী বল্লে—৫টার আগে এখানে আসার নিয়ম হয়েচে। খানিকটা পরে উঠে এলুম College square দিয়ে। পথে সাতু কাকার সঙ্গে, পণ্ডিত ও হ্যাঁদার সঙ্গে দেখা। সাতুকাকা মাংস কিন্‌চে। পথে খুব বৃষ্টি। বাসায় এসে মন এত খারাপ লাগ্‌ল যে শুয়েই পড়লাম। অনেকরাত্রে উঠে আবার বইয়ের manuscript পড়া গেল।

---

১ বিভূতিভূষণের দ্বিতীয়া স্ত্রী; ডাক নাম রমা। ১৩৪৭ সালের ১৭ই অগ্রহায়ণ বিভূতিভূষণের সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়।

তৃতীয় বন্ধনী চিহ্ন বিভূতিভূষণের দেওয়া।

৫ই জুলাই, ১৯৩৪। ২০শে আষাঢ়, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

এদিন সকালে আশু কবি এল প্রথমে। পরে কৃষ্ণধন, পি. সি. সরকার, তারপর এল কানাই। এই প্রথম আসা শুরু হোল যেন ওদের। সকালে পড়ে বইয়ের পাতা পড়লুম। মালতীর অধ্যায়টা[১] আমার বেশ লাগছিল। স্কুল থেকে বেরুচ্চি পথে রমেশবাবুর সঙ্গে দেখা। দার্জ্জিলিংয়ের গল্প হোল, ট্রামে প্রবাসী। সেখান থেকে রমেশ সেনের দোকান। তারপর সন্ধ্যার পর সোজা বাসা। এদিন আবার manuscript পড়লুম। রাত্রে বাইরে শুই—বড় গরম। পথে দেবব্রতের সঙ্গে দেখা।

৬ই জুলাই, ১৯৩৪। ২১শে আষাঢ়, ১৩৪১। শুক্রবার

সকালে মনটা যন্ত্রণাই দিল। স্কুলের পরে আগে এল কৃষ্ণধন দে, তার সঙ্গে গল্প করতে করতে স্কুলে। স্কুল থেকে বৃষ্টি মাথায় গেলুম হরিবাবুর অষ্টাঙ্গ সংহিতা কিনতে ডি, এম. লাইব্রেরীতে। স্কুলে এসে হরিবাবুর সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করি পরলোক সম্বন্ধে। সেখান থেকে হেঁটে বাসা ও তারপর ট্রামে টরুদের বাসা। পথে করুণার সঙ্গে দেখা। টরুদের বাসা যেতে রংমহলে এলুম পতিব্রতা[২] দেখতে। বন্ধুদের ছাদে গিয়ে রাত্রে শোয়া হল। একসঙ্গে আমি ঘণ্টু বার হলুম। টরুও ছিল। ভোরে চলে এলুম। বাসায় এসে কাল রাত্রের ঢাকা খেলুম। বন্ধুদের ছাদে নক্ষত্রদের দিকে চেয়ে মনের ভাব কমে গেল—নেই বল্লেই চলে।

৭ই জুলাই, ১৯৩৪। ২২শে আষাঢ়, ১৩৪১। শনিবার

সকালে থিয়েটার থেকে বাড়ী এসে স্নান করে আগের রাতের খাবার খেলাম। নরেন এল। class friend সেই নরেন। তারপর আমি স্কুলে গেলাম। এসে ঘুমুলাম ৩॥০ টা পর্যন্ত। তারপর ট্রামে নীরদ বাবুর বাসায়। নীরদবাবু নেই। তাঁর স্ত্রী চা করে খাওয়ালেন। শঙ্কর এল। আমি কাল রাত্রের থিয়েটারের গল্প করি। তারপর উঠে বাড়ী আসি। রাত ১০ টার পরে পশুপতি বাবু এলেন। ১১॥০টা পর্যন্ত গল্প হোল। মীরার বিয়ে হয়েচে—বরকনেকে তুলে দিয়ে এলেন ঢাকা মেলে।

ভাবনা এখনও যায় নি। রোজই ভাবি।

৮ই জুলাই, ১৯৩৪। ২৩শে আষাঢ়, ১৩৪১। রবিবার

সকালে উঠে মণির ওখানে গেলাম। সুধীর চৌধুরী, শচীন বাঙাল, সরোজ

১ 'দৃষ্টি-প্রদীপ'।

২ রাজকৃষ্ণ রায়ের নাটক।

চৌধুরী প্রভৃতি এল। ১২টার পরে মেসে জল খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিলাম। তারপর উঠে স্কুলে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড কমিটির মিটিং। ব্রজকিশোর বাবু ও সেক্রেটারী[1] এলেন।। বার হয়ে ৬টার সময় পুরোনো বইয়ের দোকান ঘুরে হেঁটে বৌবাজার দিয়ে মেসে এসে বর্ষণমুখর অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে চুপ করে বারান্দায় বসে ক্বত কি ভাবছিলাম। মনের স্বাদও অনেকটা ফিরে পেয়েছি। Time একটা প্রধান element মানুষের ব্যাপারে এটা বুঝেচি— মহাকাল! কিনা করে দিতে পারে মহাকাল! এর রসায়ন অদ্ভুত।

৯ই জুলাই, ১৯৩৪। ২৪শে আষাঢ়, ১৩৪১। সোমবার

স্কুল থেকে কাকার বাসা। দেখা হোল না কারুর সঙ্গে। বঙ্গশ্রী আপিস। হেঁটে মেসে এসে ট্রামে গেলুম। সজনী বল্লে—খাওয়াবো। রাত্রে পর্য্যন্ত বসে রইলুম। হেঁটে চলে এলুম। বড় বর্ষা যাচ্চে।

১০ই জুলাই, ১৯৩৪। ২৫শে আষাঢ়, ১৩৪১। মঙ্গলবার

ছুটী। সমস্ত দিন বাসায় কাটিয়ে বিকেলে বঙ্গশ্রী, সন্ধ্যার পর সেখান থেকে হেঁটে চলে এলাম। Dull Day।

১১ই জুলাই, ১৯৩৪। ২৬শে আষাঢ়, ১৩৪১। বুধবার

স্কুল। সেখান থেকে নিউ মার্কেটে Wide World. ফিরে বঙ্গশ্রী। বেজায় বৃষ্টি বিকেলে ও সন্ধ্যায়। অনেকদিন পরে আমি সজনী কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীটে সেই রেষ্টোরেণ্টে গেলুম।

১২ই জুলাই, ১৯৩৪। ২৭শে আষাঢ়, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

সকালে স্কুলের পরে বঙ্গশ্রী। সজনী নেই। প্রভাত নিয়োগীর[2] সঙ্গে দেখা [—] মুসৌরি যেতে বল্লে পূজোর সময়ে। বেরিয়ে আসচি—anderson's fairy tales কিনলাম। প্রজ্ঞাব্রতের সঙ্গে দেখা। বৌবাজারের মোড় পর্য্যন্ত তার সঙ্গে এলাম।

১৩ই জুলাই, ১৯৩৪। ২৮শে আষাঢ়, ১৩৪১। শুক্রবার

সকালে কৃষ্ণধনের বাড়ী। দেখলুম অনেকদিন আগে এই দিনটিতে সকালে কৃষ্ণধনের বাড়ীই গেছলুম। আজ মনের মধ্যে অদ্ভুত creative fervour অনুভব করচি। আর Dull বোধ করিনে। ছোট খাতাখানা হারিয়ে গিয়েচে—আর পেলাম না। মনের সেই emotional sadness এখনও যায়নি—

---

১ অমলকুমার সরকার, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, সুপ্রীম কোর্ট।

২ শিল্পী।

অনবরত সে কথা ভাবি। ও একটা অদ্ভুত ভাব। নতুন অভিজ্ঞতা হোল। দুপুরে খুব ঘুমিয়ে রথের মেলা দেখে হেঁটে টক্কদের বাসায় গিয়ে ছাদে বসে টক্ক, টুকু, টক্কর মা, সকলের সঙ্গে ভূতের গল্প করলুম।

১৪ই জুলাই, ১৯৩৪। ২৯শে আষাঢ়, ১৩৪১। শনিবার

স্কুল থেকে সকালে বেরিয়ে বাসায় এসে ঘুমুই। তারপর সেই Wellington Square এ ছেলেদের ম্যাচে রেফারী গিরি কর্ত্তে। ওখান থেকে নীহার রায় নিয়ে গেল চা খাওয়াতে। তারপর বঙ্গশ্রী হয়ে বাড়ী।

১৫ই জুলাই, ১৯৩৪। ৩০শে আষাঢ়, ১৩৪১। রবিবার

সকালে মণি বোসের বাড়ী [—] সেখান থেকে ফিরে ঘুমিয়ে বৈকালে নীরদ বাবুদের flat এ।

১৬ই জুলাই, ১৯৩৪। ৩১শে আষাঢ়, ১৩৪১। সোমবার

সকালে উঠে নীরদবাবুর flat এ। সেখানেই খেলুম। সকাল সকাল স্কুল গেলুম কারণ Inspector আসবে আজ। ৫টা পর্য্যন্ত স্কুলে রইলুম। বিকেলে সুসার কাকার সঙ্গে পথে দেখা। তিনি বাসায় ফিরে গেলেন। খুকু এসেচে। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে বঙ্গশ্রী।

১৭ই জুলাই, ১৯৩৪। ১লা শ্রাবণ, ১৩৪১। মঙ্গলবার

স্কুলে যাবার সময় বঙ্গশ্রীতে গেলুম। তারপর ছাতা দিতে সুসার কাকার বাসায়। খুকুর জ্বর পূর্ব্ববৎ। স্কুলে ইন্সপেক্টর এল। বেরিয়ে বঙ্গশ্রী আপিসে অনেকক্ষণ আড্ডা হোল। প্রভাত নিয়োগী আর্টিস্ট মুসৌরির ঠিকানা দিয়ে গেল। পশুপতি বাবুকে নিয়ে খুকুকে দেখিয়ে ওঁর গাড়ীতে বাগবাজারে গেলুম। ছাদে বসে খাবার খেয়ে গল্প করি। বৌ ঠাকরুনের সঙ্গে এক পালা ঝগড়া করা গেল। তারপর ফটো তোলানো হোল। নীরদের বাসায় এসে দেখি নীরদ ঘুমিয়েচে। নীরদের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করি। বাসে বাড়ী এসে দেখি সুটুর জ্বর। শুয়ে আছে।

১৮ই জুলাই, ১৯৩৪। ২রা শ্রাবণ, ১৩৪১। বুধবার

স্কুলের পরে খুকুকে দেখতে গেলাম। সে আজ ভাল আছে। তারপর ওদের দু একটা গল্প শোনালুম। খুড়ীমা রুটী খেতে বল্লে। খেয়ে এলুম।

১৯শে জুলাই, ১৯৩৪। ৩রা শ্রাবণ, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

স্কুলে গেলুম। সেখান থেকে বঙ্গশ্রী। বঙ্গশ্রী থেকে খুকুদের বাসায় এসে খুকু ও বিমলাকে নিয়ে মিউজিয়ামে গেলাম। ওদের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আমি

গেলুম নীরদ দাসগুপ্তের বাড়ী। সন্ধ্যার পরে চা খেয়ে চলে আসি।

২০শে জুলাই, ১৯৩৪। ৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৪১। শুক্রবার

সকালে মহিমা, কানাই, করুণা এল। আমার ১॥০ টায় স্কুল। খেয়ে ঘুমিয়ে গেলাম। তারপর বঙ্গশ্রী। সেখান থেকে বন্ধুর বাসায় গেলুম। ওদের ছাদে বসে চা খেয়ে গল্প করা গেল। সন্ধ্যার সময় মণি বোস এসে ওদের বাড়ীতে রবিবার যেতে বল্লে।

২১শে জুলাই, ১৯৩৪। ৫ই শ্রাবণ, ১৩৪১। শনিবার

আজ ছুটী। প্রবাসীর লেখা লিখ্‌লুম। নারায়ণ লাইব্রেরীর লেখা এবং কালীর মামাশ্বশুর এল অনেকদিন পরে। তারপর খেয়ে প্রবাসী আপিসে। সেখান থেকে আসবার পরে নীরদ এল। সে এসে নিমন্ত্রণ করে গেল। আমি ট্রামে বেরিয়ে খুকু ও বিমলাকে নিয়ে গেলুম নীরদবাবুর flat এ। সেখান থেকে 'রূপলেখা' দেখ্‌তে ওদের মোটরে ভবানীপুরে। ফিরবার পথে সুশীলবাবুর বাড়ীতে এলুম। খুকুদের বাসায় পৌঁছে দিয়ে এলাম মেসে। রাত্রে প্রবোধের সঙ্গে সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করি। বাইরে শুয়েচি—শেষ রাত্রে খুব বৃষ্টি।

২২শে জুলাই, ১৯৩৪। ৬ই শ্রাবণ, ১৩৪১। রবিবার

সকালে বসে লিখ্‌লাম। দুপুরে নীরদের বাড়ী নিমন্ত্রণ খেতে বসে একটু আড্ডা দিলাম। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে সুপ্রভার হোস্টেলে গেলুম—সেখান থেকে ট্রামে মণির বাড়ীতে। বারান্দায় বসে আড্ডা দিলুম। সুধীর এল।

২৩শে জুলাই, ১৯৩৪। ৭ই শ্রাবণ, ১৩৪১। সোমবার

সকালে স্কুলে গেলুম। আজ সকালেই পরীক্ষা শেষ হোল। তারপর বঙ্গশ্রীতে বসে আড্ডা দিলুম। বিকেলে খুকুকে নিয়ে সুপ্রভার হোস্টেলে গেলাম। তারপর ওকে পৌঁছে দিয়ে বাসায় এলাম।

২৪শে জুলাই, ১৯৩৪। ৮ই শ্রাবণ, ১৩৪১। মঙ্গলবার

আজ সকালেই স্কুলের কাজ হয়ে গেল। বিকেলে সাহিত্য পরিষদের মিটিং ছিল। সুনীতিবাবু এসেছিলেন বঙ্গশ্রীতে—পশুপতি বাবুর গাড়ীতে গেলাম সাহিত্য পরিষদে। সেখান থেকে চলে এলাম সকালে।

২৫শে জুলাই, ১৯৩৪। ৯ই শ্রাবণ, ১৩৪১। বুধবার

স্কুলে গেলুম বেলা একটায়; কাজ ছিল না। বঙ্গশ্রী থেকে হেমন্তের চিঠি

নিয়ে এলুম। তারপর গেলুম বন্ধুর বাসায়। সেখান থেকে নীরদের ওখানে [—] ওখান থেকে পশুপতি বাবুর বাড়ীতে। ফটোও তোলা হোল। তিনখানা প্লেট নষ্ট হোল। রাত্রে ঘুম ভাল হোল না। একটু পেটের অসুখ মত করেচে।

২৬শে জুলাই, ১৯৩৪। ১০ই শ্রাবণ, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

এদিন শরীর খারাপ। ট্রামে স্কুলে গেলুম। কাজ ছিল না। বঙ্গশ্রী থেকে আবার স্কুলে এসে শুয়ে রইলুম তেতলায়। ক্ষেত্রবাবু ও হরিবাবু এখনও কথা কইচে।··· ? থেকে বায়োস্কোপ দেখে এসে রাত্রে শরীর বড় খারাপ হোল।

২৭শে জুলাই, ১৯৩৪। ১১ই শ্রাবণ, ১৩৪১। শুক্রবার

কোথাও যাইনি। জ্বর।

২৮শে জুলাই, ১৯৩৪। ১২ই শ্রাবণ, ১৩৪১। শনিবার

আজ বেরুইনি। শরীর ভাল নয়। কৃষ্ণধন এসে অনেকক্ষণ গল্প করলে।

২৯শে জুলাই, ১৯৩৪। ১৩ই শ্রাবণ, ১৩৪১। রবিবার

শরীর ভাল। পশুপতি বাবু এলেন। বৈকালে নীরদ দাসগুপ্তের বাড়ী বেড়াতে গেলুম। পাঁচতলার ছাদে উঠ্‌লুম।

৩০শে জুলাই, ১৯৩৪। ১৪ই শ্রাবণ, ১৩৪১। সোমবার

আজ সকালে শরীর ভাল, পথ্য পেলাম। দশটায় বেরিয়ে খুকুকে নিয়ে শেয়ালদ' স্টেশনে এলাম। তারপর ট্রেনে ও গাড়ীতে আমাদের বাসা। নৌকায় রওনা হলুম বারাকপুরের দিকে। কি সুন্দর নদীর দৃশ্য! চারিধারের শোভা কি—অদ্ভুত! বেলা ছ'টার সময়ে বারাকপুরের ঘাটে এলাম। নির্জ্জন বাঁশবনের পথ, দুধারে ঝোড় জঙ্গল বেড়েচে বেজায়—কিন্তু নির্ম্মল, নীল আকাশ, পটুপটি ফল, ঘেঁটকোল[১] ফুটেচে। অপূর্ব্ব নির্ম্মল বর্ষায় অপরূপ! খুকু আর আমি বাড়ী এসে পৌঁছলাম। হরিপদদার কাছে দেখা করতে গেলাম। রাত্রে এসে তাস খেলা হোল। রামপদ ভাঙা তানপুরো বাজাতে লাগ্‌লো।

৩১শে জুলাই, ১৯৩৪। ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৪১। মঙ্গলবার

আজ কি সুন্দর শ্রাবণের সূর্য্যোকরোজ্জ্বল প্রভাত। গাছে গাছে অপূর্ব্ব সবুজের সৌন্দর্য্য! সেই মাঠে বেড়াতে গেলুম। তারপর গেলুম ঘোলার গাঙে নাইতে। ঘোলার গাঙ্ অপূর্ব্ব—কি কূলে কূলে ভরা নদীজল—এতটুকু কাদা নেই কোথায়! তাছাড়া আজ আকাশের রংটা কি অপূর্ব্ব নীল—নীচে বড় বড় সবুজ উলুবন। সতেজ তাজা, মাটীতে কোথাও কাদা নেই, শুক্‌নো খট্‌খট্ করচে।

১ ঘেঁকুল / ? ঘেঁটকচু/Typhonium trilobatum Schott.।

একটু ঘুমুলুম। উঠে দেখি অপূর্ব্ব শ্রাবণ—দুপুরের রোদ। কত কথা মনে করিয়ে দেওয়া। এই সময়টা আমি কখনো দেশে থাকিনি। ১৯১৮ সালের কিছুদিন ছাড়া। তারপর খুকু এল। আমি পাঁচীকে বই দিয়ে এলাম। তারপর বেরিয়ে পড়ি। অপূর্ব্ব রৌদ্রালোকিত নদী। মাঝে মাঝে মেঘ, রামধনু, কি রংয়ের মেলা!

১লা অগস্ট, ১৯৩৪। ১৬ই শ্রাবণ, ১৩৪১। বুধবার

কি নদীর ধারের গাছ পালার প্রাচুর্য্যে—কি শ্যামলতা!…অনেকদিন পরে কলিকাতার কৃত্রিম সমাজের চোখ নিয়ে এসে এদের দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। ওবেলা কি তৃপ্তিতেই স্নান করেছিলুম! তারপর বনগাঁয়ে এসে পৌছলাম। ৪॥•টাতে নৌকো ছাড়লুম—৬টায় এলাম বনগাঁয়ে। নদীর ধারে চটকাতলার কাছে কদমগাছে কদমফুল ধরেচে—এখনও ফোটেনি—সাঁই বাব্‌লা গাছের প্রাচুর্য্য চাল্‌তে পোতার বাঁকে—মাকাললতা ও ফল। সন্ধ্যায় বীরেশ্বর বাবুর বাসায় গল্প করা গেল। দেশই ভালো লাগে। এমন শরতের মত সূর্য্যোকরজ্জ্বল [সূর্য্যকরোজ্জ্বল] দিন আর দেখিনি শ্রাবণ মাসে। পরদিন উঠে খোকা খুকীদের পড়া নিলাম। বিভূতির আড়তে বসে গল্প করি। কালোর সঙ্গে দেখা হোল। আজও কালকার চেয়েও রোদ। বিনয়দার কাছ থেকে World of Souls[১] বইখানা আন্‌লাম। বিকেলে রওনা। সারাটা পথ বইখানা পড়তে পড়তে সবুজ গাছপালা, শ্রাবণের আকাশভরা রোদ, সোনালী রঙের অদ্ভুত রোদ উঠ্‌লে দত্তপুকুর স্টেশন—আমি বসে বসে জন্ম মৃত্যুর রহস্য পড়চি—যেন কেমন মুগ্ধ হয়ে গেলাম। বড় আনন্দে কাটল অনেকদিন দুঃখের পর অর্থাৎ অসুখের পর।

২রা অগস্ট, ১৯৩৪। ১৭ই শ্রাবণ, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

স্কুলে যাচ্চি যতীন বাবু বল্লে—যেতে হবে না [—] আপনার substitute এসেচে। বঙ্গশ্রীতে গেলুম। সেখান থেকে নিউ মার্কেটে Wide World এর জন্যে। বাড়ী এসে পড়াশুনো করি। বিকেলে একটু কলেজ স্কোয়ারে ঘুরে আসি।

সেদিন বাড়ীতে যে অপূর্ব্ব শরতের দুপুর দেখেছিলুম—তার কথা আজও মন থেকে মুছে যায়নি। এবার এই দুদিন বাড়ী গিয়ে কি enjoyই করেচি। ছকুর নৌকাতে কি চমৎকারই লাগ্‌লো আস্‌তে। ছকুদা—কাটা তামাক সাজলে। রাজনগরের বাঁকে বসে হাতে কল্কে করে খেলাম।

---

১ The World of Souls, Wincentry Lutoslawski।

৩রা অগস্ট, ১৯৩৪। ১৮ই শ্রাবণ, ১৩৪১। শুক্রবার

স্কুলে join করলুম। কোনার সঙ্গে বহুদিন পরে দেখা। তারপরে বঙ্গশ্রীতে কিরণের বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র নিয়ে আসি। নীরদ এল। বেরিয়ে কাকার বাসায় গিয়ে খুকুর কথা বলে এলাম। হেঁটে বৌবাজার দিয়ে দেশপ্রিয় খাবারের দোকানে কিছু খেলাম। খাবার ভাল নয়। ঠকলুম। আজকাল Survival of Soul পড়চি। আজ অমলাদের ওখানে বালিগঞ্জে নিমন্ত্রণ ছিল। গেলুম না। সুরেন ধর এল—সন্ধ্যায়। তার সঙ্গে বসে গল্প করলুম। রাত্রে বসে বসে পড়লুম।

আজ রাত্রে রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন দেখ্‌লাম খুব। অনেকদিন পরে আজ একটু বর্ষা মত হোল। বাড়ীর ওই শরৎ এখনও ভুলিনি—বিশেষ করে বারাকপুর থেকে বনগাঁ নৌকা করে আসা। ছকুর নৌকাতে।

৪ঠা অগস্ট, ১৯৩৪। ১৯শে শ্রাবণ, ১৩৪১। শনিবার

সকালে স্কুলে ছুটীর পরে—বাসায় এসে বই পড়লুম। আজ কোথাও বেরুতে বা আড্ডা দিতে ইচ্চে করে না। এবার বাড়ী থেকে ইছামতীর অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখে এসে পর্য্যন্ত এমন হয়েচে। ৪ টার সময় নীরদবাবুর flat-এ গেলুম। নীরদবাবু ঢাকায়। চা খেয়ে গল্প গুজব করা গেল। রাত্রে ট্রামে ফিরি।

৫ই অগস্ট, ১৯৩৪। ২০শে শ্রাবণ, ১৩৪১। রবিবার

সকালে মণি বোসের বাড়ীতে। চারু রায়, সুধীর, শচীন—ওরা ছিল। চারু রায় লোকটা বেশ। এসে একটু শুয়ে উঠে বঙ্গশ্রী আপিস। সেখান থেকে কিরণ রায়ের বাড়ী। আজ আবার সেজ মামা মারা গিয়েচেন খবর পেলাম। গত শনিবার মারা গিয়েচেন। কিরণের বাড়ী থেকে মোটরে গেলুম হাওড়া হয়ে সাঁৎরাগাছি। কিরণের বিয়ে সেখানে। ফিরবার পথে ভট্টাচায্যির মোটরে ফিরচি। হাওড়া পুল বন্ধ। বালি ব্রিজ দিয়ে এলাম। পথে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখ্‌লাম দক্ষিণেশ্বর ছাড়িয়ে।

৬ই অগস্ট, ১৯৩৪। ২১শে শ্রাবণ, ১৩৪১। সোমবার

ছুটি। এগারোটায় বেরিয়ে প্রথমে Thackers এর বাড়ী। তারপর ইন্‌কমট্যাক্স অফিসে। দেবী সেখানে উদ্ধার করে দিলে। তারপর Imperial Library—বেরিয়ে New York Soda Fountain এ আইস্‌ক্রিম খেয়ে শেয়ালদ'। ট্রেনে বেলঘরে। মাসীমাদের দেখাশুনো করে ফিরবার পথে নলীর সঙ্গে দেখা। স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে ঝগড়া হোল। সন্ধ্যাতে ফিরে কিছু খাবার খেয়ে পড়তে বসি। সুরেন ধর এল। রাত্রে feast হচ্চে। আমি আজ সারাদিন

খাইনি এদিকে।

৭ই অগস্ট, ১৯৩৪। ২২শে শ্রাবণ, ১৩৪১। মঙ্গলবার

ছুটী। দুপুরে Thackers এর দোকানে ও পরে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী। Gods সম্বন্ধে দু একখানা বই পড়ে আর আনন্দ পেলুম। ভয়ানক বৃষ্টি। ৬টার পরে বেরিয়ে বঙ্গশ্রীতে। কেউ নেই। নিখিলদার গাড়ীতে বৌবাজার পর্য্যন্ত এলুম হরিপদ ও আমি। তামাক কিনে বাসায় এলুম।

৮ই অগস্ট, ১৯৩৪। ২৩শে শ্রাবণ, ১৩৪১। বুধবার

সকালে কাশী থেকে এক ছোক্‌রা এল দেখা করতে। তারপর এলো—চারু[১] বনগাঁয়ের। রমাপ্রসন্ন এসে সৎসঙ্গের বই দিয়ে গেল। স্কুলে কোলাকে mermaid এর গল্প[২] বল্লুম। একটু ঘুমুলাম অবকাশের সময়ে। বঙ্গশ্রী থেকে টিকিট নিয়ে College Sqr এ বই দেখে এলুম। তারপর কিরণের বাড়ী। নীরদ সুরেশ এক সঙ্গে। সেখানে প্রবোধ বাগ্‌চি, সুনীতি বাবু এক সঙ্গে খেতে বসি। সুনীতিবাবুর সঙ্গে জাপানী পাঞ্জাতে হারিয়ে দিলাম। যতীন বাগচি[৩] গল্পের জন্যে বল্লেন। আমি আর সুরেশ চলে এলুম ট্রামে। বৌ দেখতে গিয়ে সুধার সঙ্গে দেখা হোল। সে বল্লে আপনার বিয়ে কবে হচ্ছে?

আমি বল্লুম রবীন্দ্রনাথের পরে।

রাত্রে অসম্ভব গরম।

৯ই অগস্ট, ১৯৩৪। ২৪শে শ্রাবণ, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

'God the beautiful' বইখানা স্কুলে নিয়ে গেলাম। আমার মন যেন অন্য রকম হয়ে গিয়েচে বইখানা পড়ে। স্কুল থেকে ছাদে দুপুরে গিয়ে শরতের অপূর্ব্ব নীল আকাশ দেখ্‌লাম। জগতের সর্ব্বত্র যে beauty তা এবার দেখতে গেলুম। শরতের দুপুরে দূরে দেশের কথা ভাবতে ভালো লাগে। ঘন নীল দিগন্তে কোথায় আমার সেই শৈশব জগৎটা। সে যেন স্বপ্নে ফিরে আসে এই সময়টা। বঙ্গশ্রীতে গিয়ে বসে থাকবার পরে পশুপতিবাবু গাড়ী পাঠিয়েছেন Y. M. C. A. তে তিমিরবরণের[৪] অভ্যর্থনায়। অমলা নন্দীর[৫] নৃত্য বেশ লাগল। খুকুর

১ চারুচন্দ্র দত্ত, বনগাঁবাসী; ইনশিওরেন্সের এজেণ্ট ছিলেন।

২ Hans Anderson এর গল্প, 'Little Mermaid'।

৩ যতীন্দ্রমোহন বাগচী।

৪ তিমিরবরণ ভট্টাচার্য, সরোদবাদক।

৫ বর্তমানে অমলাশঙ্কর।

ফটো বেশ হয়েচে। ফিরে এসে অনেকরাত পর্য্যন্ত গরমে ঘুম হোল না। আকাশে সৌন্দর্য্য, তারায় তারায় ভগবানের সৌন্দর্য্য শিল্পের খবর যেন।

১০ই অগস্ট, ১৯৩৪। ২৫শে শ্রাবণ, ১৩৪১। শুক্রবার

সকালে সুরেন এল। স্কুলে কোলা আসে নি। যাবার সময় দেবব্রত ওদের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল—আমায় দেখে ভিতরে গেল। স্কুল থেকে বার হয়ে নিখিলের গাড়ীতে আলিপুর। সেখান থেকে আবার ধর্ম্মতলা হয়ে হাঁটতে হাঁটতে আসচি। ভবলের সঙ্গে দেখা। পতিতের সঙ্গে দেখা। 'মধুচক্রে' চা টোস্ট খাওয়ালে সুধীরচন্দ্র। পুরোনো বই দেখে বাড়ী এলাম।

১১ই অগস্ট, ১৯৩৪। ২৬শে শ্রাবণ, ১৩৪১। শনিবার

স্কুলের পরে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে গিয়ে রাধাকৃষ্ণানের বই নিলাম। তারপর নীরদ দাসগুপ্তের flat-এ আসা।

১২ই অগস্ট, ১৯৩৪। ২৭শে শ্রাবণ, ১৩৪১। রবিবার

কোথাও না গিয়ে সমস্তদিন পড়াশুনো করি। শরতের অদ্ভুত রৌদ্র উঠেচে। বিকেলে রমেশ সেনের ওখানে গেলাম।

১৩ই অগস্ট, ১৯৩৪। ২৮শে শ্রাবণ, ১৩৪১। সোমবার

স্কুলের পরে বঙ্গশ্রীতে যাই। দিনটা ভালো। Spirit Unity পড়চি। পথে বিকেলে দেখা আশুর সঙ্গে। সে খাওয়ালে। টেনে নিয়ে গেল College Square এ। সেখানে বিমলেন্দু ধরের সঙ্গে দেখা। তাদের নিয়ে P. C. Sircar এর দোকানে গেলুম। তারপর Square এ বসে নৌকাডুবি সম্বন্ধে আলোচনা হোল।

১৪ই অগস্ট, ১৯৩৪। ২৯শে শ্রাবণ, ১৩৪১। মঙ্গলবার

স্কুলের পরে বঙ্গশ্রীতে চা খেয়ে মেসে এলাম। এসে একটু পড়ে গাড়ীতে বেলঘরে। সেখানে ছোট মামার সঙ্গে দেখা। দুজনে স্টেশনে এলুম। আমি রাত দশটার মধ্যে মেসে। আজ শুনলুম গত সোমবারের আগের সোমবারে বড়মামা (বাদার বাবা) মারা গেছেন।

১৫ই অগস্ট, ১৯৩৪। ৩০শে শ্রাবণ, ১৩৪১। বুধবার

সকালে চুল ছাটি [ছাঁটি]। অনেকে এসেছিল—রমাপ্রসন্নও। তারপর স্কুলে গেলাম। কোলাকে আমড়া খাওয়ালাম। সে কাছে দাঁড়িয়ে গল্প শুনলে। বঙ্গশ্রী হয়ে হেঁটে মেসে। সন্ধ্যায় সুরেন এল। গল্প গুজব হোল। আজ রাত্রে ভয়ানক গরম।

১৬ই অগস্ট, ১৯৩৪। ৩১শে শ্রাবণ, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

স্কুলে কোলাকে খুব গল্প করা গেল চেয়ারের কাছে দাঁড় করিয়ে। বঙ্গশ্রী আপিস থেকে বেরিয়ে আলিপুরে ঘুরে এলুম ট্রামে। সজনী আমি ও কিরণবাবু প্যারাডাইসে চা খেয়ে এলুম। তারপর আর একবার বঙ্গশ্রীতে এলুম—সন্ধ্যার সময় হেঁটে বাসাতে। চারু দত্ত বনগাঁয়ে রাত্রে এল।

১৭ই অগস্ট, ১৯৩৪। ৩২শে শ্রাবণ, ১৩৪১। শুক্রবার

স্কুল থেকে বেরিয়ে গেলাম পরেশ খুড়োর দোকানে। ওরা কাল বারাকপুরে গিয়েচে খোকা ও তার স্ত্রী। তারপর আশুর সঙ্গে দেখা করবার কথা ছিল—কিন্তু আশু সকালেই এসেছিল—তাকে বলেছিলাম আজ আর যাবো না। নীরদবাবুর flat-এ গিয়ে গল্প করলুম রাত আটটা পর্য্যন্ত। তারপর চলে আসি। বৃষ্টি হোল। রাত্রেও মাঝে মাঝে বৃষ্টি। ঘরেই শোয়া গেল। রাধাকৃষ্ণানের বইখানা পড়চি Idealist View of Life[১]—বড় ভাল লাগ্‌চে। কাল বনগাঁয়ে নিয়ে যাবো।

১৮ই অগস্ট, ১৯৩৪। ১লা ভাদ্র, ১৩৪১। শনিবার

সকালে এল পি সি সরকার। স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী হয়ে ২টোর গাড়ীতে বনগাঁ গেলাম। পথে রাধাকৃষ্ণানের বইখানা পড়তে পড়তে গিয়ে ভারী আনন্দ পেলাম সবুজ মাটির দিকে চেয়ে। বাসায় পৌছে—সতীশ মোক্তারের বাসায় ওপারে বেড়াতে গেলাম। তারপর টাউন হলের সাম্‌নে জ্যোৎস্না উঠেচে—সেখানে বসে সাব্‌রেজিষ্ট্রার, আমি, মন্মথ, হরিবাবু গল্প করা গেল।

১৯শে অগস্ট, ১৯৩৪। ২রা ভাদ্র, ১৩৪১। রবিবার

সকালে খয়রামারির মাঠে বেড়াতে গেলাম। এক জায়গায় কেমন চমৎকার নিভৃত কুঞ্জবন যেন। পাখী ডাকৃচে, সকালের রোদ উঠেচে—লতাপাতায় শেষ রাত্রের বৃষ্টির জল। একটু পরে খুব রোদ উঠ্‌ল—আমি বীরেশ্বর বাবুর বাসায় গিয়ে more spirit teachings বইখানা নিয়ে আসি। বিভূতির দোকানে বসে একটু গল্প করে বইখানা পড়িবার জন্যে বাসায় এলুম। স্নানের সময় মাঠের পথ দিয়ে গেলাম। চমৎকার শরতের রোদ। এক জায়গায় চুপ করে বসে নীল আকাশের দিকে চেয়ে কি আনন্দ যে পেলাম। নদীতে স্নান করলুম। বিকেলের ট্রেনে কল্‌কাতায় এলাম।

১ An Idealist View of Life, Sarvapalli Radhakrishnan।

২০শে অগস্ট, ১৯৩৪ । ৩রা ভাদ্র, ১৩৪১ । সোমবার

সকাল থেকে ভয়ানক বৃষ্টি । এবছরে এরকম বাদ্‌লা হয়নি । স্কুল সকালে ছুটি হয়ে গেল । এরা jigsaw puzzle খেল্‌লে । বঙ্গশ্রী হয়ে আমি প্রবাসীতে গেলুম । সেখান থেকে কৃষ্ণপ্রসন্ন মামাদের ওখানে বিদ্যাসাগর বাণীভবন । লেডি সুপারিণ্টেন্ডেণ্ট আমাকে সব দেখালেন । চা ও নিম্‌কি এনে দিলে সুরবালা বলে একটি মেয়ে । তারপরে Sir P. C. Ray এর কাছে—এলাম College of Science এ । তাঁর গাড়ী করে ময়দানে গেলুম অনেকদিন পরে ও পরলোকতত্ত্ব আলোচনা করলুম । তাঁর গাড়ীতে ফিরে এলাম । এবেলা আকাশ পরিষ্কার ।

২১শে অগস্ট, ১৯৩৪ । ৪ঠা ভাদ্র, ১৩৪১ । মঙ্গলবার

স্কুলে কোলা গল্প শুনলে কাছে দাঁড়িয়ে । ছুটীর পরে বঙ্গশ্রী । সেখান থেকে ট্রামে ইউনিভার্সিটি গিয়ে বিল দিয়ে চাকৃতি নিয়ে এলুম । 'মধুচক্র'-এ এসে কিছু খেয়ে তারপর পরিমলের সঙ্গে এখানে ওখানে ঘুরে বাসাতে । কৃষ্ণধন এসে গল্প করলে রাত্রে ।

২২শে অগস্ট, ১৯৩৪ । ৫ই ভাদ্র, ১৩৪১ । বুধবার

চমৎকার চাঁপাফুল বিক্রী হচ্ছিল—কিনে আনলুম । অনেকক্ষণ ললিতের বাড়ী গিয়ে বসে রইলুম । স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী । সজনী দুটী কোন্ মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বার হয়ে গেল । আমি কিছু খেয়ে হেঁটে পুরোনো বইয়ের দোকান ঘুরলাম । তারপর মেছুয়া বাজার থেকে তামাক কিনে আনি । সুপ্রভাদের হোষ্টেলে এখন আর কেউ নেই ।

২৩শে অগস্ট, ১৯৩৪ । ৬ই ভাদ্র, ১৩৪১ । বৃহস্পতিবার

স্কুল গেলাম, সেখান থেকে বার হয়ে বঙ্গশ্রী । fern নিয়ে সেখানে ওরা খুব হৈ চৈ বাধালে । অনেক রাত পর্য্যন্ত সেখানে আড্ডা । আমি আর নীরদ হেঁটে College Square এ আসি ।

২৪শে অগস্ট, ১৯৩৪ । ৭ই ভাদ্র, ১৩৪১ । শুক্রবার

পরদিন সকালে মাখন বাবু এল ও গিরীন এল কাত্যায়নী বুক স্টলের । স্কুলে সকালে ছুটী হোল । কোলা King Kong এর গল্প করলে । আমি স্কুল থেকে বার হয়ে বঙ্গশ্রী—সেখান থেকে কিরণের টিকিট নিয়ে এলুম মেস্—সেখান থেকে ইউনিভার্সিটি বিল আন্‌তে গেলাম । তারা চেক্ দিলে—চেক্ নিয়ে ট্রামে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী গেলাম । সেখান থেকে P. C. Sircar এর

দোকানে—কারণ চেক্ ভাঙানো হোল না ব্যাঙ্কে। সেখান থেকে M. C. Sircar এর দোকানে টাকা ভাঙিয়ে চা খেয়ে ? কিনলুম। তারপর আবার বঙ্গশ্রীতে। একখানা বই কিনে মোড়ের দোকান থেকে, অনেক রাত্রে বাড়ী।

২৫শে অগস্ট, ১৯৩৪। ৮ই ভাদ্র, ১৩৪১। শনিবার

সকালে ছুটী। ছুটীর পরে ট্রামটাতে বঙ্গশ্রী। তারপর নীরদ বাবুর ওখানে গিয়ে আড্ডা। পূজার সময় কোথায় যাওয়া হবে তাই নিয়ে তুমুল তর্ক। রাখা মাইন্‌স, জৌনপুট, দীঘা, বারিপদা—এইসব স্থান ঠিক হোল। রাত্রে খুব বৃষ্টি—কিন্তু বেশী রাত্রে চাঁদ উঠল। রাতে সাড়ে ন' টায় বাসায় এলাম ট্রামে। আজ ছোট মামা এসেছিল বিকেলে।

২৬শে অগস্ট, ১৯৩৪। ৯ই ভাদ্র, ১৩৪১। রবিবার

সকালে মণির আড্ডা থেকে একবার গেলুম সীতাদেবীর কাছে। 'মাতৃঋণ'[১] সম্বন্ধে দু একটা কথা জিগ্যেস্ করতে। তারপর ট্রামে বাসায়।

বিকেলে নানাস্থানে পায়ে হেঁটে বেড়াই। 'ছায়া' খুলেচে দেখে এলাম মাণিকতলায়। পথে বৃষ্টি এল—এক জায়গায় দাঁড়াই। রমেশ সেনের দোকানে গেলাম।

২৭শে অগস্ট, ১৯৩৪। ১০ই ভাদ্র, ১৩৪১। সোমবার

সকালে করুণা এল। স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী। সেখান থেকে Hans anderson এর গল্প লিখবো বলে বেড়াতে বেড়াতে নানা দোকান ঘুরে College Square এ সরবৎ খেয়ে বাসা। রাত্রে আমি, সজনী, পরিমল S.O.S. Iceberg দেখি ছবি ঘরে।

২৮শে অগস্ট, ১৯৩৪। ১১ই ভাদ্র, ১৩৪১। মঙ্গলবার

সকালে গিরীন সোম প্রকাশক এল। স্কুলে কোলা রাগ করে বসে রইল। সকালে ছুটী হোল—বঙ্গশ্রীতে নীরদ এল—সুকুমার বাবু এলেন। ট্রামে প্রবাসী। ব্রজেন বাবু লুচি খাওয়ালেন। আমি কাত্যায়নী বুক স্টলে গিয়ে আরব্য উপন্যাস আনি। গিরীন বাবু চা কেক্ খাওয়ালে। তখন ভয়ানক বৃষ্টি এল। ওদের ঘরের মধ্যে বসে গল্প করি। বৃষ্টি থামলে বাড়ী। রাত্রে ভয়ানক গরম ও বৃষ্টি।

১ সীতা দেবীর উপন্যাস। ১৩৪১ সালের আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে বিভূতিভূষণ বইটির সমালোচনা করেন।

২৯শে অগস্ট, ১৯৩৪। ১২ই ভাদ্র, ১৩৪১। বুধবার

সকালে বীরেশ্বর বাবুর পত্রে জানলাম তিনি আমার বই হারিয়ে ফেলেচেন। স্কুলে কোলার সঙ্গে মনান্তর হোল। Thackers এর ওখানে গেলাম। সেখান থেকে বঙ্গশ্রীতে এসে বসে রইলাম। সজনী এল না। হেঁটে বাসায় এলাম। Scottish এর জন কতক ছাত্র স্কুলে গেল [।] কাল তাদের সেখানে যেতে হবে।

[অনেকদিন আগে এই দিনটীতে আমি ঐতক্ষণ সার্থক দাদাদের বাড়ী বসে।][1]

৩০শে অগস্ট, ১৯৩৪। ১৩ই ভাদ্র, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

সকালে আশু এল—তার কাব্য, 'প্রান্তরলক্ষ্মী' এবার বেরুচ্চে—প্রবাসীতে। স্কুলে কোলা ক্লাসের ছেলেদের কাছে বল্‌চে আমি তার সঙ্গে কথা বলব কি না। ১॥ টার পরে স্কুল থেকে বার হয়ে বৈঠকখানার বাজারে জিনিস কিনি। তখুনি স্কটিশ চার্চ কলেজের ছেলেরা এল। তাদের গাড়ীতে কলেজে গেলুম। সেখানে বক্তৃতার পরে Professor দের সঙ্গে বসে চা ও জলযোগ করা গেল। তারপর তাদের গাড়ীতে বাসা। ট্রেনে উঠে বেশ লাগ্‌ল। খুব বেলা পড়েচে। সবুজ গাছপালা চারিধারে—অনেকদূর পর্য্যন্ত মাঠ সবুজ। পথে গাড়ী খালি হয়ে গেল—একা অন্ধকার রাত্রে চেয়ে বসে থাকি। হেঁটে বাসায় এলাম। গাড়ী নেই স্টেশনে। ক্লাবে কে একজন গান করচে। শুন্‌তে পেলাম।

৩১শে অগস্ট, ১৯৩৪। ১৪ই ভাদ্র, ১৩৪১। শুক্রবার

সকালে সুন্দর রোদ। বর্ষাকাল বলে মনেই হয় না। তারপরে খয়রামারি সকালে বেড়াতে গেলাম। গাছে পালায় রোদ—সেই ঝোপটায় ভায়োলেট্ রঙের বনকলমী ফুল ফুটেচে। রৌদ্রে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম ঝোপটার কাছে। প্রজাপতি উড়চে—এখানে ওখানে কি সুন্দর দৃশ্য! তারপর নদীতে স্নান করেও খুব আনন্দ। বৈকালে মেলা দেখ্‌লাম আমি ও সাব্‌ রেজিষ্ট্রার বাবু। সন্ধ্যায় বীরেশ্বর বাবু বিনয় বাবু ও আমি Planchet করা গেল।

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ১৫ই ভাদ্র, ১৩৪১। শনিবার

সকালে বারাকপুর গেলাম। বেশ শরতের রোদ, ছাতি নিয়ে যাইনি। খুকুদের বাড়ী দুপুরে খেলাম। তাস খেলা করি আমি। খুড়ীমা, নদি ও খুকু। কালো ওখানে নেই। তার জন্য চিঠি দিয়েছিলেন কাকা। দুপুরে সামান্য একটু

১ তৃতীয় বন্ধনী চিহ্নের লেখা বিভূতিভূষণের।

বৃষ্টি হোল। আমি বেলা পড়লে সুনীল আকাশের তলা দিয়ে চলে এলাম বনগাঁয়ে। সন্ধ্যা হবার আগেই এলাম। ক্লাবে বসে বিনয় বাবু, বিজন বাবু ও আমি গল্প করি।

২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ১৬ই ভাদ্র, ১৩৪১। রবিবার

সকালে উঠে খয়রামারি বেড়িয়ে এলাম। তারপরে ছ' ঘরে বেড়াতে গেলাম—কালোর সঙ্গে দেখা হোল। তারপর...? বাবুর বাড়ীতে গেলাম আমি ও সাব্ রেজিষ্ট্রার। বিকেলে কালো ও আমি স্টেশনে এলাম। আজ শরতের আকাশ কি সুন্দর—সারা পথটা ভাল লাগ্‌ল।

৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ১৭ই ভাদ্র, ১৩৪১। সোমবার

সকালে লিখি ও চুল ছাটি। স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী। সেখান থেকে নীরদের সঙ্গে College Sqr. [—] সুনীতিবাবুর সঙ্গে দেখা হোল সেখানে। চা খেয়ে বাসায় ফিরি।

৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ১৮ই ভাদ্র, ১৩৪১। মঙ্গলবার

স্কুলের পরে বঙ্গশ্রী আপিস হয়ে নীরদ দাশগুপ্তের flat-এ। পূজার প্রোগাম ঠিক করা হোল সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত। তারপর বার হয়ে হেঁটে এলাম College Square-এ। পি সি সরকারের দোকান হয়ে বাসা।

৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ১৯শে ভাদ্র, ১৩৪১। বুধবার

সকালে 'পাঞ্চজন্য' এসে গল্প নিয়ে গেল। স্কুলে যাবার আগে ভীষণ মেঘ করলে—বৃষ্টি হোল না। দেবব্রতের সঙ্গে পথে দেখা হোল। স্কুল থেকে বার হয়ে প্রথমে কাকার বাসায় গিয়ে চা ও পাঁপরভাজা খেলাম—সেখান থেকে বার হয়ে ট্রামে P. C. Sircar [—] তারপর বাসা।

P. C. Sircar র সঙ্গে 'যাত্রাবদল' বইয়ের terms ঠিক হোল[১]।

৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ২০শে ভাদ্র, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

সকালে খুব ঘন মেঘ করে ঝড় উঠ্‌ল—বৃষ্টি হোল সামান্যই। স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী—সেখানে সুনীতিবাবু এলেন—খুব interesting philological discussion হোল। শুক্ল যজুর শতপথ রুদ্রার স্তোত্র।[২]

১ যাত্রাবদল শেষ পর্যন্ত এখান থেকেই বেরিয়েছিল। প্রকাশক প্রভাতচন্দ্র সরকার (পি. সি. সরকার), ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। প্রকাশকাল ৩০শে নভেম্বর, ১৯৩৪।

২ শতরুদ্রিয় স্তোত্র—শুক্ল যজুঃসংহিতা, ১৬ অধ্যায় (১-৬৬ মন্ত্র)।

হেঁটে বাড়ী এলুম। কুকুর সঙ্গে দেখা পথে। হরকুমার ঠাকুর স্কোয়ারের কাছে।

৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ২১শে ভাদ্র, ১৩৪১। শুক্রবার

স্কুল থেকে টিফিনের পরে বেরিয়ে উদয়ন আপিসে গিয়ে গল্প[১] দিয়ে আসি। তারপরে উদয়ন আপিসে যেতে যেতে ছোট খাটো গলি ঘুঁজি খোলার বাড়ী দেখে মনে একটা মধুর ভাব হচ্চিল—যা অনেক দিন আগে ক্লাইভ্ স্ট্রীটে বেড়াতে বেড়াতে হয়েছিল বিনয় বাবুদের আপিসের সামনে দিয়ে যেতে। দুটোই এক ধরনের। আমারই মনের কল্পনা, বাইরের উপকরণ তার আয়োজন মাত্র। উদয়ন থেকে এসে আবার স্কুলে পড়ালুম। তারপর বঙ্গশ্রীতে আড্ডা। হেঁটে বাড়ী। আশু সান্যাল বাসায় এসে ধরে নিয়ে গেল মধুচক্রে। ফল, সরবৎ পুডিং খাওয়া গেল। ফিরে এসে লিখি। বনগাঁয়ের চারু দত্ত এল রাত্রে।

৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ২২শে ভাদ্র, ১৩৪১। শনিবার

স্কুলে কোলার সঙ্গে ঝগড়ার অবসান হোল। বঙ্গশ্রীতে গিয়ে খানিকটা আড্ডা দিয়ে নীরদ বাবুর flatএ গেলাম। তার আগে গেলাম Imperial Libraryতে—রাধাকৃষ্ণানের বই দিয়ে এলাম।

গঙ্গানন্দপুর লাইব্রেরিতে সভাপতি হতে বলেচে এসে দেখি।

রাত্রে ভাল ঘুম হোল না গরমে।

৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ২৩শে ভাদ্র, ১৩৪১। রবিবার

সকালে মণির বাড়ী।

দুপুরে অমিয় এল শ্রীরামপুরের। লিখ্‌লাম বসে। সন্ধ্যার সময় একটু বেড়াতে গেলাম।

১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ২৪শে ভাদ্র, ১৩৪১। সোমবার

স্কুলের আগে পি সি সরকারের ছেলে এল। আমি উদয়নে গেলুম—সেখান থেকে স্কুলের পরে কোলা ও আমি পোলোক স্ট্রীটে যাবো বলে বেরুই [—] ক্ষীরোদের বাড়ীতে ডাক্‌লে—দুজনে চা খেলুম। বেরিয়ে বঙ্গশ্রী।

তারপরে সেখান থেকে হেঁটে বাসা। পথে মণীন্দ্রলালের সঙ্গে দেখা—বল্লে 'সোনার কাঠি'[২] বই খানার রিভিউ করে দিতে। বাসায় এসে মৌচাকের গল্প লিখি। এখন বড় ব্যস্ত। পূজার মরশুম পড়েচে।

১ 'ডানপিটে' (যাত্রাবদল), উদয়ন, আশ্বিন, ১৩৪১।

২ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস।

১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ২৫শে ভাদ্র, ১৩৪১। মঙ্গলবার

সকালে স্কুলে ছুটি হয়ে গেল G. C. Ghosh এর মৃত্যুর জন্তে। বঙ্গশ্রীতে এসে নিখিলদার গাড়ীতে প্রবাসী আপিসে গেলুম। কেদারবাবুকে টাকার কথা বলে গাড়ীতেই সুধীর সরকারের দোকানে এসে মৌচাকের গল্প[১] দিলাম। তারপর কিছু খাবার খেয়ে ট্রামে midday fare এ উদয়ন—সেখান থেকে হেঁটে বঙ্গশ্রীতে। আবার নিখিলের গাড়ীতে প্রবাসী এবং ব্রজেনদাকে সঙ্গে নিয়ে পান্নালাল শীল বিদ্যামন্দিরে। সেখান থেকে আমার বাসার সামনে দিয়ে মোটরে বিভূতিদের বাড়ী ও সেখান থেকে নন্দরাম সেনের গলি প্রসন্নদের বাড়ী। মোটরে নিখিলদা নামিয়ে দিলে College Squareএ পি. সি. সরকারের দোকানে।

৩২ বছর পরে নন্দরাম সেনের গলির সেই ঘরটাতে বসে জল ও খাবার খেলুম। মাখন এল। প্রসন্ন তামাক সাজ্‌লে।

১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ২৬শে ভাদ্র, ১৩৪১। বুধবার

স্কুলে কেলা আসেনি। ওখান থেকে বার হয়ে থ্যাকার স্পিঙ্কের দোকানে বই পড়লুম। সেখান থেকে একবার কর্জ্জন পার্কের দিকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কি অপূর্ব্ব একটা শোভা দেখলাম। ফিরে আবার বঙ্গশ্রী আপিসে আস্‌বার পথে গির্জ্জা স্যাস্তুভ্যালিতে চা খাওয়ালে। বঙ্গশ্রীতে এসে সজনী কবিতা শোনালে, খুব জোরে হেঁটে বাসা। আজ মনে একটা কেমন আনন্দ!

রাত্রে নক্ষত্রভরা আকাশের দিকে চেয়ে বসে কত কথা ভাবি। God Consciousness এর দিকটা জাগরিত হয়েচে দেখ্‌তে পাচ্চি।

'গৃহিণী প্রিয় শিষ্যা'[২] শ্লোকটা অনেকদিন পরে মনে একটা অদ্ভুত ভাব জাগালে।

১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ২৭শে ভাদ্র, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী। রামবাবুর সঙ্গে এসে টিকিট নিই। তারপর উদয়ন।··· ?

---

১ 'গদাধরের বিপদ' (তালনবমী), মৌচাক, কার্ত্তিক ১৩৪১।

২ গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়-শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ। করুণা-বিমুখেন মৃত্যুনা হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্‌॥ (রঘুবংশম্‌ ৮। ৬৭)

[তুমি আমার সংসারকর্মে গৃহিণী, মন্ত্রণায় সচিব, রহস্যালাপে প্রিয়সখী এবং ললিত কলাবিদ্যায় প্রিয়শিষ্যা ছিলে। অকরুণ কাল তোমাকে হরণ করে, বল, আমার কী না হরণ করল ?]

দেবীর গাড়ীতে কলেজ স্কোয়ার। সেখান থেকে বাসা।

শরৎ [,] তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি।

গানটার ভাব অনেকদিন পরে মনে এল।

১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ২৮শে ভাদ্র, ১৩৪১। শুক্রবার

স্কুল থেকে বেরিয়ে বঙ্গশ্রী। সেখানে কেউ নেই—বার হয়ে আস্‌চি—মণীন্দ্রলালের সঙ্গে দেখা। তার সঙ্গে E. I. R. Booking Office এ গিয়ে বখ্‌তিয়ারপুরে যাবার দিন স্থির করলাম। তারপর হেঁটে বঙ্গশ্রী। দেবীর সঙ্গে দেখা। দেবী নিয়ে গেল। নির্ম্মলচন্দ্রের বাড়ীতে। সেখান থেকে থিয়েটারে গেলুম ষোড়শী দেখ্‌তে। রাত ২৷৷৹ টাতে ফিরে ঘুমুই।

১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ২৯শে ভাদ্র, ১৩৪১। শনিবার

সকালে উঠে লিখে স্নান করে খেয়ে তৈরী হয়ে বেরুলাম। ট্রামে স্কুলে এসে লেখা দিলাম হরিবাবুকে। সজনীকে লেখা[1] দিলাম। নীরদবাবুর flat এ এসে জানালাম দিল্লী যাচ্চি। টিকিট কিনে সোজা হাওড়ায় এসে গাড়ী চড়লাম। প্রথমে ছিল মেঘ। বর্দ্ধমান ছাড়িয়ে ঘোর বৃষ্টি—সারাপথেই বৃষ্টি। মধ্যে মধুপুরের কাছে একটু রৌদ্র উঠল। অনেকদিন পরে ঝাঁঝাঁ দেখলাম—কিউলের ওদিকে জলে ভেসে গিয়েচে। বখ্‌তিয়ারপুরে নেমে পুঁটিদিদি নেই। কালী গিয়েচে পাটনায়। অনেকক্ষণ পরে এল—রাত ২টা পর্য্যন্ত ওদের বারান্দাতে শুয়ে গল্প করি। অনেককাল পরে এখানে এলাম। বাংলা থেকে বিহারে। বেশ লাগচে।

১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ৩০শে ভাদ্র, ১৩৪১। রবিবার

বখ্‌তিয়ারপুরে স্নান করে খেয়ে বিশ্রাম করি। বিকেলে বেড়াতে বার হয়েচি। কি অপূর্ব্ব প্রখর চক্রবাল! তালবন দ্বারা সীমাবদ্ধ—কতদূর মন চলে যায়। বাংলায় এরকম নেই। ঠিক নীল আকাশের তলে সে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য। বিহারের পথে ধোয়া নদীর পুলের ওপর বসে লিখ্‌চি। সামনে ও পিছনে ধূ ধূ করচে উদার উন্মুক্ত প্রান্তর। যেদিকে চাও সোজা সোজা তালের সারি। বাংলাদেশে এ জিনিস নেই। মাথার উপর নীল আকাশ—পশ্চিমে পিঙ্গলবর্ণ মেঘ—বাংলাদেশের দিকে মুখ ফিরিয়ে আছি—তালের মাথাগুলো দেখা যাচ্চে—মন যেন ছড়ায়নি অনেকদিন। এই সন্ধ্যায় কত কথাই মনে পড়চে

১ সম্ভবতঃ বঙ্গশ্রীর লেখা। আশ্বিন মাসে বিভূতিভূষণের একটি লেখা ছিল, 'বেলজিয়ামের খাল পথে'।

আজ। ? কথা অশান্ত মনে হয়। সুপ্রভা ও খুকুর কথা মনে আসচে। নীচে ধোয়া নদীর ঘোলা জলে কল কল শব্দ হচ্চে। অপূর্ব্ব শান্ত সন্ধ্যা—দূরে বামে রাজগিরির নীল পাহাড়শ্রেণী—এই মগধ—এই রাজগৃহ, বুদ্ধের চরণরেণু-মৃত [অমৃত] আশ্রিত রাজগৃহ।

কালী পিছিয়ে পড়েচে—জবা পিছিয়ে পড়েচে। আমি দোকড়ি পশু এসেচি।

১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ৩১শে ভাদ্র, ১৩৪১। সোমবার

সকালে স্নান করে পশু চা ও খাবার এনে দিলে খেয়ে তৈরী হলাম দিল্লী এক্সপ্রেসে যাবার জন্যে। কালী আমার হাতের লেখা একখানা চিঠি দেখালে ১৯১৭ সালে College Hostel থেকে লেখা—তারিখ ২২-৯-১৭। লিখ্‌চি পূজোর সময় শ্বশুর বাড়ী যাবো। কচাকে নিয়ে যাবো। এরা সবাই এসে গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে গেল। সেকেণ্ড ক্লাস হলেও গাড়ীতে লোক অনেক। পথে খুব ঘনঘটা করে এল—ঘোর বৃষ্টি। শোন ও গঙ্গার জল বেড়ে মাঝে মাঝে গ্রামগুলো জেগে আছে—খোলার বাড়ী আর মাটির দেয়াল, জলে ভিজ্‌চে—গরু বাছুর awful ব্যাপার। ঝাঁঝা ও সিমূলতলার মধ্যে পাহাড় জঙ্গল জলে—ভিজ্‌চে—ঝোপ দেখলাম দু একটা, পাহাড়ী নদীগুলো সবেই ছুটে চলেচে—ঘাসের তীর যেন জল ছুঁয়ে রয়েচে। আসানসোলে কিছু খাওয়া গেল। সন্ধ্যার সময় এসে পৌছুই। ওদিকে অতবৃষ্টি—এদিকে তেমন বৃষ্টি হয় নি। সন্ধ্যাবেলা আশু সান্যালের সঙ্গে মধুচক্রে গিয়ে সরবৎ খেয়ে এলাম। ঘুম পাচ্ছিল—সকালে সকালে ঘুমিয়ে পড়লাম।

১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ১লা আশ্বিন, ১৩৪১। মঙ্গলবার

সকালে ছুটী হোল—বঙ্গশ্রীতে বহুক্ষণ কাটানো হল। মনোজ, মণীন্দ্রলাল [,] নীরদ সবাই এল। সুকুমার বাবুও। সন্ধ্যার সময় এলাম বাড়ী।

১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ২রা আশ্বিন, ১৩৪১। বুধবার

স্কুলের যাবার আগে মহিমা ও গিরীন এল। স্কুলের পরে বঙ্গশ্রীতে আড্ডা। বেজায় বৃষ্টি আজ।

কোল্লার সঙ্গে ঝগড়া হোল। পথে আজ দেবব্রতের সঙ্গে গল্প হয়েছিল।

২০শে সেপ্টেম্বের, ১৯৩৪। ৩রা আশ্বিন, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী।

২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ৪ঠা আশ্বিন, ১৩৪১। শুক্রবার

সকালে স্কুলের আগে খুব বৃষ্টি এল। পথে একবার রোদ—আবার বৃষ্টিতে

ভিজতে ভিজতেই স্কুলে গেলাম। এবার বোধহয় পুজোর সময় বর্ষা হবে। কোলার সঙ্গে—ঝগড়া মিটে গেল। বঙ্গশ্রী:তে গিয়ে সজনীর সঙ্গে টাকার কথা বলে দিলাম। তারপর বার হয়ে ট্রামে ষ্ট্যাণ্ডে নেমে হাওড়াপুল পার হয়ে ট্রেনে শ্রীরামপুর। দিদিদের বাড়ী গিয়ে বাইরের ছাদে বসলাম। চাঁদ উঠেচে—নির্ম্মল মেঘমুক্ত আকাশ, মাধবীলতার গন্ধ আসচে। আর এক দিদির কথা মনে পড়ল এই শ্রীরামপুরেই। ১২।১৪ বছর আগে কত আনন্দেই সেখানে আসতাম। খুকী আমার খোঁজ করেছিল মাসখানেক আগে শীলাদি বল্লেন। খেয়ে গাড়ী করে College-এ যাই। সেখানে রমণ সাহেবের সঙ্গে দেখা হোল। ত্রিগুণা বাবু আমার সঙ্গে স্টেশনে এসে তুলে দিয়ে গেলেন ট্রেনে। বাসে এলাম। বারান্দাতে খুব জ্যোৎস্না। বেশ ঘুম হোল।

২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ৫ই আশ্বিন, ১৩৪১। শনিবার

আজ শেষরাত্রের জ্যোৎস্নায় হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। আকাশ ভরা জ্যোৎস্না —মনে কেমন একটা অদ্ভুত ভাব হোল। বাল্যের কথা মনে হোল। চাপড় ষষ্ঠীর কথা মনে এল কি জানি কেন—এরা চাপড়া ষষ্ঠী করতেন নদীর ঘাটের পথে খেজুরতলাটাতে—সেই দিনের কথা মনে এল।

কোলার সঙ্গে কথা হোল। সে এল ওপরের ঘরে। স্কুল থেকে নীরদ বাবুদের flat এ। সুশীলবাবুও এলেন। সেখান থেকে হেঁটে বাসা।

২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ৬ই আশ্বিন, ১৩৪১। রবিবার

সকালে মণিদের বাড়ী। মোটরে চৌরঙ্গী পৌঁছে দিলে। সেখান থেকে বাসা। দুপুরে ঘুমিয়ে উঠে দৃষ্টিপ্রদীপের মালতীর অধ্যায় Revise করি। বিকেলে হেঁটে শ্যামবাজার যাবার পথে Duff Church এ প্রার্থনা শুনলাম। হেদোতে গিয়ে দেখি পূর্ণিমার চাঁদ উঠেচে। মনে কেমন অপূর্ব্ব ভাব হোল। তারপর নীরদের বাড়ী গেলাম। নীরদের স্ত্রী—ওদের নবজাত শিশুকে দেখালে। ট্রামে নীরদের সঙ্গে পঞ্চানন বাবুর বাড়ী এলাম মুক্তারাম বাবু স্ট্রীটে। সেখান থেকে ইনস্টিউটে [ইনষ্টিটিউটে] কি একটা নাচ হচ্চে দেখে সরবৎ খেয়ে বাসা। খুব বারান্দা ভরা জ্যোৎস্না। আকাশ নির্ম্মল।

২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ৭ই আশ্বিন, ১৩৪১। সোমবার

স্কুল থেকে বেরিয়ে নিখিলদার গাড়ীতে উদয়ন আপিসে—সেখান থেকে স্টুয়ার্ট কোম্পানীর দোকানে বড় দেরী হোল। আবার উদয়নে। সেখানে টাকা নিয়ে হেঁটে বৌবাজারে কাপড় কিনে, বাসা।

তারপর বিমল এল কলেজে বক্তৃতার জন্যে বলতে। বুলবুলের সম্পাদক এল লেখা নিতে। ওবেলা কলেজের ছেলেরা এসে শ্রীহর্ষের জন্যে লেখা নিয়ে গিয়েচে।

আজ হাওয়া কম। গরম।

২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ৮ই আশ্বিন, ১৩৪১। মঙ্গলবার

স্কুল থেকে বঙ্গশ্রীতে গিয়ে কুমারবাবু ও সজনীর সঙ্গে চৈতন্যচরিতামৃত নিয়ে কথা হোল। ট্রামে পার্ক সার্কাস [—] মণীন্দ্রলালের ওখানে চায়ের নিমন্ত্রণে। একজন বিলেত থেকে এসেছে সে ? রাতে থাকবার জায়গা পায়নি তাই বলছিল। ওখান থেকে ট্রামে কাত্যায়নী বুক স্টলে। চা খাওয়ালে সেখানেও। ঘোর বৃষ্টি মাথায় হেঁটে বাসা। এসে দেখি শ্রীহর্ষের proof দিয়ে গেছে। বাড়ী এসে Thomas Mann এর Mario and the Magician[১] পড়লুম।

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ৯ই আশ্বিন, ১৩৪১। বুধবার

স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী—কোলাকে গল্প—যেন নতুন চোখে দেখ্‌লাম।··· ? বঙ্গশ্রী থেকে নীরদের সঙ্গে চারুবাবুর বাড়ীতে গিয়ে চা ও খাবার খেয়ে গালুডি সম্বন্ধে অনেক কথা বল্লুম। তারপর ট্রামে বাসায় আসি। রাত ভাল, তবে বড় গরম।

২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ১০ই আশ্বিন, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

কোলার সঙ্গে খুব ভাব আজকাল। স্কুলে একজন হঠযোগী এসে কাঁচের গ্লাস খেলেন। স্কুল আজকাল বেশ লাগে। ক্লাসে পড়ালেই যায় ভাল। প্রসাদ আছে। কোলা আছে—স্কুলের মধ্যে এই দুটো ছাত্রই ভাল। ওদিকে সতীন ও শচীন মুস্তফী কবিতা খুব ভাল বোঝে।

বঙ্গশ্রী থেকে আমি আর নীরদ M. C. Sircar এর দোকানে এসে বই নিয়ে তারপর বাসায় এসে··· ? পড়লুম।

২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ১১ই আশ্বিন, ১৩৪১। শুক্রবার

সকালে সুরেন, শৈলেন আর কাত্যায়নী বুক স্টলের লোক এল। সুধীর চৌধুরী আর মণীন্দ্রলাল এসে নিমন্ত্রণ করে গেল ওবেলা। স্কুলে ছেলে দুটোকে হেডমাস্টার নাকখত দেওয়ালে (ভবেন আর প্রভাস)। স্কুল থেকে বার হয়ে বঙ্গবাসী কলেজে গেলাম। কলেজে বক্তৃতা হোল। তারপর প্রিন্সিপ্যাল প্রশান্তবাবু[২] ও শ্যামাপদ, কৃষ্ণধন একসঙ্গে বসে চা সিঙ্গাড়া খাওয়া গেল। আমি আর

---

১ ছোটগল্প/নভেলেট।

২ প্রশান্তকুমার বসু।

কৃষ্ণধন ফিরে আস্‌চি পথে আর একদলের সঙ্গে দেখা। বাড়ী এসে হাত মুখ ধুয়ে একটু বিশ্রাম করেই স্টার থিয়েটারে গেলুম বিভূতিদের থিয়েটার দেখতে। মন্টু কি একটা সাজ্‌চে। ট্রামে চলে এসেই পার্ক সার্কাস। সব সময়ই কোলার কথা মনে হয়। তারপর—গেলুম কালীদাস [কালিদাস] নাগের বাড়ী সীতা দেবীর বিবাহস্মৃতিবাসর। খুব ফুলে ভরা। অশোক ও কেদার বাবু এলেন সম্পাদক। ওঁদের সঙ্গে আলাপ হোল। গান হোল। খাওয়া দাওয়া হোল। কেদার বাবু ও কালিদাস বাবুতে মিলে আমায় খাওয়ালে। একটু বেশী। অশোক সিগারেট খাওয়ালে। আমার ভিটের কথা মনে পড়েছিল আজ কেবলই। এই শরতে… ?

২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ১২ই আশ্বিন, ১৩৪১। শনিবার

সকালে মহিমা ও মন্মথ এল।

দুপুরে একটুখানির জন্যে স্কুল। কোলা কেমন ঘাড় কাৎ করতেই তাকালে। তারপর বঙ্গশ্রী:তে গিয়ে সজনীর কাছ থেকে National Geographical নিয়ে এলুম। বাড়ীতে একটু ঘুমিয়ে উঠে লিখলুম সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। সুরেন এল—ওকে সঙ্গে নিয়ে গেলুম—P. C. Sircar এর দোকান—সেখান থেকে রমেশ সেন—সেখান থেকে ফিরবার পথে—College square এ সরবৎ খেয়ে দুজনে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বসে কত পুরোনো কথা আবৃত্তি করলুম রাত দশটা পর্য্যন্ত। তারপর বাড়ী। একটু sadness ছিল—সবাই বয়সে বেড়ে যাচ্চে দেখে—ভোরের দিকে ঘুম ভেঙে গেল—আমার সেই লেখা যেন আবার ফিরে এল।

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ১৩ই আশ্বিন, ১৩৪১। রবিবার

সকালে মণীন্দ্রলালের বাড়ী। মোটরে বউবাজার—সেখান থেকে হেঁটে বাসা। খেয়ে ঘুমুতে যাবো—পশুপতি বাবু এলেন—তিনি রইলেন দুটো পর্য্যন্ত। তারপর আমি ঘুমিয়ে উঠে যাই নীরদ বাবুর বাড়ী। রাখা মাইন থেকে পত্র আসেনি [।] সুশীল বাবুর সঙ্গে মোটরে মিউনিসিপ্যাল মার্কেট থেকে মুর্গা কিনে চলে গেলুম।

Death in Venice[১] পড়লুম রাত্রে।

১লা অক্টোবর, ১৯৩৪। ১৪ই আশ্বিন, ১৩৪১। সোমবার

সকালে কেউ আসেনি। স্কুলে বেশ কাটল [—] কোলা আজকাল বড় আনন্দ দিচ্চে—এখানেও। স্কুল থেকে—বেরিয়ে বঙ্গশ্রী। সেখানে প্রেমেন, নৃপেন, পরিমল। আমি বেরিয়ে ধর্ম্মতলার মোড়ে মুড়ি কিনে পরিমলকে দিলুম। তারপর

১ Thomas Mann-এর নভেলেট/ছোটগল্প।

ভাবলুম বেড়াবো। হাঁটতে হাঁটতে কর্জ্জন পার্কে এসে টরুর সঙ্গে দেখা হোল। অনেকক্ষণ গল্প করি। একটা ঝোপের কাছে ঘাসের ওপর বসে। তারপর হেঁটে College Squure এ। P. C. Sircar এর দোকানে proof দিতে এলুম। বাড়ী এসে ঈশ্বরের নামে এখন একটা… ? বোধ করলুম—যা অনেকদিন করিনি। পৃথিবীতে কতবার আসবো—কতবার childhood পাবো ওই থেকেই ওর উৎপত্তি। কোলার কথা কতবার মনে হয়েচে, আজ কেবলই। রাত্রে কৃষ্ণধন এল—গল্পগুজব হোল।

২রা অক্টোবর, ১৯৩৪। ১৫ই আশ্বিন, ১৩৪১। মঙ্গলবার

সকালে গিরীন বাবু এল কাত্যায়নী বুক স্টলের [—] ওর সঙ্গে বই সম্বন্ধে কথা হোল। আজ সুধীর চৌধুরী ও মণীন্দ্র লাল ওর ওখানে খাবে ওবেলা বলেচে। স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী অল্পকাল গেলুম। সেখানে এলেন সুনীতিবাবু। কোলা বড় আনন্দ দিচ্চে আজকাল—তার কথা ভাবি প্রায়ই। কি অপূর্ব্ব আনন্দই দিচ্চে সে। পথে দেবব্রতের সঙ্গে দেখা হয়—সে লজ্জায় জড়সড় হয়ে যায়। কি মুস্কিল! বঙ্গশ্রীতে বসে আছি—খুব মেঘ ও ঝড় উঠ ল। আমি বেরিয়ে কিছু খেয়ে ফিরচি [—] রাধারমণের সঙ্গে দেখা। চা ও চপ খাওয়ালে। তারপর বৃষ্টির মধ্যে হেঁটে সুধীর সরকারের দোকানে। চারুরায় ও গিরিজা বাবু এল পুরী ও বৃন্দাবনের adventure সব গল্প করলে। পি সি সরকারের দোকান হয়ে বাসা। রাত্রে শুয়েচি বীরেন অরুণ ও প্রসাদ এল। অনেক রাত পর্য্যন্ত রইল।

৩রা অক্টোবর, ১৯৩৪। ১৬ই আশ্বিন, ১৩৪১। বুধবার

সকালে মেঘান্ধকার। স্কুল। ব্রহ্মানন্দের হঠযোগ প্রদর্শিত হোল। কোলা বসে অনেকক্ষণ—ও বল্লে আপনি যাতে নিয়ে যাবেন, যা করাবেন, আমার করতে আপত্তি নেই। হঠযোগের ক্ষমতা অসাধারণ বটে। প্রবাসীতে গেলুম—সেখান থেকে জগৎতারণ দাসের বাড়ী। College Sqr এ এসে বহুকাল পরে চপলাদেবীর ভাই ফণি চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে আলাপ হোল। Stendhal কি বলেচেন, ইটালির হ্রদ সম্বন্ধে সেটাও দেখলুম। 'Stendhal—the great writer and and lover of beauty" [।] পি সি সরকারের দোকান থেকে বাসা। একবার আট-আনা বন্ধুর কাছ থেকে নিয়ে গিয়েছিলুম পূজার সময় সেকথা মনে পড়ল। এবার আর সেদিন নেই।

৪ঠা অক্টোবর, ১৯৩৪। ১৭ই আশ্বিন, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

দেবব্রতের সঙ্গে পথে দেখা। স্কুল। সেখান থেকে নীরদবাবুর বাসা।

রাখামাইন যাওয়া ঠিক হোল। Sauzer সাহেবের পত্র এসেচে। কাল আবার গিয়ে সব কথা ঠিক হবে। আজ জগৎ বাবু Ivanhoe[১] সংক্রান্ত বই পাঠিয়ে দিয়েচে অনুবাদের জন্যে।

৫ই অক্টোবর, ১৯৩৪। ১৮ই আশ্বিন, ১৩৪১। শুক্রবার

সকালে এল পি সি সরকারের সেজভাই ও গিরিনবাবু। স্কুল থেকে নীরদবাবুর বাড়ী। ট্রামে College Square [—] কাপড় কিনি ইষ্টবেঙ্গল সোসাইটীতে। সেখান থেকে বাড়ী।

৬ই অক্টোবর, ১৯৩৪। ১৯শে আশ্বিন, ১৩৪১। শনিবার

স্কুলে গেলাম সকালেই—পি সি সরকারের ছেলে এল। সকালে স্কুল থেকে বার হয়ে—কাপড় বদলে নিয়ে ২টার গাড়ীতে বনগাঁয়ে এলুম। আজ মহালয়ার ছুটী হবে। সুসার কাকার বাসায় গিয়ে কাপড় দিলে। বনগাঁয়ে রামদাসের সঙ্গে দেখা হোল। আমি গোপালনগরে—গাড়ীতে গোপালনগরে নামি। বাজারে বসে জল খেয়ে কাছারীতে শ্যামাচরণদাদাকে বলতে গেলুম বক্তিয়ারপুরে যাবার কথা। সেখান থেকে বাড়ী। খুকু দাঁড়িয়েছিল দাওয়ায়। মাদুর পেতে গল্প করা হোল খুড়ীমাদের সঙ্গে। গল্প শুনতে এল জগো ইত্যাদি। ? গল্প করি। খুকু ডাকতে গেল—যখন আমি পাঁচীদের বাড়ী বসে আছি। খেয়ে তাসখেলা হোল ও বাড়ীতে।

৭ই অক্টোবর, ১৯৩৪। ২০শে আশ্বিন, ১৩৪১। রবিবার

সকালে কচার বাড়ীতে গল্প করি। তাকে বল্লুম—Ivanhoe এর বাংলা লিখে দেব। স্নান করতে গিয়ে আমি ও পাগ্‌লা ও পাড়ার ঘাটে নাইতে গেলুম। খরস্রোতা নদী, অত্যন্ত জল বেড়েচে—জলের ধারে ধারে কুঁচ গাছ—গাছের ডাল পালা ঝুঁকে আছে। সাঁতার দিয়ে এমন আনন্দ কখনো পাইনি। এ যেন ইছামতীই নয়। ও পাড়ার ঘাটে ননী মাস্টার বসে আছে। খেয়ে শুয়েচি—ওরা গল্প শুনতে এল। তারপরে উঠে বসে খুড়ীমার সঙ্গে গল্প করি। তারপর রামের নৌকাতে ইছামতী দিয়ে বনগাঁয়ে এলুম। পরিপূর্ণ ইছামতীর শোভা দেখে মুগ্ধ হোলাম। আকাশের কি রং। কি গাছপালা ঝোপ ঝোপ—জলের ধারে নত হয়ে আছে! কি আকাশের সুনীল শরতের রং, কি অস্তগামী সূর্য্যের কিরণমালা! মিত্তের আড়তে…ও বীরেশ্বর বাবুর বাড়ীর মধ্যে বসে গল্প করি

১ Walter Scott-এর এই উপন্যাসটি বিভূতিভূষণ অনুবাদ করেন। অনূদিত গ্রন্থটি ? ১৯৩৮ সনে জগত্তারণ দাসের বাণীভবন থেকে প্রকাশিত হয়।

আমি ও বিনয়বাবু।

৮ই অক্টোবর, ১৯৩৪। ২১শে আশ্বিন, ১৩৪১। সোমবার

বনগাঁয়ে প্রথমে বীরেশ্বরবাবুর বইখানা পড়ি। তারপরে বীরেশ্বর বাবুর বাড়ী গেলুম আড্ডা দিতে। বারাকপুরের হাজারী ঘোষ সেখানে। বিকেলে জগদীশবাবুর বাড়ীর নিমন্ত্রণে। নদীর জলে স্নান করে ভারী আরাম হোল। বৈকালে আমি আর ধীরেন এক সঙ্গে কল্‌কাতা এলুম।

৯ই অক্টোবর, ১৯৩৪। ২২শে আশ্বিন, ১৩৪১। মঙ্গলবার

Busy day. যতকাজ সব আজ। স্কুলে যাবার পথে বঙ্গশ্রী—সেখানে চা ও ডিম খেয়ে সজনীর কবিতা শুনে স্কুল। কাক্সোকে অনেক কথা বলি। সকালে বার হয়ে আবার বঙ্গশ্রী—সেখান থেকে প্রবাসী—তারপর বরেন্দ্র লাইব্রেরী, শ্রীগুরু লাইব্রেরী—তারপর ট্রামে নীরদ বাবুর Flat এ চা খেয়ে গল্প করে ট্রামে আবার M. C. ও P. C. Sircar. [—] আজ সারাদিন খাইনি। রাত্রে সরবৎ খেয়ে ও বই নিয়ে বাসায়।

১০ই অক্টোবর, ১৯৩৪। ২৩শে আশ্বিন, ১৩৪১। বুধবার

সকালে প্রবাসীতে গিয়ে টেবিলের ওপর স্লিপ্‌ রেখে এলুম। স্কুলে যাই ট্রামে। কোলা খুব কাছে এসে দাঁড়ায়—কাল বলেচে আমাদের বাসায় যাবে। ছেলেরা খাওয়াবে। স্কুল থেকে ট্রামে প্রবাসী। চেক্ নিয়ে রমেশ সেন। হীরু চা খাওয়ালে। বৈকালে ফুটপাতের লোকের ভিড়, দোকানে দোকানে কাপড় কিন্‌চে। আমার মনে পড়ল এইসব পুজোর দিনে বারাকপুরের ভিটাতে শৈশবে বাবার অসুখ করতো, কি উদ্বেগ ও নিরানন্দই [নিরানন্দেই] কাটতো। আজ টাকা তো আস্‌চে। M. C. Sircar। P. C. Sircar এর ওখানে মনোজ বসে। নরেনের সঙ্গে দেখা, গল্প করতে করতে বাসা।

১১ই অক্টোবর, ১৯৩৪। ২৪শে আশ্বিন, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

কালরাত্রে খুব গরম। রাত্রে শুয়ে Hansa League এর স্বপ্ন দেখেচি কেবলই। ভোররাত্রে ঘুম ভাঙল। Orion জল জল করচে ঠিক মাথার ওপরে। তখনও বেশ রাত আছে। মনে পড়ল শৈশব দিনের কথা। কি শান্তভাবে সবকথা মনে আসে। ভগবানের আসন ঐ নক্ষত্রবীথিতে—আজ স্কুল বন্ধ হবে—কি যে আনন্দ—মনে যেন রাখতে পারিনে। ছুটী হয়ে গেলে কালো এল আমার সঙ্গে পেন্সিল কিন্‌তে। ওরই সঙ্গে ট্রামে বেরিয়ে আমি গেলুম নীরদবাবুর flat-এ [—] খাওয়ার প্রোগ্রাম ঠিক কর্ত্তে। সেখান থেকে ট্রামে M. C. তে গিয়ে বই

ও P. C. তে গিয়ে প্রবাসীর চেকের দরুণ টাকা নিলুম। জয়শঙ্করের সঙ্গে দেখা —সে ট্রামে তুলে দিয়ে গেল—আমি গেলুম গিরীন বাবুর ওখানে। সেখান থেকে চা খেয়ে জগৎদাসের বাড়ী। সেখানে খাবার খাওয়া। হেঁটে বাসা। সারারাত ঘুম হোল না—কি ভয়ানক unearthly heat! দুজনে স্বামী স্ত্রী পাশের ছাদে সারারাত গল্প করে আরও ঘুম হতে দিলে না।

১২ই অক্টোবর, ১৯৩৪। ২৫শে আশ্বিন, ১৩৪১। শুক্রবার

সকালে উঠে Ivanhoe পড়ে কাটল—তারপর Imperial Library তে গেলুম বই আনতে—বই পেলাম না। Wide World খুঁজে না পেয়ে ট্রামে P. C.—সেখান থেকে বাসায় এসে কালকার দ্রব্যাদি গুছিয়ে রাখি। প্রবাসীর টাকাটা নিয়ে আসি P. C. র কাছ থেকে।

১৩ই অক্টোবর, ১৯৩৪। ২৬শে আশ্বিন, ১৩৪১। শনিবার

সকালে স্নান সেরে খেয়ে নীরদবাবুর flat এ ও দ্রব্যাদি নিয়ে ট্যাক্সিতে রওনা হাওড়া স্টেশন। মাঝে মাঝে সেকেণ্ড ক্লাসে। মাঝে মাঝে ইণ্টার ক্লাসে ··· ? এলুম। প্রমোদবাবু উঠলেন খড়্গপুরে। রাখামাইনে নেমেই নীলঝর্ণায় বেড়াতে গেলুম। হেমন্তের অপূর্ব্ব বৈকাল। এত ভাল লাগ্‌ছিল—কেমন অপূর্ব্ব রোদ চারিদিকে। বেড়িয়ে ফিরে এসে অনেকরাত পর্য্যন্ত আড্ডা দিলুম।

১৪ই অক্টোবর, ১৯৩৪। ২৭শে আশ্বিন, ১৩৪১। রবিবার

সকালে উঠে ৪নং shift এ বেড়াতে গেলুম। বনতুলসী জঙ্গলের অপূর্ব্ব সুঘ্রাণের মধ্যে দিয়ে খর রৌদ্রে নীল আকাশের তলে পাহাড়ের সানুতে পিয়াশী গাছের ছায়ায় কতক্ষণ বসে রইলুম। ফিরে আসার পরে দুপুরে মেঘ করে বিকেলের দিকে খুব বৃষ্টি শুরু হোল—সারারাত—ঝমঝম বৃষ্টি—একসময় ভাবলুম —দূরের কালাঝোড় পাহাড়ের দিকে চেয়ে আজ সেই···? সন্ধ্যা বেলা—একটা ছোট্ট গ্রাম্য নদীর কথা মনে হোল—কতকাল আগের কথা সে সব। সব মুছে গিয়েচে। একদিন সেই সন্ধ্যা পরম সত্য ছিল জীবনে। তার জীবন দিয়ে সেই সন্ধ্যাটী সে আমার মনে অক্ষয় করে রেখে দিয়েচে।

১৫ই অক্টোবর, ১৯৩৪। ২৮শে আশ্বিন, ১৩৪১। সোমবার

সকালে খুব বৃষ্টি। শুয়ে শুয়ে শুন্‌চি প্রমোদবাবু বলচেন—ওই দেখুন রৌদ্র—উঠেচে। তারপর সত্যিই বৃষ্টি একটু থামল। আমি উঠে বাংলোর পিছনের পাহাড়ের পিয়ালতলার ছায়ায় শিলাখণ্ডে বনতুলসীর জঙ্গলের মধ্যে বসেছিলুম। সিঁড়ি দিয়ে একটা hedge এর ওপর রৌদ্রে—মেঘভাঙা রোদে কতক্ষণ বসে

রইলুম। বার হয়ে পাট্‌কিটার জঙ্গলের পথে ঘুরে এলুম। এক জায়গায় একটা ঘন বন, একটা ছোট পাহাড়ী নদী—সেখানে বাঘ থাকতে পারে ভয় হোল। পাহাড়ের saddle দিয়ে যখন যাচ্চি ঝমঝম করে বৃষ্টি এল—হাজার বনস্পতির পাতায় পাতায় বৃষ্টির শব্দ···তারপরই দূরে কালাঝোর দেখা গেল—নীল কালো মেঘমালায় শৈলশ্রেণী নীল···এবেলা মেঘ থম্‌কানো কালো মেঘময় বিকেল। সন্ধ্যার সময় বাসায় এসে চা খেলুম।

১৬ই অক্টোবর, ১৯৩৪। ২৯শে আশ্বিন, ১৩৪১। মঙ্গলবার

সকালে চারুবাবু, সুরেনবাবু, সস্ত্রীক এলেন—ওঁদের নিয়ে নীল ঝরনায় বেড়াতে গেলুম। কথা হোল পিক্‌নিক্ হবে একদিন। সুরেন বাবুর স্ত্রী এক জায়গায় পড়ে যাচ্ছিলেন—অতি কষ্টে লাঠি দিয়ে রক্ষা করলুম। নীলঝর্ণায় এসে নাইতে গেলুম। আমরা যখন জলে নেমেচি পট্টনায়কও সাহেব যাচ্চে। ডাক্তারের সঙ্গে নীলঝর্ণার কাছে দেখা—বল্লেন বেরুবো। আতা কিন্‌তে গেলুম। সন্ধ্যার সময় নীরদবাবু ও আমি মহুয়াতলার ঘাটে বেড়াতে গেলাম। পাণ্ডুর চাঁদের জ্যোৎস্না—তারপর সারারাত ধরে জ্যোৎস্নার কি ইন্দ্রজাল! পাহাড়ের মাথায় চাঁদ কিরণ দিচ্চে—মনে হোল এ ভগবানের conception সম্পূর্ণ অপরিচিত। ভগবান কেবলমাত্র সব পরিবর্ত্তন করে দিয়েচেন। কেবলই ইছামতী তীরের সেই দোতলা ঘরে ক্ষুদ্র কক্ষটার কথা মনে হয়—আমাদের ভিটায় ভাঙা বাড়ীর কথা মনে হয়—মনে হয় বুদ্ধদেব গৃহত্যাগের দিনটীতেও সিদ্ধেশ্বর ডুংরী ওইরকম দেখা যেত। অনেকরাত্রে গিয়ে শুয়ে পড়ি।

১৭ই অক্টোবর, ১৯৩৪। ৩০শে আশ্বিন, ১৩৪১। বুধবার

সকালে উঠে নীলঝর্ণায় হাতমুখ ধুয়ে এলুম। বেশ রোদ ছিল সকালে। বৈকালে কিছু মেঘ হোল। ওরা সুবর্ণরেখায় স্নান করতে গেল—আমি বসে আইভ্যানহো লিখি। রামধনকে বিড়ি আন্‌তে দিলুম। ঘুম ভেঙে উঠে দেখি সে আনেনি। ওরা সাহেবের বাংলোতে চা খেতে গেল—আমি বেরিয়ে পড়ি। পাহাড়ের hedge এ বসে লিখচি, মাথায় মাথায় রাঙা রোদ, কালাঝোরের মাথায় মেঘের সাদা বাষ্প আবার রোদ—সেই চেরা পথটা দেখা যাচ্চে। আমি ভাবচি—দূরে আজ বিজয়া দশমীতে বাঁওড়ের ধারে এতক্ষণ দোকান বসেচে। খুকুটুকু কাপড় পরে সেজেচে—ওখানে আসবার জন্যে। কত জায়গায় আজ বিজয়ার উৎসব। এখানে ওসব কিছু নেই—সাঁওতালরা নাচ্‌তে এসেচে। কিন্তু পাহাড়ের ও শৈলমালায় কি অপূর্ব্ব panorama এইখানটা থেকে [—] যেখানে

বসে আছি আমি। তারপরেই আমি আর একটু গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে বনতুলসীর সেই জঙ্গলে বসে আছি—ওপারে রাঙা রোদ আবার উঠেচে মহুলিয়া ও নেকড়ে ডুংরি আলো করেচে। আমি যেন roof of the wrold এ বসে আছি—এত উঁচু। রোদ এবার সিদ্ধেশ্বর ডুংরির মাথাতেও পড়ল। এরকম দিন বেশী হবে না। বাঁওড়ের ধারের জন্য মন কেমন করচে। আরও একটা উঁচু জায়গায় উঠেচি—কি vast majesty! রাঙারোদ সিদ্ধেশ্বর ডুংরির টেকো মাথায়—কি অপূর্ব্ব অপরূপ শৈলশ্রেণীর দৃশ্য চারিধারে। ঘন ছায়াভরা বিকেলটা।

১৮ই অক্টোবর, ১৯৩৪। ১লা কার্ত্তিক, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

সকালে নীল ঝর্ণাতে হাত মুখ ধুয়ে—দুপুরের পরে গালুডি। চারুবাবু, সুরেনবাবু নেকড়েডুংরিতে উঠি। সেখানে চা খাই, গান শুনি। তারপর সুধীরের বাড়ীতে এসে চা মিষ্টি খাই। স্টেশন মাস্টার বল্লে আমার মেয়ের বিয়ের কি করলেন? তারপর সকলের সঙ্গে নদী পর্য্যন্ত এসে ডোঙা পেলাম না—জ্যোৎস্নার মধ্যে দিয়ে—সুবর্ণরেখার পুল বেরিয়ে বাসা।

১৯শে অক্টোবর, ১৯৩৪। ২রা কার্ত্তিক, ১৩৪১। শুক্রবার

আজ সকালে Governor's pool বলে একটা সুন্দর স্থানে নাইতে গেলুম। কত Spider Lily[১] ফুটে আছে জায়গাটাতে। ফিরে এসে circular tour-এর পথে বেড়াতে গেলুম। রোদ ছিল, একটু মেঘলাও ছিল। পাটকিটা যেতে পথের দুধারের বনের দৃশ্য অপূর্ব্ব। গাড়ী পাহাড়ের পথে উঠ্‌তে চাইল না। একটা ছোট নদীতে বেশ সুন্দর জল। জ্যোৎস্না রাত্রে পায়ে হেঁটে বাসায় ফিরি। তারপর গল্প। বাড়ীর পেছনের পাহাড় শ্রেণীর ধারে গিয়ে বসি। কত কথাই মনে হয়। এবার পূজোতে বাড়ী গেলুম না—ওরা কত কি ভাবচে।

২০শে অক্টোবর, ১৯৩৪। ৩রা কার্ত্তিক, ১৩৪১। শনিবার

সকালে উঠে পিক্‌নিকে গেলুম। প্রথম তো চারু বাবুদের খুঁজে পাইনে। তারপর—বীরেন বাবু এল—আমি তখন রাণী ঝর্ণা [য়] বসে আছি। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে দেখি ওরা জঙ্গলের মধ্যে বসে আছে। ঝুনু মালা পাহাড়ের ওপরে উঠে গিয়েচে। উঠ্‌লুম আমিও। বাদল বাবুর[২] স্ত্রী ভিক্টোরিয়া, টুনু, চারুবাবু, আশা ও সুরেন বাবু এই কজনে উঠি। দুর্ভেদ্য জঙ্গল—সেবারে যেখানে চীহড় ফল

১ Tradescantia Virginiana Linn.। আদি জন্মস্থান? নিউ ইয়র্ক।

২ বাদল দত্ত, গালুডিবাসী; ব্যবসায়ী।

খেয়েছিলুম—সে শিলাখণ্ড খুঁজে পেলুম—তাতে বসলুম। একেবারে ওপরে উঠে গেলুম। বেজায় তৃষ্ণা—এরকম ছোট ছোট গাছের ফল খেতে অম্লমধুর—তাই খেতে খেতে ওঠা গেল। রক্ত কি বনের ফুল। নেমে খিচুড়ী খেলুম। একটা ঝরণাতে হাত মুখ ধুয়ে দেখি হেমন্ত সন্ধ্যায় জঙ্গলের গন্ধ বেরুচ্চে। নীরদবাবুদের গাড়ী বিভ্রাট হোল। আমরা হেঁটে এলুম।

২১শে অক্টোবর, ১৯৩৪। ৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩৪১। রবিবার

সকালে উঠে নীলঝর্ণায় হাতমুখ ধুতে গেলুম। ফিরে এসে চা খেয়ে পট্টনায়েককে গাড়ীর কথা বলে দেওয়া হোল—আমি ও প্রমোদ বাবু পাহাড়ের ওপরে বনতুলসীর জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে অনেকক্ষণ বসলুম—বড় রোদ। সেখান থেকে নেমে পিয়ালতলায় ছায়ায় বড় শিলাখণ্ডে বসে বটগাছের দিকে চেয়ে পাখীর ডাক শুনতে শুনতে সব যেন ভুলে গেলুম। এই পাখীর ডাক, এই প্রভাতের রৌদ্র; এই পাহাড়ের সানু, বট পিয়ালের ছায়া—অপূর্ব্ব। স্নানাহার করে রামধন দ্রব্যাদি নিয়ে রওনা। স্টেশনে একটা গাছের ছায়ায় কতক্ষণ বসি। পথে কেবলই ভাবছিলুম এই সময়ের কথা—পুরোনো বঙ্গবাসী আমলের কথা, একটা ছোটঘরে প্রদীপদানরতা মেয়ের কথা ইত্যাদি। কলকাতায় এসে মেসে জিনিসপত্র রেখে নীরদদের বাড়ী, সেখান থেকে জগৎতারণ দাসের ওখানে। খুব জ্যোৎস্না উঠেচে—হেঁটে বাসায় এলুম। ভাবছিলুম কাল কোজাগরী পূর্ণিমা—আর আমি এখনও কলকাতায়।

২২শে অক্টোবর, ১৯৩৪। ৫ই কার্ত্তিক, ১৩৪১। সোমবার

সকালে উঠে জিনিসপত্র বেঁধে রওনা [—] ট্রেনে পিয়ারগাদা ঘাট। বনগাঁয়ের এদিকে জীবনে মোটে এইবার নিয়ে চারবার। ঘাটে নেমে নৌকা করে গঙ্গানন্দপুর যেতে ৫টা বেজে গেল। কার্ত্তিকমাসের সেই কটুতিক্ত গন্ধটা—ট্রেনে নামতেই পেয়েচি—মনমাতানো বনের গন্ধ—ওই সময়েই পাওয়া যায়—অন্য সময়ে নয়। দত্তবাড়ী পৌঁছে চা খেলুম, তারপর মণীন্দ্র দত্তের সঙ্গে দেখা করে এলুম। সে সাধু হয়েচে। ২৫ বছর পরে তার সঙ্গে দেখা হোল। দেশে তার নাম "ভক্ত দাদা"। বাংলার শোভা বড় কোমল—শ্যামল অনেক বেশী। ছায়া ঘনও বটে। সুন্দর, লাবণ্যময় তবে majestic নয়! একথা মনে হোল। গাছ-পালার শোভা এখানেই বেশী। এত graceful গাছপালা কোথাও নেই। বনঝোপ ফুল এখানেই বেশী। এখানকার জঙ্গলের প্রকৃতি আরও নিবিড়, সবুজ এত গাঢ় যে প্রায় কালো। পূর্ণিমার চাঁদ উঠ্‌ল—আকাশ খুব পরিষ্কার। সভা

শেষ হবার পরে দত্ত বাড়ী আহারাদি সেরে সেখানে ঘুমুলাম। আমি ও তিনজন physical culturist···রাত্রে আমি একা শুয়ে আছি—একটা মেয়ে হঠাৎ ঘরে ঢুকে আলমারীতে কি করচে—বোধ হয় আমায় দেখেনি। হঠাৎ দেখেই পালিয়ে গেল।

২৩শে অক্টোবর, ১৯৩৪। ৬ই কার্ত্তিক, ১৩৪১। মঙ্গলবার

সকালে খুব ভোরে যাদের বাড়ী সেই ভদ্রলোক জাগিয়ে দিলেন। বাড়ীর ছেলেটা নদী পর্য্যন্ত এল। নৌকাতে যেতে যেতেই সূর্য্য উঠল। স্টেশনে এসে চা ও কেক্ খেলাম। ট্রেনে গুরুদেব হরিপদ ভারতীর সঙ্গে দেখা হোল। নেমে বাসায় এসে বাজার করি। বিভূতির সঙ্গে ও বন্ধুর সঙ্গে গল্প করি। সন্ধ্যায় যতীনবাবুর দোকানে বাজারে একজন গাছপালাবিদ্ লোকের সঙ্গে গল্প সেরে হরি মোক্তারের বাড়ীতে কলের গান শুনতে যাই। রাত্রে জাহ্নবী পাটিসাপটা করেছিল—খেয়ে শুই।

২৪শে অক্টোবর, ১৯৩৪। ৭ই কার্ত্তিক, ১৩৪১। বুধবার

সকালে উঠে হাটবাজার করে আসচি। বীরেশ্বর বাবুর পত্র পেলুম। নৌকা করে বারাকপুরে। গাছপালা এ অঞ্চলে যে রকম—সিংভূম অঞ্চলে সেরকম নেই। এত বৈচিত্র্য ও গাছের সীমারেখা নেই। সন্ধ্যাবেলা খুকু এল। সে কনকীর সঙ্গে দেখা করে গিয়েছিল, কনকী কল্‌কাতার থেকে ফিরে এসেচে—তাই। রাত্রে ওকে ঝুমুর গল্প করি ও পাহাড়ে ওঠার গল্প। ও রাত্রে আর কিছু খেলুম না।

২৫শে অক্টোবর, ১৯৩৪। ৮ই কার্ত্তিক, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

সকালে উঠে লিখি আইভ্যান্‌-হো। কবে শেষ হবে কে জানে। দুপুরে স্নান করতে যাই খুকু ও পাঁচীর সঙ্গে। আমি সাঁতার দিয়ে ওপাড়ার ঘাটে চলে গেলুম। এসে বকুলতলায় বসে আছি। খেয়ে একটু পরে শুয়ে উঠে হাটে গেলাম আমি, জেলি, রামপদ। সেখানে জিতেন, হাজারী, লক্ষ্মীনারায়ণের সঙ্গে দেখা। পূজোর কথা শুনলুম। বিজয়ার দিন এবার কি হয়েছিল, কার বাড়ী কি খাইয়েছিল জেলিকে জিগ্যেস্ করলুম। জেলি বলে তেলে-ভাজা মিহিদানা ও জিলাপি প্রায় সকলেই [—] কেবল ধীরেন কামারের বাড়ী লুচি। রাত্রে চড়কতলায় বালককীর্ত্তন হোল। খুকুরা অঙ্ক কসে ও গল্প শুনে যাত্রা দেখ্‌তে গেল। আমিও কতকাল পরে চড়কতলার যাত্রা দেখ্‌লুম। কেসা চৌকীদার[১] যাত্রা হোলে হাঁকে—কতকাল পরে দেখলুম, বাল্যে দেখেচি। কি সুন্দর জ্যোৎস্না

১ বারাকপুরবাসী।

[—] মাঝ রাত, কি আনন্দে পায়চারী করলুম। কত কথা ভাবলুম—কি সুন্দর রহস্যভরা হেমন্তের জ্যোৎস্নাশুভ্র রাত!

২৬শে অক্টোবর, ১৯৩৪। ৯ই কার্ত্তিক, ১৩৪১। শুক্রবার

সকালে উঠে লিখি, তারপর বেড়াতে গেলাম ফণিকাকার বাড়ীতে। এসে বকুলতলায় গেলাম। তারপর নাইতে। ওপাড়ার ঘাট পর্য্যন্ত সাঁতার দিলুম। বৈকালে প্রথমে ওপাড়ার ঘাট বেড়াতে গেলাম, তারপর কুঠীর মাঠে। লতা-সুগন্ধে এবার ভোর করেচে—কত কি ফুলের গন্ধ, কি শ্যামল ছায়া! কতকাল এ সময়টা দেশে কাটাই নি তাই বসে বসে ভাবছিলুম। সেই একবার পোতার বিয়ের সময় ছিলুম দিন পনেরো—তাও ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল অতিবৃষ্টির দরুণ। এভাবে কতকাল কাটাইনি। নদীর ধারে বসে vast spirit world এর কথা মনে হোল—অপূর্ব্ব সুন্দর সূর্য্যাস্তের রং এর কথা মনে হল। সন্ধ্যায় খুকুকে অঙ্ক কষাই। তারপর নিজে বেড়াতে গেলাম। রাত্রে 'দৃষ্টিপ্রদীপ' লিখ্‌লুম।

২৭শে অক্টোবর, ১৯৩৪। ১০ই কার্ত্তিক, ১৩৪১। শনিবার

সকালে লিখ্‌লুম। তারপর চড়কতলায় গিয়ে বসি। যেতে আজ বড় বেলা হোল। শীতের দিন দেখ্‌তে দেখতে ফুরিয়ে যায়। কুঠীর মাঠ বেড়িয়ে এসে ও ওপাড়ার ঘাটে নেয়ে এসে খেলুম—খুকুকে ভূগোল পড়ালুম। তারপর একটু শুয়ে উঠে আবার খুকু এল—ওদের ধাঁধা বলে দিলাম। বৈকালে কুঠীর মাঠে exercise করি। মেঘস্তূপের পাহাড়ের চূড়ায় পাটলবনের ছোঁয়া লেগেচে—কি শোভা! সন্ধ্যায় নারানদার পাড়ায় গিয়ে চা খাই ও বৌদ্ধধর্ম নিয়ে তর্ক। খুকুকে এসে পড়ালুম ও Ivanhoe-র গল্প করি। রাত্রে কি অগণিত নক্ষত্র আকাশে!

২৮শে অক্টোবর, ১৯৩৪। ১১ই কার্ত্তিক, ১৩৪১। রবিবার

এদিন সকালে খুব লিখে দুপুরে হেঁটে আকাইপুরের ভেতর দিয়ে গরীবপুর রওনা হলাম। পথে মণিবোসের, ছোট মামার, সুপ্রভার বিজয়ার পত্র পেলাম। তখন আর পড়লাম না। নওদার বিল ছাড়িয়ে একটা গাছের ছায়ায় বসে সুপ্রভার পত্রখানা খুলে পড়লাম। তারপর আকাইপুরের হাটতলা ছাড়িয়ে রেললাইন ধরে গেলুম গরীবপুরে। বীরেশ্বর বাবুর বাড়ীতে যখন চা খাচ্চি তখন ট্রেনখানা গেল। বীরেশ্বর বাবুদের পুকুরে বেড়িয়ে এলাম। রাত্রে অনেক গল্প হোল—বীরেশ্বরবাবু চিত্রকূট ভ্রমণের গল্প করলেন। রাত্রে আহারাদির পরে অনুকূল মুখুয্যের মেয়ের কথা হোল—সাহেবগঞ্জে থাকেন। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে।

রাত্রিটা বেশ কাট্‌ল। কি চমৎকার সূর্য্যাস্ত দেখা গেল বীরেশ্বরবাবুদের পুকুর থেকে ফিরবার পথে!

২৯শে অক্টোবর, ১৯৩৪। ১২ই কার্ত্তিক, ১৩৪১। সোমবার

সকালে উঠে নীরদের পুকুরে হাত মুখ ধুয়ে স্টেশনে এসে গোপালনগরের টিকিট কিনলুম। স্টেশনে নেমে বাজারে নারায়ণদার কাছে পরলোক সম্বন্ধে আলোচনা কর্ত্তে হোল। তারপর কিছু খেয়ে বাড়ী এলুম। খুকু এল—তার ওপর ভারী রাগ হোল একটা বিষয় নিয়ে। স্নান করে এসে লিখতে বসলুম। দুপুরে ঘুমিয়ে উঠে বেলেডাঙাতে গেলুম। কি অপূর্ব্ব রাস্তার শোভা। সোঁদালী-ফুল ফুটেচে দেখে এই কার্ত্তিক মাসে অবাক্ হয়ে গেলুম। এক্সারসাইজ করে চলে এলাম। সন্ধ্যায় খুকু পড়তে এসে অঙ্ক কসলে—আমি বল্লুম না। পুঁটী দিদিদের বাড়ী গেলুম রাত্রে। তারপর গল্প বলবার সময় ও সেধে কথা বলালে। রাত্রে তাস খেলা হোল—তারপরে লিখ্‌লাম। আমি ও খুকু, ন'দি ও খুড়ীমা। তারপর এসে লিখলুম। যখন শুই রামপদদের বাইরে, তখন চাঁদ উঠেচে।

৩০শে অক্টোবর, ১৯৩৪। ১৩ই কার্ত্তিক, ১৩৪১। মঙ্গলবার

সকালে উঠে লিখলাম। তারপর স্নান করতে পোড়ার ঘাটে গেলুম—সাঁতার দিলাম ও পাড়ার ঘাট পর্য্যন্ত। দুপুরে খুকুকে পড়াল। তারপর বৃন্দাবনদের বাড়ী গেলাম। পরীক্ষা নিতে। ওখান থেকে বেরুবার—বাঁশবনের আমবনের পথ দিয়ে যাবার সময় মনে কেমন একটা চমৎকার আনন্দ হোল। লণ্ঠন হাতে তেল পুরে আনতে যাচ্চি। রাখা মাইন্‌সের সেই বিরাট জঙ্গলের কথা মনে হোল। পাঁচুরায়ের দোকান থেকে তেল কিনে—কুমোর পথ দিয়ে এসে হরিপদ দাদাদের বাড়ীতে বসলুম অনেকক্ষণ। সন্ধ্যায় সময় আবার ওদের পড়াই। অনেকরাত পর্য্যন্ত Ivanhoeর গল্প হোল।

৩১শে অক্টোবর, ১৯৩৪। ১৪ই কার্ত্তিক, ১৩৪১। বুধবার

সকালে লিখে একটু কাঁটালতলায় বেড়াতে গেলুম। বলা বোষ্টম এসে গল্প করলে আর সন্তোষ। তারপর স্নান সেরে এসে একটু লিখ্‌লুম। তারপর খেয়ে এসে ঘুমুলাম কারণ কাল রাত্রে আইভ্যান্‌হোর গল্প করতে অনেকরাত হয়ে গিয়েছিল।

উঠে দেখি মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, টিপ্‌টিপ্‌ বৃষ্টি পড়চে। মন খারাপ হয়ে গেল। কোথাও বেরুনো হোল না—চেয়ার পেতে বসে পাঁচীর সঙ্গে গল্প করতে লাগলুম। সন্ধ্যাবেলা খুকু এল পড়তে—তাকে পড়িয়ে রাত্রে সে আবার হেঁয়ালী জিগ্যেস্

করতে লাগ্‌ল। রাত্রে নাপিত বৌয়ের সঙ্গে পুঁটীদিদিদের সঙ্গে ঝগড়া হোল বিচালী নিয়ে। অনেকরাত পর্য্যন্ত লিখ্‌লুম।

১লা নভেম্বর, ১৯৩৪। ১৫ই কার্ত্তিক, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

মেঘান্ধকার দিন। মণীন্দ্রবাবুকে চিঠি লিখি—সকালে বসে বসে লিখলুম। তারপর খুকু এসে প্রবাসীর বিজ্ঞাপনের শাড়ী অনেকক্ষণ ধরে দেখলে। আমি নদীতে নাইতে গেলুম না। খেয়ে একটু শুয়েচি, খুকু আবার এল। অনেকক্ষণ রইল। এ গল্প ও গল্প করতে লাগ্‌ল। সুপ্রভার কথা জিজ্ঞেস করতে লাগল। বৈকালে হাটে গেলুম। হাট সেরে ফিরতে অন্ধকার হয়ে গেল। সকালে ঘি কিনেছিলুম, রাত্রে ভাত না খেয়ে রুটীই খেলাম। সন্ধ্যার পরে খুকু পড়তে এসে অনেকক্ষণ রইল। বাইরে আমি লিখতে বসলেও খুড়ীমা খাবার জন্যে ডাকতে এলেও অনেকক্ষণ রইল। রামপদ আমার কাছে বসে ১০০ টাকার ও কি করেছিল সেই গল্প করলে। রাত্রে বাইরে শুয়ে খুব আনন্দ—বেশ ঠাণ্ডা, নির্ম্মল বাতাস বাইরে।

২রা নভেম্বর, ১৯৩৪। ১৬ই কার্ত্তিক, ১৩৪১। শুক্রবার

ঘোর বর্ষা নেমেচে। সকালে লেখা সেরে চা খাচ্চি। খুকু এসে গল্প করলে। তারপর আমি নাইতে গেলুম—এপাড়ার ঘাট থেকে সাঁতার দিয়ে গেলাম তেঁতুলতলার ঘাটে। রোজ থাকে বুধো গোয়ালার মা এ সময়। তারপর এসে খেয়ে বসেচি, আবার খুকু এল এবং অনেকক্ষণ রইল। ওর সঙ্গে গল্প করলুম Normanদের কথা—Saxonদের ইতিহাস। ওকে আর পাঁচীকে বুঝিয়ে দিলাম। এবেলা খুব বৃষ্টি। পাঁচু রায়ের বাড়ী নিমন্ত্রণ হবার কথা ছিল, হোল কৈ। শম্ভু ও রামপদ ছাগল আনতে গেল বেলেডাঙায়। আমি কোথাও বেরুলাম না। সন্ধ্যায় বৃষ্টি নামল বেশী। রাত্রে খুকুদের সঙ্গে বাইরে বসে ভূতের গল্প করি। কারণ আমার আলোতে তেল নেই। আলো জ্বালাতে পারচি না। দুধ দিয়ে যায় নি হাজ্‌রী জেলে। রাত্রে খাওয়ার কষ্ট হোল।

৩রা নভেম্বর, ১৯৩৪। ১৭ই কার্ত্তিক, ১৩৪১। শনিবার

মেঘান্ধকার আকাশ। সকালে নদীর ঘাটে মুখ ধুতে গিয়ে আকাশের ও গাছপালার সুন্দর রূপ দেখলাম। লিখে উঠে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গিয়ে দেখি একজায়গায় সৈঁয়াকুল[১] হয়ে আছে অজস্র। সাঁতার দিতে গিয়ে একটা নীলকচুরির ফুল তুলে নিয়ে বাঁশতলার ঘাট দিয়ে উঠে এলুম। মাংস ছিল রাত্রের

১ Zizyphus oenopila Mill.। সংস্কৃতে শৃগালকেলি, লঘুবদরী।

খেয়ে দুপুরে খুব ঘুমুলাম। ন'দি তাস খেলার জন্যে ডাকতে এসেছিল, শুনিনি। বৈকালে গোপালনগরে গেলুম, লক্ষ্মীডাক্তার ও মন্মথর ওখানে বসি। তামাক খাই। সন্ধ্যায় খুকু একা বাইরে বসে অঙ্ক কষলে ও গল্প শুনলে। ওর খোঁপায় কচুরির ফুলটা গুঁজে দিলুম। রাত্রে লিখি। এ বেলা বৃষ্টি হয়নি। রাত্রে ঠাণ্ডাও কম। এখানকার আর সব ভাল [—] বাদলা হলে বড় খারাপ লাগে—আর ?—

৪ঠা নভেম্বর, ১৯৩৪। ১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৪১। রবিবার

সকালে মেঘান্ধকার আকাশ—নদীর ঘাটে গিয়ে দেখলাম। মনে হোল মেঘ চলে যাবে [—] কিন্তু আরও বেশী করে জমল, তবে বৃষ্টি হল না। আমি লেখা সেরে কুঠীর মাঠে আটিতে (?) গিয়ে বেড়াই। ব্যায়াম করি, নতুন ছাতিম গাছ একটা আবিষ্কার করি। কি সুন্দর ঘন বনের দৃশ্য ও বৈচিত্র্য! এত বৈচিত্র্য ও শোভা, গাছের এমন ভঙ্গি ও সীমারেখা কোথাও নেই। আনন্দে মন কেমন আপ্লুত হয়ে উঠল। এই সময় মরচের ফুল[১] ফোটে—এবং এই সময়ের গন্ধটা মরচে ফুলের সম্প্রতি আবিষ্কার করেচি। মাখন সিমের গোলাপী দলগুলি ঘন সবুজ পাতার আড়ালে দেখা যাচ্চে—কেয়ো ঝাঁকার ফুলে কেমন একটা মিষ্টি সুগন্ধ। মরচের ফুল, হাতলম্বা লতার পাতাগুলি কুঠীর মাঠে যেতে বড় একটা গাছে—হলদে হয়ে আছে। খুকু দুপুরে এল সে কত কি গল্প করে, হাসে। বেশ লাগে ছেলেমানুষকে। হাটে গেলাম। সন্ধ্যাবেলা খুকু আবার এল বল্লে, আপনার গায়ে এত লোম কেন ? পাশে তাকে চেয়ারে বসিয়ে [—] সেই আলো জ্বাললে। তারপর ১১টা পর্য্যন্ত গল্প।

৫ই নভেম্বর, ১৯৩৪। ১৯শে কার্ত্তিক, ১৩৪১। সোমবার —

কাল রাত্রিতে নক্ষত্র দেখা গিয়েছিল—যখন হাট থেকে এসে ভরা সন্ধ্যায় আমি কুঠীর মাঠে ও নদীর ঘাটে গিয়েছিলুম। আজ প্রত্যুষে ও পাড়ার ঘাট থেকে বহুদিন বাদে সূর্য্যোদয় ও রৌদ্র দেখলুম। একটু পরেই মেঘে সব ঢেকে গেল। নদীতে যেতেই খুকু এল। তাতে আমাতে সাঁতার দিলাম। আগে ওপাড়ার ঘাটে যাচ্ছিলুম, ও বল্লে—দাঁড়ান! ও ঘাটে চলুন যাই। আমি বাঁশতলার ঘাট থেকে নেয়ে এলুম। দোকড়ির ছেলে বল্লে আপনার তো খুব সাহস! একটু ঘুমিয়ে উঠে বসে আছি, খুকু চুল শুকোচ্চে ছাদে [—] আমায় বল্লে দেখুন ? মুখ তুলে দেখি···। তারপর আমি রাঙারোদ-ভরা অপূর্ব্ব বিকেলে···? এইমাত্র

১ Piper nigrum Linn.। সংস্কৃতে মরিচ। বাঙলায় গোলমরিচ।

হোয়ে ছিল। বেলেডাঙার পথে এক জায়গায় গিয়ে বসলুম। সেক্রার দোকানে তামাক খেলুম। তারপর সন্ধ্যায় ফিরি। চারটা সিগারেট দিলে এক পয়সায়। চোদ্দ পিদীম দিয়েছে বোধন-তলায়, খুকুদের উঠোনে। ওরা শাঁক বাজাচ্চে [—] কালীতলায় প্রদীপ দিতে। তারপর খুকু এল। আবার সন্ধ্যা বেলা এসে অঙ্ক করলে। আমি ন দিদিদের বাড়ী 'মেঘমল্লার' পড়লুম। খুকু সেখানে না যাওয়াতে আমার রাগ হোল।

৬ই নভেম্বর, ১৯৩৪ ২০শে কার্ত্তিক, ১৩৪১। মঙ্গলবার

সকালে লিখে উঠে খুকু অনেকক্ষণ বাস করতে লাগল—সে উঠল প্রায় বেলা। কুঠীর মাঠে বেড়িয়ে এসে স্নান করলাম—সাঁতারও দিলাম। বিকেলে খুকুদের নিয়ে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গেলাম—কুঠী দেখে ওদের কি আনন্দ! খুকু লাফায়, ছোটে, এ ঝোপে ঢোকে, ও ঝোপে ঢোকে—আমায় কেবল বলে—দাদা, শুনুন, আসুন এদিকে, এটা দেখুন। আবার ঘাটের পথ থেকে ডেকে অনেকদিন পরে বল্লে—দাঁড়ান দাদা, আমরা যাই। আমার পেছনে পেছনে ছুটে আসে। ঠিক হোল একদিন সাতভেয়েতলায় যাবো ওদের নিয়ে। সন্ধ্যার পরে গোপালনগরে গেলাম ঠাকুর দেখতে। ধোপার বাড়ীতে গেলাম অনেক বছর পরে। স্কুলের মাঠে সেই ঘোর অন্ধকারে ও কাদায় বেড়াতে গেলাম। হাজারির ওখানে তাস খেলা গেল কবিরাজ, মানিক ব্রজেন বাবু মাস্টার। খেয়ে দেয়ে রাত এগারোটায় বাড়ী এলাম। খুকু বলেছিল [—] এসে পড়বেন সকাল, সকাল—গল্প শুনবো। তা আর হোল না।

৭ই নভেম্বর, ১৯৩৪। ২১শে কার্ত্তিক, ১৩৪১। বুধবার

সকালে খুব কুয়াশা। একটু পরে রোদ উঠল। Ivanhoe লিখলুম। একটু পরে খুকু এল—কি একটা গল্প লিখেচে স্লেটে [—] পড়ে শোনালো। তারপর আমরা নাইতে গিয়ে নৌকায় উঠে ঠেলাঠেলি করলাম—খুব সাঁতারও দিলাম। বিকেলে ওই আমাকে ঘুম থেকে ওঠালে। কিন্তু কুঠীর মাঠে যাওয়া হোল না ওর—আমরা তাস খেলার পরে কুঠীতে বেড়াতে গেলুম। সন্ধ্যার আগে নদীর ধারে বসে রইলুম। আকাশের কি অপূর্ব্ব রং দেখলাম নিস্তব্ধ নদীতীরে—সন্ধ্যার সময় খুকু এসে বল্লে—একটা জিনিস খাবেন? হাঁ করুন। তারপর আমার মুখে ভাজা মসলা ফেলে দিলে। অনেকক্ষণ গল্প হোল ও অনেকরাত পর্য্যন্ত শুনলে। তারপর আমি লিখলুম। এখানকার দিনগুলো সত্যিই যে অপূর্ব্ব আনন্দে কাটচে বিশেষ করে খুকুর জন্তে [—] আর ও আজকাল সর্ব্বদা কাছে

এসে বসে থাকে বলে [বোলে]—এ বিষয়ে ভুল নেই। কিন্তু মেঘ মোটেও কাটচে না আকাশের, রোদের মুখ একদিনও দেখতে পেলাম না—আজ সন্ধ্যার সময় কেবল আকাশের রং যা দেখেছিলাম—অপূর্ব্ব। যুগল কাকাদের শিউলে গাছটার দিকে চেয়ে থাকি।…

৮ই নভেম্বর, ১৯৩৪। ২২শে কার্ত্তিক, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

সকালে আকাশে মেঘ, নদীতে গিয়ে দেখ্‌লুম। শেষ রাত্রে বেশ শীত করেছিল। কার্ত্তিক মাসের সেই পাতালতার গন্ধটা এখনও মৃদুভাবে আছে। খুকু সকালেই এসে পৌঁছেচে—স্নানের সময় পর্য্যন্ত রইল। খুকু একটা গল্প লিখেচে—সেটা ছেলেমানুষের ভঙ্গিতে আমায় বল্লে। একসঙ্গে আমরা ঘাটে গেলুম। ঘুমিয়ে উঠেই ও আবার এল। তারপর আমি আর জেলি হাটে বেরিয়ে গেলাম। হাটে গিয়ে শোনা গেল জাহ্নবীর অসুখ। মনটা খারাপ হয়ে গেল। চমৎকার অস্তদিগন্তের আভা জড়ানো বট অশ্বত্থের গাছগুলোও ভাল লাগ্‌ল না। সন্ধ্যায় ফিরে মনোরমা প্রভৃতি পড়তে এল—খুকুও এল। অনেকরাত পর্য্যন্ত গল্প শুন্‌লে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মা কেমন করে মারা গিয়েছিলেন—গৌরী কেমন করে মারা গিয়েছিলেন—সে সব শুনলে। অনেকরাত পর্য্যন্ত রইল। বল্লে—এই বকুনি আরম্ভ হোল তো আর নিস্তার নেই।

৯ই নভেম্বর, ১৯৩৪। ২৩শে কার্ত্তিক, ১৩৪১। শুক্রবার

সকালে খুকু এসে পুঁটী দিদিদের বাড়ী বাড়ী পুজোর জায়গা করে দিলে। সবাই দেখতে এল—আমি পুজো করচি কি না—বল্লে রামমণি পুজোর জায়গা করেচে। চণ্ডীদাস পুজো করেচে—দেখি কেমন পুজো হচ্চে। শেষ পর্য্যন্ত সে কাছে কাছেই রইল। গল্পটা পড়ে শোনালে। গ্রীষ্মের বন্ধের দিন এখান থেকে চলে যাবার সময়ের মত। নদী বেয়ে যাচ্চি—সকালবেলা। মেঘ মেঘ একটু রোদ উঠেচে। বনগাঁয়ে এসে জাহ্নবীর অসুখ। এই যাবার সময় খুব আনন্দ হয়েছিল—চালতেপোতার বাঁকে ঝোপের মাথায় কুচো কুচো হল্‌দে ফুল দেখে। বাসায় এসে জাহ্নবীর জন্তে ডাক্তারখানায় গেলাম। সুরেন এলে তার সঙ্গে অনেকদিন পরে ঘাট বাঁওড় [—] শীতলদের বাড়ী গেলুম। তারপর বলু এসে জাহ্নবীকে দেখলে [—] আমি ওষুধ এনে খাইয়ে [—] লিখ্‌লুম। ঠাকুরের দোকান থেকে খাবার কিনে আনি [—] জগদীশদাদের[১] বাড়ী যাই।

১ জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রাক্তন শিক্ষক, বনগাঁ হাইস্কুল।

১০ই নভেম্বর, ১৯৩৪। ২৪শে কার্ত্তিক, ১৩৪১। শনিবার

সকালে উঠে গানটা মনে পড়ল সেদিন খুকুর মুখে শুনেছিলুম—ঘুম ঘোরে এলে মনোহর, নমো নমঃ, নমো নমঃ নমো নমঃ[1] [।] আজ আকাশ পরিষ্কার দেখে মনে কি সুখ যে হোল, সকালে! এতদিন বারাকপুরে ছিলাম আকাশ পরিষ্কার হয়নি। কেমন ওদের রান্নাকের তক্তপোষ থেকে বকুল গাছের ওদিকে গাছপালায় রোদ পড়ে স্বচ্ছ দেখচ্চে। শিউলি গাছটার মুকুলগুলি কি চমৎকার দেখাতো! খুকু এসে গল্প করত। গান গাইত।

বৈকালে মহীতোষ রায়চৌধুরী[2] ভোটের জন্যে ডাক দিলে একসঙ্গে গিয়ে বেড়ালুম। তারপর আমরা গেলুম গোপালনগরে। দোকানে দোকানে ভোটের জন্যে ঘুরলুম। অনেকরাত্রে ফিরলুম।

১১ই নভেম্বর, ১৯৩৪। ২৫শে কার্ত্তিক, ১৩৪১। রবিবার

সকালে খয়রামারির মাঠে বেড়াতে গেলাম। এসে জাহ্নবীর জ্বর দেখে তার পথ্যের ব্যবস্থা করে লিখ্‌তে বসি। একবার বিভূতির আড়তে ভোটের গল্প শুনে এলুম। বেলা চারটার সময় ঘোড়ার গাড়ীতে বারাকপুর। কুমোর বাড়ীর কাছের রাস্তা দিয়ে নেমে যেতে ফকিরচাঁদের বাড়ী থেকে বেরুচ্চে পাঁচী। সে বল্লে—ও বিভূতিমামা আপনার জন্যে পাড়া অন্ধকার। সবারই মন খারাপ, খুকুরও তাই। কচার চোখ দিয়ে জল পড়চে। যেতে যেতে চড়কতলার মাঠে খুকুর সঙ্গে দেখা। সে তো হাস্‌তে হাস্‌তে কাছে এল। সে সেই কেমন একধরনের হাসে। তারপর আমি পুঁটিদিদিদের বাড়ী গেলুম। পাঁচী বল্লে পাড়া অন্ধকার হয়ে গেছে। আপনাকে এত ভালবাসতে ইচ্ছে হয় বিভূতিমামা! খুকুর সঙ্গে আবার দেখা। সে বসলো পিসিমাদের দাওয়ায়। তাকে একটা চড় মারতে গেলে সে একটুও নড়ল না। আবদারের সুরে বল্লে—চড় মারলেন যাবার সময়ে? তারপরে গোপালনগরে…? বাড়ীতে গেলুম। সেখান থেকে বনগাঁয়ে এসেচি। এমন সময় মহীতোষ বাবু ডাক্‌চেন ওদিকের জানলা থেকে। খানিকটা কথাবার্ত্তা বলে লুচি ভাজা খেতে গেলুম দোকানে। মনে আজ একটা অপূর্ব্ব আনন্দ।

১২ই নভেম্বর, ১৯৩৪। ২৬শে কার্ত্তিক, ১৩৪১। সোমবার

আজ Assembly Election এর Polling day। গোপালনগরে গেলুম সকালে—বারাকপুরে। খুকু মাঠে গিয়েছিল—এসে বিলবিলেতে যখন পা ধুচ্চে

১ নজরুলগীতি।

২ প্রাক্তন অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

—আমি তখন মোটরের কাছে দাঁড়িয়ে। ওকে দেখে এলুম। ভিজে কাপড়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা বল্লে। আমি এলুম বৃন্দাবনের বাড়ী। সেখান থেকে গোপালনগরে এসে যুগল মদনকে নিয়ে বনগাঁয়ে। তখনি খেয়ে নিয়ে আবার গোপালনগরে। ·· ?

গোপালনগরে ··? দেখলুম কতবার। আবার ওদের নিয়ে বৈকালে বারাকপুরে। কালো ছিল বলে খুকু এল একটু আড়ষ্টভাবে। তাহলেও এল—পুঁটিদিদির ঘরের মধ্যে দাঁড়ালে।

১৩ই নভেম্বর, ১৯৩৪। ২৭শে কার্ত্তিক, ১৩৪১। মঙ্গলবার

সকালে ওষুধ আনা ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত ছিলুম। খয়রামারি বেড়িয়ে এলুম না। স্নান করে এলুম। বৈকালে গেলুম স্বদেশবাবুর ফার্মে। সুন্দর লোকটা—নানারকম বনফুলের গল্প হোল। একরকম সিমের ফুল দেখলুম। কত বড় পেঁপে···। তারপর ওখান থেকে এসে বীরেশ্বরবাবুর বাড়ীতে গেলুম। সেখানে আমি ও বিনয়বাবু গল্প করে—ফিরলুম,—।

কি সুন্দর রাত জ্যোৎস্নাময়ী! কি সুন্দর নীল নির্ম্মল আকাশ! সব বৃথা গেল এবার কুঠীর মাঠে এই আকাশ না দেখতে পেয়ে!

১৪ই নভেম্বর, ১৯৩৪। ২৮শে কার্ত্তিক, ১৩৪১। বুধবার

সকালে উঠে লিখি তারপর বাজার করতে গেলাম। তারপর জিতেন দফাদারের সঙ্গে সঞ্চয়ের গুণ সম্বন্ধে রাধুর ডাক্তারখানায় বসে গল্প করি। মন ভালই না মোটে। বারাকপুর ছেড়ে এসে মনে হচ্চে স্বর্গ থেকে চলে এসেচি—কি আনন্দেই ছিলুম সেখানে! একটা আনন্দ স্বপ্নের মত। জাহ্নবী ছট্‌ফট্ করচে জ্বরের ঘোরে—সেই হয়েচে আরও কষ্টকর। বিকেলের তিনুর সঙ্গে গেলুম খয়রামারির মাঠে। সন্ধ্যায় ক্লাবে বসে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি আরোহণের গল্প করি ওদের সঙ্গে।

১৫ই নভেম্বর, ১৯৩৪। ২৯শে কার্ত্তিক, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

সকালে উঠে লিখে বীরেশ্বরবাবুর বাড়ী বসে গল্প করি। ফিরে এসে স্নান করে আবার হিরণ্ময়ীর অধ্যায় লিখি সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টি প্রদীপে[১]। বৈকালে উঠে তিনুদের ওখানে চা খেলুম—তারপর—তিনুর সঙ্গে খয়রামারির মাঠে বেড়িয়ে আসি। এসে আমি বিভূতিদের আড়ৎ হয়ে চলে গেলুম মন্মথবাবুদের আড্ডায়।

---

১ অধ্যায় ষোল।

রোজ সন্ধ্যায় ফিরে এসে একটু লিখি। ওঘরে জাহ্নবীকে দেখে এসে তারপর একটু বিশ্রাম করি—জ্যোৎস্না খুব উঠেচে—কিন্তু মন নিরানন্দ হলে কি আর জ্যোৎস্না ভাল লাগে?

১৬ই নভেম্বর, ১৯৩৪। ৩০শে কার্ত্তিক, ১৩৪১। শুক্রবার

সকালে উঠে লিখি। আজকাল উঠি খুব ভোরে [—] খয়রামারির মাঠে যখন যাই তখন সূর্য্য ওঠে না। এসে একটু ডাক্তারখানায় বসলুম—তারপর বীরেশ্বর বাবুর বাড়ী গেলাম। সেখান থেকে এসে স্নান করে হিরণ্ময়ী episode লিখলুম 'দৃষ্টি প্রদীপে'র। বৈকালে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে তিনুর সঙ্গে খয়রামারি বেড়াতে গেলুম তখন জ্যেৎস্না উঠেচে। রাত্রে মন্মথবাবুর আড্ডা থেকে ফিরলুম।

১৭ই নভেম্বর, ১৯৩৪। ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। শনিবার

বেশ শীত পড়েচে। সকালে উঠে খয়রামারি বেড়িয়ে এসে লিখি। তারপর বাজার করে দিয়ে বিভূতির আড়তে বসে খানিকটা গল্প করি। এসে স্নান করি। একটু বিশ্রাম করে— আবার উঠে লিখি। বৈকালের দিকে আমি আর তিনু রোজ রোজ খয়রামারি বেড়াতে যাই। কোনদিন চাঁদ ওঠে। কোনদিন সন্ধ্যা হয়-হয়।

বারাকপুরের দিনগুলো এখন যেন স্বপ্নের মত মনে পড়চে। বড় আনন্দে কাটিয়েছিলুম এবার ও কটা দিন। অত অব্যবস্থা, থাকার কষ্ট, খাওয়ার কষ্টের মধ্যেও সুখ ছিল অপূর্ব্ব। সে কেবল প্রকৃতির মুক্ত উদারতার জন্যে ও খুকুর জন্যে।

রাত্রে প্রথমে মন্মথ বাবুর আড্ডায় [—] পরে বীরেশ্বর বাবুর আড্ডায় বসে গল্প করি।

১৮ই নভেম্বর, ১৯৩৪। ২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। রবিবার

সকালে খয়রামারি বেড়িয়ে এসে লিখতে বসি Ivanhoeর অনুবাদ। তারপর বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাই? ও ডাক্তার সঙ্গে বিরজার বাড়ী যাই। স্নান করে এসে লিখি ও আহারের পরে বিশ্রাম করে স্কুলে U. P. Teacher's Conferenceএ যাই। খুকী মেয়েটি বলে সে মনে কষ্ট করচে। বিকালে খয়রামারি যাওয়া হয়নি। রাত্রে মন্মথবাবুর আড্ডায় গিয়ে ভাগলপুরের গল্প, স্কুলে গাঙ্গুলীর গল্প করি।

১৯শে নভেম্বর, ১৯৩৪। ৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। সোমবার

খয়রামারির মাঠে সকালে গেলুম বেড়াতে। তারপর এসে লিখি। লিখে

সকাল সকাল গেলুম বাজারে। বাজার থেকে এসে খাওয়া দাওয়া সেরে গাড়ী করে বারাকপুরে। খুকু চুল শুকুচ্ছিল। আমায় দেখে ছাদে গেল। তারপর ডাকাডাকি করতে এল। আর কাছ ছাড়ে না। তবুও তো ঘরেই খুড়ো-খুড়ীমা সবাই দাঁড়িয়ে। ও আমায় বল্লে—ঘরের মধ্যে আসুন—ও আর পাঁচী যুদ্ধ করবে—দেখতে হবে। তারপর সমস্তক্ষণই দাঁড়িয়ে রইল। কল্কেতে আগুন নিয়ে এসে দিলে। যা কখনো করে না। তারপর বল্লে—আজ থাকুন। আমি বল্লুম—গোপালনগরে প্রাইজে যাবো। বল্লে—সেখান থেকে আসুন। আমি বল্লুম—তা হয় না। এ রকম কোন দিন বলে না। তারপর ওর লেখা গল্পটা নিয়ে এসে পড়লে। তারপর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে গল্প করলে। পাঁচী বল্লে—ছাদ থেকে আস্তে আস্তে আপনাকে দেখ্‌ছিল। আমি চলে এলুম। গোপালনগরে স্কুলে গেলুম—ইন্‌স্পেক্টর আমোদ ও S. D. O. এক টেবিলে বসে খেলুম। তারপর আমি, যতীন, মন্মথ, হরিপদ এক গাড়ীতে চলে আসি। এসে মন্মথবাবুর ওখানে আড্ডা। আজ যুটু এলে ভরসা পেয়েচি। রাত্রে সল্‌তে নেই আলোতে। গেলাম বাজারে।

২০শে নভেম্বর, ১৯৩৪। ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। মঙ্গলবার

সকালে উঠে বাজার করে দিলাম—বীরেশ্বরবাবুর বাড়ী বই দিয়ে এসে রোগীকে Glucose খাওয়ালাম। বাজার করে বন্ধুর ওখানে বসে গল্প করি।

রোজ সন্ধ্যায় তিনু ও আমি যাই খয়রামারি। আজ আর গেলুম না। মন্মথবাবুদের আড্ডায় গিয়ে গল্প করি। কাল যুটু এসেচে—আজ সে এবেলা বারাকপুর গেল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমি জাহ্নবীর কাছে বসেছিলুম। জাহ্নবীর জন্যে মন বড় খারাপ।

২১শে নভেম্বর, ১৯৩৪। ৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। বুধবার

আজ সকালে উঠে খয়ামারি বেড়িয়ে এসে লিখ্‌তে বসি। তারপর বিকেল থাকতে আমি ইন্সপেক্টরবাবু সব বসে গল্প করি। খেয়ে উঠে হেঁটে বারাকপুরে গেলুম—অনেকদিন পরে হেঁটে গেলাম। কতটুকু পথ! এর জন্য এত? গিয়ে হেলা কাঁটাল গাছটার তলায় বসি। একটু পরে ফণিকাকার মেয়েটা মারা গেল। তারপর মামার বাড়ী পাঠশালায় গিয়ে বসি। পুঁটীদিদিদের বাড়ীতে তারপর যাই। খুকু এল। আমি মাদুর পেতে বাইরে বসলুম। খুকু আমার কাছ ছাড়ে না। একবার বল্লুম কুঠীর মাঠে বেড়িয়ে আসি—খুকু যেতে দেয় না। বল্লে

—বসুন। গল্প করি। সন্ধ্যার সময় চা খেলুম। শম্ভু মাংস দিয়ে গেল। খুকু এল অঙ্ক কস্‌তে। অপূর্ব্ব হেমন্ত জ্যোৎস্না—পূর্ণিমার রাত। কত রাত পর্য্যন্ত খুকু আর আমি বাইরে বসে—এত আনন্দ পেলাম! জ্যোৎস্না রাত্রে ও আমি আর জগ বসে গল্প করচি বাইরে—তারপর ঘরে গিয়ে গল্প করলুম। কত রাত্রে ও যাচ্চে—আমি বল্লুম—শোন্। ও আবার ফিরল।

২২শে নভেম্বর, ১৯৩৪। ৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

পরদিন সকালেই আমি নদীর ঘাটে গেলুম। একটু পরে খুকু এল কি একটা বই হাতে। বল্লে 'প্রলয়ের আলো' বইখানা আন্‌বেন। আমি হেঁটে বনগাঁয়ে এলুম। খয়রামারির মাঠের একটা নিভৃত ঝোপের মধ্যে স্নানের আগে বেরিয়ে এলুম। স্নান করে এসে বীরেশ্বরবাবুর বাড়ী থেকে বই নিয়ে এলুম। তারপর খেয়ে গাড়ীতে এসে স্টেশনে এসে দেখি গঙ্গাহরি ও বারাকপুরের নলিনীদিদির ছেলে। তারা ৪টার ট্রেনে বারাকপুর গেল। আমি ভাব্‌তে লাগলুম আহা, যদি ওদের সঙ্গে চারটার গাড়ীতে এই হেমন্ত অপরাহ্নে [অপরাহ্ণে] বারাকপুর যেতে পারতুম। কলকাতায় এসেই বন্ধুদের বাসায় গেলুম। বন্ধুর বৌ প্রণাম করলে। টকুর সঙ্গে বসে গল্প করি। ওখান থেকে জগৎবাবুদের বাড়ী। চা খেলুম। গল্প গুজব হোল। মনে ভাবছিলুম এখনও নটার মেলে গেলে আজ এই জ্যোৎস্না রাত্রেই পুঁটীদিদিদের বাইরে শোয়া যায়।

২৩শে নভেম্বর, ১৯৩৪। ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। শুক্রবার

আজ সকালে G. C. College Mess থেকে একটা নিমন্ত্রণপত্র এসেছে। স্কুলে গেলুম—কোলা প্রথম তো আসে না—শেষ কালে এল। বড় ভাল ছেলে—পুরোনো দিনের মত মিশ্‌লো। স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী। সজনী পায়ের ধূলো নিয়ে প্রণাম করলে। এখানে গালুডি ভ্রমণ বৃত্তান্ত বল্লুম। তারপর নীরদবাবুর আড্ডাতে; প্রমোদবাবু আজ এসেচেন ফটো নিয়ে। অনেকক্ষণ আড্ডা হোল। ট্রামে বাসায় ফিরলুম। অনেকদিন পরে কল্‌কাতা ভাল লাগ্‌চে কিন্তু জাহ্নবীর জন্যে মন খারাপ। এসেই সুপ্রভার পত্র পেলুম। প্রমোদবাবুর আসার কথা আছে তাঁর জুতো নিতে। রাখামাইন্‌সে জুতো বদ্‌লে গিয়েছিল। এখানে ধোঁয়া—জ্যোৎস্না বোঝা যায় না।

২৪শে নভেম্বর, ১৯৩৪। ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। শনিবার

সকালে লিখে স্কুল। ছোট ঘরে কোলাদের ক্লাস উঠে গেল—আমার পক্ষে ভাল। তারপর সকালে ছুটী হলে Imperial Library তে Nature

Mysticism সম্বন্ধে বই পড়লুম। নীরদবাবুদের বাড়ী গিয়ে সন্ধ্যা সাতটা পর্য্যন্ত জমিয়ে আড্ডা—সেখান থেকে ট্রামে P. C. Sircerদের দোকানে। তারপর বাসা।

সব সময়ই গত পূজার ছুটীর অদ্ভুত দিনগুলোর কথা ভাবি—সেই বারাকপুরে রামপদদের রোয়াকে সেদিন বিকেলে মাদুর পেতে বসেচি—খুকু এসেচে—পাঁচী এসেচে গল্প করচি—সেই ছবিটা মনে পড়চে কেবল।

২৫শে নভেম্বর, ১৯৩৪। ৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। রবিবার

সকালে নূর মহম্মদ সেনের লেনে এক মিটিংএ কানাই যেতে বলেছিল—পথে হরিনাভি স্কুলের পুরোনো ছাত্র শম্ভুর সঙ্গে দেখা। কানাইএর দোকানে চা খেয়ে পার্ক সার্কাসে মণি বোসের বাড়ীতে গেলুম। বেলা একটার সময় সেখান থেকে এলুম। এসেই Sunday's Debating Club এর এক নিমন্ত্রণ পত্র পেলাম। একটু লিখে উঠে বিকেলে সেখানে গেলুম। শৈলেন লাহা, নলিনী সরকার অনেকেই ছিল এখানে। বার হয়ে এসে রমেশ সেনের আড্ডায়। আজ বড্ড ধোঁয়া—এই দেড়মাস মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে কাটিয়ে মহা আনন্দ, এই ধোঁয়া ও বদ্ধতা কি বিশ্রী যে লাগচে—কেবলই মনে হচ্চে কি জানি কুঠীর মাঠের পথের জঙ্গলে সেই হল্‌দে হল্‌দে বড় বড় পাতা থাকে—পথ চল্‌তি লোকটা বলেছিল "হাড় নাম্বার লতা"। আর মনে পড়চে আটির সাম্‌নের মাঠে সেই গাছপালার outline, নীলঝর্ণা, বনতুলসীর জঙ্গল পাহাড়ের ওপরে, সূর্য্যাস্তে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি, পাটকিটার জঙ্গল। খুকু, বাড়ীর পিছনের বাঁশবন, ইছামতী ও চালতেপোতার বাঁকে কুচো কুচো ফুল।

২৬শে নভেম্বর, ১৯৩৪। ১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। সোমবার

সকালে লিখি—তারপর স্কুল। সেখান থেকে বঙ্গশ্রীতে গিয়ে প্রমথ, প্রেমেন, তারাশঙ্কর সকলের সঙ্গে ঘোর আড্ডা। ওখান থেকে বই কিনে নিয়ে সুপার কাকার বাসায় এসে কালোর চাকুরী সম্বন্ধে আলোচনা। আমার কেমন একটু কষ্ট হচ্চিল খুকুর কথা ভেবে—এইখানেই তো সে একদিন ছিল। ট্রামে বাসায়।

২৭শে নভেম্বর, ১৯৩৪। ১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। মঙ্গলবার

স্কুল থেকে ট্রামে প্রবাসী আফিসে। সেখান থেকে বই ও ফাইল নিয়ে ব্রজেনদার সঙ্গে গল্প করতে করতে সাহিত্য পরিষদ পর্য্যন্ত। আমি ও বিভু এলুম নীরদের বাসায়। কেউ নেই। অনেকরাত পর্য্যন্ত বসেই রইলুম—চা খেলাম। ট্রামে ফিরলাম। মির্জাপুর ষ্ট্রীটে পরিমলের সঙ্গে দেখা—বল্লে, মোহিতবাবু

আপনার সম্বন্ধে শনিবারের চিঠিতে লিখেছেন। তাকে বাসে তুলে দিয়ে এলাম। ... বরে মীরাকে নিয়ে পশুপতিবাবু এসেছিলেন যে। তা কি আর করবো। নীরদের বাড়ী বসে আজ্বদে সা আবদালির দিল্লী ও মথুরা বৃন্দাবনের লুঠের কাহিনী পড়ছিলুম। হজরত বেগমের কথা—বৈরাগীদের গরুর মুণ্ড মুখে দিয়ে মারার কথা। কলেরা এপিডেমিকের কথা—পলাতক নরনারীদের কথা কি ভয়ানক! ১৭৫৪ সালের মার্চ্চ।

২৮শে নভেম্বর, ১৯৩৪। ১২ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। বুধবার

স্কুল থেকে নিখিলদার গাড়ীতে আমি ও পরিমল নানা স্থানে বেড়িয়ে বলাই বাবুর শ্বশুরবাড়ী কালীঘাটে ও সেখান থেকে আমি যাই চারুবাবুর বাসায় চৌরঙ্গীতে। নীরদের বৌদিদি অনেক ফটো দেখালেন—চারুবাবুও ছিলেন। মেদাশাল পাহাড়ে আরোহণ সম্বন্ধে গল্প শোনা গেল। ভিক্টোরিয়া দত্ত সেখানেও উঠেচেন দেখলুম। ওখানে চা ও খাবার খেয়ে বাসে শ্যামবাজারে নীরদের বাসায়। নীরদের স্ত্রীর শরীর কিছু খারাপ [।] নটা পর্যন্ত গল্প করে ফিরি। রাত্রে হরিনাভির ছাত্র শৈলেন ঘোষ এল।

২৯শে নভেম্বর, ১৯৩৪। ১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

সকালে খুব তাড়াতাড়ি লেখা সেরে—যোগেশ বাগলকে 'দৃষ্টিপ্রদীপে'র কপি দিয়ে এলুম। স্কুলে কাল কোলার সঙ্গে মনান্তর হয়েছিল—সেটা মিটে গেল। তারপর বঙ্গশ্রীতে গিয়ে একটু আড্ডার পরে U. N. Dhar এর দোকানে গেলুম মধুচক্রের ফলানো গল্পের জন্যে। সেখানে চা খেলুম। পথে পুরানো বাজার দেখে ফিরচি পথে কানাইয়ের সঙ্গে দেখা। তাকে নিয়ে সুকুমারের কাছে ঘড়ি আনতে গেলুম। দেখা পেলাম না। করুণার সঙ্গে পথে দেখা হ্যারিসন রোডে। রাত্রে এসে বিচিত্র জগৎ লিখি। জগৎদাসের লোক এসে আইভ্যান হোর অনুবাদ নিয়ে গেল।

৩০শে নভেম্বর, ১৯৩৪। ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। শুক্রবার

সকালে লিখতে বসেচি [—] আজ এল রাজ্যের লোক। আশু, গিরিনবাবু পাব্লিশার, কান্তি, সুরেন, কৃষ্ণধন পি. সি. সরকারের ছেলে—ছোট গল্পের বই দিয়ে গেল Standard Literature. স্কুলে ফোন [?] বল্লে to put young— বঙ্গশ্রীতে গেলাম—সুকুমারবাবু সেখানে। বার হয়ে বাসায় এলুম বিকেল বেলাই। এসে Wide World নিয়ে এসেছিলুম এপ্রিলমাসের তাই পড়লুম। রাত্রে করুণা একটা ছেলেকে নিয়ে এল।

১লা ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। শনিবার

সকালে পি. সি সরকারের ছেলে এল। স্কুল যেতে দেবব্রতের সঙ্গে দেখা ওর বাড়ীর সামনে। কোলা বল্লে আপনার সঙ্গে দেখা হোলেই আপনি (?) [—] বঙ্গশ্রী আফিসে না গিয়ে মেসে ফিরে আসি। বিকেলে নীরদ দাশগুপ্তের বাড়ী যাই। তাঁর মোটরে সোমনাথ বাবুর বাড়ী, সেখান থেকে—সুশীল বাবুর বাড়ীতে অনেকক্ষণ গল্প করি। রাত নটায় ট্রামে চলে এলুম।

২রা ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। রবিবার

সকালে মণি বোসের আড্ডা। সেখান থেকে এসে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত Great Short Stories পাঠ। মধ্যে দুপুরে এলেন পশুপতিবাবু। রাত্রে সৌরীন[১] নিয়ে গেল পার্ক সার্কাসে নিমন্ত্রণ ওর কাকার বাড়ীতে। খুব খাওয়ালে। কাকা বেশ লোক—গল্প গুজব হোল।

৩রা ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। সোমবার

সকালে Great Short Stories পড়লুম। ওতেই মসগুল হয়ে আছি ক'দিন। স্কুলে পরীক্ষা সুরু হোল আজ থেকে। দেড়টা পর্য্যন্ত ক্লাসে গার্ড দিয়ে ছুটী। নীরদের জন্তে বঙ্গশ্রীতে গিয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলুম—দেখা পাওয়া গেল না। আমি খুব হেঁটে চৌরঙ্গী পর্য্যন্ত বেড়িয়ে এলুম। পথে পরেশ খুড়োর সঙ্গে দেখা। বল্লে—সামনে বুধবার ছুটি নিয়ে বাড়ী যাবে। বল্লে—রাত্রে খুব তাস খেলবো। বারাকপুর কেউ যাচ্চে একথা শুনলেই যেন মনটা খারাপ হয়ে যায়। আগেও যেত—চিরকালই যায়। কিন্তু এখনকার সঙ্গে ও পুরাতনের সঙ্গে খানিকটা পার্থক্য আছে।

সন্ধ্যার সময় মেসে এসেই Short Stories পড়তে শুরু করলুম।

৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। মঙ্গলবার

স্কুলে গেলুম বেলা দেড়টার পরে। রঞ্জনদের ঘরে গার্ড দিলাম। সেখান থেকে বঙ্গশ্রী। সুনীতিবাবুর সঙ্গে দেখা বহুদিন পরে। ট্রামে জগৎতারণ দাস—ও গিরিনবাবুর দোকান। ট্রামে College Squr—ও বাসা। সেখান থেকে এসে দেখি নুটু এসেচে। জাহ্নবী ভাল আছে শুনে আনন্দ পাওয়া গেল।

৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। বুধবার

সকালে স্কুলে গেলুম। সেখান থেকে বেরিয়ে বঙ্গশ্রীতে অরবিন্দ দত্তের[২]

১ ? সৌরেন্দ্র সেন, সেনোলা স্টুডিওর পরিচালক।

২ শিল্পী। Statesman-এর কমার্শিয়াল আর্টিস্ট ছিলেন

কাছে তার বিধবা পিসির গল্প শুনি। চা খেয়ে বেরুলাম—হাঁটতে হাঁটতে ইডেন গার্ডেন—সেখানে একস্থানে গায়ের আলোয়ান পেতে Short Stories পড়লুম। বড় বড় ভিক্টোরিয়া রিজিয়া[1] ফুটে থাকে খালের জলে। বেশ লাগছিল। তারপর হেঁটে বাড়ী ফিরবার পথে ডালহাউসি স্কোয়ারে একখানা বেঞ্চের ওপর বসে ১৬।১৭ বছর আগেকার কথা অদ্ভুতভাবে মনে এল—এই সন্ধ্যায় বাঁশবনের নীচে ছোট্ট একটা রান্নাঘরে তারা রাঁধ্‌চে—কিংবা হয়তো খাওয়া শেষ হয়ে গেছে [—] এবার ওদের বাড়ী যাবে। গৌরীর কথা—খুকুর কথা মনে এল। অনেকক্ষণ পরে উঠলাম। কেবল বঙ্গশ্রীর আড্ডা না দিয়ে আজ বেশ নতুন হোল।

৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

সকালে 'প্রবন্ধ ও গল্প' রচয়িতা একটা ছেলে এল। বেলা দেড়টার সময়ে পোস্টাপিস্‌ হয়ে স্কুল। স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী। বঙ্গশ্রী হয়ে Camp Stool কিন্‌তে নিউমার্কেট ও চাঁদনী। ফিরবার পথে শেষে বৌবাজার থেকে আমার সেদিনের দেখা সেই Camp Stool টা কিন্‌লুম ও নিয়ে এলাম। আজ সকালে Richard Dehan এর 'A Nursery Tea'[2] বলে একটা সুন্দর গল্প পড়েছি।

আমি দেখি আগে আগে যখন বয়স আরও কম ছিল, তখন মাঝে মাঝে যে নিরানন্দ ও অবসাদের ভাব আসতো মনে—তা এখন একেবারেই নেই। বিশেষ কিছু ঘটে না—তবুও তো যথেষ্ট আনন্দে আছি।

৭ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। শুক্রবার

স্কুলে গিয়ে রাম খাবার আনালে—খেয়ে হেড্‌ মাস্টারের সঙ্গে গল্প করি। তারপর বার হয়ে ফোর্টের পলাশী গেটের কাছে ময়দানে চাদর পেতে শুয়ে বই পড়চি—এল বৃষ্টি। একটা অশথ গাছের তলায় দাঁড়াই। বৃষ্টি থাম্‌লে একটা সাঁকোর ওপর বসে 'Rosanna'[3] গল্পটা পড়লুম—Short Story বই থেকে[—] ওতেই এই কদিন মসগুল হয়ে আছি—কি না। তারপর পার্ক স্ট্রীট, ওয়েল্‌সলি দিয়ে বঙ্গশ্রী আপিস—সেখান থেকে পরিমল, বৈজ্ঞানিক গোপালবাবুর[4] সঙ্গে—

১ Victoria regia Lindl./Victoria amazonica Sow.। আদি জন্মস্থান আমাজন।

২ 'Nursery Tea', Earth to Earth (গল্প-সংকলন)।

৩ লেখিকা Maria Edgeworth।

৪ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য।

হেঁটে বাসা।

আজ আমার 'যাত্রাবদল' বেরুল। সকালে পি সি সরকারের ছেলে এক কপি দিয়ে গেল। আজ একটা রামপুরী পান্ কিন্‌লুম।

৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। শনিবার

সকালে আশু এল—পি সি সরকারের ছেলে 'যাত্রাবদল' দিয়ে গেল। কাল বার হয়েচে। কোলার সঙ্গে অনেক গল্প হোল—স্কুলে। প্রায় তিন ঘণ্টা ছিল। মণীন্দ্র বসুও এসেছিল আমার বাসায়। স্কুলে কোলাদের Oral English। কোলা নম্বর টুক্‌তে লাগ্‌ল। কোথায় সে বলে—at the back। বার হয়ে বঙ্গশ্রী হয়ে নীরদবাবুর বাড়ীতে দুটো গল্প পড়লুম। Procurator of Judea[১] ও Nursery Tea—সেখানে জালু এল—অনেকদিন পরে—আমার গল্প শুনলে। তারপর পি সি সরকার দোকান থেকে বই নিয়ে আবার নীরদবাবুর বাড়ীতে এসে মোটরে শ্যামাপ্রসাদবাবুর—বাড়ীতে গেলুম। উমাপ্রসাদের বৈঠকখানায় উমাপ্রসাদের সঙ্গে গল্প গুজব করি।

৯ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। রবিবার

সকালে মণি বোসের বাড়ী। ফিরে এসে আর কোথাও বেরুইনি। Short Story বইগুলো পড়লুম। তারপর বার হয়ে কানাইদের সঙ্গে রামকমল সেনের লেনে গেলুম—দেখা হোল না ক্ষিতীশ সেনের সঙ্গে। চলে আসচি তখন দেখা হোল। আমি একটু বেড়িয়ে চলে আসবার পথে একবার ভাবলুম বিভূতিদের বাড়ী যাবো? টকুদের বাড়ী যাবো? কিন্তু রাত ৮টা হয়ে গেছে। শীতের রাত ৮টা। বাবার কথা আজ হঠাৎ মনে এল—বিধু বাবুর বাসায়[২] বাবা এলেন—আমি এক গ্লাস জল দিলাম—সেই কথা। বাবাকে কতকাল দেখিনি! কোলার সম্বন্ধে অন্য মনই হয়ে গেল এই পিতৃমনস্তত্ব এসে। রিপনের সেই ছেলেটি এসে অনেকরাত পর্য্যন্ত গল্প শোনালে।

১০ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। সোমবার

প্রজ্ঞাব্রতের বাবা এসেছিল তার ছেলের নম্বর কম হয়েচে বলে। তাকে পত্র লিখে আবার দেখা করতে বলা হোল। আমি স্কুল থেকে বেরিয়েচি; কোলার সঙ্গে দেখা হোল। ওকে নিয়ে একটা চায়ের দোকান [—] চা খাইয়ে দিলাম।

---

১ Anatole France-এর গল্প।

২ বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়; ইনি এককালে বনগাঁর সরকারী ডাক্তার ছিলেন। বিভূতিভূষণ এঁর বাড়ির ছেলেমেয়েদের পড়াতেন।

তারপর ইডেন গার্ডেন দিয়ে হেঁটে পুরোনো আমলের ক্লাইভ ষ্ট্রীট্ দিয়ে ১১ বছর আগেকার ইউনাইটেড্ ট্রেডিং বিল্ডিংতে আবার উঠলুম। শেষে কবে উঠেছিলুম মনে নেই। নিশ্চয়ই বিভূতিদের বাড়ী ঢোকবার আগেই। প্রজ্ঞাব্রতের বাবার এই কথাটা মনকে খিচ্‌ড়ে দিয়েচে। তারপর চাঁদ বুক ডিপোতে চা খাওয়ালে— বিভূতিদের বাড়ী গিয়ে ভাগলপুরের নেবাজি সর্দ্দারের কাছে টাকার জন্তে চিঠি লেখা গেল। দুটো ভালো কাজ করেচি আজ। তিনটা কুলীকে পয়সা দেওয়া, কোলাকে খাওয়ানো। নেবাজি সর্দ্দারের টাকার তাগিদ। বটু [,] রাখী ও ছোট খুকী প্রণাম করলে।[১] ওখান থেকে বার হয়ে রমেশ সেনের আড্ডায় ও সেখান থেকে P. C. Sircar এর দোকানে বই নিয়ে এবং সুপ্রভাকে বই পাঠিয়ে দেবার কথা বলে বাসায় এসে লিখ্‌চি। হাঁ এই একটা ভাল কাজ সুপ্রভাকে বই পাঠানোর কথা বলা। দিনটা ভাল। কিন্তু মনটা খারাপ প্রজ্ঞাব্রতের নম্বর কম পাওয়ার কথায়।

১১ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। মঙ্গলবার

সকালে আজ আইভ্যান্‌হো শেষ করলুম অনুবাদ। জসিমুদ্দিন, সুরেন ধর, গিরিনবাবু এল। দুপুরে কোলা এল College Square এ। কি একটা ছড়া বলে—father, uncle, cousin, king—ইত্যাদি। ফিরে স্কুল গিয়ে গার্ড দিলুম ৫॥০ টা পর্য্যন্ত। বার হয়ে বঙ্গশ্রী হয়ে ট্রামে কাত্যায়নী বুক স্টল হয়ে জগৎদাসের ওখানে শেষ কপি দিয়ে এলুম আইভ্যান্‌হোর।

হেঁটে বাড়ী এলাম। শীত পড়েচে বেশী। কাল দরবারডের[২] ছুটী। ভাব্‌চি কি করবো কাল। কোথাও বেড়াতে যাবো? বুকস্টলে ৫ খানা যাত্রাবদল দিলাম।

১২ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। বুধবার

দরবার ডের ছুটী। দুপুরে এলেন সোমনাথবাবু, তাঁরই গাড়ীতে বসে গেলুম বেলুড় মঠে বহুকাল পরে। ১৯১৬ সালে গিয়ে আর এই ১৯৩৪ – ১৮ বছর পরে। পথে একখানা বই দিলুম সোমনাথবাবুকে—গঙ্গার ধারে বিবেকানন্দের মন্দিরে বসে বিলেতের গল্প হোল। সেখানে আবার রিপন কলেজের সেই আশুর সঙ্গে দেখা। প্রণাম করলে। ওখান থেকে পুরোনো বিবেকানন্দের ঘর ও লাইব্রেরী

১ সম্ভবতঃ পাথুরিয়াঘাটার ঘোষেদের বাড়ির ছেলেমেয়ে।

২ ১৯১১ সনের ১২ই ডিসেম্বর দিল্লিতে পঞ্চম জর্জের অভিষেক উপলক্ষে এই দরবার ডে হয়।

দেখে এসে প্রসাদ নিলুম। তারপর মোটরে ফিরবার পথে হাওড়ার ষ্টেশনের রেষ্টোরেণ্টে চা খেয়ে দুজনে এলাম College Street-এ। আমি অবিশ্যি নামলুম College Square-এ ও হেঁটে বাড়ী এলুম।

১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

সকালে অনেকদিন পরে দক্ষিণাবাবু এসেছিলেন। স্কুলে গিয়ে একগাদা খাতা দেখে গেলুম কার্জ্জনপার্কে। এক ঝাড় সুন্দর ফুল গাছের ধারে [—] গায়ের কাপড় পেতে Prosper Merimee এর Mateo Falcone[১] পড়লুম। একটা সুন্দর ছোট ছেলে বছর পাঁচেক বয়স—কেমন অনেকক্ষণ আলাপ করলে। তার চোখে চশমা [—] দেখতে পায় না ভাল। আমার হাতের আংটীটা নিয়ে নাড়া-চাড়া করলে। যাবার সময় বল্লে—Good by [bye]. তার মা আমেরিকান্—বাবা বাঙালী। তারপর হেঁটে চলে এলুম। ছেলেটাকে বড় ভাল লাগল।

১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। শুক্রবার

সকালে স্কুল থেকে কোলার সঙ্গে বাসায় এলাম। পথে…র সঙ্গে দেখা। কোলা একটা দোকানে জিলিপি খেলে। তাকে ট্রামে উঠিয়ে শেয়ালদহ এসে বরিশাল এক্সপ্রেস ধরে বনগাঁয়ে এলুম। কাল ছুটী নিয়েচি। চমৎকার জ্যোৎস্না। এমন জ্যোৎস্না কল্‌কাতাতে পাইনি। মন্মথবাবুর আড্ডাতে গিয়ে সোমনাথবাবুর বিলাত ও ইটালী ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা গেল। জাহ্নবী সেরে উঠেচে দেখে খুব আনন্দ হোল।

১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। শনিবার

সকালে উঠে মনে বড় আনন্দ হোল চারিপাশের প্রকৃতি দেখে। খয়রামারির মাঠে বেড়াতে গিয়ে এক জায়গায় ঝোপের মধ্যে জঙ্গলে গাছে ক্ষুদে ক্ষুদে নীল বর্ণের ফুল ফুটেচে—সেদিকে চেয়ে একটা অদ্ভুত আনন্দ হোল। দুপুরের পরে বিজয় ও আমি বারাকপুরে গেলুম। খুকু ওদের বাড়ী থেকে বালিশ বিছানা বয়ে নিয়ে আসবার সময় বল্লে—কি করবেন? আমি বল্লুম—আয়। ও বল্লে—ও মা! এখন কি করে যাবো? বলে একটা কি চমৎকার হাস্‌লে। তারপর এসে অনেকক্ষণ গল্প করলে। রাত্রে কালোদের বাড়ীতে কালো আমি খুকু খুড়ীমা তাস খেলা হোল। কালুকে নিতে এসে মানুর স্বামী কি রকম কেঁদেচে—তাই নিয়ে পাড়া গুলজার! অনেকরাত পর্য্যন্ত সেইসব গল্প হোল। মানু নিজের দুঃখের কথা বল্লে। রাত ১২টা পর্য্যন্ত খুড়ীমা আমি, খুকু কালো সেই গল্প।

---

১ 'Mateo Falcone', Mosaique (গল্প-সংকলন)।

১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। রবিবার

সকালে উঠে খুকুর সঙ্গে দেখা হয়নি। আমি ও বিজয় বনগাঁয়ে এলাম হেঁটে। এসে যতীন ডাক্তারের দোকান থেকে জামা সারিয়ে আনলুম। বাজার করে বিভূতির ওখানে খানিকটা গল্প করা গেল। খয়রামারির মাঠেতে কালকার সেই ফুলগাছটার কাছে বেড়িয়ে এলুম। তারপর একটু ঘুমুনো গেল দুপুরে। বিকালে কচা এল—দারোগার আসর বসে (?) চা খাবার যাচ্চে। আমি ও সরোজ খয়রামারিতে বেড়াতে গেলুম সন্ধ্যার সময়। কি অপূর্ব্ব রক্তাভ পশ্চিমাকাশ। আসবার সময়ে চাঁদ উঠেচে। মন্মথবাবুর আড্ডাতে গিয়ে রাসপুটিনের[১] গল্প হোল। সুন্দর পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার মধ্য দিয়ে ফিরলুম বাসায়।

১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ১লা পৌষ, ১৩৪১। সোমবার

সকালে এক্সপ্রেসে কল্‌কাতা এলুম। স্কুলে গিয়েই বেলা দুটোর সময় বেরুই। প্রথমে নীরদ দাশগুপ্তের বাড়ী—সেখানে এল ভাবলু [—] সে পুডিং করার কথা সেখানে। সেখান থেকে বন্ধুর বাসা ও নীরদ চৌধুরীর বাসায়। বাসে ফিরলুম।

১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ২রা পৌষ, ১৩৪১। মঙ্গলবার

সকালে এক্সপ্রেসে কানাই, গিরীনবাবু, রমাপ্রসন্ন এল। স্কুলে যাই দেড়টাতে। মনোমোহনবাবু বল্লে কোলা কি চিঠি এনেচে হেড্‌মাস্টারের কাছে। নীরদ চৌধুরী এল—তার সঙ্গে book company, পরে কাত্যায়নী বুক স্টল—ও জগৎ দাসের ওখানে।

১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ৩রা পৌষ, ১৩৪১। বুধবার

সকালে কেউ আসে নি। আমি নিখিলবাবুর বাসায় গেলুম। স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী—নীরদের সঙ্গে প্রবাসী। সকালে সকালে বাসায় ফিরি। এক ভদ্রলোক সিলেট্ থেকে দেখা করতে এল। সুপ্রভা সম্বন্ধে নীরদ বল্লে আজ বিকেল বেলা।

২০শে ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ৪ঠা পৌষ, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

যাওয়ার কথা ছিল নিখিলদার গাড়ীতে বনগাঁয়ে। ফিরে এলুম তার বাড়ী থেকে—খাওয়া হোল না। স্কুলে গেলুম—সজনী আজই চাকরী ছেড়েচে[২]। পি সি সরকারের দোকানে এসে টাকা কড়ি ও দৃষ্টিপ্রদীপের কথা নিয়ে কথা-

১ বিখ্যাত রুশ সাধু Grigori Yefimovich Rasputin।

২ বঙ্গশ্রীর চাকরি। আসলে এই চাকরি তিনি পাকাপোক্তভাবে ছাড়েন ১৯৩৫ সনে।

বার্ত্তা ও আলোচনা হোল।

এসে মনে হোল ভগবান আমায় টাকাকড়ির চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত করুন—ও আমার ভাল লাগে না।

২১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ৫ই পৌষ, ১৩৪১। শুক্রবার

কোলার জন্যে আজ মনটা বড় দুঃখে। প্রথমে গেলুম বঙ্গশ্রীতে—সেখানে সজনী চাকুরী আবার নিয়েচে। আজ সকালে আশু এসেছিল, তার পত্র ও দৃষ্টি-প্রদীপের কপি যোগেশকে দিয়ে চা খেয়ে এলুম। বঙ্গশ্রী থেকে ট্রামে নিউ মার্কেটে Geo. Mag. ও Wide কিনে স্কুলে এসে খাতা দেখি। আবার বঙ্গশ্রীতে গিয়ে দেবীপ্রসন্ন [দেবীপ্রসাদ] রায় চৌধুরীর সঙ্গে Hotel Majestic'এ গিয়ে চা। তারপর হেঁটে বাসা।

রাত্রে Short Story পড়ে মসগুল হয়ে ছিলুম। Mrs Knollys[১] গল্পটা পড়ে সারারাত্রিটা স্বপ্ন দেখেছি ১৮ বছরের মেয়েটা [?] এর ধারে বসে আছে।

২২শে ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ৬ই পৌষ, ১৩৪১। শনিবার

সকালে পি. সি. সরকার, সুরেন ধর, কান্তি। দৃষ্টি প্রদীপের টাকাকড়ির কথা বলতে অনেক দেরী হোল। স্কুলে গেলুম সকালে সকালে। কোলার সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা। সে বল্লে –I shall forget everybody except you. তারপর টাকাকড়ি নিয়ে কোলার সঙ্গে বাসায় এলুম। কোলা অনেকক্ষণ রইল। একটা ছোট খাতা সে নেবেই···অনেক করে তার কাছ থেকে নিলুম। দুজনে স্টেশনে এলাম। বেজায় ভিড়—বনগাঁয়ে এসে স্টেশনে গোবরাপুরের অনাথের সঙ্গে দেখা। খয়রামারি গেলুম সন্ধ্যাবেলা। সেই সাদা সাদা কুচো ফুল দেখে মনের কালকার টাকাকড়ির আলোচনা দরুন নিরানন্দ ভাব কাটল। ক্লাবে গল্প। রাত্রে জ্যোৎস্না উঠ্‌ল। কোলার কথা কেবলই মনে হচ্চে।

২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ৭ই পৌষ, ১৩৪১। রবিবার

সকালে উঠে বাজার গেলাম ও বারাকপুরে আস্‌বার যোগাড় করি। বেলা একটার নৌকায় চেপে বারাকপুর রওনা হই। দুধারে অতি সুন্দর দৃশ্য। জল-পিপি[২] জলের ধারে খেলা করে বেড়াচ্চে। খয়রামারিতে যে ফুলটা দেখেছিলুম —ঐ ধুর ফুল[৩] নদীর দুধারে ফুটে আছে—মাঠের মধ্যে। সন্ধ্যার সময় বাড়ী

১ লেখক Frederic Jesup Stimson।

২ Bronze-winged Jacana/Metopidius indicus।

৩ Lavandula Stoechas Linn.।

পৌঁছে গেলুম। খুকু কোথায় বেড়াতে গিয়েছিল—সে এল—তাকে কোলার গল্প করা গেল। সন্ধ্যার পরে আবার এল—অন্ধ কসাই—তারপর সে আবার তাড়াতাড়ি রাগ করে চলে গেল গল্প না শুনে। রাত্রে খুব শীত করল।

২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ৮ই পৌষ, ১৩৪১। সোমবার

সকালে নদীতে হাত মুখ ধুয়ে এসে লিখতে বসি। একটু পরে রোদ উঠল—খুকু এসে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রইল। বেলা ১১॥০ টার সময় গেলুম নাইতে। কুঠীর মাঠের কি শোভা হয়েচে—তা অবর্ণনীয়। ধুর ফুল ফুটেচে সর্ব্বত্র। যেদিকে চাই সেদিকেই নীলাভ সাদা ধুর ফুল। স্নান করে এসে রৌদ্রে বসলুম। বেলা যাওয়া পর্য্যন্ত বসে গল্প। সইমা, নদি, খুড়ীমার কাছে পরলোকতত্ত্ব বললাম। তারপর কুঠীর মাঠে বেড়াতে গেলাম। সে যে কি শীতের অপরাহ্নের রাঙা রোদ মাখানো গাছ, ঝোপ, ঘাসের মাঠ—কি চারিদিকে ফুটন্ত ধুর ফুলের শোভা—সর্ব্বত্র ধুর ফুল, যেদিকে চাই সেদিকে। সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে গেলুম—আরও লোকে বলে বাংলা ফুলের দেশ নয়। ক্রোকাস্[1], মার্গারেট[2] হয়তো ফোটে না, কিন্তু এখানকার ফুলের সম্পদ কি কম? অনেক রাত পর্য্যন্ত খুকু রইল—গান করলে যেতে আর চায় না। জ্যোৎস্না উঠলে গেল [—] আবার এল। বল্লুম, এখানে এসে দাঁড়া। জ্যোৎস্নার মধ্যে দাঁড়াল।··· ? গল্প হোল।

২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ৯ই পৌষ, ১৩৪১। মঙ্গলবার

এখানে বড়দিনকে আমরা গ্রাহ্য করি? দিব্যি গিয়ে সকালে নেয়ে এলুম খুকুর সঙ্গে—সাঁতার দিয়ে ওপাড়ার ঘাটে গেলুম। দুপুরের পরে খুকু—একখানা বই পড়ে শোনাতে লাগ্‌ল। তারপরে টুলখানা নিয়ে আমি কুঠীর মাঠের তিন জায়গায় গিয়ে টুল পাতলাম—ফুটন্ত ধুর ফুলের বনের পাশে, নিভৃত বনঝোপের ধারে। পাখীর কল কাকলীর মধ্যে, সুন্দর রাঙা রোদ-পড়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেখানে বসে মনে যে কত কি অদ্ভুত আনন্দের ভাব জাগল—কতকাল আগে ছেলেবেলায় এই বড়দিনের সময়ে মুচিপাড়ায় যেতুম রস জ্বাল দেওয়া দেখতে —কলাইমুগের ক্ষেতে ক্ষেতে ঘুরে বেড়াতুম সে কথা মনে পড়ে গেল। এখনও লোক আছে—যারা কলাই মুগ ঝাড়া নিয়ে ওই পৌষ মাসে মহাব্যস্ত। এই জীবনও আমি একদিন যাপন করেচি। তাই দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর সঙ্গে হোটেল ম্যাজেষ্টিকে যদিও সেদিনকার কথা ভেবে হাসি পায়। ওরা

১ **Crocus sp.** । সংস্কৃতে কেশর।

২ **Crysenthemum frutescens Linn.** ।

আবার আর্টিস্ট, এখানে smoke nuisance একটা problemই নয়। রাত্রে খুকু গাইলে। ওদের গল্প করলুম।

২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ১০ই পৌষ, ১৩৪১। বুধবার

সকালে উঠে মাঠে বেড়িয়ে এলুম। এসে লিখতে বসি। একবার উঠে হরিপদদাদের বাড়ী গেলুম মাংস নিতে। ফণি কাকা ইত্যাদি সেখানে এসেচে। স্নান করে আসবার আগে ধুরফুল ফোটা মাঠে গেলুম—মাঠ বেড়িয়ে ওপারের ঘাটে সাঁতার দিয়ে এলুম। খাওয়ার পরে খুকু এসে বসল, বেলা গেল সে আর আমাকে উঠতে দেয় না—কুঠীর মাঠে যেতে দেয় না—বলে, বসে আমাদের খেলা দেখুন। অনেক বেলা গেলে জোর পায়ে হেঁটে বেলেডাঙার দোকানে গেলুম ও খানিকটা বসে গল্প করে অপরূপ সন্ধ্যায় ফিরে আসি। রাত্রে খুকু এল —আমাকে বল্লে—কড়াইয়ের ডাল দুধ দিয়ে খাবেন? দিয়ে গেল এ ঘরে। অনেকক্ষণ অঙ্ক কস্‌লে। সকাল সকাল চলে গেল [—] বল্লে আজ আর গল্প শুন্‌বো না। ও যেন একটা প্রহেলিকার মত।

২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ১১ই পৌষ, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

সকালে খুব ভোরে কুটীর মাঠে গিয়েছিলুম। তারপর এসে বসে লিখলুম স্নুসার কাকা এসে গল্প করলেন। স্নানের পূর্ব্বে কুটীর মাঠে গিয়ে ধুর ফুল ফোটা একটা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যভূমি আবিষ্কার করলুম। স্নান করে এলুম কিন্তু সাঁতার দিলাম না। খাওয়ার পরে রৌদ্রে পিঠ দিয়ে লিখচি—তারপরেই খুকু এসে sentence লিখতে বসল। হাটে গেলুম। হাট থেকে এসে সন্ধ্যার সময় কুঠীর মাঠে গেলাম। আমাদের ঘাটের ঠাণ্ডা জলে হাত মুখ ধুয়ে সন্ধ্যায় ওঠা Orion এর দিকে নির্জ্জন নদীতীরে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। রাত্রে খুকুদের অঙ্ক কসিয়ে তারপর ? গল্প করলুম। টুনি দৌড়ে গিয়ে বাড়ী থেকে টিকে নিয়ে এল। আজ শীত কম।

২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ১২ই পৌষ, ১৩৪১। শুক্রবার

সকালে উঠে লিখলাম। খুব ভোরে উঠে মাঠে বেড়াতে গিয়েছিলুম—টক্‌টকে লাল্ সূর্য্য উঠেচে নদীর ওপার থেকে। ঘি কিনলাম বনগাঁয়ের একটা লোকের কাছ থেকে। স্নানের পূর্ব্বে খানিকটা মাঠে বেড়িয়ে এলুম—সেই ফুল ফোটা মাঠে। বাঁশতলার ঘাট পর্য্যন্ত সাঁতার দিয়ে এলাম—বাঁশতলার ঘাটের ছায়া ভরা পথ দিয়ে আসতে ভারী ভাল লাগছিল। খুকু এসে দুপুরে কতক্ষণ বসে রইল। তারপরে টুনি, বাতু (?) জগো এদের সঙ্গে কুঠীর মাঠে

১৯৪১

১লা জানুয়ারি, ১৯৪১। ১৭ই পৌষ, ১৩৪৭। বুধবার

সকালে খুকুর বাড়ী গিয়ে প্রায় ১১॥০টা পর্য্যন্ত কাটলো। খুকু বল্লে—মা বিভূতিদাকে খেতে দাও না? তিনি পাঁপর ভেজে নিয়ে এলেন। তারপর বাড়ী আসতে কল্যাণী[1] স্নান করিয়ে দিলে। দুপুরের পর বার হয়ে বেড়িয়ে এলুম, বিভূতি ওর ভ্রমণের প্রবন্ধ শোনালে। ১৯৩৯ সালের এই দিনটি আর আজকের দিনে কত তফাত তাই ভাবি। জীবনের কি বিচিত্র গতি!

সন্ধ্যায় মায়াদিদি[2], কল্যাণী ও আমি খুকুদের বাড়ী গেলুম। খুকু, কল্যাণী মায়াদিদি গান গাইলে, গল্প ও চা খাওয় [খাওয়া] হোল। রাতে কল্যাণী কেবল গান করে আর আমার কথায় নকল করে—ঘুমুতে দেয় না। একটা বাঙলা গান গায়, 'মচছ বাজার ভার' বেশ লাগে ওর মুখে।

২রা জানুয়ারি, ১৯৩৪। ১৮ই পৌষ. ১৩৪৭। বৃহস্পতিবার

সকালে লোকাল ট্রেনে কলকাতা। স্কুল থেকে সজনী দাস ও পশুপতিবাবুর বাড়ী। জ্যোৎস্না এসে ওর ছবি দেখালে। অনেকক্ষণ গল্প-গুজব করলে। ওখান থেকে বাসে বারবেলাতে[3] এলুম। অনেক নতুন বিষয়ে আলোচনা হোল। আমি ও উকিলবাবু অনেকরাত্রে বাড়ী ফিরি।

৩রা জানুয়ারি, ১৯৪১। ১৯শে পৌষ, ১৩৪৭। শুক্রবার

সকালে বহুলোক। কানাই সাহা এসে প্রুফ দেখলে ভ্রমণ কাহিনীর[4]। সকালে ছুটি হোল। প্রথমে রমাপ্রসন্নদের আপিসে যাই, গৌর বাবু চা খাওয়ালে। হেঁটে আসবার পথে ফিয়ার লেনের দেবুদের বাড়ী গিয়ে বসে গল্প করি। তারপর M. C. তে এসে সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের[5] সঙ্গে বহুকাল পরে দেখা। মিত্র ও ঘোষে কৃষ্ণদয়ালের সঙ্গে বইয়ের নামকরণ নিয়ে কথাবার্ত্তা। 'অভিযাত্রিক' নাম ঠিক করা গেল। অমর দত্তের সঙ্গে দেখা পথে—বাসায় এল গল্প করতে করতে।

---

১ বিভূতিভূষণের দ্বিতীয়া স্ত্রী। ১৯৪০ সনের ডিসেম্বর মাসে (১৩৪৭, ১৭ই অগ্রহায়ণ) বিভূতিভূষণের সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়।

২ মায়া মুখোপাধ্যায়, কল্যাণীর দিদি।

৩ অধ্যাপক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত এক সাহিত্যসংস্থা।

৪ অভিযাত্রিক।

৫ সাহিত্যিক সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; এঁর নামকরা বই বনস্পতির অভিশাপ, চিত্রবহা, জাপান।

৪ঠা জানুয়ারি, ১৯৪১। ২০শে পৌষ, ১৩৪৭। শনিবার

সকালে এল কানাই সাহা। ভ্রমণ কাহিনীর proof দেখা হোল। তারপর স্কুলে গেলুম। কল্যাণীর পত্র পাই, সে লিখেচে বনগাঁ যেতে। ২টোর ট্রেনে বনগাঁ আসি। কল্যাণীকে নিয়ে খুকুদের বাড়ী গিয়ে কতক্ষণ গল্প করি। গান করলে কল্যাণী। খুকুর বিয়ের পরে সে সব দিনের কথা মনে হয়—কি ওলটপালট হয়ে গেল জীবনের তাই ভাবি। পরিবর্ত্তনই জীবন।

৫ই জানুয়ারি, ১৯৪১। ২১শে পৌষ, ১৩৪৭। রবিবার

সকালে কল্যাণীর সঙ্গে গল্প করলুম ১০টা পর্য্যন্ত। তারপর খুকুর বাড়ী গিয়ে কতক্ষণ গল্প করি। দুপুরে লিখচি, খুকু এল এবাড়ী। তাকে পৌঁছে দিতে বল্লে—তখন বিভূতি এল। কল্যাণীকে সঙ্গে নিয়ে রাজনগরের বটতলা পর্য্যন্ত বেড়িয়ে এলুম [—] বিভূতি ছিল সঙ্গে। শুক্‌নো পাতায় আগুন ধরিয়ে দিই। রাত্রে মন্মথদার আড্ডায় গিয়ে গল্প। কল্যাণী ছাড়তে চায় না—তবুও সে তো ঘুমিয়ে পড়েচে।

পাটিসাপ্‌টা খেয়ে রাত্রে জাহ্নবীর সংসার মনে পড়লো। আটবছরের সংসার—শেষ হয়ে গিয়েছে আর বছর। পরিবর্ত্তন—জীবনের কি পরিবর্ত্তন!

৬ই জানুয়ারি, ১৯৪১। ২২শে পৌষ, ১৩৪৭। সোমবার

সকালে ওদের ঘরে এলার্ম বেজে উঠলো। তখন পাঁচটা। কল্যাণী উঠে জিনিসপত্র গুছিয়ে দিলে ও মায়াদি ও আমি কলকাতা এলুম[১]। গুটকে[২] এল স্টেশনে। মায়াদিদিকে হোস্টেলে রেখে ট্রামে স্কুল। তারপর প্রেমরঞ্জনবাবুর বাড়ী এসে প্রদোষের সঙ্গে গল্প করি। সুপ্রভা যেন বাড়ীর মালিক, আমি ওর বাসাতে ওর ছেলে স্কুলে ভর্ত্তি করতে অনুরোধ করতে এসেচি। স্কুল থেকে প্রবাসী হয়ে বুদ্ধদেব বসুর বাড়ী। বালক কবি এল সেখানে, ১৯শে অভিনন্দন হবে তাই বলতে।

রাত্রে বহুলোক। প্রসাদ (পানিতর) [,] গৌরীশঙ্কর[৩], তারাপদ, অবিনাশ-বাবু (ইন্‌সিওর) ও সর্বশেষে ক্ষিতিনাথবাবু (যশোহর)।

প্রসাদকে বিয়ের গল্প করলুম।

১ মায়া তখন কলকাতায় পড়তেন।

২ অজিত রায়, বারাকপুরবাসী; ইন্দুভূষণ রায়ের ছেলে।

৩ সাহিত্যিক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য।

৭ই জানুয়ারি, ১৯৪১। ২৩শে পৌষ, ১৩৪৭। মঙ্গলবার

সকালে গোপালবাবু[১] (মাতৃভূমি) এসে গল্প করলেন ও লেখা[২] নিয়ে গেলেন। মিত্রের রাঁচী ভ্রমণ ও ওই সঙ্গে দিলুম। স্কুল। হেডমাস্টারের সঙ্গে ছুটির পরে বরুণ মিত্র (মায়া) বলে একটি ছেলের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম ওয়েলেস্‌লি স্ট্রীটে। দুপুরে প্রদোষের বাড়ী প্রেমরঞ্জন বাবুর সঙ্গে দেখা করে এলুম। ওখান থেকে হেঁটে মিত্র ও ঘোষে কপি দিলুম ভ্রমণ কাহিনীর। চা খাচ্চি এমন সময় অপূর্ব্ববাবু[৩] এসে বল্লেন চলুন আমাদের ওখানে। M. C.-তে গিয়ে বাসায় ফিরি। তারপর ইষ্টবেঙ্গল স্টোর গিয়ে কল্যাণীর জন্যে ঢাকাই সাড়ি একখানা কিনি।

৮ই জানুয়ারি, ১৯৪১। ২৪শে পৌষ, ১৩৪৭। বুধবার

সকালে এল বিশ্বনাথ। লিখতে দেরী হয়ে গেল। যখন স্নান করচি, তখন প্রায় ১১টা। উঠে স্কুলে গেলুম। জিনিস নিয়েই এসেছিলুম—বরিশাল এক্সপ্রেসে বনগাঁ। সন্ধ্যায় চমৎকার জ্যোৎস্না উঠলো। কল্যাণী অনেক গান করলে কত রাত পর্য্যন্ত। বিছানায় জ্যোৎস্না পড়েছিল—বেশ লাগলো গানগুলো। রাত ২টায় বোধহয় ঘুমুলাম।

'[?] ভুল ভুলরে'[৪] বলে একটা গান আমার এত ভাল লাগলো!

৯ই জানুয়ারি, ১৯৪১। ২৫শে পৌষ, ১৩৪৭। বৃহস্পতিবার

সকালে উঠে কল্যাণীর সঙ্গে গল্প করলুম। তারপর খুকুর বাড়ী গিয়ে শুনি খুকু বড়ি দিচ্চে—এসে বল্লে—একটু ব্যস্ত আছি। আমি বেরিয়ে মন্মথদা ও বিভূতি মুখুয্যের বাড়ী গেলুম। দুপুরে খেয়ে শুয়েচি—এমন সময় এলেন পশুপতি বাবু ও যুথিকা[৫]। ওঁদের নিয়ে বসলুম, তারপর খুকুদের বাড়ী নিয়ে গেলাম। কল্যাণীকে নিয়ে সবাই মিলে বারাকপুর গেলাম। কল্যাণীকে সব বাড়ীতে

১ সাহিত্যিক গোপাল ভৌমিক; মাতৃভূমির সম্পাদক ছিলেন।

২ কেদার রাজা। ১৩৪৭ সালের অগ্রহায়ণ মাস থেকে উপন্যাসটি মাতৃভূমিতে বেরতে শুরু করে।

৩ সাহিত্যিক অপূর্বমণি দত্ত। এঁর লেখা উপন্যাস সিদ্ধিকবচ, সোনার শাঁখা।

৪ সবই মায়ারই স্বপন/ভুল ভুল মন ভুল রে।

৫ যুথিকা ঘোষ।

ঘোরালেন ওঁরা—নারাণদার[১] বাড়ী। সইমা কল্যাণীকে দেখে চোখের জল ফেললে। আমরা ফিরবার পথে বিলবিলের মধ্যে দিয়ে বকুলতলা দেখিয়ে আমাদের বাড়ী এলুম। আমি আবার ইতিমধ্যে একা বাঁশবনের দিকে বেড়াতে গেলুম। নিস্তব্ধ বনভূমি, এড়াঞ্চি ফুলের শোভা এত ভালো লাগলো। কল্যাণী আমাদের ভিটেতে গিয়ে মায়ের কড়ায় ফুল দিলে, প্রণাম করলে। নদিদের সঙ্গে দেখা করে সবাই মিলে ইন্দু রায়দের[২] মাঠে এসে দাঁড়াই। বারাকপুর থেকে ফিরবার পথে বাঁওড়ের ধার দিয়ে ফিরলুম। খুকুকে তুলে নিয়ে আসা গেল—আমি হেঁটে এলুম। ওদের গান হোল। খুকু, কল্যাণী—সকলের। সন্ধ্যার সময় চলে গেল। আমরা বসে আড্ডা দিই—তারপর খুকুকে পৌঁছে দিয়ে মন্মথদার ওখানে গেলুম।

ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁ মারা গিয়েচেন আজকের খবর। কাল একটা সভা এজন্যে, তাই সকালে বীরেশ্বরবাবুর ও মুন্সেফ বাবুর[৩] কাছে গিয়েছিলুম।

১০ই জানুয়ারি, ১৯৪১। ২৬শে পৌষ, ১৩৪৭। শুক্রবার

সকালে বেলা দশটা পর্য্যন্ত লিখি। তারপর মিটিংএর জন্যে নানাস্থানে ঘুরি, আলো যোগাড় করি প্রফুল্লের[৪] বাড়ী। খুকুর ওখানে খেলুম। এখনও ওদের ছাদের চিলে কোঠার গায়ে দিব্যি রোদ ভাল লাগে—ও বল্লে। রেলিং ধরে বাইরে এসে রোদটা লক্ষ্য করলে অনেকক্ষণ ধরে। আমি বিভূতির ওখান থেকে বাড়ী এলুম চলে। কল্যাণী স্নান করিয়ে দিলে, তারপর আমি একটু বিশ্রাম করলুম। আবার বিকেলে প্রফুল্ল ও মন্মথদার বাড়ী যাই। তারপর ফিরে এলে কল্যাণী সাজগোজ করিয়ে দিলে—সভায় গিয়ে দেখি সভা বসতে দেরী। খুকুর বাড়ী গিয়ে অল্প একটু বসি। ও আশা করেছিল কল্যাণীকে নিয়ে আমি যাবো বিকেলে। পান চাইলুম—খুড়ীমা বল্লে—তুই যা। ও কিছুতেই উঠলো না—খুড়ীমাকে পাঠালে। এ কি রকম ব্যবহার ওর ?

সভাতে মুন্সেফ বাবু প্রবন্ধ পড়লেন। আমি, প্রফুল্ল বক্তৃতা দিলাম। এসে কল্যাণীর সঙ্গে গল্প করলুম অনেকক্ষণ। তারপর ঘুমিয়ে পড়ি।

১ নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বারাকপুরবাসী।

২ ইন্দুভূষণ রায় (পচা), বারাকপুরবাসী।

৩ হরিচরণ ঘোষ।

৪ বনগাঁবাসী।

১১ই জানুয়ারি, ১৯৪১। ২৭শে পৌষ, ১৩৪৭। শনিবার

সকালে লিখে সকলেই বার হই। খুকুদের বাড়ী গেলুম। চশমা পকেট থেকে বার করে পরা অভ্যেস ঠিক আমার আগের মতই আছে। খুকু স্নান করতে ব্যস্ত—দেখা হোল না। আমি অন্য কোথাও বসে গল্প করে এলুম। কল্যাণীরা দুপুরে বেড়াতে গেল—আমি মন্মথদার বাড়ী বসে গল্প করি। সন্ধ্যার পর বিশ্বনাথ এসে ডেকে নিয়ে গেল—মুন্সেফ বাবুর অভিনন্দনপত্র লেখা হোল।

রাত্রে অপূর্ব্ব জ্যোৎস্না।

১২ই জানুয়ারি, ১৯৪১। ২৮শে পৌষ, ১৩৪৭। রবিবার

সকালে মুন্সেফবাবুর অভিনন্দন লিখি—মনোজ বসু এল। সঙ্গে করে গেলুম মুন্সেফবাবুর বাড়ী। সেখান থেকে খুকুদের বাড়ী গিয়ে দেবু,[১] সুরেশের[২] স্ত্রী[৩] প্রভৃতির সঙ্গে গল্প করে বাড়ী ফিরলুম। কল্যাণী স্নান করিয়ে দিলে। তারপর স্কুলে হেড পণ্ডিত মশায়ের অভিনন্দন সভায়[৪] গেলুম। খগেন দা, সৌরীন, হরিপদ চক্রবর্তী প্রভৃতি পুরোনো ছাত্রদের সঙ্গে দেখা। সভায় আমি বক্তৃতা করলুম। তারপর খুকু, দেবু, কল্যাণী [,] সুরেশ বাবুর স্ত্রী ও আমি সবাই মিলে রাজনগরের বটতলায় বেড়াতে গেলুম। সেখানে বটগাছের তলায় আধ আলো (?), আধ অন্ধকারে বসে আমরা কত গান কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদি করলুম। ওখান থেকে ফিরবার পথে জ্যোৎস্না উঠলো। কল্যাণীকে খুকুদের বাড়ী রেখে আমি মুন্সেফবাবুর পার্টিতে এলুম। সেখানে খুকু ও দেবু এসে ডাকলো। বটতলা থেকে বার হবার সময় খুকু বল্লে—চলুন আমরা আলাদা যাই। ওকে দেখলে কষ্ট হয়—যেন একটু খানি মিষ্টিকথার কাঙাল হয়ে পড়েচে। আবার কবে মানকুণ্ডু যাবেন বারবার জিগ্যেস্ করলে।

রাত্রে কল্যাণীকে বকলুম। ও ফোঁস্ ফোঁস্ করে কাঁদতে লাগল। ছেলেমানুষ, বকুনী খেলেই কাঁদে। ভারী মায়া হয়।

১ দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, খুকুর স্বামী।

২ দেবব্রত মুখোপাধ্যায় বন্ধু।

৩ নীলিমা দেবী।

৪ সম্ভবতঃ বনগাঁ স্কুলের হেডপণ্ডিত মশায় কেদারনাথ চক্রবর্তীর বিদায় অভিনন্দন-সভা। ১৮৯৩ সনের ৩রা ফেব্রুয়ারি ইনি বনগাঁ স্কুলে যোগদান করেন।

যখন কাছারীর ঘণ্টা পড়লো alarm bell—তখন যেন মনে হোল জাহ্নবীর বাসায় শীতের রাত্রে শুয়ে আছি। ওর কথা মনে হোল, পুরোনো বাসায় পুরোনো দিনগুলোর কথা মনে হোল—মন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। জাহ্নবী নবদ্বীপে গিয়েছিল, ভাতের হাঁড়ি দেখিয়েছিল জ্ঞান মাছ খেলে—সে সব কথা মনে হোল।

১৩ই জানুয়ারি, ১৯৪১। ২৯শে পৌষ, ১৩৪৭। সোমবার

কল্যাণী আজ যেতে দিলে না—পৌষ সংক্রান্তি। কাল সকলে অফিসার ও মুন্সেফের বিদায়ের জন্য বলেছিল থাকতে। আজ সকালে কল্যাণীকে নিয়ে খুকুদের বাড়ী যাই। তারপর স্নান সেরে বেলা একটার সময় আবার ওদের ওখানে গিয়ে কল্যাণী, নীলিমা, দেবুদের নিয়ে সাতভেয়েতলা এসেছিলুম। ও সেকথা কতবার করে বল্লে। পুলের তলাকার পথ দিয়ে বার বার বল্লে—চলুন যাই, সেবার যাওয়া যতটা হয়েছিল, তা ছাড়িয়ে যাই। যেতে যেতে বল্লুম—রামপদ কই খুকু? রামপদ আজ কোথায়? ও বল্লে—রামপদ আজ নেই—কিন্তু আমরা দুজনে কাছাকাছি আছি—না? বল্লুম—ঠিক। সেই পুলের তলা দিয়ে গেলুম সেবার যতটা গিয়েছিলুম—তার চেয়েও। এবার আর একটি নতুন মেয়ে এসেচে কল্যাণী। সত্যি ও আমাকে বড় ভালবাসে, আজ আমার কি ভাগ্য যে এই সাতভেয়েতলায় বেড়াতে এসেচি—কল্যাণীও সঙ্গে আছে। এমন যে হবে কখনো ভেবেছিলুম? কল্যাণী হাসিতে গানে সমস্ত সময় ভরিয়ে রেখেচে। ওর কথায় সবাই খুসি। খুকু নৌকায় উঠে আসবার সময় বল্লে—তাস খেলবো। তাস খেলা হোল, খুকুর খুব উৎসাহ—কি উৎসাহ তাস খেলায়! পূর্ণচন্দ্র উঠচে ওপারের গাছপালার আড়াল থেকে [—] কল্যাণী, দেবু সবাই দেখলে। আমি এসে মুন্সেফবাবুর পার্টিতে গেলুম। মিটিং শেষ—S. D. O.[১] বসে আর মুন্সেফ্ বসে। খানিকটা আড্ডা দিয়ে এসে দেখি কল্যাণী রান্না করচে। বেশ রাঁধতে পারে। এসে বসলুম ওর কাছে। দেবু খুকু [,] নীলিমা এল। নিমন্ত্রণ ছিল এখানে। খুকু বলে—গল্প বলুন। তিনটা গল্প বলি। অনেক রাত্রে ওরা খেয়ে চলে গেল।

১৪ই জানুয়ারি, ১৯৪১। ১লা মাঘ, ১৩৪৭। মঙ্গলবার

কল্যাণীকে ডাকলুম তখন রাত প্রায় ৪॥০টা। ও বল্লে—এখনও জ্যোৎস্না আছে। ও যেতে দিলে না। দুজনে খুকুর বাড়ী গেলুম। সকলে বসে গল্প করা গেল। কল্যাণীকে নিয়ে ফিরে এলুম। দুপুরে কল্যাণী ঘুমিয়ে পড়লো। আমি

১ মহম্মদ শামসুদ্দীন।

বার হয়ে গল্প করি মন্মথদার বাড়ী। খয়রামারি গেলুম বেড়াতে। সন্ধ্যা হয়ে আসচে। কেবলই এই ছন্নছাড়া সন্ধ্যায় জাহ্নবীর কথা মনে আসে। এতদিন পরে যেন ওর কাছে পুরোনো বাসাটায় গিয়েচি। ও বল্লে—আসুন দাদা। যেন কেঁদে উঠলো—এত দিন যেন ঝগড়া হয়েছিল। আমি যেন ময়দা কিনতে যাচ্চি সন্ধ্যাবেলা। আচ্ছা, আপনি কি আমাকে সেই আগের মত ভালবাসেন? আহা কোথায় চলে গেল! কল্যাণীকে নিয়ে খুকুদের সঙ্গে তাস খেললুম। কল্যাণী ও আমি কত গল্প করি। একদিন ও আমার কাপড়ের সঙ্গে গিঁট দিয়ে রেখেছিল, পাছে আমি পালাই। বড় ভাল লাগে ওকে। রাত্রে কল্যাণী বড় হাসায়। বলে —ঘুমুবেন না।

১৫ই জানুয়ারি, ১৯৪১। ২রা মাঘ, ১৩৪৭। বুধবার

শেষ রাতে আমি কল্যাণীকে উঠিয়ে বলি—ওঠ জিনিসপত্র গোছাতে হবে। ও শীত বলে উঠলো না। বড় ভূতের ভয় আর শীতকাতুরে। তারপর ভোরের ট্রেনে চলে এলুম। এসে হুটু প্রভৃতির পত্র পেলুম। স্কুলে গেল শরৎস্মৃতি সমিতির লোক আমাকে সভাপতিত্ব করতে অনুরোধ করতে। তারপর প্রবাসী অফিসে টাকা নিয়ে গিরিনের ওখানে। গিরিন নেই। রমেশ বাবুর ওখানে এলুম, রমেশও নেই। মিত্র ও ঘোষে এলুম চা খেতে। M. C. হয়ে মেস।

কল্যাণীর জন্যে মন কেমন করচে। ওকে ফেলে এসে মোটে ভাল লাগচে না। ও কেমন হাসায় কথা বলে [—] সর্ব্বদা সে কথা মনে পড়চে। বেশ আনন্দ গিয়েচে ক'দিন।

কল্যাণী সেদিন বেশ বলেছিল—আপনার লেপখানা আপনি গায়ে দিন—আমার লেপ নেবে না! বাবা তো দুখানা লেপ দিয়েচেন।

অথচ সেদিন শীত নেই। আমার লেপের দরকার নেই। কল্যাণী একথা এমন হাসির সুরে বল্লে যে আমি হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ি। কি চমৎকার হাসাতে পারে! এজন্যে বড় ভাল লাগে ওকে। এমন মজার কথা এক একটা বলে!

১৬ই জানুয়ারি, ১৯৪১। ৩রা মাঘ, ১৩৪৭। বৃহস্পতিবার

সকালে কানাই সাহা এসে বক্ বক্ করে সময় খানিকটা নষ্ট করে গেল। কল্যাণীকে পত্র ধীরে সুস্থে লিখতে পারলুম না, স্কুলের বেলা হয়ে গেল। স্কুলে এল শরৎস্মৃতি সমিতির লোক। ওখান থেকে বার হয়ে সজনী দাসের ওখানে গেলুম। পশুপতিবাবু সেদিন বারাকপুর যাওয়ার ফন্দি (?) করেচেন। কল্যাণীর

কথা খুব বলেচেন শুনলুম। ওখান থেকে মায়াদিদির হোস্টেলে এসে দেখা পেলুম না। হেঁটে D. M. Libraryতে এসে খানিকটা বসে চা খেয়ে বারবেলা ক্লাবে এলুম। বালককবি এসেচে, রবিবার আমায় অভিনন্দনের সভাপতি ঠিক করতে। আমি সুরেন মৈত্রকে[১] ফোন করতে উমা ফোন ধরলে—প্রথমে ইংরিজিতে কথা বল্লে—তারপর আমার নাম শুনতে বাংলায় বলতে লাগলো। সভাপতি নির্ব্বাচন এখনো করেনি—নীরদবাবুকেও ফোন্ করলুম। নীরদবাবু কল্যাণীকে নিয়ে আসতে বল্লে ও রবিবারে। অনেকরাত্রে চলে আসি।

১৭ই জানুয়ারি, ১৯৪১। ৪ঠা মাঘ, ১৩৪৭। শুক্রবার

আজ সকালে ঘুম ভেঙে কল্যাণীর কথা মনে হয়েচে। আর কিছুক্ষণ পরে বনগাঁয়ে ও-চিঠি পাবে এখন। রমাপ্রসন্ন, অপূর্ব্ব বাগচী, ? সেই ছেলেটী এল সকালে। সকালে স্কুল ছুটি হতেই গেলুম Bank এ। সেখান থেকে খাতা নিয়ে M. C.তে। সেখান থেকে বাসা। তারপর বুদ্ধদেববাবুর বাড়ী। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী সভায় যাচ্চে শুনে এলুম। হীরু এল সেখানে।

গোপালবাবুর মুখে শুনলুম সুপ্রভা ? থেকে পত্র দিয়েচে। প্রীতিদি এসেচেন কলকাতায়—তাঁর হাতে ওর উপন্যাসের কাপি পাঠিয়েচে।

বারবেলা থেকে শিবু ও আমি হেঁটে বাড়ী চলে আসি।

কল্যাণীকে কলকাতায় আনার জন্যে নীরদবাবু বল্লে—আগামী রবিবারে। কিন্তু সেদিন আমি বিশ্বাসচকে[২] অভিনন্দন নিচ্চি।

১৮ই জানুয়ারি, ১৯৪১। ৫ই মাঘ, ১৩৪৭। শনিবার

স্কুলে যাবার সময় মনে হোল আজ সকালে সকালে বেরিয়েচি। সুতরাং ডাক্তার অমল চৌধুরীর বাড়ীতে রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র রায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। তিনি শয্যাগত—আমায় দেখে খুসি হোলেন। সেখানে গিয়ে দেখি সেবার রাঁচী থেকে ফিরবার পথে যে সন্ন্যাসী মত ছোকরাকে দেখি—সেই ছোকরাই শরৎবাবুর ছেলে—। ছেলেটা খোঁড়া হয়েচে বাতে—অমন সুন্দর চেহারা!...স্কুল থেকে গেলুম ট্রেনে রাজপুর। ফুলিদের বাড়ী যাবার পথে বাঁশবনের ছায়ায় ছায়ায় কেবলই কল্যাণীর গানের সুরটী 'চোখে মুখে লাগে যদি

১ কবি ও অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ('সুরেশ্বর শর্ম্মা'; 'তথাস্তু')। এঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নাম ব্রাউনিঙ পঞ্চাশিকা (১৯৩৯)

২ বারাসতের কাছে।

রে, ওরে মোদের ভাই—মান দোষ নাই—কাটি সামালো'[১] কানে বাজছিল। শুর কি সব ছেলেমানুষি কাণ্ড! আজ শনিবার বৈকাল, এত মন খারাপ হয়েচে এর জন্তে কিছু ভাল লাগচে না কেন?

ফুলির মা রাগ করে চলেচে কোথায়। ফুলি চা করে দিলে। কল্যাণীর কথা অনেক বললুম। বিকেলে সেই পুকুর ঘাটে গিয়ে দাঁড়াই। কেবলই কল্যাণীর কথা বলি এই ইচ্ছে হয়। ভগবান কল্যাণীর মঙ্গল করুন।

সন্ধ্যায় ট্রেনে কলকাতা। গৌরীশঙ্কর এসে ওর লেখা গল্প শোনালে।

ভাল কথা, ওবেলা স্কুলে যাবার পথে হরনাথের সঙ্গে দেখা। সে আমায় অনেক দূর এগিয়ে দিয়ে এল। কানুমামাও[২] এসেছিল ওবেলা। জ্যোতিমামার[৩] যে সব কীর্ত্তি কানু বল্লে তাতে জ্যোতিমামার ওপর অশ্রদ্ধা হয়ে গেল। ছিঃ এমন নীচু মনের মানুষ?

১৯শে জানুয়ারি, ১৯৪১। ৬ই মাঘ, ১৩৪৭। রবিবার

সকালে উঠে এক পাতা লিখতেই বালক কবির বড় ছেলে এসে বল্লে—চলুন, স্টেশনে সবাই এসেচেন। ওকে নিয়ে রমাপ্রসন্নের বাড়ী গেলুম। সে যেতে পারবে না বল্লে। রানী বল্লে—কাকু আসেন নি কেন আপনি? তাড়াতাড়ি স্টেশনে এসে দেখি শৈলজা, প্রভাবতী, বুদ্ধদেব,? সবাই দাঁড়িয়ে। ট্রেন ছাড়লো। দক্ষিণ বারাসাত পৌঁছে সবাই সালতিতে উঠে চলচি—প্রত্যেক গ্রামেই চিতা জ্বলচে। কি ব্যাপার? মনে খটকা লাগলো। লোকে বল্লে এ অঞ্চলে কলেরার মড়ক লেগেচে। বড় ভয় হোল, কেন এরা আমাদের এখানে আনলে? নিজের জন্ত নয়, সেই একটী নিরীহা বালিকা—তার মুখ মনে পড়লো। কল্যাণী! তুই কি বুঝবি কি যেন হয়ে গেল এক মুহূর্ত্তে। মনে হোল ওকে একবার দেখবো। প্রভাবতী ও তার ভাইঝি পূরবী পর্য্যন্ত ভয় পেয়ে গেছে দেখলুম। যা হোক, গ্রামে পৌঁছে গেলুম, সভা হোল। খুব খাওয়ালে। সেই ভীষণ কলেরার মড়ক যে গ্রামে হচ্চে, সেখানে খেতে হোল চক্ষুলজ্জায় পড়ে। কাপুরুষতা দেখাবো কি করে? মরি মরবো। অভিনন্দনের পরে রাত্রে হেঁটে মাঠের মধ্যে দিয়ে রওনা সবাই মিলে—প্রায় ২৫।৩০ জন লোক। শৈলজাকে ডেকে চুপি চুপি বল্লুম—ভাই, আমার স্ত্রীর জন্তে বড় মন কেমন

১ ব্রতচারী গান।

২ নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, কল্যাণীর মামা।

৩ জ্যোতির্ম্ময় মৌলিক।

করচে। ও বল্লে—কেন? বল্লুম—তা কি জানি। চিতা জলতে দেখে পর্য্যন্ত এমনি মনের অবস্থা হয়েচে। ও হাসলে, সান্ত্বনা দিলে। আমার মন যে কি উতলা হোল কি বলবো। সেই দিগন্ত বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে অন্ধকারে দূরের একটি নিরীহা প্রেমময়ীর কণ্ঠস্বর কেবলই কাণে আসে, কান্না পায় যেন। কল্যাণী! আর কি তোকে দেখতে পাবো? কেন এমন মন হোল? মেসে এসেই আগে ঘর খুলে দেখচি দোরের পাশে ওর চিঠি এসে পড়ে আছে কিনা। আছে, আছে! ভগবান তোমায় অজস্র ধন্যবাদ। সত্যিই এমন অদ্ভুত মনের অবস্থা আমার কেন হল আজ? চিঠিখানাও ওর আজ বড় সুন্দর।। কতবার পড়লুম যে! তোকে ক্রমে ক্রমে চিনচি, কল্যাণী। কত ভাগ্যে তোর মত স্ত্রী পাওয়া যায়। হৃদয় আছে তোর। ভগবানকে আবার ধন্যবাদ দিই যে ওকে পেয়েচি।

২০শে জানুয়ারি, ১৯৪১। ৭ই মাঘ, ১৩৪৭। সোমবার

সকালে বিশ্বনাথ এল। কল্যাণীকে পত্র লিখলুম সকলের আগে কারণ সারারাত স্বপ্নের মধ্যেও ওর কথাই মনে এসেচে। তারপর স্কুলে গেলুম—ছেলেদের নিয়ে Zooতে গেলুম কারণ Zoo আজ সকলের জন্যে বিনি পয়সায় খোলা। জলের ধারে একটা গাছে বাদুড় ঝুলচে, উল্লুক গাছের ডালে ডালে লাফিয়ে খেলা করচে—ঠিক যেন আফ্রিকা—কল্যাণীর চিঠিখানা জলের ধারে বসে দুবার পড়লুম। তারপর ছেলেরা ছুটে ছুটে এসে কাছে বসতে লাগলো—বাওবাব গাছ[১] দেখলুম এই প্রথম। কলকাতায় বাওবাব দেখবো, কখনো ভাবিনি, রাঁচির সেই bottle tree[২]। আমাদের দেশের রাস্তায় যে বিলিতি চট্‌কা—এর নাম Eretolobium Saman[৩]—Rain tree[৪]—আমেরিকাই ওর জন্মস্থান। ট্রামে আসতে আবদুল রসিদের সঙ্গে দেখা। তারপর শ্যামাচরণদা আজ স্কুলে এসেছিল ওবেলা [—] তার সঙ্গে নীরদবাবুর ওখানে দেখা করার কথা, কিন্তু ওদের পুরোনো বাসা দেখলুম বদলেচে। সুনীতিবাবুর বাড়ী গিয়ে চা খেয়ে কল্যাণীর কথা বল্লুম। অনেকদিন পরে ইনষ্টিটিউটের সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। তিনি 9/1 Dover Lane এ বাড়ী করেচেন। ফার্ন

১ Adonsonia digitata। আদি জন্মস্থান আফ্রিকা। সংস্কৃতে গোরক্ষী।

২ Brachychiton Sp.।

৩ Enterolobium Saman Prain। আদি জন্মস্থান আমেরিকা। বাঙলায় বিলিতি শিরীষ।

৪ Samanea saman Merr.। আদি জন্মস্থান আমেরিকা।

রোডে নীরদবাবুকে খুঁজে না পেয়ে ট্রেনে কলকাতা ফিরলুম।

২১শে জানুয়ারি, ১৯৪১। ৮ই মাঘ, ১৩৪৭। মঙ্গলবার

সকালে রমাপ্রসন্ন এল। ৮টার সময় ভাবলুম এই সময় কল্যাণী নিশ্চয়ই চিঠি পেয়েচে। স্কুল থেকে গেলুম সরস্বতী পুজোর চাঁদা নিতে বিভূতিদের বাড়ী। সবাই বল্লে—আপনি বিয়ে করলেন আমাদের খাওয়ালেন না। ঘণ্টু এল। ওখানে থেকে—?, হেডপণ্ডিত, ? অমরেশ সবাই মিলে কুমারটুলিতে প্রতিমা বায়না দিতে গেলুম। সেই চায়ের দোকানে খেতে বসে খোলার চালের দিকে চেয়ে মনে পড়লো অন্য বৎসরের কত কথা! সুপ্রভা—বিশেষ করে খুকুর সম্বন্ধে পাটনার মিটিং এর পরে কত কথাই ভেবেছিলুম। এবার কল্যাণী এসে সকল অভাব পূর্ণ করেচে। ওর চিঠিখানা পকেটেই ছিল—ছেলেদের সামনে বের করে পড়তে লজ্জা হোল। চা খেয়ে আমার ছেলেবেলাকার বাড়ীটার সামনে দিয়ে পশুপতি বাবুর বাড়ী এলুম। বৌ ঠাকরুণ বসিয়ে চা ও খাবার খাওয়ালেন। বল্লে —কল্যাণীকে আনলেন না কেন? পশুপতিবাবু বল্লেন—যুথিকা দেবী খুকুর চেয়ে কল্যাণীর বেশী প্রশংসা করেচেন। উনি নিজেও কল্যাণীর খুব প্রশংসা করলেন। উনি বল্লেন, খুকুর চেয়ে কল্যাণীকে ভাল লাগলো [।] কল্যাণী সরলা স্নেহময়ী। খুকুর সারল্য কম। একটু খেলোয়াড় ধরনের। আমি কল্যাণীর চিঠিখানা দেখালুম না—কারণ কল্যাণী হয়তো কি মনে করতে পারে। ওখান থেকে বার হয়ে বাসে M. C. হয়ে মেসে আসতেই অবিনাশ ও কমল এল। সুটুর পত্রও পেলুম আজ।

২২শে জানুয়ারি, ১৯৪১। ৯ই মাঘ, ১৩৪৭। বুধবার

সকালে গোপালবাবু ও রমাপ্রসন্ন। কল্যাণীর পত্র পেয়ে সে বড় ব্যস্ত হয়েচে জেনে ১১টার ট্রেনে বনগাঁ। সে হাসতে হাসতে এল। কত খুশি আমায় দেখে। সন্ধ্যাবেলা সত্যর[১] বাড়ী গিয়ে চা ও খাবার খাই। চারু দত্তের বাড়ী। জাহ্নবীকে একবার চারুদার মা এই বাড়ীতে থাকতে বলেছিল। তারকের[২] বউয়ের[৩] সঙ্গে দেখা হোল। তারপর লিচুতলা হয়ে বাসা। কল্যাণী সারারাত গান করলে—শেষরাত্রে একটু ঘুমিয়ে পড়লো—তাও আমার হাতখানা ধরে রাখলে পাছে পালিয়ে যাই ভোরের ট্রেনে।

---

১ সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, বারাকপুরবাসী; শান্তশীলার ভাইপো।

২ তারক বন্দ্যোপাধ্যায় (জেলি)।

৩ জবা বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৩শে জানুয়ারি, ১৯৪১। ১০ই মাঘ, ১৩৪৭। বৃহস্পতিবার

আসতে পারলুম না কল্যাণীর ব্যাপার দেখে। কিন্তু না এসে ভালই করেচি। বেলা দশটার সময় হঠাৎ জ্বর হোল। বাসায় এসে রৌদ্রে শুয়ে থাকি। কল্যাণী মাথা ধুইয়ে দিলে—বড্ড খুশি জ্বর হয়েচে—কারণ যাওয়া হবে না। দুপুরে ঘুমিয়ে সন্ধ্যায় ? মন্মথদাদের বাসায়। রাত্রে বেশীক্ষণ জাগিনি।

২৪শে জানুয়ারি, ১৯৪১। ১১ই মাঘ, ১৩৪৭। শুক্রবার

আজ সকালে জ্বর চলে গেল। সকালে সবাই মিলে পাহারা দিয়ে রাখলে ছেলেমেয়েরা—পাছে বার হই। কল্যাণী বড় ভালোবাসে—ছেলেমানুষ! তাও দুপুরে বিভূতির দোকানে গিয়ে বসেছিলুম! দুপুরে ঘুমিয়ে উঠে বিকেলে চলে আসবো—কল্যাণীর কি কাণ্ড! কখনো কাঁদে, কখনো রাগ করে। ছেলেমানুষকে কি করে যে বোঝাই। চলে আসতেই হোল মিটিং এর জন্যে। জ্বরও যদি আসতো—তবে ঠিক থাকতুম। রাত্রের ট্রেনে এলুম। স্টেশনে হরিবোলের সঙ্গে দেখা। সে বল্লে—বঙ্কু কলকাতায় আছে।

সারা ট্রেন কল্যাণীর মুখ মনে পড়ছিল। কি করবো—আমার হাতে উপায় নেই কিছু।

২৫শে জানুয়ারি, ১৯৪১। ১২ই মাঘ, ১৩৪৭। শনিবার

সকালে কানাই সাহা এল। স্কুল থেকে বাসায় আসতেই মিটিং এর ? গাড়ী নিয়ে এল। সেখানে গিয়ে ভীষণ বৃষ্টি। ঠাণ্ডা লাগলো খুব। ভয় হোল আবার বুঝি জ্বর দেখা দেয়। রাত ১০ টায় আমি ও রমাপ্রসন্ন ফিরলুম।

২৬শে জানুয়ারি, ১৯৪১। ১৩ই মাঘ, ১৩৪৭। রবিবার

সকালে নীরদ বাবুর বাড়ী বালিগঞ্জে গেলুম। এটা নতুন বাসা ওদের। কত জায়গায় যে গেলুম ওদের সঙ্গে। বেলুড়, দমদমা, পার্ক সার্কাস কলকাতার সব দিক হয়ে গেল। ওখান থেকে বেরুবার সময় ঝম্-ঝম্ করে বৃষ্টি নামলো। নীরদ বাবুর মোটরে ঝাউতলা রোডের মোড়ে নেমে বাসে মণি বোসের বাড়ী আসবো—দেখি বাসে ভূপতি চৌধুরী[1]। সে বল্লে—আপনাদের ফটো বেশ উঠেচে। চলুন দেখাবো মণির বাড়ী। ঘণ্টা খানেক থেকে বাড়ী এলুম চলে। খেয়ে একটু বিশ্রাম করে কল্যাণীকে পত্র লিখি। তারপর ফুলুর (?) মার বাড়ী গিয়ে খানিকটা বসে অপূর্ব্ব বাগচীর বাড়ী গেলুম। সেখানে বহুক্ষণ মুকুলের কথা শুনলুম অপূর্ব্ব বাবুর মুখে। মুকুল মেয়েটা বড় কষ্ট পাবে দেখচি। ওখান থেকে

১ সাহিত্যিক ও ইঞ্জিনিয়ার।

বার হয়ে রমেশ সেনের দোকানে গিয়ে দেখি রমাপ্রসন্ন বসে। দুজনে চলে এলুম College Squareএ। সেখানে তড়ুলাল মাড়োয়ারী খুব তর্ক চালিয়েচে ধর্মসংক্রান্ত। আজ ২০ বছর ধরে এদৃশ্য দেখে আসচি। দুজনে অনেক দিন পরে ফেভারিট্ কেবিনে[১] চা খেলুম। Y. M. C. A.র সেক্রেটারী চক্রবর্ত্তী ঠিক আগের মত এসে আমার সঙ্গে মিটিং এর আলাপ করলে। তারপর রমাপ্রসন্নের সঙ্গে দোকানে এলুম। ভাল কথা, আজ বঙ্কিম এসেছিল মেসে বিকেলে।

২৭শে জানুয়ারি, ১৯৪১। ১৪ই মাঘ, ১৩৪৭। সোমবার

সকালে বাক্স গোছাতে গিয়ে দেখি বাবার হাতের খাতা ও পথের পাঁচালীর MS উইয়ে খেয়ে ফেলেচে - দেখে বড় দুঃখ হোল। স্কুল। সেখান থেকে বিভূতিদের বাড়ী। সেখানে আমার শ্বশুরের এক আত্মীয় সুরেশ[২] বাবুর সঙ্গে দেখা। ওখানে হিরণ্ময়ীকে বসিয়ে গেলুম ট্রামে সজনীর বাড়ী। সজনী বল্লে, শনিবারে শৈবাল গুপ্তের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ [—] যেতেই হবে মিসেস্ গুপ্ত বলেচেন। আমি বল্লুম [,] তা সম্ভব নয়। ওখান থেকে ফিরচি, শৈলজার সঙ্গে দেখা। সে ডেকে নিয়ে চা খাওয়ালে। তাঁর স্ত্রী হাঁসপাতালে [হাসপাতালে] বড় ভুগচে। দুজনে বার হয়ে এলুম কলেজ ষ্ট্রীট। ওখানে Prof. মনোমোহন ঘোষের সঙ্গে দেখা। তিনি আমায় বলতে বলতে চললেন স্যার যদুনাথ সরকার অতি খারাপ লোক [,] রামমোহন রায় সম্বন্ধে তাঁর রিসার্চ সত্যি আর সব মিথ্যে ইত্যাদি। তাঁর হাত অতি কষ্টে এড়ালুম যদি, তখনি কোথা থেকে এলেন মিঃ চক্রবর্ত্তী Y.M.CAর সেক্রেটারী। বল্লে—চলুন মিটিং এ যাবেন না? আমি বল্লুম—বড় ব্যস্ত [—] মিটিং মাথায় থাক। বাড়ি গিয়ে লিখতে হবে। ওদের হাত ছাড়িয়ে চলে এলুম মেসে। ননকু এসে বল্লে [—] Baptist Mission এ সোমবারে আমাকে chief guest হোতে হবে। আমি সোমবার কোথায় থাকি ঠিক নেই, রাজি হলুম না। সুরেনের কাছে গল্প করে এলুম।

২৮শে জানুয়ারি, ১৯৪১। ১৫ই মাঘ, ১৩৪৭। মঙ্গলবার

সকালে লিখি। বিশ্বনাথ এল। কল্যাণীর পত্র এল না কেন? স্কুল থেকে বাড়ী চলে এলুম—খুব বৃষ্টি এল। তারপর সুরেনের সঙ্গে দেখা করতে Midland Hotel এ গেলুম। সেখানে চারু দত্ত বসে তার মায়ের অনেক নিন্দে করচে

১ মির্জাপুর ষ্ট্রীট।

২ কল্যাণী দেবীর মায়ের কাকা।

শুনে এলুম। বাসায় তারাপদ বাবু এল রাত্রে।

২৯শে জানুয়ারি, ১৯৪১। ১৬ই মাঘ, ১৩৪৭। বুধবার

সকালে কল্যাণীর চিঠি এল না? বড় ভাবনা হোল। চিঠি না দিয়ে তো সে থাকে না? স্কুল থেকে প্রবাসী আপিসে—সেখানে বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের[১] সঙ্গে দেখা। বল্লে—কি বিভূতিবাবু, চুপি চুপি বিয়েটা করে ফেললেন? কবে খাওয়াবেন বলুন! শ্যামাচরণদা এসেছিল স্কুলে। আমি টিফিনের সময় ছাদের ওপর। ওকে বসিয়ে গল্প করলুম অনেকক্ষণ।

প্রবাসী আপিস থেকে মায়াদির হোস্টেলে গেলুম। কল্যাণী বলেছিল দেখা করতে। কানু মামা দেখি দাঁড়িয়ে আছে। মায়াদির সঙ্গে কথা বলে ট্রামে এলুম রমেশ সেনের ওখানে, চা খেয়ে বেচু চাটুয্যের ষ্ট্রীট্ দিয়ে বাসায় এসে দেখি উকীল ভূপতি বসে। সে অনেক লেখা এনেচে আমায় দেখাতে। বসে বসে অনেক লেখা শুনতে হোল। কানুমামা বল্লে—সে যাবে না বনগাঁ, মায়াদিকে আমায় নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু যদি সজনীরা যশোর টেনে নিয়ে যায় আমায় [—] তবে বড় মুস্কিলে পড়বো দেখচি। কল্যাণীকে স্টেশনে আসতে লিখলে হোত কিন্তু।

৩০শে জানুয়ারি, ১৯৪১। ১৭ই মাঘ, ১৩৪৭। বৃহস্পতিবার

সকালে লিখি। আজও কল্যাণীর পত্র এল না কেন? শরীর অসুখ করেচে না তো? ভাবনায় পড়েচি ওকে নিয়ে। দেবু এল—বল্লে—কল্যাণী, খুকু, নীলিমা, সবাই মিলে দেবানন্দপুরে যাবার ঠিক করেচে। স্কুলে সকালে ছুটি হোতে ট্রামে চৌরঙ্গী পর্য্যন্ত গেলুম। বৃষ্টি এল—সঙ্গে সঙ্গে air raid এর মহড়ার siren বেজে উঠলো। পুলিশ আর যেতে দেয় না। অগত্যা ব্রিস্টল হোটেলের গাড়ী বারান্দায় দাঁড়িয়ে থেকে যখন All clear signal দিলে তখন air wardenরা পথ ছেড়ে দিলে। ট্রাম থেকে এসে লিখি। তারপর বারবেলা ক্লাবে গেলুম। আজ অনেক লোক এসেচে। একজন কাশী ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলে। রাত দশটার সময় বাসায় ফিরে দেখি প্রবোধ বাবু এসেচে।

৩১শে জানুয়ারি, ১৯৪১। ১৮ই মাঘ, ১৩৪৭। শুক্রবার

সকালে লিখি। Proof নিয়ে গেল অভিযাত্রিকের। স্কুলে গিয়ে সকালে ছুটী হোল। আমি গেলুম ভূপতির আপিসে। কল্যাণীর ফটো দিয়ে—বাসায় এসেই স্টেশনে এলুম। মায়াদি বসেছিল মেসে, ওকে সঙ্গে করে নিয়েই এলুম।

১ কবি; এঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নাম সবহারাদের গান।

মেঘ দেখে ভাবলুম বৃষ্টি হবে—কিন্তু বনগাঁ এসে তত মেঘ দেখা গেল না। কল্যাণীর সঙ্গে দেখা হয়ে ভারি আনন্দ হোল। ওপারে সাহিত্য বাসর। আমায় সভাপতি করে একটা Resolution করে নিয়ে নিল। অনেকরাত্রে পর্য্যন্ত কল্যাণীর সঙ্গে গল্প।

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। ১৯শে মাঘ, ১৩৪৭। শনিবার

সকালে উঠে মন্মথদার বাড়ী বেড়াতে গেলুম। তারপর পাঁচী এসেচে আমাদের পুরোনো বাসায় [—] ওদের পুজো হচ্চে। বাসায় ঢুকে জাহ্নবীর জন্যে কষ্ট হোল। পাঁচী প্রতিমা সাজাচ্চে। স্নান করতেই (?) আসতেই নীরদবাবুরা মোটরে এলেন। ওদের নিয়ে অঞ্জলি দেওয়া হোল। তারপর আমরা সব শুদ্ধ চলে গেলুম বারাকপুরে। হরিপদদা, ইন্দুরায়, গজন এল আমাদের সঙ্গে। আমাদের বাড়ীতে বসে কল্যাণীর গল্প পড়া হোল। তারপর আমরা সরস্বতীপূজোর বিকেলে কুঠীর মাঠে গেলুম কতকাল পরে। সেই বাল্যদিনের জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে এসেছিলুম প্রথম। কল্যাণী কুল পাড়তে লাগলো—মায়াদি বেড়ার মধ্যে গাছে কুল তুললে। আমরা বেলেডাঙায় বটতলা পর্য্যন্ত গিয়ে একটা জায়গায় ছায়ায় কতক্ষণ বসি। কল্যাণী ও মায়াদি গান গাইলে। সঙ্গে সত্য, গঙ্গাচরণের ছেলে[1], গুটকে, ইন্দু ছিল। ওখান থেকে বাঁওড়ের ধারের পথ দিয়ে গোপালনগরে গেলুম স্কুলে। বটগাছগুলো কাটিয়ে ফেলেচে দেখে কষ্ট হলো। সুধীরবাবু সবাইকে চা [,] খাবার খাওয়ালে—তারপর আমরা পুকুরের ধারে মাঠের মধ্যে বেড়াতে গিয়ে নীরদবাবু ও আমি কত আলোচনা করলুম। দিনটা বেশ কাটলো। শিমুল ফুলের শোভা হয়েচে পথে। পরেশ খুড়ো, ইন্দু, হরিপদদা সবাই ছিল। বনগাঁ এসে চা খেয়ে চলে গেল।

২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। ২০শে মাঘ, ১৩৪৭। রবিবার

আমি সকালে উঠে যশোর গেলুম সাহিত্য সভায়। স্টেশনে নেমেই দেখি প্রবোধেন্দুবাবু[2] ও শান্তি দাঁড়িয়ে। মোটর এসেছিল নিতে—ওদের সঙ্গে যেতে যেতে গেলুম টক্কদের বাড়ী। জজসাহেবের বাড়ী থেকে সোজা সভায়। সভায় ক্ষিতিবাবু সভাপতি। আমি প্রথম বক্তৃতা করি। তারপর চাঁচড়া গেলুম সভার পরে। বাবার সঙ্গে প্রথম আমি যখন মাইনর দিতে আসি। জজসাহেবের বাড়ী গিয়ে প্রবোধেন্দু সংস্কৃত আলোচনা করতে লাগলো। আমরা স্নান করে নিয়ে

১ [ছোট] পণ্ডিত রায়, বারাকপুরবাসী।

২ সাহিত্যিক প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর; এঁর নামকরা বই অবনীন্দ্রচরিতম্।

খেতে গেলুম। ক্ষিতিবাবুও নিমন্ত্রিত। সবাই বসে গল্প করে খেলুম। তারপর সবাই বসে গল্প করে মোটরে স্টেশনে আসি। সারাপথ শিমুল গাছে ফুলে ভর্তি। ডাঃ সত্যনারাণ আমাদের ফটো তুললে। মন্মথদার বাড়ী এসে গল্প করে বাড়ী এলুম। কল্যাণী এসে গল্প করলে—তারপর ওরা চা খেতে গেল। আমি মনোজ ও বিভূতি সেদিনকার সভা সম্বন্ধে অনেক কথা বল্লুম। মন্মথদার আড্ডা হয়ে বাড়ী চলে আসি। রাত্রে সকালেই শুয়ে পড়ি—কারণ, শরীর খারাপ ছিল।

৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। ২১শে মাঘ, ১৩৪৭। সোমবার

সকালে উঠে আজ উৎকৃষ্ট পরেটা ভাজা খেলুম—কল্যাণী বল্লে, বেলে দিইচি। স্নানের পূর্ব্বে বার হয়ে মন্মথদার বাড়ী ও আমাদের পুরোনো বাসায় গিয়ে বসি। পাঁচী চা করে নিয়ে এল। মনে হোল জাহ্নবী যেন এখনও রয়েচে। কল্যাণী স্নান করতে গেল গুটকে ও আমার সঙ্গে। তারপর দুপুরে ঘুমিয়ে উঠে মন্মথদার বাড়ী বসে গল্প করি। এসে হালুয়া তৈরি করলুম নিজে—সবাই খেয়ে প্রশংসা করলে। যাবার সময় কল্যাণী কলকাতায় যাবার জন্যে বল্লে। ভাত খেতে খেতে ছুটে এসে আমার হাত ধরে বল্লে—বলুন আপনি রাগ করেন নি? বেশ লাগলো। গুটকে চুরুট নিতে এলো মন্মথদার বাড়ী থেকে, ফিরে গিয়ে বল্লে—কাকীমা আপনাকে আসতে বলচে। সেখানেও খতা[১], মায়াদি বসে। খানিকটা গল্প করতেই দুগগো[২] ডাকতে এল। ননীদার মেয়ের বিয়ে। সেখানে নিমন্ত্রণ খাবার আগে মনোজ আমায় ডেকে লেখা শোনালে। কল্যাণী কাল বলে আপনাকে ফেলে ঘাটশিলায় কি করে থাকবো?

৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। ২২শে মাঘ, ১৩৪৭। মঙ্গলবার

মায়াদিকে নিয়ে আসবো—কল্যাণী বারণ করেছিল—হয়তো থাকতুম। কিন্তু মায়াদিকে নিয়ে আসতেই হবে। মায়াদিকে হোস্টেলে পৌঁছে দিয়ে স্কুল। নরেন সিংহ (মাধবপুরের) স্কুলে এসে গল্প করলে। আমি বাসায় এলুম—আর কোথাও বেরুইনি। কল্যাণীর জন্যে মন আজ বড় খারাপ—কিছু ভাল লাগচে না। একবার ভাবলুম বিকেলের ট্রেনে বনগাঁ যাই। কিন্তু কাল মাতৃভূমির লেখা

১ জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, বনগাঁবাসিনী। এঁদের বাড়ীতে বিভূতিভূষণ ভাড়া থাকতেন।

২ ? দুর্গা চট্টোপাধ্যায়, বনগাঁবাসী; ডাঃ যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে।

তাহলে দেওয়া হয় না।

তারপর এসে হিমালয়ের গল্প শুরু করলে। আমিও জমে গেলুম। বল্লে—কতলোক ভবঘুরে হয়ে গেল হিমালয়ের নেশায়। বাইরের টান বড় ভয়ানক—একবার যার লেগেচে তার আর থাকা চলে কি? দুর্দ্দমনীয় বাইরের টান অসীম অনন্ত—আর বল্লে—টাইগার হিলে সূর্য্যোদয়ের দেখবার জন্যে কত লোকের ভিড়। পৃথিবীর মধ্যে ও দৃশ্য আর কোথাও নেই। আমেরিকান টুরিস্টরা পর্য্যন্ত এসে দাঁড়িয়ে আছে রাত সাড়ে তিনটার সময়। আমি বল্লুম—আলমোড়া থেকে গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের পথে আমি একবার যাবো। নিবিড় হিমারণ্য, বনকুসুমের শোভা—সন্ন্যাসীর মত গৈরিক ধারণ করে আমার বন্ধু গিয়েছিল—আমিও যাবো।

৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। ২৩শে মাঘ, ১৩৪৭। বুধবার

সকালে বিশ্বনাথ এল। তারপর স্কুলে গিয়েই ছুটী হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি চলে এলুম বরিশাল এক্সপ্রেস ধরতে। বেশ লাগলো সারা মাঠটা। কল্যাণীদের বাড়ী আসবার সময় মন্মথদা ডাকলেন। সেখানে গিয়ে বসে গল্প করে চলে এলুম। কল্যাণী ও সুনীতিদি[১] বসে কতক্ষণ গল্প করলে। তারপর আমি একটু গেলুম মন্মথদার আড্ডায়। তখন রাত প্রায় ৯॥০টা। রাত্রে কল্যাণীর শরীর ভাল ছিল না—সে কথা মনে পড়লো। আমি রাত্রে কত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলুম।

৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। ২৪শে মাঘ, ১৩৪৭। বৃহস্পতিবার

সকালে লিখি। মন্মথদার বাড়ী বেড়িয়ে আসি। দুপুরে শুই, সুনীতিদি এসে গল্প করে। তারপর আবার বেড়াতে যাই। কল্যাণীর সঙ্গে তর্ক হোল সন্ধ্যা বেলা। ওকে নিয়ে জ্যোৎস্না রাত্রে বেড়িয়ে আসি ও মন্মথদার আড্ডায় ওকে নিয়ে বসি।

৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। ২৫শে মাঘ, ১৩৪৭। শুক্রবার

সকালে উঠে মন্মথদার বাড়ী। দুপুরে কল্যাণীকে নিয়ে ঘাটশিলায় রওনা। কলকাতায় মেসে এসে ছেলেরা দেখা করতে এল ওর সঙ্গে। তারপর ওকে নিয়ে স্কুহর (?) মার বাড়ী গিয়ে দেখি কেউ নেই। কলেজ স্কোয়ার ঘুরে এসে আমরা রওনা হই। ট্রেনে ভিড় ছিল—তারপরে ভিড় অনেক কমে গেল। রাত দুটোর সময়ে স্টেশনে নেমে ধানক্ষেতের পথ দিয়ে বাসায় এলুম।

১ সুনীতি ভদ্র, বনগাঁবাসিনী।

৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। ২৬শে মাঘ, ১৩৪৭। শনিবার

সকালে উঠে কমলদের[1] বাড়ী গেলুম কল্যাণীকে নিয়ে। তারপর শালবনে অনেকক্ষণ বসলুম। বৈকালে ওদের সবাইকে নিয়ে ফুলডুংরী ও শালবনে বেড়াতে গেলুম। খুব জ্যোৎস্না। ফুলডুংরী উঠে আমরা অনেকক্ষণ বসে থাকি।

৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। ২৭শে মাঘ, ১৩৪৭। রবিবার

এদিন সকালে কমল এই। তখন আমরা ঘুম থেকে উঠিনি—তারপর কল্যাণীকে নিয়ে নদীর ধারে গেলুম বেড়াতে। ফিরে এসে দ্বিজু[2] বাবুর বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ। সন্ধ্যায় কল্যাণীকে সুবর্ণ রেখার ধারে নিয়ে গেলুম বেড়াতে। ডাকতে এল অমর বাবু,[3] বিবেকানন্দ স্মৃতি সভায় সভাপতিত্ব করবার জন্যে। আজ অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নায় কতক্ষণ গিয়ে মাঠের মধ্যে বসে থাকি।

১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। ২৮শে মাঘ, ১৩৪৭। সোমবার

সকালে কোথাও বেরুলাম না, বসে বসে লিখি। তারপর দ্বিজুবাবুর বাড়ীতে বেড়াতে যাই। সন্ধ্যাবেলা কল্যাণীকে নিয়ে সুবর্ণ রেখার মধ্যে পাহাড়ে বেড়াতে গেলাম। জ্যোৎস্নারাত্রে কতক্ষণ রইলুম বসে নদীর ধারে। শান্তিকে সিগারেট আনতে পাঠানো গেল—সে আর ফিরলো না। আমি রাত্রে দ্বিজুবাবুর বাড়ীতে বেড়াতে গেলুম।

১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। ২৯শে মাঘ, ১৩৪৭। মঙ্গলবার

সকালে কল্যাণীকে নিয়ে সুবর্ণরেখা পার হয়ে ওপারে ঝর্ণার ধার ধরে অনেকদূর চলে যাই। একটা পাহাড়ের কাঁটাজঙ্গল পার হয়ে বনের মধ্যে পাথরের ওপর দুজনে বসলুম। তারপর তিনু[4] ঝর্ণার ধারে অনেকক্ষণ বসে জল খেয়ে পাহাড়ে উঠলুম। ফিরতে হয়ে গেল বেলা ৩টা। পাহাড়ের ওপর কি সুন্দর গোল গোলি ফুলের শোভা। সন্ধ্যায় সুবর্ণ সংঘের

১ কমলরানী মিত্র, ঘাটশিলাবাসিনী; লেখিকা। এঁর স্বামী অমর মিত্র, বিভূতিভূষণের বন্ধু।

২ দ্বিজেন্দ্রনাথ মল্লিক, ঘাটশিলাবাসী। এঁর বাড়িতে 'সুবর্ণ সঙ্ঘ' নামে সাহিত্যসংস্থা ছিল।

৩ অমর মিত্র, ঘাটশিলাবাসী; ইনি মৌভাণ্ডার Indian Copper Corporation-এর কর্মী ছিলেন।

৪ সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ('বন্ধু') ছোট ভাই তিনকড়ির নামে বিভূতিভূষণ ঘাটশিলার এক স্থানীয় ঝরনার নাম দেন 'তিনু-ঝর্ণা'।

অধিবেশনে আমরা সবাই গেলুম।

২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। ১৬ই ফাল্গুন, ১৩৪৭। শুক্রবার

ফাল্গুন দিনের অপূর্ব্ব শোভা।

৭ই মার্চ, ১৯৪১। ২৩শে ফাল্গুন, ১৩৪৭। শুক্রবার

এদিনটা ভালই কাটে।

১১ই এপ্রিল, ১৯৪১। ২৮শে চৈত্র, ১৩৪৭। শুক্রবার

আজ ছুটির দিনটা।

২৪শে এপ্রিল, ১৯৪১। ১১ই বৈশাখ, ১৩৪৮। বৃহস্পতিবার

কাল বিকেলে বারাকপুরে এসেচি। যখন গাঁয়ে ঢুকি তখন বেশ ঝড় আরম্ভ হয়েছিল। পরে অবশ্যি থেমে গিয়েছিল। চালকীতে দিদিদের সঙ্গে দেখা করে এসেচি।

৯ মাস পরে বারাকপুরে এসে এত ভাল লাগচে বলবার নয়। বাড়ীটা ঘুরে ঘুরে দেখলাম বারংবার। মনে গর্ব্ব হোল এর সমস্ত জিনিস আমার নিজের হাতে গোছান। লোকে জানে এ বাড়ীর কর্ত্রী আমি। নিজের ওপোর শ্রদ্ধার ভাব হয় নতুন জিনিস এটা, এই অনুভূতি।

রকের ওপাশে বিলবিলের দিকে যে ঠেস চেয়ার ওখানে বসে উনি রাতের খাবার খান, ঘি, মাখন, রুটী, আলুচচ্চরী, দুধ, গুড়। এত ভাল লাগচে বারাকপুর যে বলবার নয়। লিখবার নয়। সমস্ত দিন বড্ড খাটতে হয়েচে। সমস্ত ? নোংরা হয়েছিল। বাবার পুঁথি ও মায়ের কণ্ঠা ঝেড়ে মুছে সাজাই। প্রণাম করি। কি আশ্চর্য্য, আমার শিউলী গাছে আজও ফুল ফোটে। উনি এনে দিয়েছিলেন। আমি বাবার পুঁথির ওপোর ফুলটি দি। বেশ রাত হয়েচে। উনি ও ডাইরী লিখচেন আমার পাশে বসে[১]।

১ এই তারিখের দিনলিপি কল্যাণীর লেখা।

নির্ঘণ্ট